

উৎস আলোক



সিন্দুরের সংকেত, শেষ নয় শুরু
মোল্লা-মুফতি এবং বুদ্ধিজীবী
আবিষ্কারের প্রচার না খ্যাতির লোভ
ওঝারাও সহযোগী হতে পারে

“উন্নয়ন হবে। তোমার বাড়ি ভাঙা
পড়বে। এটা তুমি কীভাবে নেবে?”

যাটি

আমাদের প্রয়াস : টেক্সকোটর ঐতিহ্যে আধুনিকতার বিস্তার

হালিসহর, উঃ ২৪ পরগনা, ৭৪৩১৩৫

: যোগাযোগ :

সূচীপ-অভিজিৎ ☐ ফোন : ২৫৮৮-০৯৭৯/২৫৮৮-১২৭৪/৯৪৩৩৮৮৪৯৭৭

এসো

সহজে শিখি কম্পিউটার

ডাঃ দেবাশিস দাস

মূল্য : ৯৫ টাকা মাত্র

লেখকের সাথে যোগাযোগ :

৫৬৮, ডি আই পি নগর, কলকাতা-৭০০ ১০০।

মোবাইল ফোন : ৯৪৩৩০৮৪৩৭২

প্রাপ্তিস্থান : দশগুপ্ত এন্ড কোং, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা আই টি প্রাঙ্গণ, বিনোদনো পরি, চুচুড়া, মৌসুমী পুস্তকালয়,
শীপারি পাড়া, ঝাঁকুড়া।

প্রাথমিক কম্পিউটার সাক্ষরতার জন্য নির্বেদিত গ্রন্থ লেখক এ বইতে বিশাল কম্পিউটার জগতের শুধুমাত্র অ-আ-ক-ণ
তুলে ধরেছেন। ছাত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন বাংলাভাষী ছাত্র-ছাত্রী, গৃহবধূ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, ডাক্তার ও অন্যান্যদের যারা যে
কোন বয়সে, যে কোন অবস্থায়, নতুন কিছু শিখতে চান।

জনৈক শুভার্থীর সৌজন্যে

সূচিপত্র

সিন্ধুর এ ইতিহাস (যে আমায়)	সৌমেন নাথ	৩
সিন্ধুর শেষ নয়, প্রকৃ	পর্মিষ্ঠা বায়	৬
নবীগ্রামের যাত্রা	চিত্তরঞ্জন পাল	১৫
গান (সিন্ধুর থেকে নবীগ্রাম)	হাফেজ সন্ত	১৭
হেউনের পাতা		১৮
পূর্ব ভারতে পরমানু-শক্তি	সেবতুমান বসু	২০
লক্ষপতি কোটিপতি ভ্রম-প্রতিনিধি	সুমনের কনউল	২৬
মোক্ষা-মুক্তি এবং মুসলিম মুক্তিযোদ্ধা	গিহাসুদ্দিন	২৮
লোহে বিক্রান্ত	শঙ্কু রায়	৩২
আসুন, বাংলায় ফিরি	আশীষ গাতিউ	৩৭
খাড়ির সোভ না পমার বাড়ারনা	মৃণালকান্তি রায়	৩৭
অমাপক সুশীলকুমার মুনোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ও মননে	সুবীর কুমার সেন	৫৩
সমাজ বহলের ধর্ম ছিল অমৃত্যু	মনোজ্যোব সাহা	৪১
মীহারিকা একটি নাম	উৎস মান্নস প্রতিবেদক	৪২
ওগা বনাম আমরা	বিজয় ভট্টাচার্য	৪৬
আবার আমরা উৎসমানুসের - ২০০৬	মুরবী ঘোষ	৪৭
আলফ মানুসের বোভে	বিবর্তন ভট্টাচার্য	৪৮
ইইমেলায় মানুসের পরিবেশের প্রতি	তরকমোহন দাস	

সম্পাদনা □ অলোক বধ্যোপাধ্যায়

উৎস মানুষ

ISSN 0971-5800

বি ডি ৪৯৪, স-টলেক, কলকাতা ৬৪

BD-494, Sali Lake, Kolkata-64

প্রকাশী কার্যালয় — প্রাবী, এস ৬/২, স-টলেক, কলকাতা ১০৬

ফোন : ২৫৫৮ ৬৩২১, ২৫৫৪ ৬১০৪

সম্পাদকীয়র বদলে

১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াশিংটন থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তুপতি
জাফলিন শিয়ার্স সিয়ার্স উপজাতির লোকদের নিয়ন্ত্রণ কেন
তাদের বসতি এলাকা ছেড়ে চলে যেতে কেন না দেখার ইচ্ছা
হাসে আধুনিক সভ্য শহর তখন। তিক যেমন বাঁধ, গাড়ির কয়েকটা,
খারাপ পাওয়ার টেলিফোন ইত্যাদি জ্ঞান, বাস্তব ১৮৫৩ অবধি জ্ঞান
নিয়ন্ত্রণের দ্বিষ্ট গ্রাম জগল ছেড়ে চলে যাবার যুক্তি মেওয়া হয়
আমাদের দেশের যদিবাঁসী বা গরিব মানুষদের। ওয়াশিংটনের
নিয়ন্ত্রণের উত্তর সিয়ার্স উপজাতির প্রথম একটি চিঠি কেন
বাস্তুপতিকে উপজাতির ভাষায় ছিঁনি লসান্দে বড় সত্য।
অন্যদিকে এই চিঠি সত্য পৃথিবীর পরিবেশবর্তীতেও ওয়াশিংটনের
সবচেয়ে সুন্দর ও সরলভাবে প্রকাশ করেছে। বাস্তুপতি এই
লিখিতভাবে গ্রহণ করেছে আতিশুভের আশুনিয়ন্ত্রণের অধিকারের
স্বীকৃতি করে। ইংরেজি থেকে মূল্যায়ন বাংলা অনুবাদের নিয়ন্ত্রিত
আল এখানে ছাপা হল।

ওয়াশিংটনের বড় মাঝা সন্ন্যাসের কাছে

সিয়ার্স উপজাতির প্রথমে চিঠি : ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ

কি করে তোমরা চেয়েছিলে কলের আকাশ,
বিরুদ্ধে উন্নতা? অমর তোমাদের চিত্ত যুগের পরিণত
বাস্তবের সচেতনতা, জ্ঞানের ভিত্তি-নির্ভর আমর
তো এতলোক মলিক নই, তবে তোমরা
(আমাদের থেকে) এতলোক ভিন্নের চেয়েম লোক।

এই পরিচয় প্রতিটি অংশই আমর লোকদের
কাজে পত্রি। পত্রি গল্পের প্রত্যেকটি চক্রেতে ওগা
বাস্তুপতিতে প্রতিটি সূত্রটো, অক্ষরকে বস্তুনিষ্ঠ ওগা
থাকা কুমার, প্রতিটি প্রস্তর, প্রত্যেকটি পত্রের ওগা
আমর লোকদের মর্ম অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিতে পত্রি।
প্রতিটি লোকের ভিতর দিয়ে যে লোকসম গ্রন্থিই হলে
তার লোক মানুষদের স্মৃতি হয়ে নিজে চলতে

মাঝ মানুষদের সূত্রের তাদের নিয়ন্ত্রণের স্পষ্টত,
কুলে লোক আকাশের সূত্রের কাছে চলে যায়, আমরদের
সূত্রকে এই সূত্রের পৃথিবীতে কখনও তোলে না, কেন না
সে লোক মানুষদের মা।

আমরা এই বিরুদ্ধে আল, সেও আমাদের আল
সুগম মুগলি আমরদের সেন, গরিব মোড়া

কিন্তু সবার উত্তর পশ্চিমে এগে আমলের ভাই
পাহাড়ের পাথুরে সব গুল্ম, সবল হাত, ঘোড়ার
বস্ত্রের গানের যে উচ্চতা আর মনের সব তিষ্ঠ
নিম্নে একই পরিচয়।

তাই কখন ওয়ালিউনের বড় মাথা সর্বদা যখন সলে
পাঠায় যে সে আমলের সেল কিন্তু নিজে চান তখন সে
আমলের কাছ থেকে অনেক বেশি তিষ্ঠে চান, বড়
কখন আমলের চানিয়েছে সে আমলের বসে বসে
কিন্তু একটা বিতর্কে অক্ষয় থেকে যেখানে আমরা আসতে
যাচ্ছি: সে আমলের দিতার মতো হবে, আমরা
তার সন্তানের মত হবে। সুতরাং আমরা তার কথা বিবেচনা
তার চেয়ে

কিন্তু এটা এত সহজ নয়। এই ভূমি আমলের কাছে পশ্চিমে
এই যে নীল জল তিলমিল করে দেখে যাচ্ছে এ ওয়
জল নয়, এ আমলের পূর্বপুরুষের রক্ত

যদি আমরা এই ভূমি তোমাদের নিয়ে যিই তাহলে
তোমাদের মনে রাখতে হবে যে এই ভূমি পশ্চিমে।
তোমরা তোমাদের ফেলসোফিতেও নিশ্চয় করে
সেখানে এর পবিত্রতার কথা। তাদের শিবিও যে
এখনকার হুগুওসির পরিচয় জলের মধ্যে দেখতে
পাওয়া যে কোন বসন্তে চাইই আমরা মানুষের
জীবনের কোন না কোন ঘটনার স্মৃতি।

করোনাকাল জলের মর্মের আদর করার ও তার
শিষ্টপুরুষের সব শোনা হবে

নীলবা আমলের ভাই, তারা আমলের কুলা মেটাবে।
নীলবা আমলের কোনো বয়ে নিয়ে যায়, আমলের
ফেলসোফির মুখে থাকার যোগ্য। যদি আমরা
আমলের সেল তোমাদের যিই তাহলে তোমরা মনে
করো, তোমাদের ফেলসোফিতে, শিবিও যে নীলবা
মানুষের ভাই সুতরাং তোমরা নীলবের সে কতমই বড়
কেনো যেমন তোমরা তোমাদের ভাইদের করে
আমরা জানি সবার মানুষকে আমাদের ধরনধারণ
বোঝে না। তার কারণে পৃথিবীর এক অংশের সঙ্গে অন্য
অংশের কোনো তফাত নেই কেননা সে ভিন্নভাষী
গাঠিত বস্তুকারে আসে, নিজের যা দরকার মতিন কাছ

থেকে ভেঙেঝেঙে নিয়ে আসে মন। এই পৃথিবী তার
আইন নয়, তার শত্রু। সে একে জয় করে, প্রাপন
ফেলে নিয়ে যায়।

সে শেতল ফেলে নিয়ে যায় নিজের দিতার ওপর,
তিষ্ঠে মনে করে না। নিতেনু মস্তানদের তাহ থেকে
পৃথিবীকে যে ছুটি করে, তিষ্ঠে মনে করে না
তার শিষ্টপুরুষের কবর, তার মস্তানদের অধিকার
সে ভুলে যায়। তার না এই পৃথিবী, তার ভাই অশ্বল
এসবকে সে মনে করে ছেড়ে। ভিলা পশ্চিম পৃথিবী মতো
কোমলোকা করা, লুট করার ভিত্তি।

তার সোভ এই পৃথিবীকে থেকে ফেলবে, পাতে খাবার
কোন এক মরুভূমি

তোমাদের শব্দগুলির লাল মানুষের জোরে যথা দেয়।
অথবা আমরা লাল মানুষের জালি, তাই কখনই হয়তো এমন হয়।

সবার মানুষেরাও চলে যাবে পৃথিবী থেকে, হয়তো
অন্যদের থেকে এতটী ভাড়াভাড়াই যাবে। একবার নিজের
বিদ্যায় নষ্ট করে, একদিন রাতে নিজের অবজ্ঞাতেই নয়
আটকে মরে যাবে ভূমি।

হয়তো ধরমে হয়ে যাবার সময়েও তোমাদের দেখাবে
উচ্ছল, ঈশ্বরের শক্তির আওতা উপমান কেননা ঈশ্বর
তোমাদের এই সেনে এনেছে, লাল মানুষের ওপরে
আধিপত্য নিয়েছেন কোন বিশল উপল্য নিয়ে

সেই নিয়তি আমাদের কাছে মহা। কেননা তাকে
আমরা কুফতে পারি না যখন সমস্ত মহিষ নিহত হবে, সমস্ত
বুনা ছেড়াগে গোর মানোনে হয়ে যাবে, অরণ্যের প্রতিটি
কমর ভরি হয়ে উঠবে ভিত্তি গড়ে, প্রাণী পাহাড়গুলি
আড়াল করে ফেলবে কথা বলতে থাকা তার

আপজলসতলা কোথায়? সেই

ইপলওলো কোথায়? সেই

বেঁচে থাকা শেষ, কোন বকবে টিকে থাকার ওক

সৌজন্য : 'এক ছাত্রছাত্রী', জানুয়ারি ২০০৭ সংখ্যা।

শি-১০৬বি, সি আই টি রোড দ্বিম ৯ (এম),

চলকাতা ৭০০ ০৪৪

উৎস মানুষ-এর নতুন বই

আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান

পঞ্চাশ টাকা

প্রকাশিত হল

সিসুুর : এ ইতিহাস যে আমার – একটু ফিরে তাকান

সৌমেন নাগ

যক্ষ ভাড়াভাড়ি ইত্যাদি চাইছেন কমপেই। আপনাদের পেছনেস জনতা যে আপনার থেকে তমস্র পিছনে পড়ছে বুঝতে চাইছেন না, এতদিনের অর্জিত বিশ্বাস আর কোটি কোটি মানুষের অর্জিত আস্থাভাণের ইতিহাসের এই হারী আধাধাক্কাে শব্দধারণ করে এত রক্ত ছোটা যায় না। 'রাম নাম সং হ্যাং'—কমি তুলে যাকে শব্দধারণে তুলে সংসার ঘাট নিয়ে যাওয়ার জন্য হুটতে চাইছেন সৌমেন ওজন যে পৃথিবীর মতই ভারী।

অর্ধমিডিস অবশ্য দুর্বল লোককেও ডরলা দৃষ্টিয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, উত্তর টুপেটা একটা লাঠি দিয়ে তিনি এক জামুনের চাপে পৃথিবীর ওজনকেই হাতের ডাসুতে তুলে ধরতে পারেন। তবে সেই লাঠিটার ঠোঁট হতে হবে পৃথিবীর ঠোঁট। থেকে বেশি আর তাকে দিতে হবে পৃথিবীর বাইরে পাঁজরবাগ একধক একটু ভাষণ। কিন্তু কমেছে, আপনার হাতের লাঠিটা যতই মোটা হোক না কেন তার ঠোঁট যে পশ্চিমবঙ্গের মতন এক কুয়াতিস্কুর রাজ্যের সৈন্যের সমান। এর সৈন্যের সঙ্গে অবশ্য আরো দুটা লাঠির ঠোঁট যোগ করার দাবি করতে পারেন। তবে তাদের ঠোঁট যে আরো ছোট। ত্রিশুলা ও কবলের দাপ পৃথিবীর নমনীয়ের সর্বে দানার মতন। এদের বিলিত সৈন্যে পড়িয়ে তো লক্ষ কোটি মানুষের আস্থাভাগ ও বিশ্বাসের এই পৃথিবীর ওজন ন। এই ইতিহাসটির নাম যে মার্কসবাদ।

কৌশলটা অবশ্য (সু) কৌশলই ছিল। কীটা দিয়ে কীটা তোলায় কৌশল তো অতি প্রাচীন। মার্কসবাদের নামাকলী গায়ে মার্কসবাদকে উপড়ে ফেলার কৌশল তো সবাই জানে। এই বোধহয় বর্ণনাত্মিক অস। কিন্তু কৌশলের লড়াইতে তো এত অধীর্থ হলে চাপেনা কমেও। কারণ কৌশলটা ডাক্ষলভাতে যে ধরা পড়ে যায়। তখন এটা বুঝেও হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শত্রু সাধারণ হয়ে যায়। যেমন হয়েছে সিসুুরে। এখনও ধীরে মার্কসবাদের অধে মুক্তির আসা দেখার বিশ্বাসকে কুকে ধরে রেখেছেন তারা যে এই কৌশল ধরে ফেললে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়তে পারেন। একচেটিয়া পৃথিবীর শিরোমণি টাটরে শিল্পমুদ্রার মধ্যে মুক্তির বাণী প্রচারের বিরুদ্ধে তারা মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে যদি একটা সমস্যা হলে পড়েন তবে যে মুক্ত দুনিয়ার মুক্ত বণিকদের প্রতুচসে বিপদের কারা হয়ে পড়বে। শত্রুর দ্বাৰ্ব সিদ্ধ না হলে শত্রুর দরবারে দুর্জমান ভূতাতও কোন জায়গা থাকে না।

চরাসি রাষ্ট্রপতি দাশল উর মন্ত্রী পিনেতে বলেছিলেন 'ঘটনাবলি প্রমাণ করত পারে আমারই তুল হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করতে অস্বিঠ ঠিক। শিরে অস্বিচ্ছিনে, কিন্তু মর্গিয়ে, ঘটনাবলি তো ইতিহাস।'

কখনো আরেকবার ভেবে দেখা যেতে পারে। ইতিহাসটাকে কখনো ধরে অনেকই নিজের আভ্যবহ দাসের ভূমিকায় খাঁচার পুরে রাখতে চাইছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ইতিহাসের পিকা হল আত্মজা ইতিহাস থেকে পিকা নিতে চাই না। ইতিহাসের যে অংশটা মনঃশুভ

হে না তা ইতিহাস থেকেই মুক্ত সেওকটা নিবাপ্ত ভেবে যেন এংশেরাে চোটা করি। পৃথিবীর সব বৈজ্ঞানিক শাসকই যে ইতিহাসকে এটাপুরে আপন অর্জিত মতন তৈরি অবশ্য মুখে ফেলান চোটা কারণে ইতিহাস কিন্তু তাদের ইতিহাসের অবৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ করেছে, যাদের ইতিহাস থেকে মুক্ত সেওয়ার চোটা হারছিল তাদেরই যে ইতিহাস বলে আসলে আসলেই কলহঃ। 'পাণ্ডিত্যবাদের হস্তা' করে ইতিহাস থেকে মোছার চোটা হলেও ইতিহাস কিন্তু 'পাণ্ডিত্যবাদেরই চাপে' করে গিয়েছে। ষাঁও কৃশ-বিন্দু হয়েছেন বট্ট, ইতিহাস তার হত্যাকাণ্ডীর ইতিহাস হযনি। ইতিহাস হয়েছে ষাঁওন ইতিহাস।

গণসি জেদার সিসুুরের ইতিহাস যে টাটরে সিসুুরের ইতিহাস নয়। এন ইতিহাস কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস। টাটরে শিল্প মুদ্রার অনেক আগেই সিসুুর তাপ কৃষক আন্দোলনের মর্গিত্তে ইতিহাসে যে জামনা লগ্নে নির্মিত হতে মুখে ফেলার জন্য বহু ভাড়াভাড়ো করে ফেলেছেন মন কমেওনি। আর তা করতে গিয়ে নিজের পরিচয়কে ইতিহাসেরই অধীকার করতে বাসেছেন তারা। কারণ ৪০-এর ম্পরকে সেই কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস বর্জিত হয়েছিল সংগ্রামী কৃষক-শ্রমিকের দাস্তর আত্মনা দিয়ে। আর সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব ছিল সেমিনকার তারতের কমিউনিষ্ট পার্টি।

একটা স্মৃ অথবা ভক্তি নিতে পারে। ইতিহাসকে মুখে সেওয়ার পেছনে আজকের নবা কমিউনিষ্টদের অজ্ঞতা নাকি জ্ঞানপানীর মতন সেই ইতিহাসকে ঢেকে রাখার চোটা—কোনটা প্রশ্ন ভূমিকা পালন করতে চাইছে। আজকের কমনরেডের হস্ততা জানাই সেই ভক্তিও ওইরামের নামসহ সিসুুরের পাঁচ কৃষক রামের কথা। এরা যেমনি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির তাকে ভবির অধিকার সত্যক লড়াইতে পহিহ হয়েছিলেন সেমিন আভক্তের অনমীয় দুখামই নিতঃ বিশেষ ভক্তি মূখ্যাতীরে হলে এমনও তো অনেক প্রবীণ ব্যক্তি অংশে টপ্পে তো সিসুুরের সেই সাং শহিদের রক্ত ভেঙা ইতিহাসকে সে হস্ততে তুলে যাওয়ার কথা ছিল না। সেমিনকার সেই পহিহদের বহুতর বিনিময়ে পড়া শব্দ করেই আজকের এই ম্হাকরণ নথ্য করা সম্ভব হয়েছিল। একথা বিবেকের মরজয় কোনো এক একাত দুহুতেও সে ইতিহাসে ওকথা না। কারণ শ্রুতি যে বড় নিষ্ঠুর। বিবেক করে সেই শ্রুতি যদি হয় বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার আবরণে ঢাকা। তাই বোধ হয় ভূমি ও ভূমিভাজ্য মন্ত্রী বেকাক মোদো মাঝে মধ্যে কৃষি চর্চি থেকে কৃষকদের এই উচ্ছ্বসের ঘটনায় সেই কৃষক শহিদের শ্রুতিব ভারে প্রতিবাদের দুখে কথা বলে ওঠেন। তাই যল প্রতিবাদী হয়ে কমতার সুখের ঘর থেকে বিভাডিত হবার কৃষ্টি নেহেন, ঘোর কলি মৃগ এমন আশা করা ঠিক নয়।

সিসুুরের ইতিহাস ঐতিহাসিক সংগ্রামী ইতিহাস। নেতৃত্ব ছিলেন সেমিনকার ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি। শহিদের শব্দে সিঁড়ি বনিয়ে লাল বাড়ির কমতার ঘরে শৌছে গিয়ে সেই শহিদের কথা তুলে ফেলেও তাদের উত্তরপুরুষদের রক্ত প্রবাহে সেমিনকার সেই

কলিউনিট নৈরুতের উত্তর আদম এখানে যে তালুক সংগ্রহে যেক
 গিয়ে আসেন। এটাই যে ইতিহাসের পড়ি। জাফা লসলুদে সেই বিখ্যাত
 গল্প "Call of the Wild" নিশ্চয়ই জানাবার পড়া কমিয়ে
 পূর্বকণ্ঠস্বর ডাকতে যে অসীমতা করা যায় না। আজকে যে নিম্নসুত্রে
 কৃষকেরা জমির অধিকার রক্ষায় নব্বিতে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে
 তুলছেন তাদের ব্যক্তি ও যে বৈশিষ্ট্য পূর্বকণ্ঠস্বর ডাকে। ভাল মানুষ আর
 ভাল কনস্ট/আর কেব না ডাব কেব না/বলতে কোনো ধান, হোপের প্রশ
 সে।

কবি হোসেন বা 'দুঃসমন্ব' রচনা করলে ইতিহাসকে জানার
প্রয়োজন নেই, এটা কিন্তু সিক নয়। দুঃসমন্ব একবার প্রবেশ মিল না তাঁর
লিখিত কবিতার কবিতা। মিলারের সহজ সরল ইতিহাস তাঁর সমস্ত
জীবিত হার। স্বতন্ত্র পাবন, সিদ্ধান্তের কবিতার এই বোঝাপনা
বিশুদ্ধভাবে পিছনে রেখে এ কবিতা স্বাধীনভাবে নয়, এ উচ্চ স্থানের
সহজভাবে এটি সমস্ত ইতিহাস।

শিবুর খনন কৃৎসনসমূহই যে নানা বৈবেচিক ধাৰণা
জ্ঞানার কৃত্ত সন্নিহিত। এতদকর জনিতর ভেদেদ সন্নিহিত বসলে ছিল
ইউনিয়ন বোর্ড। ১৭-এর নিৰ্বাচন সকলকর অসক ভাবে নিচে
কমিউনিষ্ট পার্টি নিৰ্বাহিত কৃত্ত সন্নিহিত বসলে ভাবে নেয় কোর্ডের
অধিকার। অসক। জনিতর সন্নিহিতর থেকে যে তোলা তুলন কৃত্ত
সন্নিহিত তার বিকল্প পদ্ধতি প্রতিলোভ।

১৯৪১ : বার্মিন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বরাট্ট মন্ত্রী পরিষদের হয়ে। এখানে বরাট্ট কৃষক সমিতির ভাঙতে নিষুদ্ব পরিষেছিলেন পুণ্ডি বার্মিন। বৃহত্তমসী পুরে অতিথান চলিয়ে কৃষক সমিতির সঙ্গে এই অসম্পূর্ণ শত্রুত গভীরতা প্রেরণ করে বরাট্ট থিয়ে কৃষক সমানুষ্ঠিক ভাবে টোল হিউতে নিয়ে যাওয়া হইল। পুণ্ডিগে এই নির্ভরভার বিতর্ক কঠিক ও এইরায় প্রতিবান অক্লিষ্ট। পুণ্ডি সঙ্গে সঙ্গে টোল চায়ালে কঠিক ও এইরায় উদ্যোগেই নিহত হয়েছিলেন। উভয় প্রতিবানকে নেতাবলি করতে সমগ্র এলাকায় শত্রুত করে নিসিটিরি লাহারায় কৃষক সমিতির সমন্বয় প্রেরণ করে হারলি।

১৯৪৬ সালেই তেভাণা আশ্রমালয়ের টেউ এখানে আচ্ছড়ে পড়েছিল।

১৯৪১। কৃষক সমিতির কর্মী সত্য সত্যি একটা ভয়ে। বিভ্রম
বলি নাহলে এক ভোঁটলার হাঙ্গর খসলো ৬৭৬ নিয়ে ঘরের মজার
সময়ে এসে মাথাতে ওঠ করেছিল এখানে কৃষক মানচিত্র সত্য সত্য
কালে না। কীভাবে এই শাসনীর প্রতিবাদে তার হাত থেকে বন্ধুত্ব
ভেঙে নিয়ে ভেঙে নিয়ে ফেরত গিয়েছিল। বিঃ ২। ২২ কখন কখনকে
কৃষক নিয়ে মাথাতে এসেছিল সেই অভিযোগকে কোন আমল না দিয়ে
কৃষক সমিতির সমস্যা। কেন তার কৃষক ভেঙে গিয়েছিল সেই
অভিযোগে তর্ক না গড়া। কেন দুইরা সহ বেশ করে কখন কখন
কখনের কথা না।

১৯৪১-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি, কিম্বালা পুলিশ থানারী কৃষক পরিষদকে নির্বুল করতে সমগ্র এলাকাতে ঘিরে নিয়ে কৃষক সমিতির সদস্যদের প্রচেষ্টায় কর্তৃত্ব এড়াইল। গ্রামের মেয়েরা সামনের সড়িতে ভাঁড়িয়ে পুলিশের পতিলয়কে বন্ধ করে। পুলিশের বিধি মর্মে যে ডায়েরী হোক কৃষক সমিতিতে নির্বুল করা হবে, প্রত্যেক না সামনের সড়িতে থাকবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধকরিয়া কৃষক দাবী। পুলিশের হাত থেকে তত্ত্ব নিস।

কেন পরীক্ষা, অনুসন্ধান, চর্চা। এ প্রত্যয়ের মাধ্যমে সৃষ্টির আনন্দে সে বেঁচে থাকার অর্থকে খুঁজে পায়। অথচ তাকে হতে হবে টেকনিকের অভ্যুদয় নয়ত জন্মানার। তাদের ইচ্ছা হতে পারে মানুষ পড়ির 'বি' :

এটা হয় না ফলশ্রুতি। কলা হারসে উদ্ভিত জন্ম কিছু মানুষকে তো মবীতি হতেই পারে। কিন্তু কালের উদ্ভিতি :

উদ্ভিতি তো চাই। শিল্পাচার্যের বিবর্তনধিতা কখনও ভ্রম নেই। শিল্পাচার্য এ কৃষি তো একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় যে কৃষিকে হত্যা করে শিল্পাচার্যের ইমানত পড়তে পারে। কৃষির জন্য প্রয়োজন উর্বর ভূমি, শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয় কাঁচামাল ও পরিবায়ন। জালালেপন্থের সেই ভূমি তো এখন উর্বর কৃষিভূমি ছিল না। প্রয়োজন ছিল প্রয়োজনীয় বস্তু আর যোগাযোগের ব্যবস্থা।

উন্নয়নের অর্থ নিশ্চয়ই আরেকের বিনাশ নয়। অথচ এখানে যে সেই বিনাশের মধ্যেই উন্নয়নের ছবি আঁকার কথা বলা হচ্ছে। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ভূমি থেকে উৎস্বহ করা হয়েছে ১ কোটি ৬২ লক্ষ মানুষকে। পুনর্বাসনের সুযোগ পেয়েছে মাত্র ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার। টাটার শিল্প সাম্রাজ্যের প্রয়োজন (মূলত) ইটবাঁধ কেন্দ্র বিস্তৃত অধিগ্রহণ করেছিল ৫০,০০০ একর ভূমি। ৫২,৭৫০টি পরিবার ভূমি থেকে উৎখাত হয়েছিল। কর্মসংস্থান হয়েছিল মাত্র ১১,১১০ জনের। (সূত্র : ভারত সরকার—১৯৮০)।

মাজো নাকি কর্মসংস্থানের বান বইলে। উন্নয়নের মোহময়ী কাকা হুতাঘ ফলতা, ফুলশি, রাকারহাট, সানতলা, গোদমনি—এতে একে কৃষিভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। মাজোর নবিত্ব বেকার সংখ্যা হাউই বাজির মতন উল্লগামী হতে হতে ৮০ লক্ষ হুই হুই করছে।

কী অবস্থা এখন সেই কব খোঁচি ফলতায়? ২৮০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তার সবটাই ছিল কৃষি ভূমি। কলা হয়েছিল মাজোর অবশিষ্টের বানর সঙ্গে কর্মসংস্থানের ভোয়ার আশ্রয়। সরকারি কোষাগার থেকে ঢালা হল ৭০০ কোটি টাকা (১৯৮০-৮১-এর মূল্য মানে)। কর্মসংস্থান হয়েছে ৫০০ জনের। এখানে যারা এসেছে তারা মূলত এডেলি হাউস, এতে কর্মীর প্রয়োজন বৃদ্ধি কম। অর্থাৎ কর্মসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়াল একর প্রতি ০.৭ জন। আর এই অবিকৃত ভূমিতে যখন চাষ হত তখন একর প্রতি কর্মসংস্থান হত ৩.২ জনের।

বেশিপুর মাওয়ার সরকার নেই। সিঁচিএনের অতিক্রম মুখপত্র 'মার্কসবাবী পথ'ই (নভে: ২০০০) এমন একটা তথ্য দিয়ে বাসে আসে। দুর্গাপুর সিনেটর কাজ করে ৫০০ জন কর্মী। পার্শ্ব টাটার সিনেটর কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০০ জনের। গার্মেন্ট দুর্গাপুর সিনেটর কারখানা থেকে আসে। সেখানে কর্মিকের সংখ্যা মাত্র ২০ (দুইশ) জন। বর্ধমান জেলায় বিশেষ প্রকৃতির স্টলবার্ণের আয়মের নিয়েও বলা হয়েছিল জেলায় কর্মসংস্থানের বন্য বইবে। 'মার্কসবাবী পথ'ই জানিয়েছে এখানে কাজ পেয়েছে ১৮ জন। এর মধ্যে হাটী কর্মিকের সংখ্যা মাত্র ৬ জন।

আজকের মেহনতি জনতার মুক্তিযুদ্ধ টাটা সিন্দুর যে যেটির গাড়ি নির্মাণ করবে তাতে কাগাসীর বা অজাণীও মুখাণী গিলির মত হার্পির রথে চড়তে পারবে বলে যেভাবে এ যুগের কুলপুত্রোহিত চট্টোপাধ্যায়-কল হাতুড়া বলেছেন তা জানতে পারলে শরৎ চট্টোপাধ্যায় শব্দই 'অজাণীর স্বপ্ন' লিখে কাগজ ভুলি আর সময় নষ্ট করাটেন কল বলে হয় না।

আবগানটো নিশ্চয়ই হবে অত্যাধুনিক পরীক্ষার মধ্য নির্ভর। অত্যাধুনিক শিল্পের ত্রিভাঙ্গ: হাউজির কলসেই 'তো' রেখে মনে কতজন মানুষ কাজ করতে। মানুষের আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণ করতেও কাজে সরকারেরই 'তো' এগিয়ে আসার কথা ছিল : কতজন চাকরি পাবে, কতজন পাবে সব কিছুই যে তথা চিত্তিক বাসায় প্রয়োজন ছিল : অথচ কাজে সবকিছু টাটা, সিন্দুর গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের এই মনে স্বাভাবিক বিবরণ গোপন করতে চাইতো কেন? এ তো পর-মদুর মুখশ্রুতি নয় যে সাধারণ মানুষের জিতবাদের বিরুদ্ধে জানার অধিকার প্রদত্ত নয়। এখানে তো সাধারণ মানুষের স্বার্থ অভিভূত আছে। তাকে বিচিরে নেওয়ার অধিকার কিছু সাপাট কারে মনেপন মনে খণ্ডন হয়ে না।

কৃষি ভূমিই সমারিষ উপর চিহ্নিত। (সেটা শুধু যে কৃষির দুর্ভাগ্যী কাজের তা তো নয়। একটা পরিবেশকেও গলা টিপে হত্যা করা। কৃষি ভূমি শুধু ফসলের মোলার মোলে না। ভূমি ধরে রাখে কুস্তরের জলতর। লালন করে অসংখ্য কীটপতঙ্গ। এক প্রত্যেকেই পরিবেশের ভারসাম্যের হকা করার জন্য নানা ভূমিকা পালন করে থাকে। একা নহিন হয়ে কিন্তু পরিদ্রুতাও মৃতের হয়ে পরিণত হয়।

হাতে আছে লব্ধ। শিল্পেরে বৃত্ত কলসের কাজে সিত করে হয়েছে টাটার ইমানত গভীর ভাবটো সিনিক হিস্পেল মিডেলের প্রতিদ্ব: করণে পারবেন কমরত:। ইটপাল পেরেছিলেন। মুদ্রাসংকট পেরেছিলেন। কৃষ পেরেছেন (:) কিন্তু ইতিহাস বলে—লব্ধকে পেতে কথা বলে না।

একটি কবিতা পোষন কমরত:। এক অগ্রসর কবি বিদ্যু (১৯৪৬ সালে দুলা ভোজার মৌতাপন অনুষ্ঠিত কিংবা সম্মেলনের উপলক্ষে যে কবিতাটি লিখেছিলেন এতবার দৌটা মল্লম সোধে হয় সিন্দুরের সেই গরিম কৃষকেরা একটা সাফল্য পেতে পারেন

"জন্ম তাদের কৃষাণ ভূমি ক্যানে কলার ইপপারে
কৃষাণের বট পিঠিতে গাছ পলায়ে
যাত্রা তাদের কলির পথে ক্রীড়াকা: বিশেষণ হতে—
কাকসেবা দুপট্ট যে নয় পলায়ে
মীলকমলার আগে সেই গাঙ্গকমল যে ভাগে
তৈরি হাতে নিশাহালা গাঙ্গ তরলমল,
লাল হিস্পেল মলটি কাজে উমার রক্তরাগে
—তার এসেতে কল?"

আজ কমরতের সবকিছুতে সিন্দুরে বোলেছেন। কিন্তু কৃষিতে যেসঙ্গে যে আসে মুখশ্রুতি। আশপাশে যে আবার শব্দে কিসেই হ'ল করে মলা বিতে আসেন। ওনতে পান না, ১৯৪৭ সালে ১৯৯৯ ভূম সেমিনকার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র "খালিনতা"য় প্রকাশিত এক সাংবাদিক আলিবাঈ রচিত সেই আবেগের গান—

"জান আমনি খেতে আমরা
হাসির করলম বন
উঁচু ভূমি সযান করলম
হেসে উঠল ফসল।
আজ সে ছড়ির মালিক আমরা নই
সেই ক্ষিমেও ইলেক
আর থাকার মধ্যে রইল শুধু নৈই নৈই।

কমরতের দরকার কি আর মুখশোলের? টাটা যে উলস রাজার মতন মুখ থেকে বাসে পাড়িয়ে।

সিসুর শেষ নয়, শুরু

শর্মিষ্ঠা রায়

সাদা চোখে

বৃহস্পতি তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পর থেকেই মুসলিম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি একতরফী এমটা পথে যাত্রা শুরু করেছে। শিলাচল—ওখুই শিল্পায়ন। বৃহৎ পুঞ্জির ওপর ভর করা শিল্পায়নের পাশেই উন্নয়নের মূল নজর। সারি কটা হাফেল কৃষির সমস্যা ভিত্তি টেকি, (মডিও এগোতা) কত হাসান এখনও অসহায়দের পরিস্থিতি আছে এমন কীভাবেই বাধ্যতামূলক মুখ্যমন্ত্রী) এবং সারি কটা হাফেল উন্নয়নের উচ্চল ভবিষ্যতের হুমকি ভাবনার বোঝে মনে হচ্ছে, পথ হারানোর সর্বকালের হটাইই কোনো সন পেয়েছিল ফেল'স সমস্যা পেয়ে গেছে।

উন্নয়নের পাশ্চাত্য আধিপত্যের ছায়া

সামাজিক অর্থনীতিতে উন্নয়নের যে সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়ে চলেছে, তা শিল্পায়ন ও মৎস্যায়নের দ্বারা পড়া। বৈজ্ঞানিক বাস্তবের চরিত্র, সীমিত ও নীতি অনুসরণে শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশকে অবশ্যস্বার্থী সমাজ বিবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবেই হিসেবে বলা করে চলেছে ও নব্য জলসী অর্থনীতি। শিল্পের বিকাশ ও কাজের প্রসারণকে অর্থনৈতিক করে দেওয়াই আধুনিকতা। পণ্য উৎপাদন ও পুঞ্জি বণ্টন উন্নয়নের কেন্দ্রে চলেছে এই 'কাজবিক্রিয়' মেনেই উন্নয়ন অর্থনীতি। উন্নয়নের এই স্বাভাবিক নিয়ম মেনে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো উপনিবেশ বিস্তার ও অর্থায়ন করিয়ে গেছে, পণ্য চাহতে সমাজতন্ত্রে। আরও ঐ একই নিয়ম মেনে স্বাধীনতা অর্জনের পর ঐ প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে অর্থনীতিক উন্নয়ন কোন পথে হওয়া উচিত, সেটা বাস্তবে দেয় শিল্পায়ন বর্মী দেশগুলো।

পশ্চিমবঙ্গ এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয় ভারতবর্ষের মতোই। ঘটনার সূত্রপাত এই ২০০৬ সালের যে মাস। অসিদ্ধিমূলি স্ট্রিট মলের সর্বমুখ্য বিক্রেতার খবর জানতে তখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হচ্ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক। এমন সময়ে মাঝে উপস্থিত হলেন আশু সহায়ক জয়দীপ ব্রহ্মোপাধ্যায়। রতন টাটা চিঠি পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রের কোঠার কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে। তার কিছু আগেই জলকটীর সঙ্গিনী গোষ্ঠীর সঙ্গীতার বেনি সাহেবের অভিনয়মূল্য জানিয়েছেন। মুকেশ আব্বাসি পাঠিয়েছেন পুস্তকবন্ধ। একদা 'চোরদের কারিগরে' ছেড়ে বেরিয়ে আসা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দুশমতাই বিবৃতি। একদা টাটা-বিল্ডিং-গোয়েন্দার কল্যাণ হাত কোট-চিঠিরে নেওয়ার লগন নেওয়া সংকটপ্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর থেকে এও বোধহয় এক 'কালচারণাল রেলকলম'।

বর্গা চাকের উত্তীর্ণতা ও বর্তমান

১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ বর্গায়ন আইনে বর্গায়নের অংশ প্রথম স্বীকৃতি পায়। এই আইনে মালিক ও বর্গায়নের প্রাপ্ত সমান

সমন্বিত ছিল। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনে ভাগ্যবিধিতে আরও কিছু সুযোগ সৃষ্টিতে দেওয়া হয়। পরে বামফ্রন্ট সরকার আইন সংশোধন করে বর্গায়নের অংশ আরও বাড়ানোর চেষ্টা করে। এমনকায় নিয়ম হল চাকের ব্যবহৃত ভূমিসম্পত্তি যদি বর্গায়নের ক্ষেত্রে, তাহলে উৎপন্ন ফসলের তিন চতুর্থাংশ তাঁর, আর ভূমির মালিক যদি চাকের জমির অংশ মেনে, তবে অর্ধেক ফসল চাকের, অর্ধেক মালিকের।

১৯৫০ সালের বর্গায়নের আইনে কিছু অধিকার স্বীকৃতি পেলেও বর্গা ভূমিতে চাকের উত্তরাধিকারকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১৯৭০ সালের ভূমি সংস্কার আইনে। তবে, এই আইনের দুর্বলতা হল এখানে নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত বর্গায়নের কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাই অনথিভুক্ত বর্গায়নের প্রায়ই উৎখাত হতে হয়। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে এদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য পঞ্চায়েতকে দৃঢ় করে অপারেশন বর্গা আন্দোলন করে। সেলেক্টেড রেকর্ডে বর্গায়নের নাম নথিভুক্ত করা এবং এই নথিভুক্তিকার কাগজাদেশিক করা হয় এক আইনের মাধ্যমে। এদের মধ্যে অনেক বর্গায়ন অবশ্য পরে চাকবাস হতেছেন, বা মালিকের কল্যাণ মানবার কারণে সেখানে চাক করতে পারেননি। আচ্ছ এই বর্গায়নের অধিকারকে অস্বীকার করেই সি.পি.এম. শিল্পায়ন ঘটতে চাইছে।

চলুন চিনে

কৃষকের অধিকার স্বাক্ষর লড়াইয়ে থাকা ছিলেন সবচেয়ে অগ্রণী তাঁদের বর্তমান অবস্থা জানতে হলে চিনের দিকে তাকানো প্রয়োজন। ঠাঁ-চকতে সংঘাই ছাড়া চিনে থাকা আচ্ছ আর কিছুই দেখতে পান না, তাঁদের জন্য বলি থাকা আর এক গল্প।

নামকর মুন্সে কৃষিজমি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রেলসাইনে ছফটা গুলে পড়ে মেরে তাকচুর করেছিলেন ২৪ মে জিয়াউর রহমানের ক্ষুদ্র গ্রামবাসীরা।

৩০ হেক্টর ভূমিতে একটা শিল্পপার্শ্ব গড়ার কথা ছিল বর্গায়নের প্রথম প্রায়। কৃষি হাজার কৃষকের প্রতিরোধে সেদিন লাঠা লাঠির পালিয়েছিল তিন হাজার পুলিশের হামলার বাহিনী। শেষ পর্যন্ত সাধা নাহয় প্রকাশন। শিল্প পার্শ্ব থেকে ছাড়া কারখানা বাইরে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা তারা ঘোষণা করে। কেমন চেনা চেনা লাগছে না গরুটা।

[সূত্র : ১৩ জুলাই টেনিক স্টেটসম্যান—অসিদ্ধি ঘোষ]

আসুন উন্নয়নের

শিল্পায়নের চারদিকে চা বাগানে প্রোমোটার রাষ্ট্র কায়েদের জন্য উৎখাত করা হয়েছে চা বাগিচা শিল্পকে, এই কার্যকর বহন আশা। উন্নয়নের শিল্প করতে চা শিল্পকেই বোঝায়। এই শিল্প পুঞ্জির পরিবর্তে

অসমিত্বের। একই সঙ্গে পরিবেশের সমৃদ্ধ বেগে দুলাফ অর্জন করা যায়। ১৯৯৭ সালে চাঁদনির জমির উৎপাদিত চাষের বাতাস-মুদা ১ কোটি ৩২ লক্ষ, উৎপাদন মুদা ৪০ লক্ষ টাকার মত।

চাঁদনির চা বাগানের মাফসন দিয়ে চলে গেছে ৩১ নং জাতীয় সড়ক। এই সড়কের দু'পাশের ভূমিও ৩০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার কাঠ।

কোনো চা বাগানের ভূমির মালিক কখনই চা শিল্পের মালিক নন। এর প্রকৃত মালিক রাজা সরকার। রাজা সরকার ৩৩ বছরের শিল্পে চা বাগান স্থাপনের জন্য এই ভূমি দেয়। ভূমি পতিত থাকলে বা বাগান পরিত্যক্ত না করতে পারলে এই শিল্প বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু এখন ১৯৯৭ সালের এক ভূমি পরে দেয়া গেল। চাঁদনির চা-বাগানের কর্তৃপক্ষ ৪০৪-৬৪ একর ভূমি রাজা সরকারকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। রাজা সরকার এই ভূমি মক্কেল গভিয়ে ওঠা লক্ষী টাউনশিপ কোম্পানিতে ১৩.৯২.৮৭.৯৪৭ টাকায় উপনগরী অর্থাৎ প্রোমোশন গ্রান্ড প্রতিষ্ঠান জন্য ৯৯ বছরের শিল্পে হস্তান্তর করেছে। আর বলার কথা, এই কোম্পানিটির মালিক চাঁদনি চা বাগানের মালিক শীপের চ্যাটার্জি।

এখানেই শেষ নয়। এর আর্থিক অনিয়মের প্রমাণও চমকে দেওয়ার মতো। ভূমি ও ভূমি স্বার্থের সঙ্গতির নির্ধারিত যে নব, তাতে এই ৪০৪ একরেরও বেশি ভূমির দাম ১২০ কোটি টাকার কাছাকাছি। বাজার দর আরও বেশি। অথচ, চাঁদনি চা বাগানের মালিককেই সে ভূমি দেওয়া হল ১৪ কোটি টাকায়। শিল্পভিত্তিক অনেক বৈজ্ঞানিক সংগঠন সহ বেশ কিছু দারবান বুদ্ধিভীরী এগ প্রতিবাসে রাষ্ট্রায় নেমেছিলেন। জাতীয় সড়কে গুলি চালিয়ে বু'ভন অসমিককে হত্যা করে চা গাছ তুলে দিয়েছিল পুলিশ। ঠিক টাউনের প্রায় বিনা পয়সায় ভূমি দেওয়ার মতোই চাঁদনির মালিককেও এত কমে ভূমি ছেড়ে দেওয়ার উৎসাহটা সরকারের কেন, তা এক মন্ত বীণ।

[সূত্র : উদ্ভেদ মিছিল-সৌরেন নাথ। একক যাত্রা।
নভেম্বর, ২০০৬]

সিসুরের জমির চরিত্র ও সরকারের টাটাকে আড়াল করার চেষ্টা

সিসুর নিয়ে সংবাদমাধ্যমের এক অংশ ও সরকারি প্রচার যেসব তথ্য দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সিসুর ব্রকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক রামপ্রসাদ ঘোষের লেখা 'কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী সহায়িকা' নামে গত বছর (২০০৪) ২৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বইটি খেতে কিছু তথ্য পিছি।

শ্রীযোষের তথ্য অনুযায়ী সিসুরের মাটি প্রচণ্ড উর্বর, বোরাল। এখানে মোট কৃষি ভূমির পরিমাণ ১০ হাজার ৫২৬ হেক্টর। এর ৮০ শতাংশ, অর্থাৎ, ৮ হাজার ৮০০ হেক্টর সেচসমিতি। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড় বার্ষিক ১৪৭৫ মিলিমিটার।

শাসকমল ভবিত 'অনুর্বর একফসলি' সিসুরে কেমন ফসল হয় তাও বলেছেন ঐ ব্লক আধিকারিক। আমন ধান চাষ হয় ৭৩৪০ হেক্টরে। ১৮০০ হেক্টরে বোরো ধান, ৩২০ হেক্টর কুমিলে আউশ ধান।

৪০০৬ হেক্টর ভূমিতে আলু চাষ হয় বীতকার্যকর সজ্জি হয় ২৪৭৬ হেক্টর ভূমিতে, প্রিন্সিপাল সজ্জি হয় ২৪৭৬ হেক্টরে, তবে বীতকার্যকর ১০০ হেক্টরে।

শ্রুত পট হয়, ২০২২ হেক্টর ভূমিতে। কলা, পেঁপে, আম প্রভৃতি লগিচা ফসল হয় ১০৮০ হেক্টর ভূমিতে। এছাড়াও তিল, বাসম, লসক প্রভৃতি উৎপাদিত, মুগ, কলাই, অত্রহর প্রভৃতি তালশস্য, গমও উৎপাদিত হয়। চাষাবাদ এখানে বহুশক্তি শক্তিত ও উন্নত প্রযুক্তিতে কৃষিকাজে অভ্যস্ত। উৎকৃষ্টমানের চম্পুসুই আলুর চাষ হয় সিসুরে। কলা আলু বীজই-এখানে ৪০০০ মেট্রিক টন। আলুচাষ সমগ্র বংগের দাবল অংশে, তাঁরা বুঝছেন, ঐ অসুভীত থেকে বড় হজাব মেট্রিক টন আলু ফলতে পারে।

ভৈর সাধারণ বাৎসরিক চাউল ১০০০ মেট্রিক টন। তাছাড়া মাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ মিলিয়ে ৭০০০ মেট্রিক টন বাসায়নিক দার বিক্রি হয়। উৎপাদ্য দারও বাতাস উড়ি করেছে। এখন দার চাউল এক মেট্রিক টন।

পরিমার্জনা করে শিল্পে বী বিপুল শস্যের জাতক এই সিসুর Cropping Intensity পা কলা-মিলিডা রামপ্রসাদবাবু বইতে বলা হয়েছে ২২০ শতাংশ।

এমন সোনার ভূমি হার বিনা পয়সায় বুঝাবুঝি তুলে দিলেন টাউনের হাউস। এই ভূমি টাউনা রাজ্যের ভূমিসংস্কার অইনের ফোরে সরাশরিই বিনে নিতে পারত। কিন্তু সেক্ষেত্রে অধিপুত্রের মর্শ ভাগ টাকাই আগে কমা নিতে হত এবং মইই করে তা প্রকল্পে জানতে হত। তা এড়াতেই রাজ্য শিল্পোন্নয়ন মিলনে মাধ্যমে ভূমি কেনা হয়েছে, এমনই অভিযোগ এনেছে নগরিক মণ

সরকারের সর্বশেষ ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি হয়েছে সরকারের নশকে। তখন এই এলাকাকে বলা হত বৃষ্টিসমিতি। তারপর থেকে ওখানে চারটি সরকারি ভূমি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, যিনটি সংস্কার করা ভিভিসি ক্যানাল রয়েছে। উৎপাদন এতটাই বেড়েছে যে ২৭টি ব্যক্তি-মালিকানাযে মিনি পাশ্পলও এখানে চলে। চলে ডিজেল কেরোসিনের কয়েকশো পাশ্পল। এটি এখন সেচসমিতি উন্নত কৃষি এলাকা।

[সূত্র : সৈনিক স্টেটসম্যান, ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৬]

অশান্ত সিসুরের মিনলিপি :

'কৃষি আমাদের ভিত্তি শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। আজ এই শ্লোগান দিয়ে বীরা বাজার মাত করার চেষ্টা করাছেন, বাংলায় চা-পট ও ইলিনিয়ারিং শিল্পে ভাঙ্গা কোলাবার কাছ শেষ করেছেন উঁগা গত ৩০ বছরে। বাংলার এক বিখ্যাত সাংবাদিকের কথায় এদের বাজকর এটাই পাঁড়াম্বে 'আর্যসবায় আমাদের ভিত্তি, পুঞ্জিবাদ আমাদের ভবিষ্যৎ'। টাউনা না আসুন—একথা আজ পর্যন্ত কোন বইই বলেগি। সকলের একটাই দাবি, শিল্প হোক, তবে তা উর্বর কৃষিজমি কান দিয়ে। কিন্তু এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেহ 'কায়কলা' ওহি বন্যোৎসব' বজায়

সামনে কত যে মিথ্যার, অশ্রুচরার চলছে, তা জানতে হলে নিম্নরে একবার যেতেই হবে।

২ ডিসেম্বর '০৬ নিসূর

কোনো প্রতিরোধ আসবে না চাবিফের পক্ষ থেকে। বেড়া সেবার জন্য নিযুক্ত সংস্থা মার্কিনিস্টার্স কার্ণের কর্মী—ইন্টরন্যাশনালের কাছেও শৌকে সেওয়া হয়েছিল অভ্যর্থকণী। তার অগ্নের দিন বিধানসভা তাক্ষর করেছেন তুপনুল বিধায়করা রাজা সরকার তা খুসে দেখাচ্ছেন রাজ্যবাসীকে। তা সেখা নিসূরকে সাময়িকভাবে তুলেছেন রাজ্যবাসী এবং সমতাও সপারিষদ ইসলামপুরে, ভোটের প্রচারে। এমনই মাহেজ্জাক্সে প্রতিরোধহীন ভাবেই কেটে যায় ২ ডিসেম্বরের বেড়া সেওয়ার কাজ। সরকার পক্ষের চট্টিকার সংবাদপত্র পরের দিন হাবিসহ দেখান, কত উৎসাহে নিসূরের মানুষ হাত মিলিয়েছে বেড়া সেবার কাজে। একখণ্ডি অবশ্য বলা হয়নি, সেইসব আভারবাহিনী যা তাদের পরিবারের সেকতর ১০২ টাকা রোকে নিযুক্ত করা হয়েছে (অপ্রকাল্য মজুরি কত, তা জানা যায়নি) যেখানে নির্ধারিত মজুরি ৬৮ টাকা, প্রতিদিন।

মানুষ দেখেছিলেন দু'রে ধাঁড়িয়ে হাজারে হাজারে মানুষ দেখেছিলেন, কীভাবে তাদের সম্মতি না সেওয়া ভবির বুকের ওপর বসছে শামবদ্য আর পুলিশ-ক্যাডারের দাপদাম। কত পুলিশ ছিল সেদিন? বুড়াবুড়ার হাতে '৯৪০ একতরের সম্মতিপত্র' ধাকা সন্তেও অনিন্দক চাবিফের প্রতিরোধ থেকেই সেদিন পুলিশ আনা হয়েছিল কুড়ি হাজার। সুকলা-সুফলা-শ্যামানমা গ্রামটির মানুষের প্রতিরোধে নামতে সময় লেগেছিল একদিন। তারপর ২ ডিসেম্বর কী হল, ওনুন প্রত্যক্ষমণী গোপালনগর পশ্চিমপাড়ার হারানব মন্ডির কাছে।

সকাল থেকে ঝুটি পোতার হেড়াজোড় চলছে। এক থেকে দেড় হাজার মানুষ জড়ো হয়। পুলিশ সহ আভার বাহিনী এগিয়ে আসে তাদের বাধা সেওয়ার জন্য। রবার কুলেট থেকে ওলিঝুটি চলছে। পুলিশ বাড়ির দরজার খিল তোড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে অকথা অত্যাচার চালিয়েছে, বাচ্চা মেয়ে ও বুড়-বুড়াদের ওপরে। মেয়েদের ঘর খেলে জোর করে বের করে জানা ছিড়ে মাথা ঘাটিয়ে সেওয়া হয়েছে। লাঠির বাড়ি মেবে চানালার ঝড় ভেঙেছে পুলিশ। ধানের গালা, খড়ের গালা ও পাটকারির ছুপে আতন ধরিয়েছে। দুশে তাদের অত্যাধা বিস্তি।

২ ডিসেম্বর, সপ্তাহটি এলাকা—নিসূর। এ রাতে যখন মেডিক্যাল টিম নিয়ে আনরা শৌছাই, বাগ্ৰাহাত কলীতলার সন্তপ্ত মানুষ আনাদের বাধা নিলেন বাসেরলভেড়ি যাওয়ার জন্য। আরোষ্ট হওয়ার ভয়ে কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছে না তাদের ধারণা, বেশি রাতে পুলিশ এসে থাকে পারবে তুলে নিয়ে যাবে পরের দিনের বেড়া সেওয়া নিষ্টক করতে।

২ ডিসেম্বর, বিকলে ৪টি, টুচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালের লক আশে পদাশাশি ৪টি বেড়ে ওয়ে আছে বামবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র, ২৬ বছরের ক্লাস সরকার—পায়ে চোটা, বুকের হাড় ভেঙেছে। সি.নি.আই.এম.এল (লিবারেশন) রাটা কর্মিটির সদস্য তপন ঝটগাল—সিন কোন ভেঙেছে। মাথার বিশাল ব্যাডেজ ওরে



চরীরা খলিল হাও

আছেন ফেটমজুর নিলীপ দাস, আর বাসেরলভেড়ির মুড়াগু পাড় কোমরে চোট। দুশন বন্ধুত্বার্থী আছেন পাহারায়। গরাদের বাইরে থেকে কথা বলতে হল।

নিসূর খুসে এসে অতিজ্ঞতা জানালেন সমাজকর্মী অনুসাদা তলোয়ার। বললেন, ওখানে যুদ্ধ চলছে। পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে কৃষকের। ভবির মালিকের অনুমতি ছাড়াই বেড়া সেওয়া হয়েছে ওখানে। এখনও এক তৃতীয়াংশ ভমিতে ধান আছে। মানুষকে ধান আনতে দিচ্ছে না পুলিশ। হারাস করছে। মুড়ি কেড়ে খেয়ে নিচ্ছে। তবু মানুষ এখনও লড়াইয়ের উদ্যম হারান নি। স্যাম্প পেপারে তিনকোটি টেসিমেইন সঙ্গে এনেছেন অনুসাদা, যেখানে কৃষকরা লিখিত দিয়েছেন, তাঁরা ভমি মেননি, সেবেন না।

বেরিতে এসেন। এসেই মেধা ফেটে পড়লেন কোভে। পুততার সঙ্গে জানালেন, বুকের গলায় তিনি নরেন্দ্র মৌরীর কণ্ঠের ওনতে পাচ্ছেন। ওরা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক চার্ট আনছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনত কৃষকদের দিকছে। তিনি যোগদা করলেন, এই আন্দোলন তিনি জাতীয় স্তরে নিয়ে যাবেন।



পায়ে রবার কুলেটের কত

১০ ডিসেম্বর নিসূর : বেলা বায়োটা

উত্তর বাজেমেদিয়াতে পাঁড়াল আনাদের মেডিক্যাল টিমের গাড়ি। আনাদের পরিচয় পেয়ে একে একে এগিয়ে এসেন এলাকার মানুষজন। বেশা হল ৫৭ বছর বয়সী শৈলেশ নাথ দাসের সঙ্গে। সৌমে তিনলো ওজনের রবার কুলেট এসে লেগেছিল পেটে। বাধা-ফোলা কর্মেই তাঁর।

এলেন আরতি পাঁড়া। ২৫ সেপ্টে খাবের লাঠির আঘাতের

স্বাধীনতা আন্দোলন। এবারে ২ ভিসেসবর মাটিতে ফেলে কানন ও শব্দ বুট দিয়ে চেপে ধরেছিল পুলিশ। রাগান্বিত হয়ে কণা কলা নিরাপত্তা নয়। সি. পি. এমের কাভারার আশপাশই ঘুরছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। নিজেদের বাড়িতে বড়কুটো ছেলে পুলিশ ভেঙে আনছে।

এত সন্ত্রাস, তার মধ্যেও চোখ দুটি চকচক করে ওঠে বসুসেবের। উত্তর বাজেন্দারিয়ার মাহিষা পাড়ার বাসিন্দা এই যুবক বলছেন, 'এক বিয়ে ভবিষ্যৎ ৩০,০০০ টাকার আসু চোখ বুজে পাবেন।' পাশেই বসেছিলেন ব্রজমোহন ঝাড়া। বলছেন, 'সবই আমাদের। কিন্তু, আশনারা ওনে যান, শেষ শেষে তবেই ছাড়ব আমরা।'

এসেছেন ৩৮ বছরের তুষারকান্ত শীট। উল্লেখ্য রবার নুলেটের চিকিৎসা। কিংবা ৫৫ বছর বয়সী আতা পাত্রী। না, পুলিশ নয়। পতি পোষাক পরা কাভারার তিনজনকে চেপে ধরে ইট দিয়ে খেঁতলে দিয়েছে। এদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ২৫ সেপ্টেম্বর লাঠি চার্জের পরে। কারা বেছে বেছে এদের বাড়ি চিনিতে দিয়েছিল পুলিশকে?

'জানেন সিঁদি, সেদিন মেধা পাটকর যখন ব্যক্তি ড্রেন পরা শরতানওলোকে চ্যালেঞ্জ করেন, আই. ডি. কার্ড দেখতে চান, ৫০০ ব্যক্তি বৌড়ে পালিয়েছিল। এখন ওই দলদলতলোকে রাত পাহারায় রাখার জন্য ক্যাম্প তৈরি হচ্ছে।'

সৈবক বাসের ধার দিয়ে আসতে পড়ে হিন্দী পাত্রের বাড়ি। জানলার সারি ভেঙে ছত্রখান। সৈবক বাসের পাড় ধরে গণ অনশনে বসেছেন অসংখ্য মানুষ। নিম্নের কৃষিজমি বন্ধা কমিটি (বাজেন্দারি-য়া উত্তর) ক্যানের বসেছেন ২০ জন পুরুষ ও মহিলা। বাড়ির বাচ্চারাও সমিল। 'পাড়া, কলম, ক্যানেরা দেখে ভিকিং অধিগ্রহণ। ভিজাসা করলাম, আশনারা নিকি সেলিন ছুঁবি, আদিত বাধা নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন।' 'হৈ হৈ করে প্রতিবাদ করে উঠলেন সবাই। এগিয়ে এলেন একজন। 'কোন কাগজ থেকে এসেছেন বলুন তো? সবার প্রবন্ধের ছবাব সিঁদি না আমরা।'—আমাদের সঙ্গী স্থানীয় নেতাকে দেখে অবশেষে সবই বললেন।

সেবা হল সনৎ শীটের সঙ্গে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন সব। বললেন কারাবাসের অভিজ্ঞতা। কপির উটা-পাড়া সেভ থেকে পুলিশ কাটতে হয়েছে। তারপর প্রতিবাদ করতে একটা ডালো খাবার দেয়। কোর্টে কেস ওঠেনি। তাতে ওরা ২৮ ঘণ্টা অনশন করেছেন, জামিন পাবার পর অনশন ভেঙেছেন ওরা।

হেটু আসছি, সৈবক বাসের ধার ধরে, হঠাৎ পেছন থেকে ডাকলেন কেউ। এক ভদ্রলোক, জান করছিলেন। আমরা এগিয়ে যেতেই উঠে এলেন। নাম বললেন, কোমল ঝাড়া। ৩৬ বছর ধরে সি. পি. এম. করেছেন। দাবি করলেন, সি. পি. এম. কে এ অঞ্চলে এনেছেন তিনিই। অতীত, অতীত অনশনে বসেছেন ভূপাল বিহারকের সঙ্গে। যোগ্য করার চেষ্টা বললেন, আর ওদের ভোট দেব না।

ওরা বুক দিয়ে আগলে রেখেছে মাটি। বর্ণী হানাদারদের অত্যাচারের সারি নিরন্তর কৃষক অযোগ্যদের নতুন এক ধারা তৈরি করেছে নিম্ন। উঠে এসেছে নানা সৃজনশক্তির পরিচয়। শীঘ্র বাজিয়ে, কীটা

শেষে প্রতিবাদের কণ নতুন নতুন পথ ওরা খোঁজছে। আভ ও বু পড়ায় সেখানকার প্রতিটি বাড়িতে কালো পতাকা উড়ছে।

এলান শাসনভেঙিত। একটা মৌজা যেন তরল হয়ে গেছে। কিনয় লাসের দুটো ঘরের ছিটকিনি ভেঙে পুলিশ ঢুকছিল। ঘরে তখন অতঃস্থতা স্ত্রী সোনালি ও তিন বছরের শিশুকন্যা বিলিশ। ভয়ে বুক হয়ে গেছে। ছিটকিনি সারানো হয়ে গেলেও মেয়ে আর পাগালত নিজে না।

পাশের বাড়িটা ভাঙতী লাসের। বড় নিয়ে অঘাত করে যান হাতের তালু ছিটকিনি করে নিয়ে গেছে পুলিশ। মহিলায় অপরূহ, তিনি ছেলেকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন।



মোহন দাস, পেছনে পুলিশ তালু

যেমন দাস, পেছনে পুলিশ তালু। ছোট্ট এলেন মীরা দাস। ভাড়া দরজার পান্নাটা খাড়া করে আঁক রাখাও চেষ্টা। পুলিশ ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছে সন্তানকে। সেওর রাড ওরফে বড়কুমার মিত্রকে মারতে মারতে ছান থেকে পাশের বাড়ির চালে ফেলে দিয়েছে পুলিশ। সুশীল দাসের ২ বছরের মেয়ে বিবিতাও বান যাবনি। কানে-গলায় কাচের টুকরো ঢুকে গেছে এই ছোট্ট শিশুটির।

এঁদের অপরূহ এরা ভবিষ্যৎ নেননি। কিন্তু বেছে বেছে এদের বাড়িওলো পুলিশকে চিনিতে মিলি কারা? ২৯ নভেম্বর নিম্নের ভবিষ্যৎ বিমান বসু-কিনয় কোমলার ঘমকি দিয়েছিলেন যে, সাধারণ মানুষ নকি বিরোধীদের পেটোবে। তা, এরাই বৃষ্টি সেইসব সাধারণ মানুষ?'

একটা অঞ্চলকে ভেঙে-চুরে বণ্ড খণ্ড করে দিয়ে ওরা সন নিতে ঢুকছিল বুকন বড়ই এর সোকানে। সোকানের মালগর সব লুট হয়ে গেছে। যা পেরেছে রায়-পুলিশ ধোয়েছে। কুড়ি থেকে ডালন-ডালন ভিম বের করে গেলুয়া বেলেছে। ভাঙুর করেছে শিশি-বাসে।

সোকানের পেছনেই বাড়ি অরবিন পাত্রের। কাগজ-কলম-ক্যামেরা দেখে ফুঁসে উঠলেন অরবিন। সবা ছেলে থেকে ফিরেছেন। 'কোন কাগজ থেকে আসছেন? বুড়ের লোক যদি হন, তাহলে ওখান থেকেই আসুন।' আমাদের স্থানীয় বন্ধুদের আশাস পেয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। মেঝেতে ছড়ানো আদুরী সীত। ঘরের টিউব লাইট ভেঙে খানখান করে গিয়ে গেছে পুলিশ। দরজার পান্না টুকরো টুকরো। ঘরে ঢুকে মীননাথ পাত্রের মেয়েদের অস্ত্রী ভাবায় গালিগালাজ করেছে।

তাই অশোক পাথরে বাড়িটা একটু দূরে। অবলম্বন বাড়ি থেকে পুলিশ গেছে ওখানে। ওরা লুকিয়ে ছিলেন ঘাটের তলায়। রাত্তি করছিলেন সনকা পায়া। দরজা ভেঙে ঘাটের তলা থেকে বের করে ইসুবার মত পিটিয়েছে পুলিশ। ১২ বছরের মেয়ে কুমাকে ধরে নিয়ে ভেসে পুড়ে গিয়েছে। হৃদয় গভিয়ে বিকল। আমরা ফিরছি বেড়াগেড়ি হয়ে। শীতলা মাতা শক্তি সংঘের সামনে প্রচুর ভিড়। ক্লাবের পাশেই চতুর্মুখ প্রাসাদ ১৪ জন অনশনে বসেছেন। ওদেরই সুপে বয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ জেত মন্ডুর সমিতির সংগঠকরা। বয়েছেন অনুগাথা ভোগোয়ার। ভবি সেননি—সেবন না—এই লপথ নিয়ে সমাবেত হ্রসের কামোবের সামনে হাতে বলিল নিয়ে ছবি ছিলেন শ'শংক কৃষক।

কমিটির তরকে হ্রসেনজিত দাস বললেন, তাদের কাছে ৪৫০ একর ভবির হিসাব এসেছে, যারা কেননতেই টাটার গাড়ি প্রকল্পে ভবি সেননি, বা সেবন না।

বিদেব অগো কন আসছে। আমরা ফিরছি আলপথ ধরে। পথে পড়ল নিউ উজ্জল সংঘ। মাস্টারবেশাই প্রমুখ মাটি মশ জনকে নিয়ে অনশনে বসেছেন। এই সেই নিউ উজ্জল সংঘ, যেখানে প্রথম টাটার গাড়ি অটকানো হয়েছিল।

এখন চেক ফেরত দিতে চাইছেন অনেকেই :

লড়াইটা যে এই উচ্চতায় পৌঁছবে, তা কে ভেবেছিল? অনেকেই ভয়ে-ভাবনায়-বলকিতে ভবি নিয়ে চেক নিয়েছিলেন। আজ অনেকেই আসছেন চেক ফেরত দিয়ে ভবি ফেরত পেতে। রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনকে দেওয়া বিপ্লবটি সিআইডি-ও জানিয়েছে, এমন সিসুবে অনেক কৃষক আছেন, যারা ভবি ছাড়তে রাজি নন। এলাকায় রটে গিয়েছিল, তলে তলে সবাই ভবি দিয়ে নিরাছে। ফলে অনেক অনিশ্চয়ও এগুবে পা বাড়িয়েছিলেন। প্রদাসন জোর করে বেড়া সেবার পর কৃষি ভবি রকম কমিটি অনিশ্চয় চাহিদের তালিকা তৈরি করায় প্রকৃত তথা চাহিদের সামনে এসে পড়েছে। আর তা দেখেই বৈকে বসেছেন অনেকেই। যেমন বেড়াযেবির বাসিন্দা অনন্ত ঘোষ। ভবি যেহেতু মিউটেশন হয়নি, তাই জতিপূরণের তালিকার আগের মালিকের নাম উঠেছিল। তাঁকে বলা হয়, তিনি টাকা না নিলে আগের মালিককে টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। সেই ভয়ে টাকা নিয়েছিলেন তিনি। এখন শক্তিরাম ঘোষের মত তিনিও চেক ফেরত দিয়ে ভবি ফেরত পেতে চান।

কুমো মালিক

সিসুবে কৃষিভবি নিয়ে আশোলনকে জাতীয় স্তরে নিয়ে গেছেন মেধা পাটেকর। শাসক শ্রেণীর খুব কেড়ে নিয়েছেন। তাঁকে বোকঝিলা করতে এসেন কৃষা করায়ত। কৃষিভবি রকম কমিটির প্রচার ভেঁতা করতে ভবি দাতা কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে সিসুবের কৃষকদের নিয়ে এসে সভা করলেন ধর্মতলা রানি রাসমণি রোডে। এ বিনের সমাবেশে শ'ভিকের বৈশি লোক আসেনি। (সূত্র : বর্তমান ১০ ডিসেম্বর)। সরকারি হিসাব মত ১১ হাজার ১১০ জন চাবি বেছায় ভবি নিলেও

এদিন বেছায় ভবি নিয়েছেন বলে স্বাক্ষর করেছেন মাত্র ৪২ জন। বিভিন্ন মিডিয়া ঘাসের 'ভবি দানের বেছায়প্রত্ন' নিয়েছে বলে দেখাচ্ছে, সেই পোকার কইদাস, ভয়মের কইদাস, কচি ঘোষ, ভুজ, মাদা, সুদাস, বতন কোলে, বমা—ভারা সবাই মলুইগাছার বাসিন্দা। এক হুটাক ভবিও ভাসের টাটার মলম করা এলাকায় পড়েনি। কুমো ভবির মালিকের তালিকায় বাড়ছে আরও নাম—ভয়ন্ত মালিক, বরীন ঘোষ, প্রশান্ত মালিক, ভিনীপ বায়। ভয়ন্তের মতো থেকে উঠে আসছে বোম 'সি.পি.এম. আর মিডিয়া পয়সা নিয়ে গ্রামের কয়েকজনকে কিনে নিয়েছে। সেলাই-কোড়াই শ্রমিকসংগঠন ক্রান্তি কাক শিথিয়ে চাকরি দেওয়ার চোপ ফেলে ঘাসের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ভাসেরও কারও ভবি নেই যেবা জায়গার। যেমন—গামল মালিক, শ্রীকান্ত সাধুবা, সুকুমার সাধুবাের স্বীদার নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

(সূত্র : একদিন : ২২ ডিসেম্বর, ২০০৬)

এই মুক্কা উপত্যকা ...

২৫ সেপ্টেম্বর লাইভার্ড কেড়ে নিয়েছিল তরতাতা যুবক রাজকুমার তুলকে। ওকে ফেলে পিটিয়েছিল পুলিশ। আর ১৮ ডিসেম্বর ভোররাত্তে খুন করা হল ভাপসী মালিককে। ভোর পাটায় ভাপসী যখন প্রান্ত:কৃত্য সারতে টাটারে চান অধিকৃত ভবিতো গিয়েছিল, তখন তাকে নৃনসেভাবে খুন করা হয়। খুনের ঘটনায় ত্বরিত শোকাহত কৃষকরা এবং ভাপসীর না-বাবা অভিযোগের আড়াল তুলেছেন সেদিন রাত্তে যারা পাহারায় ছিল সেই সিপিএমের ওওবাধিনীর দিকে। ভাপসীকে খুন করে আওন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার গলা থেকে ইট পর্যন্ত। ওর জিত বেরিয়ে ছিল।



কালো পতাকা

ভাপসীর বাবা অনারজন মালিকের নিজের ভবি নেই। মাত্ত বিক্রি করেন। তবু, ভাপসী যোগ দিয়েছিল কৃষি ভবি স্বাক্ষর আশোলনে। তাকে ধর্ষণ করে শ্বাসরোধ করে গায়ে আওন দিয়ে ছালিয়ে দেওয়া হয়েছিল লম্বী পুছোর খিড়ি রাত্তা করার উনুনে—এমনই মনে করছেন গ্রামবাসীরা। সি.আই.ডি. তদন্ত করেছে। সি.বি.আইও তদন্তে নেমেছে। কিন্তু হ্রত্যাকেই বাস্তব একে 'প্রেমঘটিত আত্মহত্যা' বলে প্রদান করেছে।

যাদের দিকে শুল্ক গ্রামবাসীদের সম্মুখের দাঁড়, সেই পাহারাদারদের চেজাই করিয়ে দিই। আর থেকে পাওয়া চুল ও জোশের ধারে রক্তের এরা ফোঁসে মানুষের নয়, পাঁচ। ১০ ডিসেম্বর, তৈমিক স্টেটসমানের অধীর্ভূত বলয়ে—‘যদিওর রাতেও বসিনা হলে এমন কিছু নিরাপত্তা সেদিন পুলিশ। তার ফলে পুলিশ আরও প্রশংসা পেয়েছে।’

‘বহিরাগত’ কারা?

২ ডিসেম্বর সিন্ডুরে অমানুষিক প্রতিজ্ঞার দৃশ্য অধিকাংশ মিডিয়াই মানুষের কাছে তুলে ধরেছিল। আর তখন থেকেই সর্বত্র ‘বহিরাগত’ মেঘেঘন সরকার। আসুন দেখি, সেদিন পুলিশ যাদের গ্রেফতার করেছে, তাদের কতজন বহিরাগত?

সিন্ডুর থানা, কেস নম্বর ১৫০/৩০ নেওড়াবেক পুলিশ চন্দননগর আদালতে যাদের নার পেশ করেছে, তাদের প্রথম তের জনের বাবো জন্মই বাসরেভেড়ির, একজন বেড়াবেড়ির। ১৫০ নম্বর কেসেই ওকালতনামার আর এক পাতায় মশ জনের মধ্যে আছেন বেড়াবেড়ি, বাসের ভেড়ি ও বায়েমেলিয়ার বাসিন্দারা। ১৫১ নম্বর কেসের ওকালতনামায় আছে ২১ জনের নাম। তাঁদের মধ্যে একজন হরিপালের, কামবাড়িরা হুত বেড়াবেড়ির, নম্বোতা বাসরেভেড়ির।

এদের মধ্যে আছেন বাট বছরের বৃদ্ধা শঙ্করী কোল, ১২ বছরের সুন্য পাড়া, ১৫ বছরের সোনা খাড়া। কী কেস নেওড়া হাফতে এদের কিছুতে ওনয়েন? রয়েছে ভারতীয় গণবিধির ৫৯৭ ধারা। আছে ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৮৬, ৪৪৭, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪ ধারাকে ভয়ঙ্কর সব অভিযোগ—মারায়ক অস্ত্রহাতে হামলা, সরকারি অফিসারকে ধাধা, পুলিশকে সাংঘাতিক ভাবে আহত করা।

বাইরের লোক বলতে তিনজন। চুটুড়া ইমানবাড়া হাসপাতালে অর্ধমৃত সিলীপ দাস—এই মিনমুদুর পুলিশবাসের লোক। আর রয়েছে ঘাঘপূর বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্শনের ছাত্রা বিলাস সরকার। আর সি.পি.আই.এম.এল কর্মী তপন ঘটগ্যাল। তিনজনই হাসপাতালে।

ওই সব মারায়ক কাণ্ডকরকানি কি এরা খালি হাতেই করেছিল? করে নিজেবাই আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল? একমাত্র মহিলা ডিসএলি সোমা দাস ভয়েমেলিয়ার নারি। হোমে ভর্তি হয়ে ৩ ডিসেম্বর ছাড়া পেরেছেন। তাছাড়া, পুলিশ কোন সিদ্ধার লিস্টও সেদিন! ‘এবদিন’ পত্রিকার সম্পাদক সুমন চট্টোপাধ্যায় এ বিবরণে ৮ ডিসেম্বর কী কলছেন—ওনি—

‘নবিনার সিন্ডুরের গ্রামে পুলিশ সন্ত্রাসের পর যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, সরকারের অভিযোগ, তাঁরা অনেকেই নাকি ‘বহিরাগত’। এবং সেইটাই তাঁদের অন্যতম অপরাধ। এর চেয়ে কিছু ফাসিবাদী কুযুক্তি বাকি জ্ঞানায় কেউ কখনও পোনেদিন।

সিন্ডুরের কৃষক আন্দোলনে সিন্ডুরের বাইরের মানুষ, সংগঠন, বা রাজনৈতিক দল সমর্থন জানাতে পারবে না, কিংবা গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়াতে পারবে না, এমন ফড়তারা সভা গণতান্ত্রিক সমাবেশ

নেওড়ার অধিকার মন্ত্রণালয় বা আদিনিমিত্তকে দিল কে?’ সি.পি.এম নেতৃত্ব, রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের এই সূত্রিতক নিরুপার্থ্য কবায় অর্থ দাঁড়ায় একটাই। তাহলে কোলো আন্দোলনে সেই এলাকায় বাইরের লোক অংশ নিতে পারবে না। এই যুক্তি মনস্তত্ব হলে সর্বত্র সিটি ও কৃষক সরকার সব নেতৃত্বকে কোলো ভরতে হয়। তেনেমা বহিরাগত হিসাবেই তাঁরা বিভিন্ন কারখানা ও শিল্প ক্ষেত্রে যান এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলে পারেন। সমগ্রিত তথা-প্রযুক্তি শিল্পে ইউনিয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সি.পি.এম যে সব নেতৃত্বকে মনোনীত করেছে, তাঁরা কেউ তথা প্রযুক্তির লোক নয়। সিন্ডুরে যাওঁয়ার জন্য ঘাঘপূর বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নেতৃত্বকে যদি গ্রেফতার করে হয়, তাহলে বিধাননগরে স্টেটস ফাইভ প্রাধিকার করার জন্য সি.পি.এম নেতৃত্বেরও গ্রেফতার করা উচিত। শাক সিরি মাংস জরুরে গিয়ে বৃক্ষসেবের পুলিশ ও প্রশাসন যেসব হামাসের যুক্তি অসংযোজন, তাহলে পাশেব প্রলাপ কলসেও কল কল হয়।’

সিন্ডুরে গিয়ে কারাগার-পুলিশ কর্মসিঁদে শীতারা প্রত্যেক কলসেই ‘অসীক’ সম্প্রদায় উপভোগ চরমবর্তী। ২২ ডিসেম্বর তৈমিক স্টেটসমান তৈমিক বৃক্ষসেবাবুর ডাকেশন লিখছেন একটা চিঠি, ‘কীভাবে আশিঁ কেনে আন্দোলনের বাইরের সন্ততন মানুষের সমর্থন এবং আশিঁক সমর্থনকে মীতিগত বিরোধিতা করছেন? অসীক সন্ততন মানুষবাই প্রতিক-কৃষক আন্দোলনকে এগিয়ে নেওড়ার কান্ডে সহযোগিতা করেন, এতো ইতিহাসের শিক, শ্রেণি সন্ত্রাসের অঙ্গ। তাহলে সেদিন-পুলিশ-আও-কে-ম—সবাইকেই বহিরাগত বলে নিশা করতে হয়। কিংবা কে-ওয়েডারা, যিনি কিউবার লোক তো ছিলেনই না, হেবনে বিল্লই আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন, সেই বসিতিভাবও লোক ছিলেন না। কে আসলে ছিলেন আভেতিনার লোক। তাহলে ডাসে, বসিতিভাব বা মুক্তফর আন্দোলন যে প্রতিক অন্দোলন বা বসিতি মুখার্জি কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেটাও তাহলে ছিল ‘বহিরাগত’দের চক্রান্ত। বাংলার যে ভেভাগ আন্দোলনের গৌরবনয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আপনরা লবি করেন তাই দুল নেতারা (কুমারি হালদার বাসে) অসীক বসু, অসীক সাহিত্যী, ডা: পূর্ণশ্রী, ফেদ প্রতীতিবা তো ছিলেন ‘বহিরাগত’-ই। এমনকি, বর্তমান সীতাবান ইয়েকুচা বা কৃষা কারাও—যাদেরকে আপনরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত করেছেন, তাঁরাও কি আপনাদের ভাষায় ‘বহিরাগত’ নয়? সিন্ডুরে বাইরে থেকে যে মুক্তিযোদ্ধা কর্মী আন্দোলনে সহযোগিতা করতে গেছেন, তারা সিন্ডুরে লোক না হলেও সবাই তো পশ্চিমবঙ্গেরই লোক; কিন্তু, সীতারাম, কুমারী তো তাও নয়। তাহলে?’

সিন্ডুর ও মহিলা কমিশন

২৫ সেপ্টেম্বর রাতে পুলিশ ফেলে পিটোয়েছিল মহিলাদের। প্রীলতাহাদি করেছিল। একই কাজ আবার কলস ২ ডিসেম্বর, বাড়ি বাড়ি চলে। তার শেষ তাপসী মাসিকের হত্যাকাণ্ড। মহিলা কমিশনের টিকিও বেশা বাড়নি। শেষে প্রকল প্রতিবাদের মুখে পাড়ে ২০ ডিসেম্বর তাঁরা সিন্ডুরে গেলেন, গিয়েই প্রকল বিক্ষোভের মুখে পড়েন তাঁরা। তাপসীকে

নিচে নেভা এবং তিনু সংকলন মাধ্যমে বানানো গল্প প্রকাশের একটি কর্মসূচি কৃষকরা একত্রেই হয়ে রয়ে দাঁড়ান। বাধ্য হয়ে যশোবন্তা খেঁকিবা গাভি থেকে নেমে ওঠের কথা পেয়েছেন। কলকাতায় এসে তাঁরা যে বিশেষটি খিয়েছেন তাতে উল্লেখ করছেন ‘ভূমি নিজে অনিচ্ছুক মহিলাদের ভূমি থেকেও তাদের সম্বন্ধি স্বাভাবিক হয়েছিল। একলা তারা কৃষক’।

শীর্ষ আদালতের গুরুত্বপূর্ণ ওনানি

সিন্ধুতে চাকিরের হতে সূত্রিম কোর্ট এক জনস্বার্থের মায়ালা পায়ের করেছেন আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। বিচারপতি কে. জি. বালকৃষ্ণণ, বিচারপতি এ. আর. লক্ষণ এবং বিচারপতি জি. সি. মাধুরাজ নিয়ে গঠিত বেঞ্চকে তারবরনকারীর তরফে ৮ ডিসেম্বর শেওড়াফুলিতে সাংবাদিকদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের ঘটনায় আহতদের মেডিক্যাল রিপোর্ট সত্যতা হয় এবং তাঁরা মোটরের প্রস্তুতিভ ভূমির নথিভুক্ত বর্ণনায় ও নথিহীন বর্ণনাসময়ের একটি তালিকা পেশ করা হয়। বর্ণনায় তেলনা শাসককে ভূমি দিতে অনিচ্ছুক শাসনিক চাবি চিঠি সত্যতার পরও তাঁদের কোন ওনানি হয়নি একথাও বলা হয়েছিল। এই অভিযোগের মীমাংসা না করে সরকার ভূমি অধিগ্রহণের লিকে কী করে না বাতাস।

জালপত প্রস্তুতিভ ভূমির কইরে সিন্ধুবেই অন্য কোনো অকৃষি বা কৃষকসমি নত এমন ভূমির হুমিলা আছে কিনা জ্ঞানহেট চাইলে জয়দীপবাবু সিন্ধুবেই অন্য ভূমির নক্সা সেন।

বেড়া গ্রামে বেঙ্গ বালসুত্র, মামলা যখন চলছে, তখন বেড়া দিয়ে ভূমি খিঁয়ে থিয়েই তা বেড়ার দারিকের হয়ে যায় না। এ ব্যাপারে মা সিদ্ধান্ত জ্ঞানপতই নেবে। (সূত্র : বর্তমান, ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৬)

সূত্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ বাস

বিদ্রি-উত্তরপ্রদেশের মীমাংসা শহর নবদত্তা এলাকায় ২০০৬ একদ ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত এক মামলার বাস দিতে গিয়ে সূত্রিম কোর্ট ভূমিগোষ্ঠে, যে সমস্ত মানুষের ভূমি সরকার অধিগ্রহণ করতে চায় তাদের তাদের সার্ব স্বার্থ বক্ষণ হতে। সিন্ধুতে হতে তাদের কারিও কোনও বকম প্রাপ্তি অদ্যে কিনা। ভূমি হারিয়ে বস মানুষদের সম্বন্ধি হতে। সরকার কোনও ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারবে না বলেও সূত্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে জানায়।

(সূত্র : সৈনিক স্টেটসম্যান, ১০ ডিসেম্বর, ২০০৬)

আইন আছে। অসম্পত্ত আছে। এখনও হারিয়ে যায়নি মানুষের মনুষ্যত্ব। সিন্ধুদের কৃষক সংগ্রাম আসলে একটা অসম্পত্ত টেস্ট। আমলের প্রত্যেকের পরীক্ষা হয়ে যাবে এ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। এ সংগ্রাম সিন্ধুবেই শেষ নয়, বরং শুরু। সার্ব সেন হতে এস. ই. জেড তৈরির নামে চলছে যে ডুমিলংহারসীসা, তাতে শব্দ দেখাবে সিন্ধুর, মানুষের শিকড়ের লড়াইয়ের দাবিতে।

তথ্যসূত্র :

উত্তরপ্রদেশ পুরাতন—বেঙ্গ মেহ, নগরিক মঞ্চ

সৈনিক স্টেটসম্যান

বর্তমান

আনন্দবাজার পত্রিকা

একদিন

আরকের সেন্ট্রাল টিমের সংখ্যা ২০ ডিসেম্বর, ২০০৬

একক মাত্রা

এক

সিন্ধুর মানুষ

উৎস মানুষ-এর বইপত্র পাওয়া যাচ্ছে

বই-চিত্র (কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের তিন তলা) এবং

বুক মার্ক, পাতিরাম (কলেজ স্ট্রিট মোড়), অমর কোলে (বি. বা. দি. বাগ),

রাসবিহারী মোড়, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,

সৈকত (আগরতলা)

নন্দীগ্রামের যাত্রী

তিরুগুন পাল

‘যেটিপুত্রপুত্র—ও কে যাবে? সেখানে সৈন্য পুলিশ গ্রাম ঘিরে আছে, ইতিমধ্যে লড়াই চলছে।’—‘যেটি পুত্রপুত্রের বাড়ী, আমিও একশোপাশায়া।’
‘আপনারা কি নন্দীগ্রামে গিয়েছিলেন? ও খানকার কোলে বসে পোলে?’—‘কিন্তু কে হতুভূব, দেবীদি গ্রাম, সিন্ধু।’

আপনারা কি নন্দীগ্রামে গিয়েছিলেন? ও খানকার কোলে বসে পোলে?

প্রথম ক্রৌর্য আতঙ্কিতিকতা নয়, পুড়িয়ে কিষায়ন। তাই পুড়ি সর্বগ্রামী হলেও এখন এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তা, এক ভেলা থেকে অন্য ভেলা, এক ব্লক থেকে অন্য ব্লক, এমনকি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গেলেও আমরা ‘বহিরাগত’। কিন্তু সিন্ধুরের মানুষ জানতে চান সংগ্রামী নন্দীগ্রামের কথা। নন্দীগ্রামের মানুষ জানতে চান সিন্ধুরের বর্তমান পরিস্থিতি। হরিপুরের মানুষ জানতে চান সিন্ধুরের হাস্য হাসিকতা। জানতে চান সংহতি। তারা ছুটে আসেন বাজইপুরের ‘কুচি ভূমি বন্ধা কমিটি’র সভায়। আনখতিয়াদের মানচিত্রে কোনও সীমানা নেই। আমরা বাঁরা নাগরিক সমাজের মানুষ, রাজনৈতিক কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, গণ বিজ্ঞান কর্মী, যা পরিবেশ আন্দোলনের সাথে যুক্ত তারাও ‘বহিরাগত’ হিসেবেই ছুটে ফাঙ্কি বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠা আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে।

এখন সারা দেশে ছুড়েই বৃহৎ পুড়ির স্বার্থে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা এস ই ভেদ গড়ে তোলা হচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের কুচি ভূমি অধিগ্রহণ সেই প্রক্রিয়ারই অঙ্গ। ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এবং কনসাল্ট্যান্ট ইন্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্ট-এর মুখ্য সচিবকে যে চিঠি (Memo No. ৪৪৪/HDA/VII-M-72/06) দিয়েছেন সেখানে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য সংশোধিত ব্রহ্মবর নন্দীগ্রাম, বহিরাঞ্চল, সুভাষা ইন্ডাস্ট্রিজ অঞ্চলে যেটি জমি চাওয়া হয়েছে ০৮.৮৭০.০৭ একর। সংযোজ প্রকল্প, নন্দীগ্রাম ১ নং ব্লকের ২৭টি শেঁড়া এবং খেঁড়ুর ২টি শেঁড়া নিয়ে একটি মেগা কেমিক্যাল হাব এবং জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির কারখানা এবং ফলিগা কলারের উন্নয়নের জন্য যেটি ২২.৫০০ একর জমি নেওয়া হবে।

জমি অধিগ্রহণের আলাচনা শুরু হতেই মানুষের মনের মধ্যে নানা জল্পনা, ধ্রুং ও অলপাড়া উঠেছে। বসন্ত চিঠি, কুচি ভূমি থেকে উচ্ছেদ, কর্মহীনতা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—এইসব দুর্ভাবনা মিলিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে একটি একই করে কোঁচ জমা হচ্ছিল। পাশাপাশি প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতিও চলছিল।

৩ জানুয়ারি, ২০০৭। হলদিয়া উন্নয়ন পরিসরের বিল্ডিংয়ে কেন্দ্র করে গড়ে চুরুবেড়িয়ার ৯ নং কাঁচীচরগুপ্ত গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে

অবস্থান বিবেচনা, পুলিশের নির্বিচারে লাঠি-চার্জ, গুলিচালনা, জনগণের পানচী প্রতিরোধে পুলিশের পালিয়ে যাওয়া, পুলিশের ভিগ পুড়িয়ে নেওয়া, রাস্তা কেটে বড় বড় গাছের গুড়ি, ইটের পাঁজা দিয়ে রাস্তা খাঁড়ার দেওয়া, রাস্তা ভেঙে দেওয়া—গণ বিক্ষোভের এসব ধরনই বিভিন্ন পর পরিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে ৭ জানুয়ারি ভোর রাতে হলদি নদীর ওপর থেকে আসা লক্ষণ বহির্নির্গত আতঙ্কিত গণহত্যার বরও। প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা এখনও অজানা। হারানো আত্মা, তেতাগার সংগ্রামী প্রতিরাগী নন্দীগ্রামে অসংখ্য বসন্ত কৃষকের হাতে।

১২ জানুয়ারি, ২০০৭। দুপুর ১টা ৪০ মিনিট। আমরা যখন নন্দীগ্রামে বাস স্ট্যাণ্ডে পৌছলাম, তেতাগার এলাকার ই এফ আর ট্রলসে দিচ্ছি। ডানদিকের রাস্তা ধরে আরও কিছুটা এগোলে বন্ধাবের ভেতর পৌঁছিয়ে আসে ডিমেট পুলিশ ডান। প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু যোজনম পথ ধরে আরও ঘনিষ্ঠতা এগিয়ে হোসেনপুর গ্রামে রোভার আগে প্রাঙ্গণের গাড়ি পৌঁছিয়ে গেল। করল গাড়ি আর যাব না। রাস্তা কটা? আছে। আমরা নেমে হাঁটা শুরু করলাম। দিগা থেকে আসা ‘বন্ধু’ মজবুত নুতিন রায়ী অধিবাস, মর্মান্বী বাঁচাও আন্দোলনের মেই মেগা পটিকর, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত্রমজুর সমিতির সভাপতি। অনুগ্রহা তলোয়ার, প্রবীণ পাণ্ডীবাগী শ্রম বহুশোপাধায়, গণ প্রতিরোধ মজবুত ছোটন রাম সহ কলকাতা থেকে আমরা প্রায় ২০-২২ জন গিয়েছিলাম। নন্দীগ্রাম বাজারের কাছ থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন দল পঠিত ‘ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি, নন্দীগ্রাম’-এর সামান্য চাই।

আমরা যখন রাস্তা ধরে হাঁটছি, গ্রামের মানুষও এগিয়ে এসে আমাদের সাথে যোগ দিলেন। ক্রমশ মিছিল লম্বা হল। জনসংস্কৃতির কর্মীরা গান ধরলেন, ‘আনবো না এ বহুশে, আনবো না এ পুছলো’।

হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে একটি দাঁড়াতে হয়েছে। কাফ, কোথাও রাস্তা কটা আছে। কোথাও বা গাছের গুড়ি সন্ধ্যা সন্ধ্যায়ে হৈছে। পথ আটকে কাফা ইটের পাঁজার কিছুটা অংশ সরানো হয়েছে। হাজরাপটী বন্ধাবের পুল কাটা রয়েছে। তবে সেই পুলাটি এমনভাবে কাটা হয়েছে যাতে যাতে একজন মৃত্যু করে ওপাশে যাওয়া যায়।

পথে হাঁটতে হাঁটতেই জানতে চাইছিলাম, সিন্ধুরের মতো এখানে কোনও মদীকা করা হয়েছে কিনা? যেদিনা জালানলেন, ‘গণ উদ্বয়ন ও জন অধিকার সংগ্রাম সমিতি’র তরফে চাববিন ধরে ৫১০ জনের মধ্যে একটি নমুনা মদীকা করা হয়েছে। ৫১০ জনের মধ্যে মাত্র একজন

বাক্তি ভূমি দিতে বাক্তি আসেন। ১০ জন বলেছেন, ভক্তিপূরণ ও পুণ্যসান্নেহে ন্যাকর দেশে নিবাস্ত। ন্যাকর। বাক্তি ৪২১ জনই বলেছেন, তাঁরা কোনও মুসলৈই ভক্তি দিতে বাক্তি নন।

হাজরাকটা বাক্তারই কথা হল দুইয়ি বাক্তি। বাক্তি ন্যাকর মনসজব-এস মনস। তাঁর ভিন্ন বিধা ভক্তি আছে। ধান আর কেশরি চাষ হয়। চাষ মেয়ে এক ছোলে। সবসবই বাক্তারামচক পিকা নিকতম-এ পাড়। বাক্তি ন্যাকর ভক্তি দিতে বাক্তি নন। কথা বলেতে বলেতেই আমকা এখিয়ে গেলান 'ভুক্তি উত্তম' হস্তিরোগ কর্মি, ন্যাকর গ্রাম' অসংজিত ভক্তসজাব মনসব দিক। আমকানক আসে কটা হয়েহে ধান। সেই ধান বেতেই সজাব অসংজিত করা হয়েহে। ভিক্তিকরণে মধ্যেই ১০ থেকে ১২ হাজার মোক ভক্তাভ্যে হলেন।

হোসেনপুর-হাজরাকটার এই সভায় দুইয়ি বাক্তি হাড়াও ধন পলে মনসজব এসেছেন শামসুদ্দীনচক, কাকরামচক, গোপীনাথনপুর, সরবেড়িয়া, কেশানাবি, মীলপুর, বৈভবসরি ইত্যাদি গ্রাম থেকে। বাক্তি ন্যাকর মনস। ভক্তি ন্যাকর গ্রাম দিতে প্রস্তুত সবসজব। গ্রামের মহিলারের হস্তঃস্বস্ত অংশগ্রহণও অংশগ্রহণের মাত্রা অনেকটাই বলে দিয়েছে।

গোপীনাথনপুরের শেষ আশুপল বাক্তি। ১০ বিধা ভক্তি মনস। দু'বর ধান হাড়াও কেশরি চাষ হয়। ভক্তি সেধেন না বলে কেশের সঙ্গে ভক্তিরে ছিলেন। শামসুদ্দীন চক-এই নিকতম ভক্তা ভিন্ন বিধা ভক্তি মনস। ধান, কেশরি চাষ করেন। ভক্তি সেধেন না। সরবেড়িয়ার বাক্তি ন্যাকর মনস। তাঁর পাড় চাষ বিধা ভক্তি আছে। ধান, মটরওটা চাষ হয়। চাষের ব্যবসায় আছে। ভক্তিও ভক্তি দিতে বাক্তি নন।

সবসবই জানালেন, 'এখানে কোনও সঙ্গী ব্যবসার নেই। ভক্তি আমকা সেব না।' কথা বলে জানা গেল সি পি আই (এম) ধলের বক কবী সমর্থকই ভক্তি বাক্তি এই আশেপাশের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন। এমন কি তাঁরা গত বছর বিধানসভা নির্বাচনেও ধলের হয়ে কাজ করেছেন ভক্তি অধিগ্রহণের প্রসে তাঁরাও সরকার এবং ধলের বিরুদ্ধে ঘুরে পড়িয়েছেন।

জনসভা শুরু হল দুপুর ২ টো ১০ মিনিট নাগাদ। পূর্বদিকের স্থিতির প্রতি প্রত্যক্ষ ভক্তিরে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হল। শেষ সেলিন, ভক্ত মওল, বিখ্যাত মাইতির মুদ্রাও পাওয়া গেছে। অনেকই নিখোঁজ হয়েছেন।

সভায় সম্মেলনই সারা দেশে ছড়িয়ে বিকাশের নামে বিনাম-এর চলাবের প্রতিপাল ভক্তিরে বক্তব্য রাখেন। পূর্বদিকের সক্রিয় করে রেখে, সমস্ত পাঠি আভার দিতে আক্রমণ চালিয়ে বর্ষের কাহিন্যের পরিকল্পনার কঠোর ভাষায় নিশ্চা করেন।

আমকা ঘিরে আসার সমস্ত, সাংবাদিক বক্তব্য আসে থাকতেই আমকানের জানিয়েছিলেন, হাঁসভাড়ার সি পি আই (এম) ধলের কবীরা জড়ো হয়েছেন। আমকানের বাধা খেলেন।

আমকা যখন হাঁসভাড়ার শৌখিন তখন রাত সোয়া আটটা। আমকা-আধারে সেকলার রাজার দু'পাশে 'ওরা' ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়িয়ে।

সংখ্যার জন্য লক্ষ্যবস্তু। হাট হাটে সঙ্গী ব্যবসার আস লক্ষ্য বস্তু। ভক্তির মতো থেকে থেকে একজন প্রোগ্রাম খেলেন, 'সেবা গো-বার্ণ। না, গঙ্গা ব্রিটিশের সর্বত্র হলেন না কেউই। চাষপাশে অসং সঙ্গীবাণ। কাঠের শিখারের মতো নিকট হয়ে মড়িরে রইলেন বাক্তি।

মানুষের দেশে, কোভ বড় পবিত্র আবেশ। ভক্তাবাসা বড় গভীর হয়, নির্মল মানবিক কোভও তত হীর হয়। মানুষের প্রতি মানুষের ভক্তাবাসা, ভক্তাবের প্রতি, নিখোঁজের প্রতি, আ-আটি, পুঁথি-প্রকৃতির প্রতি ভক্তাবাসাই কোভে 'আওনের পরশমণি' প্রলে কোভে। যে আওনের আঁচ কোভ এলাম সমস্ত ভক্তিরে ভক্তে, সে আওন তো অসংজিত কোভে কোভে বিজ্ঞানের পালন না। মানবিক হিসেব ভক্তা করা যায়, মানবিক কোভ ভক্তা খাটো না।

'ওদের শিখের কোভে এখিয়ে চলল আমকানের পাড়। মুক হাড়াওতেওলা ক্রমশ অসংজিত ভক্তিরে যাবে। চড়া হেডলাইটের আলোয় সামনের রাস্তা পরিষ্কার দেখা যাবে। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে।

এক সভার একপাশে

নবীগ্রামে মোট কত একর ভক্তি ভক্তিপূর্তি হবে?

মোট ২২,৭০০ একর। এরমধ্যে ১১,২০০ একর ভক্তি নবীগ্রাম-১ প্রকল্পে ৫৮টি মৌজায়।

কী কী শিল্প ও প্রকল্প হবে?

একটি বাসিন্দা প্রোগ্রাম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, মেগা জেনিকাল হাট, জাহাজ নির্মাণ ও মেরোভিত্তিক কারখানা এবং সেতু। প্রথম দফার কঠোর জমির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল?

মোট ১৪,৭০০ একর। নবীগ্রাম-১ প্রকল্পে ২৭টি মৌজা এবং বেছনি-২ প্রকল্পে ২টি মৌজা অর্থাৎ মোট ২৯টি মৌজায় ভক্তি। ১০,০০০ একর ভক্তিরে (১৫টি মৌজা) গড়ে উঠবে ইন্ডোনেসিয়ার সালিন গোষ্ঠীর বৃহৎ রাসায়নিক কারখানা। ১৫টি মৌজার ৪,৫০০ একরের মধ্যে ৪০০০ একর ভক্তিরে তৈরি হবে পলিমার তৈরি গোষ্ঠীর জাহাজ কারখানা এবং বাক্তি ২০০০ একর ভক্তি হলদিয়া কলর থেকে ড্রাইং-এর পলি ফেলবার জন্য ব্যবসায় হবে।

কৃষিপ্রকৃতি ও সেব্যবস্থা :

বুটিনিওর চাষাবাস। দু'পাশের বগলি ও হলদি নদী আর খালনগার হল সমুদ্র উপকূলের কাছে কাজ লক্ষ্য। ভুক্তি হল মাটির ১৬০ ফুট গভীর। তাই নলকূপের বলে এলাকায় গুরু পুকুর খনন করে বৃষ্টির জল ধরে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে।

জমির প্রকৃতি :

অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত কৃষি জমির অধিকাংশই প্রায় ৭০ শতাংশে 'শালি' ভক্তি। অর্থনৈতিক ভিক্তি অংশ খাস ভক্তি (মাত্র ৫-৬ হাজার একর) এবং নদী চর এলাকায় বহুর একসার খালের চাষ হয়।

কী কী ভঙ্গল উৎসব হয়?

ঘন, আলু, পেঁপেজলি, সূর্যমুখী চাষ হয়। প্রচুর সংখ্যক লক্ষের লোকের আচর। এছাড়াও অগুড় পেঁপেজলি, কপিল, টম্যাটো, লাভসজ্জিব ফলম এবং পর্যাপ্ত মাছ চাষ। ভাঙ্গল মানের চিহ্নিত চালও হয়।

জীবন-ক্রমিকা :

২০০১-এর জনগণনার রিপোর্ট অনুসারে, এই অঞ্চলে ৬৪ শতাংশ মানুষের জীবন-ক্রমিকাই কৃষিনির্ভর। বহু মৎস্যভিত্তিক মানুষও আছেন।

জনবৈচিত্র্য :

সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামবাসী মুসলিম (৬১ শতাংশ)। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণা হিন্দু, ব্রাহ্ম নেই। কিছু তফসিলি জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ। অধিক আছেন কিছু অধিক পরিবার।

বিস্তৃত পুরি ভাষা ছাড়াও বিশেষ দাঙ্গাভাষিও সঙ্গীতময়দের এই শিল্প ভাষাভাষের কথায় লভ্য। নবীগ্রামের ৪২টি মসজিদ এবং ১১২টি মন্দিরও প্রত্যেকের গ্রামে ঘুরে ঘুরে আসে। গ্রাম ৬০-৭০ বছরের মানুষের ঘন বসতিপূর্ণ। এই এলাকা থেকে উচ্চতর হতে হলে লোক পরিবারকে। অনেকগুলি মাদ্রাসা এবং প্রাথমিক ও হাই স্কুলের জন্যে অধিগৃহীত হয়ে।

গান

সিন্ধুর থেকে নন্দীগ্রাম

কথা ও সুর : রাজেশ দত্ত

এক

চালের ভরি লুইটা নিতে
রতন টাটা আইল রে।
সোনার সিন্ধুর খাইল রে।

(আমার) চালের লাগল কাখে রে।
(আমার) খেতের ফসল কাখে রে।
(আমার) উঠানে পাশুই কাখে রে।
(আমার) শূনা মরাই কাখে রে।

টটার সামান্য বিমান-বুড়
কোমর খাইল। পাটি সুড়,
চাবির সঙ্গে শুইয়া গুড়
কাইড়া নিল ভরি।
(আবার) ক্যাডার পুসিল-পায়সা দিয়া
জ্বরের বেড়াই কাখে রে।

ভাপসী আর বাজুকুমার ভুল,
ভাজা গ্রানের বুনের মাওল
বুড় নিয়াই করব উত্তল
ভাঙব রে তার বেড়া।
(আজ) লড়াই ছাড়া বীজার পথ নাই,
খাঙ্কিল নে ঘন ঘন রে।

দুই

সংগ্রাম-গামাং-গ্রাম,
ডাক দিয়েছে নন্দীগ্রাম।
জনতার প্রতিযোগে,
বিক্রোডে-প্রতিবারে
ওই শোনা ক্রোডের পথগাম।

এ পড়াই বুঝকের, এ পড়াই মল্লকের।
ঘুম ভেঙে নেমে ঘর ঘাসিকের, গছুরের।
সংঘাতে নির্মাণে,
সীমানের ভাঙগারে
বিরে আসে ইতিহাসে তেভাগার নাম

শোষণের দ্বারা আর বুঝ বুঝে সইনো।
বারে বারে অন্যায়েরে চাপ সুরে বইব না।
পথে নেমে একসাথে
ভেটে বেঁধে প্রতিঘাতে
বুঝে নেব শহীদেব রক্তের দাম।

এ মাটি বুকের ঘন, দেখে কে নেহে কোড়ে?
(সেখি) বুঝোনি লড়াইতে কে ভেঙে, কে হলে?
আওন কলসে বুকে,
বোমা-ওগি-কম্বুকে
এ আওন নিভাবে না, জেনো রেখে পরিগাম।

পানের সুর ও স্বরলিপি রচনা আশ্রীরা সূত্রপদ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। পুরোটা : ৯৬৮৪ ২২২২/৯৬০০৯৮৮১০৮

দুই প্রজন্মের মধ্যে দুটিজন্মের অন্তর পড়বেই। তবু, এখন নতুন প্রজন্মকে যেন বড়দের থেকে বড় পূর্বের মনে হয়। ওরা কী ভাবছে, কী বলছেন মূল্যবোধকে মূল্য দিচ্ছে, সমাজ ব্যতীকৃতি 'উন্নয়ন' নিয়ে তাদের মনস্তত্ত্বটা কেমন—আমরা, বড়রা, ঠিকঠাক জানি না। হয়তো ওরা যা করতে চায় তা অতপট্ট বলার সুযোগ পায় না, ভাষণ পায় না। 'উন্নয়ন মানুষ' বর্তমান প্রজন্মকে যে ভাষণে করে দিতে চায়।

এবারে হঠাৎ প্রাসঙ্গিক একটি কথা বলা হয়েছিল কোলমোহাম্মদের সাথে :

কোমার এলাকার উন্নয়ন হবে। খুই-ওভার হবে, শশিং মল হবে। সরকারি বোতিল হাফেজ কোমারের বসত বাড়ি ভাঙা হবে, বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। এটা কুনি কীভাবে নেবে?

উত্তর পাওয়া গেছে এরকম :

দাখী কে?

শশিং সেন্টার, খুই-ওভার, এই কথাগুলো আমাদের প্রত্যেকেরই পরিচিত। তবে এগুলো কতটা উন্নতি করতে পারবে, কতটা কল্যাণে পারবে পরিলক্ষ, এ নিয়ে কেউ কি একটু ভেবে দেখেন! সেলে এখনও অনেক শিশু আছে যারা লুৎফা বনুয়া থেকে পায় না, যাগের চাবিকাঠি বসে কিছুই প্রায় নেই। তাদের জন্য কি কর্মকর্তারা কিছুই করতে পারেন না?

নিউনিসিপালিটি কর্তৃপক্ষের ডিরেক্টে লেখা ছিল আগামী মাসে আমাদের বাড়ি ভাঙা হবে। সাবা, লতা কী করবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না। আমার মনটা ব্যাথা হয়ে গেল। না, বাবা বুজানোই কর্তৃপক্ষের কাছে গেলেন কিন্তু কোনো কাজ হল না। আমাদের তিনতলা বাড়ি চোখের সামনে সকলে ১০টা থেকে ৪টাের মধ্যে ভেঙে চুরঝর হয়ে গেল। আমাদের ঘোশ সরকারই সব। জাভা যা বুঝে গাই করবে। সেখানে এইরকম ঘটনা হয়েছে। শহরের বুকে মিনারাইট ঘট চলেছে, তার এই সবর সমসার সমাধান হতে হচ্ছে আমাদের মনে সাধারণ মানুষদের, আর মনোতা কৃপণ্ডিবাসীদের। একরা অপনারাগি হলুন, দেশের উন্নতি বা অবনতি করার জন্য দাখী আবাবার দেশের সরকারি কবকা, না জনগণ?

শশিং দাখ
নবম শ্রেণি

রাজার হস্ত...

আমাদের এলাকায় এক বিশাল শশিং মল তৈরি হবে, তাতে আমাদের বাড়িও ভাঙা পড়বে। হঠাৎ সরকার এর বিপদ বাহবা গ্রহণ

করবে। ভাণ্ডারের হাফেজা অন্য একটি নামহানের গ্রন্থ আমাবের মিলবে, কিন্তু তা কি আমাবের সেই পূর্বের পরিলক্ষ চিহ্নে দিতে পারবে? তাহা কি আমাবের মনে থেকে মুছে দিতে পারবে আমাবের পূর্ব মৃত্যু? আমাব পরিলক্ষের সাথে হঠাৎ অজিমাচন করতে পারবে কিন্তু তাতে কি মনে থেকে মনে দিতে পারবে? মনটি তৈরি হয়ে হয়েছে কত মানব এর সুবিধা পাবে, কিন্তু আমাব সুবিধার জন্য নিচ্ছেন সুখ কনি দিতে পারবে না। মানুষ মাত্রই স্বার্থপর, আমিও মানুষ। সেহেতু আমি আমাব স্বার্থপরতাকেই বড় করে দেখতে চাই। কেন জানিনা, হয়তো পরিলক্ষ আমাবকে এই শিকড়ি দিয়েছে। এতসব যে ভাবছি এ সবই দুঃ, জগৎ জানি আমি নিশ্চয়। তাই একেবারে নিশ্চয়ই হয়ে পড়ে গেল ভাঙা আমাব আর কোনো ভূমিকা নেই। সরকারের সিদ্ধান্তই চরম। তার ওপর আমরা করার কথা আমার নেই। এর থেকে আমার এই মান হয় যে

"এ কলমে চায় সেই পেশী চায় আছ যাচ ভূমিভূমি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের মনে চুরি।"

অজিতা দাখ
নবম শ্রেণি

ওড়ির বেতাই হবে

এতদিন চাইছিলাম আমাবেরই এলাকায় একটা "শশিং মল" তৈরি হোক। কিন্তু যত্নেও কোনোদিন জারিনি যে আমাবেরই এতদেব মৃত্যুনা ঘটবে। কোনো জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত অর্থহীন হলে, শশিং, সুখ, দুঃখ সমস্ত কিছু নিশ্চয় হয়ে যাবে কিছুদিন বাস। বাক, জোতা, বাড়ির বড়কা অনেক তেতা করবেন বাড়িটাকে বাঁচানোর জন্য। এলাকার অনেকেরই সহানুভূতি জানালেও সেভাবে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসছে না। না, তাকুনা সবাই ভগবানের উপর আস্থা রেখে বসে আছেন। সরকারের দ্বয়ের শিশাল শশিং মলের কাছে আমাদের বাড়িটা বড়োই ছোটো, বড়োই ভঙ্গুর, তাকে ওড়িয়ে ফেটেই হবে।

সেবাঙ্কনা দে
নবম শ্রেণি

দুঃখের ক্ষতিপূরণ

আজ আমাদের থাকার কোনো আশ্রয় নেই, সেই কোনো মাথা গোঁজার ঠাই। যে বাড়িটিতে আমাবের পূর্ব-পুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বাড়ি আজ সরকারের একটি পরিকল্পনার কামানে ধসেছে পলিত হয়ে। আমাবের কোলকাতাকে সজিয়ে তোলার জন্য 'শশিং মল' 'ফুড ব্যাজার', 'খুই ওভার' ইত্যাদি বিভিন্ন আয়োজন-প্রয়োজের জায়গা তৈরি হচ্ছে।

ডবিষাতে যখন আমি চোখের সামনে দেখব যে আমাদের বাড়িটিতেই ভেঙে বা ধসে পড়ে কোলকাতা নগরী নানা স্মৃতি সঞ্চিত হচ্ছে, তখন আমার মনে হবে যেন সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে আমাদের চোখ থেকে ধরে পড়া প্রতিটি ভুলের সিন্দুর ওপর। সরকার মনে করে যে, আমাদের বাড়িটিতে থেকে বিতাড়িত করার দুঃখ সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে মূর করতে সক্ষম হবে। কিন্তু যা

সম্মত নয়, তা কখনও হয় না। কোলকাতাসকল সমৃদ্ধ ও উন্নত করার জন্য আমাদের কল্টিভেট করতে নেওয়ায় পছন্দ করেন। তাদের মানসিকতার লক্ষ্য নয়।

সমর্পিতা সে
নবম শ্রেণি

সমুদ্রের অস্ত্রব্যয়:

বি. টি. রোডের রাস্তা চওড়া হবে, ট্রাই ওভার হবে, তাই আমাদের বাড়ি ভাঙা হবে। কথটা আমার বুকে শেলের মতো বিধল। মনে তেমন একটা শুনাতার সৃষ্টি হল, তিন বলে শোকারে পাড়ল না। যদিও ভাবি, আমাদের জন্য বিলম্ব বাস্তব করা হবে। কিন্তু সেটাই কি সব? প্রতিবেশী, বিশেষত নিজের ভিত্তিমাটি, তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে আমার ঠাকুর-পনের স্মৃতি; তাম্রাড়া শীর্ষ পনের বছর যে পরিবেশকে আঁকড়ে ধরে কঠিনেতি, তার কি কোলে মূল্য নেই? সরকারের কাছে এসব নষ্টায়ত্ত্বিয়ার কোনো মূল্য নেই। তাই আমার এই ক্রোধের ছল বার্থে, এতো সমুদ্রের অস্ত্রব্যয়ের মতো।

প্রতিভা সব
নবম শ্রেণি

ওমুই আনন্দ

পাড়ায় শনিং মল হলে, সবাই অসুস্থ সুবিধা হবে। হাতের কাছে নতুন, সুন্দর, শৌখিন সিনিসপত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনও পরিবারের সমস্যার বাড়ি-ঘর ভেঙে শনিং মল তৈরি হবে, এটি কী ধরনের সিদ্ধান্ত? তারা খালি নিজেরের সুখটাই দেখলে, এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করার আগে কি একবারও ভেবে দেখলো না, আমার পরিবারের কি হবে? আমরা কোথায় যাব? কোথায় থাকবে? আমরা? আমাদের আশ্রয়ের এইলপ পরিস্থিতিতে যদি তারা উপস্থিত থাকতো, তবে তাদের হৃদয়ের কিলপ অবস্থা হত?

আমার মতে কোনও পরিবারের ঘর বাড়ি ভেঙে দিয়ে দেখানে শনিং-মল তৈরি করা উচিত নয়।

সোনাঙ্গী সেন
নবম শ্রেণি

কোথায় যাব?

সরকারের হঠাৎ এমন পরিকল্পনায় আমরা সবাই চিহ্নিত। সরকারের দায়িত্ব আমাদের হাল্কাভাবে দিতে লক্ষ্য রাখা। কিন্তু এ কি? এখন আমাদের কী হবে? কোথায় যাবে? আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষের দিকে একবার সরকারের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কিন্তু সরকার তা না করেই এতবড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। যে-বাড়িতে আমাদের পূর্বপুরুষের এত স্মৃতি জড়িত, সেই স্মৃতিপূর্ণ বাড়ি ভাঙা পড়লে যেমন ব্যাঘাতের সন্ধ্যা হবে ঠিক তেমন মনের অবস্থাও খুব দুঃসহ হবে। সরকারের পরিকল্পনায় আমাদের সুবিধা হবে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য

বাড়ি ভাঙার কোনো প্রয়োজন আমার মনে মনে নেই না। প্রাচীন যাবতী জায়গা আছে। তবু কলকাতা চাই বাড়ি না ভাঙাই উচিত।

পাল্লী মাথ
নবম শ্রেণি

হেঁচো যেতে পারলেই বাঁচেন।

পাড়ার ওপর বাড়ি বাড়ি সোধমা ওয়া এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাবা অসুখ এতে বেশ খুশি। 'বাড়িটা দেয়ার সোত পাল্লিমাথ না। এমন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।' বৌদিশ বলায় যে আমাদের এক মাসের মধ্যে বাড়ি উঠা করে দিতে হবে এতকাল উন্নয়নের জন্য। ট্রাই ওভার, পরিবাসের মতো সংকটজনক জন্য আমাদের বাড়ি একমাস পর ভেঙে ফেলা হবে। বাবা খুব খুশি। সম্মিলিতক তিনতাল বাড়ি ফেলা হয়েছে। সেখানে বসবাসের জন্য চলে যাবার ইচ্ছে আছে। হৃদয়-কলকাতার শেষ স্মৃতিস্মৃতি পর্যন্ত ভেঙে চূর্ণন হবে যাবে এবং তার চায়পায় একটা পনিং মল গড়িয়ে উঠবে, ভাবতে খুব বেশি সুখ পাল্লিমাথ না। ম-ও ফেসমাম, বাবাব মতো পুরনো টুই সোভেল স্মৃতি ভাঙাফ্রা এই পুরনো বাড়িটাকে হেঁচো চলে যেতে পারলেই বাঁচেন।

স্বর্ণিত বোম্বাশাখার
সমুদ্র শ্রেণি

রূপ সতি

সহরটা ক্রান্ত বন্যাকছে। এখন কী আর পুরানো আমাদের শোভা বাড়িওলোকে ভুতের মত বাড়িয়ে থাকতে দেখলে ভালো লাগে? মাথের যদি বাড়িটা নিজের হয়। যখন অন্য চায়পায় পূর্ণপ্রোজার দিয়ে পুরাতার উদ্যোগে 'উন্নয়নের যাত্রা' বাড়ি ভাঙিয়ে নেওয়া বেশে আমরা বলি 'এটুকু sacrifice তো করতেই হবে' তখন নিজের বাড়ির কথা বোঝায় ভুলেই যায়। অথবা ভাবি 'আমার বাড়ির উপর আর ক'ব নতব পড়বে।' উন্নয়নের জন্য চিন্তা সবসময়ই ওত লতণ, এতে কোনও সমস্যা নেই। পুরানো বিপজ্জনক বাড়িওলিও লক্ষণ কিছু গর্ভের বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু মূলকিন একটাই, পূর্ববাসিন। কথটা ওনতে মত ভালো, প্রয়োণে ততটাই করিন। সংজাবে মতি কথা বলতে গেলে, উন্নয়ন হোক সবাই চাই, কিন্তু তার জন্য নিজেরের গায়ে ঝাঁড় যেন না লাগে। কারণও খুব পরিচায়; কিছু কিছু ব্যাপার আছে যাে জন্য স্বর্ধর্গণ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কথটা একটু কর্কশ শোনালেও এটাই রূপ সতি। তাই কখনোই নিজের কসতবাড়ির ক্ষতি যেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সোমক মুখোশাখার
একাদশ শ্রেণি

আনন্দ হল, কিন্তু...

উত্তর কলকাতার যে অংশে আমার বাড়ি সেটা কলকাতার পুরানো পাড়া। প্রায় হাজার কলকাতা বাসিন্দা। সাবেক আমাদের গায়ওয়ান বাড়ি। অধিকাংশই শ্রীল প্রায়। ডায়নামিট্র, অধুনিকতার ছোঁয়া এখনও লাগেনি এখানে।

কিন্তু নগরায়নের দ্বারা কসতে চললে আমাদের পাড়ায় ছাইওভার হবে, শিশি মল হবে, আরও কত কী। হনসী আমন্থে নেচে উঠল। এসব হলে অশুভিত সব সুযোগ সুবিধা আসবে হতেছে বুঝে। সরকারি নোটিশ বেখে পাড়ার মধ্যে চাঞ্চল্য। শূন্যবাসিনের কাছাকাছি নিয়ে মতামত। আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে। বহিঃ ভাঙ্গা পড়ছে ব্যাধ প্রলম্ব হবে। ভাঙা পড়ছে আমাদের মতো আমাদের পুরাতন বাড়িটাও। এই বাড়ির প্রতিটি ভালে আমার ছোট খোক বড় হয়ে ওঠে। খুঁটি হলহল করছে। তাই চেয়ে যেতে একটি কই হচ্ছে। পাড়ার লোকনওলা সব বন্ধ হয়ে গেছে। ইট, বালি সিমেন্ট স্থানীয়কৃত হয়েছে আমাদের খেলার মাঠটায়।

উপায়ন পাত্র
একদশ শ্রেণি

কল্পনাবিহীন

একদিন আমারের বাড়িতে সরকারি নোটিশ এসে যে সরকারি ছান অনুসরণে আমাদের বাড়ির চমিটা থেকে তৈরি করা যাবে সুন্দর একটি শিশি কলত্রপ্রসঙ্গ।

মা-বাবা চিহ্নিত হয়ে পড়লেন। অত্যন্ত আমগল ঘিরে ধরল। বাবা, বাড়িটা ছেড়ে ফেরেন, না অন্য কোনও পছন্দ অনুসরণ করবেন তা ভেবে পেলেন না।

অমর হন হলেছিল যদি সরকারি আমাদের অন্যতর তেজাও পাড়ার কাছাকাছি কলে নেচে তবে বাড়িটা ছেড়ে কেওটা উচিত। নিজেদের প্রত্যেক সন্তানকে হস্ত নিয়ে ঘিরে রাখতে হবে। সন্তানের মূখ ও আনন্দ নিজেদের দুই ও অর্জনিত কলে তোলাই তো প্রকৃত মানুষের কর্ম।

সুজিতা দাস
একদশ শ্রেণি

উন্নয়নের স্বার্থে ত্যাগ

আমাদের এই শহরের উন্নতি করার জন্য কড়কড় খাঁড়ি, কল-কলহাসা, লোকন ও বিমান কল নির্মাণ হতে চলেছে। এবং তার জন্য আমাদের বাড়ির এলাকা সর্বসুবিধাযুক্ত হওয়ায় আমাদের একাধিক সমস্ত এলাকা ভেঙে নতুন করে গড়া হবে, আর এর জন্য আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

এই বাড়ি, যেখানে আমি, আমার সোন ও ভাই সগাই ভায়েছি, যেখানে প্রথম আমার হাতে গড়ি হয়েছে, সেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাদের সাত দিনের মধ্যে। আমি জানি না কেন্দ্র করে চলে যাবে আমাদের এই ছোট স্বর্ণ ছেড়ে। কিন্তু উন্নতির জন্য আমাদের কিছু ত্যাগ করতে হয়। হয়তো আমাদের শহর ও দেশের উন্নতির জন্য আমাদেরই পৈতৃক বাড়িও ত্যাগ করাই উচিত হবে।

তনিমা মল্ল
একদশ শ্রেণি

উন্নয়নের সামগ্রিক দৃশ্য

আমাদের এই এলাকাটি শহরের অধিগ্রহণ করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিতে চলেছে। বাস্তবায়ন প্রকল্প ও শূন্যনির্মাণ হবে, ছাইওভার গড়ে তোলা হবে। পরিবহন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন উন্নতির প্রক্রিয়া হবে। কাঙ্ক্ষিতকই নিতাপিনের ফানলটি সমস্যা এই একটি সূত্র ও রতী সমাধান। সাম্প্রতিককালে কলকাতার উন্নয়ন যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলটি গড়ে তোলা হচ্ছে সেটি এই নবনির্মিত মডেলগণের মাধ্যমে যুক্ত হবে মহানগরীর সাথে। প্রগতিতে দুগম্বু তখন এই অঞ্চলটির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটেবে।

তবে এর জন্য কত মানুষের জীবনে যে ছাড়া অক্ষতাল নেমে আসবে, তাও সরকারের নৃসিংগচর হওয়া প্রয়োজন। পাড়ার এক ছাত্র যেখানে কিছু মানুষ টিনের ঘর তৈরি করে কোনেমেতে জীবনধারণ করছেন, তারা তো সামান্য অতিপূর্ণও পাবেন না। তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে? পুরোনো নগরীর সোলনগরত বসলে কলকাতা মহানগরী রুত চলছে উন্নয়নের পথে। কিন্তু অনেক সামাজিক দুসোপে বিদ্যমান। ভবিষ্যৎই বলবে আভ্যন্তর এই উন্নয়নের প্রক্রিয়া কতদূর সাফল্য পাবে।

সুজিতা ঘোষ
একদশ শ্রেণি

চাই সুখ অর্থনীতি

একজন সুখ স্বাভাবিক নাগরিক হিসাবে আমাদের উচিত পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে যা না ভাসিয়ে নিজের নিজস্বভাবে মূলধন করে একটি সুখ অর্থনীতি গড়ে তোলা। এই সুখ অর্থনীতিতে ধনী শ্রমিকবাসিনের মৃত প্রাচ্য, শিশি মল আর নার্সিংহোম না থেকে থাকবে গরিব কৃষকের সমাব্যক্তি, হোস্টেল, বিদ্যালয় প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্যে যদি আমার বসতবাড়ির সোলনগর করতে হয়, তবে বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে আমি তা গান ত্যাগ।

স্বাধী মুখার্জি
বাণিজ্য বিভাগ, এম. কম, প্রথম বর্ষ

এই উন্নয়ন কাদের জন্য?

কাদের একটিমতে আমাদের বিলম্বিত এইসব নির্মাণকার্য কি সত্যিই আমাদের কাছে গর্বের বিষয় হবে? এই এলাকায় এমন কত মানুষ আছেন বাসের একমাত্র ভরসা তাঁদের একটি ছোট্ট বাসস্থান কিংবা জীবিকার একমাত্র উপায় একটি ছোট্ট সেকান। সরকারের গামনার ক্ষতিপূরণের বিলম্বিতও তাঁরা ছেড়েও তাঁদের বাসস্থান কিংবা জীবিকা সংস্থানের উপায় পুনরায় গড়ে তুলতে অপারগ।

এই মানুষগুলোর কথাও তো ভাবতে হবে। এরা না থাকলে এই উন্নয়ন কাদের উদ্দেশ্য হবে? তাই আমার মনে হয় সরকারের বিলম্বিত নিরে আরও ত্বরিতে ভাষা উচিত এবং সব মানুষের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে, তাঁদের জীবনকে বিদ্বিত না করে তাইই উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেওয়া উচিত।

শিলা বানার্জি
একদশ শ্রেণি

তিসোত্তমা কলকাতা নাকি দিনে দিনে আসে অপকণা হয়ে উঠেছে! বয়ানগরের বি. টি. রোডের ওপরেই আমাদের বাড়ি। গত কয়েক বছরের মধ্যেই কত পরিবর্তন হয়ে গেল। চারদিকেই পুরোপুরি, অতিশোভিত-বড় আপন সব বাড়িগুলো ভেঙে নৈত্যাকৃতির স্বতন্ত্র হয়ে গেল। বি. টি. রোড চওড়া করাও জনা ইঁটকাফান চায়ের দোকান, সুচিত্রার স্টাটির টিকিটের দোকান ভাঙা পড়ল। কুব মুখ করছিলেন ইঁটকাফা। গতকাল সন্ধ্যায় যখন ওনামের কাড়ব আছে যে, আমাদের সাবেকি আমাদের বাড়িটা আর মাঝখানে একটা বিরাট উঠোন, বিশাল ছানটায় শীতের রোদ্দুর এসে পুরোপুরি যায়, চওড়া ব্যাংকা, সেই চিরপরিচিত আপন বাড়িটাও ভাঙা পড়বে, বিশাল পলিও মল তৈরি হবে। এখন চোখের ভল বাধা যাননি।

এই ঘরটার ঠিক বিপরীতেই লাভের ঘরে মন্ত একটা তাল্লা কুলাছে। মাঝ সেই। তার অতি প্রিয় এই ঘরটা থাকবে না আর। ছাঙ্গের কলিলে এ বছরও পাঁচটা ব্যায়াম ঠান্ডার তৈরি আচার পরম নিশ্চিতত্বের শীতের রোদ পোচ্ছাচ্ছে। এসব কিছুই আর থাকবে না। থাকবে না, বাড়ির পেছনের নিম্ন, জামকল বা ভাঙা গাছটাও। বুকের ভেতর থাণ্ডা হাওয়া শব্দ শব্দ করে যেন বয়ে গেল।

বহুতল কলমলে বাড়িটার কত মানুষ, পণ্য, সামনে সারি সারি গাড়ি। কিন্তু আমরা কোথাও নেই। শুধু আমবাই তো নয়, কত মানুষকে নিজের জমি, বাড়ি দিয়ে নিতে হচ্ছে এই উন্নয়নের জন্য। সোনালি চতুর্ভুজ ভেঙে দিচ্ছে কত মানুষের স্বপ্ন, আশা, সুখ। আমাদের মতই সেই হস্তভাগ্য মানুষওসোব কথা, তাদের ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন, মলে যাওয়া আমাদের কথা ইতিহাস কি দিয়ে বাঁধবে? কলকাতা—আমাদের চোখের ভালে রান করে ভুমি কি সত্যিই আসে অপকণা হবে?

দুর্গা পাল্লী
অটম শ্রেণি

এ কতি কি পূরণ হয়?

কিছু না ভাঙলে কিছু গড়া যায় না। তাই স্বতন্ত্র হবে, মেনে নিতে হবে, জমি ভঙে হবে তবু মানতে হবে, যাতে পৃথিবীর সাথে ভালো ভালো হিসেবে আমরা সামনের দিকে চলতে পারি। আর একটা কথা—বাসেব জমি, বাড়ি যাঁবে তাদের বিকল্প বাস্তব বাঁধা ও উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া সমাজের কর্তব্য ও সরকারের দায়িত্ব। তবু বসন্ত বাড়ি তো শুধু সম্পত্তি নয়, তার সাথে জড়িত থাকা স্মৃতি ও যন্ত্রের কেন্দ্রো মন হয় না, কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না। তাই তো বললাম, কতী হলোও মেনে নিতে হবে—না হলো ইতিহাস আমাদের কমা করবে না, জীবিত্য প্রকল্প আমাদের কমা করবে না।

অভিজিৎ ভট্টাচার্য,

ইন্টারনি এম. আর. এস মেডিকেল কলেজ
এড হাসপিটাল, কলকাতা

উন্নয়নের পন্থায় নিজের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় জমি আমরা পরম কর্তব্য মান করি। কিন্তু জমি একজন প্রতি সাধারণ মানুষ, তাই নিজেদের থাকা, খাওয়া ও মজুতাবে কেউ থাকল ব্যাপারে খুবই সংকল্পবশীল, ফলে দেশ ও দেশের উন্নয়নের সমসিয়ারে গৃহভাণ্ডে জমি সম্পূর্ণভাবে গররাজি।

সুতরাং স্বার্থেব কথা ভাবতে দিয়ে আমরা এটা ভাববে অধিকার আছে যে, কোথাও না কোথাও আমরাও খার্ব জড়িয়ে আসে যা জমি কিছুতেই ছোটে করতে পারি না। আর আমরা বাড়ি ভাঙে গেলে যে ধরনের মানসিক ও শারীরিক বিষণ্ণতায় মগ্নো আমাকে বা আমার পরিবারকে পড়তে হবে তা কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়েই তবল্যব করা সম্ভব নয়। যা আছে তাকে অক্ষত রেখে, তাগ পাগে নরনিমানের ভিত্তি ফেলাই উন্নয়নশীল মানসিকতার পরিচয়।

আজ সিদ্ধান্তে বৃহত্তর স্বার্থেব নামে যা হচ্ছে তাতে সেসমানকব অনুভবের খার্বক ছোট করে দেখাব কোন অধিকার আমাদের সেই। একটি দেশ তখনই উন্নতিশীল যখন তার প্রত্যেকটি মানুষ উন্নতিশীল একমল মানুষের উন্নতি এক নলের অবনতির কাগ্ন হল, যেটা ব্যাপারটা কতটা উন্নতিশীল সত্যিই ভেবে দেখা উচিত।

অভিষেক সিংহরায়

সাহিত্যকর্তা, চট্ট

রসায়ন বিভাগ, আই. আই. টি. বোম্বে (বৃহত্ত)

একত্রিত হয়ে কিছু করা সম্ভব

আমাদের এলাকার খুব শীঘ্র উন্নয়ন হতে চলছে। কথাটা শুনে খুবই আশঙ্ক হয়েছিল। ভাকলান, আমাদের এলাকায় গ্রাম বসে সমাজের করে কলোভের বন্ধুরা যে ব্যাপার সেইদিন বোধহয় শেব হতে চলছে। তখন আমরা এও ওয়েছিলুম যে, ব্যাকার ওপর অনেক বাড়িতে মোটাল এসেছে, বাড়ি ভাঙা পড়বে। কপাটা শুনে ব্যাপার লাগলো সেই পরিবারগুলোর অবস্থটা দিকমত উপলব্ধি করতে পারিনি।

ওগে ত্রিদেশ্বর দুপুরে যাওয়া-নাওয়ার সব নতুন বছরেব তলা পথ চেয়ে বসেছিলেন। ঠিক সেই সময় কাবা আতঙ্কিত মুখে ঘরে ঢুকলেন। এক আমনের জানাফেনে টাইওডার ও শশিমেরের জন্য যে সনজ বাড়ি ভাঙা পড়বে তাদের মগ্নো আমাদের বাড়ির সনহও নথিত্বক। মা ওমে পাগলের মত ক্যানকাটি ওক করলেন। কাবা কী কলেন ভেবে পাগলেন না। জমি অসহায় ভাবে মলে পড়িলো। কী কলন আমরাও মাধ্যম আসলেন। স্মৃতি বিজড়িত আমদের এতদিনের পুরোপুরি মথের-সুখের বাড়ি ওঠিয়ে ফলে ভাবতেও পারছি না। যখন ওনাম অনেক বাড়ি নথিত্বক, তখন একবার ভাবলুম একত্রিত হয়ে কিছু করলেও করা যেতে পারে। উন্নয়ন কি এই? জনগণের ক্ষতি করে জনগণের উন্নয়ন তথা এলাকার উন্নয়ন। এটো "জাতের নামে বজ্রাতির" সন।

দেবলীনা মলগুপ্ত

গার্ভেনরীয়া, প্রথম বর্ষ

পূর্ব ভারতে পরমাণুশক্তি

মেঘকুমার বসু

। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সর্বোচ্চভাবে খেয়াল করবেন এ ব্যাপারে। পরমাণু বিদ্যুৎ চুক্তি করতে চলেছে, সম্ভব হলে পূর্ব মেদিনীপুরের কান্দুপাতি বিলম্বিত এই উদ্যোগের স্বাক্ষর স্বাক্ষরকরণ করে নেওয়া হবে। ২০০০ সালে মুম্বাইতে পরমাণুটির ব্যবহারে প্রকৃতি দিয়েও মনোযোগ পড়িয়ে আসছে ইন্ডিয়ান প্রাইভেট প্রাইভেটাইজেশন কর্পোরেশন। কংগ্রেস, সমাজবাদী, বামপন্থিক নেতারা সোমবার বিবেচনা করেছিলেন। ছাত্রদের পরে আরও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে — উত্তরবঙ্গের মধ্যে। অর্থাৎ পরমাণু বিদ্যুৎ যে একটি সফল নয়, পরমাণু কেন্দ্রের মতোই যে পৃথিবীর কোথাও আছেও নেই। পরমাণু চুক্তির যে লক্ষ্য লক্ষ্য দিলে ... এভাবে এটা মনোযোগে বসে বসে চিন্তা করে নেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গের মধ্যে। এই আলোচনা শেষের হয়, কোথায় হয় আলোচনা করে পরে পড়ে।

যে ২০০০-এর সেক্টরে Economic and Political Weekly (EPW) পরিভাষা XXXV ৩২ সংখ্যক আলোচনা মেঘকুমার বসু এ একটি ইংরেজি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন — Nuclear Power for Eastern India, No Basis for Choice। এটি প্রকাশিত হয়েছে পরমাণু প্রকাশিত হয়েছে এটা হল। অনুবাদও আশীষ দাখিল।

স. ইয়া।

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বঙ্গের এটা হাজার হাজার টন বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পরমাণু-শক্তি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভাষণে নির্দেশ করে উদ্যোগ নিয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের এখানেই এক বাজা যা কল্যাণমণ্ডল হল। কয়েকটি সেখানে পরমাণু শক্তি উৎপাদনের এই উদ্যোগ সামাজিক কারণে ঘোষণা মীতির সঙ্গে নিত্যই যেমনই বলেই আসে হয়। পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের একেবারে প্রথম লক্ষ্য খেতেই বেশ আসা হচ্ছে যে, ভারতের পরমাণুশক্তি যেকোনো অবস্থাতেই তাপশক্তি তুলনায় বেশি নিরাপদ এবং শক্ত, তা সে পি-ও-ই (খনি-পুই) থেকে বহুদূরেই অবস্থিত হোক না কেন। ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে কিন্তু পরমাণু বিজ্ঞানীরা ইংরেজ করেন যে কল্যাণমণি থেকে ২০০ ক। ১০০০ কিলোমিটার দূরে কেন্দ্রে তাপশক্তি পরমাণুশক্তির চেয়ে সস্তা পড়ে।

কৃত্রিম পদ্ধতি

অগ্রণী পরমাণু-পদার্থবিদ্যা কিছুদিন করে দাবি করছিলেন যে তাপশক্তির তুলনায় পরমাণুশক্তি সস্তা পড়ে — এমনকি বিনিমুখিতও। সভাচার ওটাই তখন মেওয়া হয় যে [সভা সন্ধ্যা ১৯৮০ : এম আর প্রিন্সিপাল ১৯৮৩] পরমাণুশক্তি স্থানীয় যে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়, উৎপাদিত শক্তির একক পিউ তার খরচ কতটা-জাত শক্তির তুলনায় অনেক কম। পরমাণুশক্তি যে তুলনামূলক বিচারে সুবিধাজনক তা সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব, যদি সেখানে যায় যে তাপশক্তির তুলনায় পরমাণুশক্তির কাশিটাল কটও কম পড়ে। ১৯৮৬ সালে প্রিন্সিপাল রিক স্ট্রীটাই খেলিয়ে তেন। তিনি যেমন যে তাপশক্তির কাশিটাল কট খনি-বা পরমাণু শক্তির তুলনায় সামান্য কম হয়, তবু তাপশক্তি উৎপাদনের খরচ সর্বোচ্চ পরমাণু শক্তির তুলনায় বেশি। কল্যা-কেন্দ্রে থেকে শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রের পূর্বদিক নির্দেশেই একটা হয়।

এইসব ফলাফলের মধ্যে একটা ব্যাপার একটি অস্বাভাবিক। ফেকোনা হচ্ছে, তাপশক্তি কেন্দ্রের কাশিটাল কট (অর্থাৎ কেন্দ্রটি গড়ে

তোলা ও চালানোর খরচ) পরমাণু-শক্তি কেন্দ্রের কাশিটাল কটের পূর্ব বাজারকাঠি, বা তার চেয়ে বেশি। ব্যাপারটা এই জন্য অস্বাভাবিক যে, একটি তাপশক্তি কেন্দ্রের তুলনায় হার্ডওয়্যারের মিক থেকে একটি পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের নির্মাণ অনেক জটিল ও ব্যয়সম্পন্ন। তাপশক্তি-কেন্দ্রে তাপ আর বাষ্প উৎপাদনের জন্য থাকে বয়লার; পরমাণু-শক্তি কেন্দ্রে তার জায়গায় থাকে পরমাণু চুলি। এর বইয়ে, টারবাইন, জেনারেটর এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি উভয় পদ্ধতিতে কিন্তু একই থাকে। পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে ও ছাড়াও সরকার হয় একটি স্থানীয় প্রকিয়াকরণ ইউনিট, যার কাজ হল ইউরেনিয়াম আবহিত থেকে স্থানীয়-নও হৈরি করে ভারতীয় চুক্তির চানো ভারী চুল উৎপাদন করা। তুলনায় পরমাণু-শক্তি কেন্দ্রের কাশিটাল কট তাপশক্তি-কেন্দ্রের তুলনায় অনেকটা বেশি হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাহলে প্রিন্সিপালের হিসাব থেকে কেন এর বিপরীত ফল পাওয়া যাচ্ছে? তার সাাখা হিসাবে প্রিন্সিপালেরই আরেকটি হিসাব থেকে। সেখানে সেখানে হচ্ছে, তাপশক্তির মোট বিনিয়োগ-ব্যয়ের প্রায় ৪৪ শতাংশই হল কলার অনুসন্ধান, উৎপাদন আর পরিবহন-ব্যবস্থার ব্যয়। এই অনুপাতটা বিশাল। আর এইখানই গুরুত্ব। যেভাবে হিসাবটা করা হয়েছে, তা অর্থনীতিশাস্ত্রের হিসাব-প্রণালীর নিয়মবিরুদ্ধ। কেননা, কলার খরচটা অবিরত খরচের (কোরিয়েল কট) অন্তর্গত; আর বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের খরচটা হল নিরত (ফিক্সড) খরচ। অর্থাৎ কলার সেই অবিরত খরচের ওপরেই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের নিরত খরচকে। একটি শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রের বছর কিংবা অন্যান্য ইনপুটের মতন স্থানীয় খরচটাও কিন্তু শক্তির উৎপাদন-মাত্রার সঙ্গেই ওঠানো করে। তাই হিসাব-প্রকিয়ায় স্থানীয় খরচকে অনিয়ত (কোরিয়েল) খরচের বাবে সেখানেটাই নিয়ে। এন নাহা নিয়ে প্রকৃত বাস্তব অবস্থারই প্রতিফলন ঘটে, যে-অবস্থায় একটি শক্তি কেন্দ্র চালু করে বাজার থেকে কলার কেনে। সেসঙ্গে কটুপারের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। কলার পরিবহনের জন্য নিরত (ফিক্সড) খরচ আর

অনিয়ত (কোরিয়বল) পরে কত, তা হিসাব করার পরেই বাল বহনের ভাড়া ঠিক করা হয়। কাজে কসতেই, তাপশক্তি উৎপাদনের জন্য কত শক্তি পাড়ে তার হিসাবের মধ্যে কমানোর উৎখনন আর পরিবহনের বিনিয়োগ-মাত্রের চুক্তির সেওয়াটা অর্থনৈতিক।

করক ভিন্স ইউনিয়নিয়-ক্যান্সারিস উৎখনন ও পরিবহনের বিনিয়োগ-মাত্রের হিসাবের মধ্যে অন্যতর সমস্যা তখন দৃষ্টি হজাতা পাকত, যদি শক্তি-উৎপাদন কষ্টপত্র সত্যি সত্যিই ঐসম সম্পদের মালিক হইতেন। কিন্তু এমনকি সেক্ষেত্রেও জ্বালানির সম কমানাই ক্যান্সারিস চালু রাখার-বয়ের চেষ্টা বেশি হত না। তা নাহলে তে ঐসম সম্পদের মালিক হওয়াটা অর্থনৈতিক সিক থেকে সম্ভাব্যকরই হত না। দুইধর কথ এই যে ভারতের নামজাদা পরমাণু বিজ্ঞানী এই মুক্তি সন্ধিরে চলেছেন যে পরমাণুশক্তি তাপশক্তির থেকে সস্তা — এমনকি বিন-শুল্কেও। এ মুক্তি কিন্তু কোলাবলির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। এটা জানো কেননাযাক এই জানো যে তাঁদের মুক্তির পরমাণু কোথায় তা কিন্তু বহুকালা আগেই, সেই ১৯৭৯ সালেই, দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। [বোস, ১৯৮০]

পরমাণুশক্তি উৎপাদন-মাত্র কত তা অন্য একটি সমীক্ষায় আলোচনা করে হিসাব করা হয়েছিল। [বোস, ১৯৮১] এর জন্য আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি এবং ইনস্টিটিউট অব আমেরিকান ফিজিক্স কলিফোর্নিয়া একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। ঐ প্রকল্পনায় একটি বিশেষ পদ্ধতির কথা বলা হয় যার সাহায্যে 'পরমাণু শক্তি-চক্র' নিয়ে, এবং বাজী পর্যায় নিয়ে ঐী কথা হবে সেই সংক্রান্ত টেকনিক্যাল সমস্যাগুলি সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। আর সেই সঙ্গে তাঁদের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, পরিকল্পণ, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিণামগুলির মূল্যায়ন করাও সম্ভব হবে। [এ পি এস, ১৯৭৮] এই বিশ্লেষণের ফলাফল ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়।

জ্বালানি-চক্রের পরে কত তা হিসাব করার জন্য ভারতীয় মূত্র থেকে বরফেরি তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জারী চক্র-চক্রির যে-দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন এ পি এস, তার ভিত্তিতেই ঐ সমীক্ষায় হিসাববিকাশ করা হয়েছিল। স্বার্থে একটি ২০০ মেগাওয়াট জারী চক্র-চক্রির ফ্যান্ডিয়াল কল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কত পাড়ে আর ভারতে কত পাড়ে, মোটামুটি তারই অনুপাত অনুযায়ী উপাত্তগুলিকে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই হিসাব থেকে দেখা যায়, ১৯৭৭-৭৮-এ বিন-শুল্কে অবস্থিত একটি কয়লাখোজ সেক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন শক্তির ইউনিট-পিঙ্কু পরে ১৪.৯১ পয়সা থেকে ১৮.৮৪ পয়সার মধ্যে ওঠানামা করবে। শক্তি-ক্ষেত্রের প্রকৃত উৎপাদন-ক্ষমতা মোট উৎপাদন ক্ষমতার ৬০ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। পরমাণু কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে বনতের তুলনীয় অঙ্কগুলি ছিল যথাক্রমে ১৭.৫২ পয়সা থেকে ২২.০৮ পয়সা। অবশ্যই জ্বালানির পুনর্ব্যবহারের হিসেবেও এর মধ্যে ধরা ছিল। কাজেই, পরমাণু-শক্তি তাপশক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে তখনই, যদি বরতের ঐ ফারাকটা কয়লার পরিবহন-ব্যয় নিয়ে পুড়িয়ে ফেঁচকা যায়। দেখা গেল, সেই সময়কার কয়লা-পরিবহনের ভাড়া অনুযায়ী বিন-শুল্কে থেকে ৭০০ কিলোমিটার

দূরত্বের সবটাকা তুলানুসারে হয়ে থাকে। এম পাশেও কিন্তু ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানীরাও মনে রাখা কথা সম্ভব হয়নি। [...]

কেন মাস্ক, পরমাণু শক্তির বরত তাপশক্তির চেয়ে কম পাড়ে একদার তখনই যদি ডিসকন্টেন্ট রেট ৬.৭ এর কম হয়, তা হলে কখনই হয় না কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ পরিবহন শক্তির পরিচালনা ও প্রকল্পের মূল্যায়নের হিসেব করার সমস্যা ১২ শতাংশ ডিসকন্টেন্ট রেট ধরে। ১০ শতাংশ না হলে তখন বেশি হলে ডিসকন্টেন্ট ধরার পরমাণু শক্তির বরত তাপশক্তির চেয়ে বেশি পড়বে। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক পরমাণু শক্তি কমিশনের একটি সমীক্ষাপত্রও একটি সিদ্ধান্ত বলা হয়েছিল।

তাই বনি হয়, তাহলে এ প্রশ্ন না উঠেই পারে না যে, এইসব কথা হাতে থাকা সত্ত্বেও কেন পরমাণু শক্তি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই রাজ্যে একটি ১০০০ মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদনের উপযোগী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণের নির্দেশ দিল? এবং কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ পরমাণু শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করতে রাজি হল?

ভারত মার্কিন পরমাণবিক চুক্তির (১৮ জুলাই, ১৯৫৭) এর ফ্রাঙ্ক মহাশত্রুর সমুদ্র উপকূল চিত্রাপুর-এ ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভব চারটি ফাস্ট রিঅক্টর বসানোর জন্য ভারতের পরমাণবিক শক্তি কমিশনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। ইতিমধ্যে তামিসান্দ্রু ক্যানালের পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারল এমন দুটি ফাস্ট রিঅক্টর প্রোটোটাইপ রিএক্টর বসানোর কথা শুরু হয়েছে। গ্রাম ১৯৯২ সালে পরমাণবিক ইন্সটিটিউট চুক্তির (এন.পি.টি) নই করার পর দুই দেশের মধ্যে কোনো বরম পারমাণবিক সহযোগিতা বন্ধ ছিল। (উঃ হলভেস, ট্রেন্ড'স সামাজিকার, ফ্রান্সিস, ২৫ আগস্ট, ২০০২। পৃ. ৮৭-৮৮)

অসম্পূর্ণ হিসাব

পরমাণুশক্তি আর তাপশক্তির তুলনামূলক বিচার করতে গেলে একটি কাণারের বেশ দটকা লাগে। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, বরতের শক্তি থেকে এই ধই প্রতিশত মূল্যে আসলে তুলনা চলবে না। তাপ-বিদ্যুৎশক্তির হিসেবটা সম্পূর্ণ হয়ে যায় এতটা তিনিই অমবেকলের মধ্যে ট্রাই-আলোকের বিচার করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু পরমাণুশক্তির সঙ্গে তুলনা হিসেবটা অনিশ্চিত্যের মধ্যে অসম্পূর্ণই থেকে যায়। একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সক্রিয় জীবৎকালকে যে-পরিমাণ ট্রাই আপ টেরি হয় তাপক কাজে লাগানো হয় ইট আর সিমেন্ট টেরি করে, সচ বোঝানোর জন্য শেষ হিসেবে ব্যবহার করে, বাজা টেরি করে এবং পরিচালক বিনিয়োগ ভরাট করে। এগুলি কিছু পরিমাণে মুক্তিকার একেবারে উপরিভাগের বিতরণ হিসেবে কাট করে, আর সেই কারণে পরিবহনের ওপল এতল অভিযোগ অনিশ্চিত্যের মধ্য। অর্থনীতির পরিভাষায়, এইসব কাজে লাগা কাল ট্রাই অ্যাপের মতো একটি পরার্থের একটি 'কম' না দিক তদুপ

আমু ঘুরিয়ে গেলে তাশখিবান্দা তেজস্ৱীত কাক্সরে বেতে নিলে তাৰ
ছায়াটাই আবে কিছু 'চম্বা' পালে। তাৰ এটা গিত যে (খোঁচা) আৰ
কান্বে তই-তুম্বাইত পাস হেতে তা গ্লীনহাউস-ফিফাতে মনত পেত।
এওলিকে যদিও বহুতৰে হিঙ্গলকৰ ভাণ্ডা ধৰা হুত না, তদু এওলি
খৰিগৈলৈ পকে অনিউকৈ।

এৰ বিশৰীতে, পৰমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্ৰ কে বৰ্জা তৈৰি কৰে তাৰ
মিস্টাট একেবাৰে অন্য ৰকত, ছালালি-মওণ্ডো, উৎপাদনকেন্দ্ৰৰ
একটা বড়ো অংশ, তা খেতে নিৰ্গত কিছু কিছু বৃত্তিত ভৱল পৰাৰ,
সেইখি শবলভাৰে তেজস্ক্ৰিয় হৱে ওঠে, এবা অনিশ্চিতাল ধৰে
তেজস্ক্ৰিয় হুইই ধৰে। এলৈৰ বিদ্যুৎ কবলৰ কোনো লাভাই কাৰ কৰা
হয়নি। বৰ্জা পৰ্যায়ৰ মধ্য বেসৰ মৌল থাকে তাৰ মধ্য ২০টি
প্ৰায়েৰ মৌল অৱেক সপ্তাহ খেতে ওক কৰে ২৪০০০ বছৰৰও বেছি
কাল পৰ্যন্ত তেজস্ক্ৰিয় হুই থাকে। শূটোনিয়াম, যা কিনা পুৰোণি
মন্ত্ৰেৰ তৈৰি সমস্যাঃ বিহাতি মৌল, তাৰ আৰ্হেটা কত হুতে সময়
লাগে ২৪০০০ বছৰ। ঐৱকৰ চাবটি অৰ্ধজীৱন, অৰ্থাৎ ১৬০০০ বছৰ
পাৰ কৰে তাৰ তা নিঃশেষে কমিত হয়। এই খোঁচা পৰ্বটা ছুড়ে ঐসল
ভাৱনত বৰ্জাওপোকে সাংখ্যন সূৰ্জিত আধাৰেৰ মধ্য ৰেখে নিতে
হয়, য'তে কৰে পৰিণত তেজস্ক্ৰিয়তাৰ দ্বাৰা কিত্তিত্ব না হু। ইতিহাসে
অনেকা মান; সভ্যতাৰ পতন-অভ্যুদয় দেখেছি। কত সভ্যতা প্ৰায় কোনো
চিহ্ন না কৰেই বিলীন হুয়ে গৈছে। এই তেজস্ক্ৰিয় বৰ্জাকে আধাৰী
২০০০ বছৰ ধৰে সূৰ্জিতহুৱাৰে পুৰিতৈ লাভাই অনুশাভ্ৰাতিৰ পকে
কিবা-বহুতৈ পকে সন্তৰ হুৱ কিলা, সেটা একটা বহু প্ৰশ্ন। এই
উপলব্ধি পৰমাণুপত্ৰিৰ সমৰ্থক আৱিষ্কাৰ ওয়াইনষ্টাইন আৰ্টনাম
কৰে উল্লেখিলে। 'আমকা যাৱা পৰমাণুপত্ৰিৰ সমৰ্থক ভাৱা সমাভেৰ
সময় একটা নাৰকটী চুটি কৰাই। এক বিকে, অনুঘটক পৰমাণুচি
[ট্ৰীভাৰ] মাৰফত আমকা পত্ৰিৰ এক অনুঘটক উৎস হুৱেৰ নাগালে
এনে সেৱৰ প্ৰস্তাব দিছি। 'অন্যকিমে এই তাৰ-উৎপন্ন মুলা হিসাবে
আমকা সমাভেৰ কাছ খেতে সামাজিক প্ৰতিৱাদওলিৰ ওপৰ এখন এক
বগনেৰ নজৰৱানি দাবি কৰছি, তাৰপৰ এও বেছি আয়ু দাবি কৰছি, যাৱ
মসে আমকা নিতাইই অনভাৱ।' [ওয়াইনষ্টাইন, ১৯৭২]

শতাব্দীৰ পন শতাব্দী ছুড়ে এই পাৱনাৰকিত বৰ্জাকে ভীতানে
চাপা দিছে লাখ যানে তা নিয়া ভাবতে হয় পলাখৰিগান। গিত ত্ৰেননি,
ভবিষ্যতে শতাব্দীৰ পৰ শতাব্দী ছুড়ে ই বৰ্জা পৰ্যায়ৰে সূৰ্জিত
ভাঙাৰেৰ বোকা টেনে নিজে চলাবল বৰজ কত পড়াবে, তাৰ হিসেব
কৰতে হুই অৰ্ধজীৱিকমেৰে। এই চ্যালেঞ্জৰ সামনে পলাখনি আৰ
অৰ্ধজীৱিক কৰাৱাই অবশ্য বুঝ সুবিধেৰ ময়। বৰ্তমান প্ৰকল্প পৰমাণু-
কেন্দ্ৰ খেতে তৈৰি পৰমাণুপত্ৰিৰ সুযোগসুবিধা ভোগ কৰে। আৰ
ভবিষ্যতেৰ প্ৰকল্প, যাৱা এইসব সুবিধে ভোগ কৰাবে না, তাৱা এই বৰ্জা
পৰ্যায়ৰে সূৰ্জিত বোকা ইইয়াৰ বৰজ ভোগাবে। এই তেজস্ক্ৰিয়-বৰ্জা
পৰমাণু-পত্ৰিৰ নেট হিসাবে ভাৱাৰ বাতে কিছুই নেই না, কিন্তু বৰজৰ
যহ্ন বহুতৰে পৰ বহুৰ বাবে বাঢ়িহুই চলে। তাপপত্ৰিৰ সমে এটাই
তাৰ তফাত।

উৎপাদন-কেন্দ্ৰেৰ আৰু শেষ হুৱাৰ পৰ বত্ৰপাতি, কাৰখানা
এসব নিজে কী কৰা হুবে, তা নিজেও তাপপত্ৰি-কেন্দ্ৰ আৰ পৰমাণু-

পত্ৰিকেন্দ্ৰৰে মধ্য অনুঘট পৰ্যায় আছে। সাৰা উলান ধৰে কত কল
চলাব মজন পৰমাণু কেন্দ্ৰেৰ ও বিদ্যাইটৰে কাৰোমোৰণি পুৰিত যো
থাকে, তাৰপৰ তেজস্ক্ৰিয়তাৰ মায়া বুঝ বেছি থাকে। অতি সাৰপৰনে
এওলিকে বুজাৰে দেখাতে হুই। অন্যান্য বৰ্জা পৰ্যায়ৰ সমেই সূৰ্জিত
অবস্থাৰ তাৰপৰ ৰেখে নিতে হুই। তাই পৰমাণু-পত্ৰিকেন্দ্ৰকে পুৰি
ফেলাটো বেশ বৰচাপপেত ব্যাপাৰ — কাৰ্ণিটাল কৰ্টেৰি প্ৰায় ৪
থেকে ১০ শতাংশ এৰ পেছনে চলে যায়। এৰ ফালে পৰমাণু
পত্ৰিকেন্দ্ৰৰেৰ কাৰ্ণিটাল কট আৱাৰ খেঙে ঘটে। পত্ৰি উৎপাদন
চলাকাৰী যেনে বৰ্জা পৰ্যায় তৈৰি হয়, আৰ পত্ৰিকেন্দ্ৰেৰ আয়ু ঘূৰিয়ে
যাকৰ পৰ বেসব তিনিমাকে ভজাল হিসাবে ফেলে দিতে হয়, তাৰপৰ
প্ৰতিকালকাৰে ব্যাপাৰে পৰমাণুপত্ৰিকেন্দ্ৰ আৰ তাপপত্ৰিকেন্দ্ৰৰেৰ মধ্য
অৱশ্যপাতাল ফৰাক। তাপপত্ৰি কেন্দ্ৰেৰ কেন্দ্ৰে তা ভাৱাৰ বাতে ভৰা
পড়ে। পৰমাণু-পত্ৰিৰ কেন্দ্ৰে বহুতৰ চাৰে। প্ৰথমটিৰ কেন্দ্ৰেই পুৰোণি
পুৰোণি চুৰিতৈ নেওচা যায়। দ্বিতীয়টিৰ কেন্দ্ৰে তা অসম্পূৰ্ণ পেকে
যায়। সেই কৰণই বৃহি বৃত্তিকৰ মধ্য বেহোলা তুলনাতেই দেখা যাবে,
পৰমাণুপত্ৰিৰ খৰ তাপপত্ৰিৰ চায়ে বেছি।

কয়লা ও পৰিবেশ

একটা কথা বলা হুয়ে থাকে যে, কয়লাৰ উল্কাৰ যেনেই সীমিত তাই
একটা মজন আশেৰ যখন আমাৰেৰ বিকল্প পত্ৰি-উৎপন্ন কৰে পাত
পাততেই হুবে। বলা হুয়েছে, ভাৱতে আৰ একপন বহুতৰেও কম সমাৱেৰ
মধ্যেই হুয়েতা কয়লা ঘূৰিয়ে যাবে। পৰমাণুপত্ৰিৰ সমৰ্থকতা অৱকে
এই বৃত্তিতেই পৰমাণু কৰ্মসূচিকে ভোৱাৰ কৰাৰ সমপেক সওয়াল
কৰয়ে। কিন্তু ঘনিদ এই যে ভিকেলিভাৰল মাৰ্টে অব ইণ্ডিয়াৰ পেণ্ডা
তথা অনুঘাটী বৰ্তমানে ভাৱতেৰে প্ৰমাণিত কয়লা-ভাঙাৰেৰ পৰিৱাল
লে ৮২০০ কোটি মেট্ৰিক টন। [বি এম আই ২০০০] কয়লা মজুকৰ
নেওচা তথা অনুঘাটী ১৯৯৮-৯৯ সালে বছৰে আয় ২১ কোটি ২০
লাখ টন কয়লা লাগে। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ পৰ্বন উল্কাৰ একটি প্ৰতিবেদনে
বলেন যে, ২০০৭ থেকে ২০১২ সালেৰে মধ্য, অৰ্থাৎ একাদশতম
পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সময়, দেশত কয়লাৰ প্ৰাপ্যতাকে কাৰ্বণত বছৰে
৪০ কোটি টনৰ মধ্য সীমাবদ্ধ থাকতে হুবে। [সি ই এ ১৯৯৮]

বৰ্তমানে বছৰে ৪০ কোটি টনেৰে প্ৰায় কম কয়লাই বৰজ হয়।
তবু যদি ধৰে নেওচা যায় যে বছৰে ৪০ কোটি টন কৰেই কয়লা পৰজ
হুবে, তাৰলে কয়লাৰ প্ৰমাণিত মজুত নিয়ে আৰও অন্তত ২০০ বছৰ
চলে যাবে। ধৰে নেওচা যাক, কয়লাৰ প্ৰমাণিত মজুতৰে সৰ্বটা সমজে
হুৱে পাওতা যায় না। সেকেন্দ্ৰেও অন্যায়সে বলা যায় যে একোপৰ
কয়লাৰ মজুত যুগ্মতেও চুৰোতে অন্তত ১২০ বছৰ কেটী যাবে। এই
সময়েৰে মধ্য বিজ্ঞানীৰা নিশ্চইই পৰমাণুপত্ৰি সন্বেত অসমাণিত
সমস্যাওপোৱা সমাধান কৰে নিতে পাৰবেন। সেটা না কৰে এখনই
পৰমাণুপত্ৰি কৰ্মসূচিকে তড়িঘড়ি এগিয়ে নিজে চলোৱা কোনো বৃত্তি
নৈ। অথব অনুশাভ্ৰাতিৰ ইতিহাসেৰে দিক থেকে কিন্তু ১৫০টা বছৰ
এমন কিছুই না। কাৰেই ভীৰল-ছালানি ঘূৰিয়ে যাৱাৰ আৰ্হেই বিকল্প
পত্ৰিৰ উৎস আৱাৰেৰে বুজাৰ পেতেই হুবে।

একপা মানতেই হুবে যে, পৰিৱেশেৰ ওপৰ কয়লাৰও অনেক

কঠিনের প্রভাব রয়েছে। আবশ্য্যগুলি থেকে যে কল্যাণোভা (এমন যেখানে তার মধ্যে থাকে সালফার, নাইট্রোজেন আর কার্বন) অক্সাইড, যা বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস-ফ্রিফা ঘটনা: শিল্পগুলি, বিশেষ করে বিদ্যুৎ-শক্তি নানান ব্যবস্থা নিয়ে স্টো করা হয়েছে কারণ নানা থেকে নির্গত যৌগের মধ্যে উল্লেখ্য থাকে গ্যাসের মাত্রা কমানো যায়। শিল্প ব্যবহৃত ব্যাটারীগুলো থেকে কয়লা জ্বালানোর মতন যে যৌগ বেরোবে, তার মধ্যে থেকে সালফার আর নাইট্রোজেনের অক্সাইডকে শোধনের ব্যাপারে বেশ সফল পাওয়া গেছে। কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইডকে নিরুৎসাহ করে বেশ কঠিন বলে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইডই হল গ্রীনহাউস গ্যাসের প্রধান উপাদান। কল্যাণ সেয়েই শিল্পক্ষেত্রে অসহ্য অস্বস্তি একশত বছর ধরে বাধাগ্রস্ত হয়ে, তাই বিশ্ব ভূত্ব কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ভরবেই থাকবে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রনায়করা সবেমাত্র ১৯৮০-র মধ্যকার গ্রীনহাউস ক্রিমার সম্ভাব্য অতিথিত নিয়ে ডাবনচিঠি করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। মাত্র সেদিন, ১৯৭৭ সালে, বিভিন্ন রাষ্ট্র কিয়দাটা প্রোটোকল-এ কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমন কমানোর চুক্তিতে সই করেছে। কিন্তু এই বছরক বছরের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা এমন কিছু ফলাফল নিয়ে হাজির হয়েছেন যাতে এ সমস্যাটির সমাধান করা যাবে বলে মনে হচ্ছে। মহাসাগর কিংবা ভূতাত্ত্বিক অবশেষের মধ্যে কার্বন চলিয়ায় নিজে তাকে ধৌল-ফেলে নিষ্ক্রিয় (সেয়েয়েস্টার) করে ফেঁড়া হয়ে, অর্থাৎ বিভিন্ন স্থান অতিক্রম রাখে যাবে। কল্যাণের আরেক গভীরে যে মিথেন অক্সিড পড়ে থাকে তার মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড চলিয়ে দিয়ে তাকে সরিয়ে ফেলা যাবে। যশে কল্যাণের একই সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের গ্যাস-উৎস হিসাবে এবং অত্যন্ত দ্বিভিত্তিক এবং ভাঙার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কল্যাণের আলবার্টার ধুমুহীন বিদ্যুৎ-উৎপাদনের একটি পরীক্ষামূলক ইউনিট তৈরির কাজ এখন পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। জমি চাষের ক্ষেত্রেও কার্বনকে মাটির মধ্যে বেঁধে ফেলে নিষ্ক্রিয় করে ফেঁড়া যাবে কিনা, অনুসন্ধান চলছে তা নিয়েও।

কনসারভেট সলোশ-সংরক্ষণ কার্যকর কার্বন ডাই-অক্সাইড পাকড়ানের এক পদ্ধতি বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভূমি, অরণ্য এবং ভলক্যানগুলিও (মহাসাগর সমত) এখন কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভাঙার বলে গণ্য। আবহাওয়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত অধিবেশনের রূপরেখা (ইউ এন এফ সি সি) রচনা করে রাষ্ট্রসংঘ কিয়দা গ্রীনহাউস গ্যাসের ভাঙ-বিষয়ে, যাতে তারা যাচাই করে দেখেন যে, গ্রীনহাউস গ্যাসের কাজ-ধারণ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা কতটা পৃথিবীর রয়েছে, এবং সে-কমতা বাড়ানো যায় কিনা। অরণ্যগুলির, বিশেষ করে উচ্চমতলীয় শেওলির অরণ্যগুলির বিধ্বার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে উন্নত শেওলি যোগ দিতে।

বায়ুবদ্যায় বিকল্প

পরমাণুশক্তির প্রবক্তারা দাবি করেন যে প্রযুক্তিগত উন্নতির কঠোর চেষ্টায় পরমাণুশক্তিই জীবাশ্ম-জ্বালানির একমাত্র বায়ুবদ্যায় বিকল্প। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, সৌর আলোক-ভৌতটিক সেল (এস পি ডি), বায়ুশক্তি, জ্বালানি সেল প্রকৃতি প্রযুক্তিকে এখনও

সাম্প্রতিকতার প্রাচীরে করার সমর্থ অংশনি। প্রকৃত তথ্য কিন্তু এটি ধারণাতে কুল সল প্রমাণ করে। এ তথ্যটি বুঝ বেশি জটিল নয় যে, ১৯৭৭ সালে ভারতে বায়ুশক্তির স্থাপিত উৎপাদনক্ষমতা ছিল ১০২ মেগাওয়াট, যা কিনা মোট উৎপাদনক্ষমতার ১.০৩%। এস পি ডি সেল-এর ক্ষমতা ছিল ৩৭ মেগাওয়াট, জাতীয় ইলেক্ট্রিক প্রকল্পের ক্ষমতা ছিল ২৭১ মেগাওয়াট আর ইকমপলার (কল্যাণোভা) ভিত্তিক ইউনিটগুলোর ক্ষমতা ছিল ১০২ মেগাওয়াট। সব মিলিয়ে মরীচক-সম্পদ (রিনিউয়েবল) শক্তির মাত্রাটি ছিল মোট শক্তি ১২ শতাংশ: এর পরশপাশ, ১৯৭৭ সালে পরমাণুশক্তির স্থাপিত ক্ষমতা ছিল ২২২৫ মেগাওয়াট, যা কিনা মোট বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতার (৮৫.৭৩৫ মেগাওয়াট) ২.৭১ শতাংশ। যখন একদল হয়ে, পরমাণু-শক্তি গড়ে উঠবে গত পঞ্চাশ বছর ধরে, আর মরীচকসম্পদা শক্তি-উৎপাদনের কাজে কোন কলমে চলবে কেবল গত দুটি শতাব্দীর পরিচয়মান সময়।

একথা দিক নয় যে মরীচক-সম্পদা শক্তির প্রচুরতা কেবল সেইসব বুন বুন এলাকাতেই কম সমর্থ প্রমাণ দিয়ে পাটকিল সমস্যাতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়াটা অর্থনৈতিক বিত। শুধুই সার্বভৌম নয়, কারণ জলপন, জলমি, জ্বালানিকর্মী সেলগুলি, ইউট্রালাসও এবং মরীচক যুক্তবায়ুশক্তি মাত্রা উন্নত সেল সৌর আলোক-ভৌতটিক সেল বৃদ্ধবায়ুশক্তির একসাথে যেতে একবারের পরে কেন্দ্রীয়িত পরিকল্পনাও ভাঙা করে নিয়েছে। ১৯৯৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেন্টো: মিউনিসিপাল ইলেক্ট্রিক ডিস্ট্রিক্ট (এস এম ইউ ডি) তার প্রকল্পই একটি পরমাণু-শক্তিকল্প বন্ধ করে নিজে হার, কারণ যেটি প্রকৃত শেওলার সমস্যা। তার বললে এস এম ইউ ডি তা স্যাক্রামেন্টোয় ও মেগাওয়াটের এস পি ডি এবং ৫০০টি হাউস-বলন: এস পি ডি দিয়েই চালু করে। এই উন্নয়ন প্রকল্পটিকে বন্ধে কোথ চলে। গ্রাহকরা বেশি বার নিতে রাজি হয়। গ্রিডের সর্বোচ্চ চাহিদা মেটাবার জন্য সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে এস এম ইউ ডি বায়ুশক্তির স্পস ইলেক্ট্র-শক্তিও সঞ্চয়ন ঘটায়। এ ছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাসকে ইলেক্ট্রিকালের উৎস হিসেবে কাজ লাগিয়ে তারা দুটি ২০০ মেগাওয়াটের জ্বালানি সেলও বসিয়েছে। জ্বালানি সেলের কার্যকরী কর্ম এমন নতুন নতুন জাপশক্তিও কার্যকরী কর্মের সঙ্গে পাল্লা দিতে বলে মনে করে হচ্ছে। এসব শুধুকে মোটেই উত্তা বলে উপেক্ষা করা যায় না, এতটা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করছে।

ভারতে পরমাণুশক্তির ওপর সবকিছুর নিরস্ত্রণ গোপনীয়তার ঘেরাটোলে ঢাকা। ১৯৮২ সালের 'পরমাণু শক্তি আইন' বলে পরমাণবিক ব্যবস্থা বা শক্তি-উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত সকলের পক্ষেই ঐ সংক্রান্ত তথ্য জানালা নিষিদ্ধ। একটা অতিকথা চালু করা হয়েছে যে পারমাণবিক প্রযুক্তি নাকি এতই বিপজ্জনক যে অথবা তা নিয়ে চর্চা করা উচিত নয়। কথটা একবারেই ঠিক নয়। বস্তুত, মার্টিন বুদ্ধরাষ্ট্র সামন্ত অনেক দেশেই পরমাণুশক্তির সাংগঠিক উৎপাদন ও তার পরিচালনা করে ব্যক্তিমানিকারী সংস্থা। প্রতিযোগিতাত্মক বাজারে অবশেষে তথ্য পাওয়া যায়। যশে পরমাণুশক্তির অর্থনীতিটিকে আর থেকে রাখা সম্ভব হয়নি। বাজারের নীতি বাস্তবতাই তো মার্টিন

দুর্ভরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে পরমাণুশক্তিকে ব্যর্থ করে প্রচণ্ড ক্ষয়
দিয়েছে।

সংক্ষেপেই যদি হুৎ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের একমাত্র সংস্থা,
ভাষে পরমাণুশক্তি সংস্থাপনিত সেওয়া তৎক্ষণে সভাতিয়া যাচাই করে
নেওয়া সম্ভব হয় না। কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবস্থার হিসাব করা হয় তা মাঝা-
করা হয় না, ফলে নিরাপত্তাহার ব্যবস্থার হিসাব পরীক্ষা করা হয়ে না।
ফলত, যে-তথ্য জানানো হয়, তাই বিশ্বাসযোগ্যতা করে যায়। ব্রিটিশ
সরকারের অধীনস্থ স্টেটস ইলেকট্রিসিটি কেন্দ্রাবর্তী বোর্ড (সি ই ডি
বি)-এর অভিযন্তা এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। ১৯৮৮ সালে সি ডি
বি পবি করে যে, পরমাণুশক্তি উৎপাদনের ব্যয় তাপশক্তি উৎপাদনের
তুলনায় কম পড়ে। কিন্তু পরে দেখা যায়, পরমাণুশক্তি উৎপাদনের ব্যয়
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-জার্মানি ডিভিড বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনায় অনেক
বেশি পড়ে। ১৯৮১ সালের ১ নভেম্বর সেক্রেটারি অব স্টেট হাইড্র
এর কর্মসূচী জানান যে 'ব্যক্তিগতকরণের প্রক্রিয়ায় পরমাণুশক্তি
উৎপাদনের ব্যয় আগাগোড়াই বেশি থেকে গিয়েছিল। বিদ্যুৎকরণের
প্রকৃতি নিজে গিয়েই এই আসল ব্যয় ধরা পড়ে গেল।' সে সময়কার
শেখর কমন্ডারজেনিট কম পরমাণু শক্তির বিদ্যুৎকরণের হস্তক্ষেপ ঘিরিয়ে
নেবে, তাহলে ব্রিটেনে কোনো ব্যক্তি-উৎপাদনিত এর চেহারা নির্নিয়োগ
করতে পারি হইনি।

পরমাণবিক শক্তি তখনই ও সবকিছু সব সময়েই পরমাণবিক
শক্তি হেতুচিত্রতার অস্তিত্ব অস্বীকার করে থাকেন। সাধারণ মানুষ
মিলেক বা ম্যাগনে (যেতে হেতুচিত্রতা) যে মাপের, তাই সুযোগ
নেই। বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা যাতে হেতুচিত্রতা মাপতে না
পারে, ফেলনা পরমাণবিক শক্তি আত্মজটিল স্তরে 'ব্যবহার
কট্টবাহ' যন্ত্রটির দাম বেশি বেহেদে-এক লাখ টাকার উপর।
বেসরকারি পর্যায় হুটুটি আমদানি করতে সমর্থ হলে আমদানি-
ওষ দিয়ে দুলত টাকার সহতা লম্ব পড়বে। (একশ বহুতে নারী
অবিদার, কলকাতা এপ্রিল, ২০০০। পৃ. ১৪)

পরমাণুশক্তি নিরাপত্তার

পরমাণবিক সংস্থাপনিত যদি বস্তু, ভারতের পরমাণু শক্তিকেন্দ্রগুলিতে
কিন্তু ওকতর ভয়নক দুর্ঘটনা ঘটবে। সরকারি গোপনীয়তা আইন এবং
১৯৮২ সালের 'পরমাণু শক্তি আইন' এইসব বিদ্যুৎশক্তি-কেন্দ্রের
কর্তাদের সেবা-মাধ্যমের সভ্যনী সৃষ্টি থেকে আড়াল করে চালাবে। তা
সত্ত্বেও গোপী রেনিয়ামক (১৯২৯) এইসব ঘটনার এক তালিকা তৈরি
করেছেন। ১৯৯১ সালের মার্চ মাস্ত্র পরমাণু-বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রে একটি
ডিফেন্ডেট কম পরীক্ষা করার সময় একটি বিশেষ যন্ত্র থেকে হেতুচিত্র
টিউবায়ন-সংযুক্তি বিপুল পরিমাণ ভারী জল বেরিয়ে যায়।
সংবাদমাধ্যমের লোকেরা এ বিষয়ে এ শক্তিসংক্রেত কর্মকর্তাদের কাছ
থেকে কোনো তথ্যই সংগ্রহ করতে পারেননি। কিন্তু এ কেন্দ্রের প্রমিক
ইউনিটের, বীরা অংশ থেকেই এই ধরনের অন্য অনেক ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন
হয়েছিলেন, তাঁরা সাংবাদিকমহাশয় এ বিষয়ে কিছু তথ্য সরবরাহ করেন।
তখন বেসরকারি পড়ে গিয়ে কর্মকর্তারা বীকার করতে বাধ্য হন যে
হুটন ভারী জল এ সময় বেরিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা অকথা পাবি করেন

যে ব্যাপারটা 'অতি সামান্য', বস্তুত 'জার্মানি রেনিয়ামের ড-৩ থেকে
ভারি জল বার করে সেওয়ার যে-পরিচরিত প্রক্রিয়া', ওটা নাকি তাই
অস। কিন্তু কর্মকর্তারা এটাকে 'অতি সামান্য' ব্যাপার বললে তা হলে,
তাঁদের পবিত্র মেসেজি কোল টোকেন। ফলে উৎপাদন-কেন্দ্রের কর্মকর্তা
এ ঘটনার সব উৎপাদন-কেন্দ্রের মধ্যে আত্মকর্তাধীন অবস্থা থেকে
করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

রেনিয়ামক ১৯৮১ থেকে ১৯৯১-এ মধ্যে জটিল একটা পর
একটা দুর্ঘটনার প্রতিবেদন দিয়েছেন। এগুলি ঘাটতিয়া মালদার,
কারাবাদ, লাহোর, কাইশ অব হারাপুরের উৎপাদন কেন্দ্রে ঘটিয়ে।
গোপনীয়তার সেজা উপাত্ত যেটুকু তথ্য বেরিয়ে এসেছিল, 'কেন্দ্র'র
তাইই ডিভিডে এই প্রতিবেদনটি রচিত। কিন্তু তা থেকেই অস্বাভাবিক
নেওয়া যায়, আসলে ইরকম দুর্ঘটনা কতগুলো ঘটেছিল। এরকম
আলোচনের একটা ডিভি আছে। ১৯৮৬ সালে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ
পর্যায়ের সভাপতি এ গোপালকৃষ্ণ ভারত সরকারের তাত্ত্ব পরমাণু
শক্তি বিভাগের অধীনস্থ কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা এবং হুটুবিচারিতগুলি
নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন শেষ করেছিলেন। কর্মকর্তারা যেটি পড়ে
গোপালকৃষ্ণের ওপর খুব চটে গিয়েছিলেন। বিরক্ত হয়ে গোপালকৃষ্ণ
পরমাণু শক্তির এবং জানান যে বিভিন্ন পরমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে
নিরাপত্তা ভয়নক ১৯০টি ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু ১৯৬১ সালের 'পরমাণু
শক্তি আইন' মোতাবেক তা নিজে বিচারিত কিছু দমা হয়ে না।
দুর্ঘটনের কয়েকটি এন ডি ও এ বিষয়ে আলো তথ্য সংগ্রহ করতে
চাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে তাঁদের পথ রোধ করা হয় এই যুক্তিতে
যে, ঐসব নথিপত্র একান্ত গোপনীয়, অত্যন্ত টেকনিক্যাল এবং দুর্বি
স্পর্শকর্তার। সংশ্লিষ্ট বিভাগটির মতে রাজ্যতাব পবিত্র কর্মসূচী ভারতীয়
নিরাপত্তার চাইতে বেশি ওকর পোতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য দেশের
অভিভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এ যুক্তি নিতান্ত অসার বলে-প্রতিপন্ন হয়।
ফেসব থেকে বেসরকারি উৎসেপ পরমাণবিক শক্তিকেন্দ্র চলে সেখানে
তো জনসমাজের তথ্য পরীক্ষা করার বিচারক রয়েছে, যাবতীয়
টেকনিক্যাল সেধাগর সেখানে প্রকাশিত হয় এবং তাতে সংশ্লিষ্ট তথ্য
সরবরাহ করা হয়। তাতে করে অকথা পরমাণবিক অস্ত্র বানানোর
উদ্দেশ্যে নিবেশিত জার্মানি-মণ্ডলিক মুটোনিয়াম নিউক্লিয়ার অন্য
সামগ্রিক বহির্ভূমি যাতে তুলে সেওয়ার পথে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়
না। এইই নাম নাকি শক্তিপূর্ণ উৎপাদন পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার।
যদি হোক, পরমাণু শক্তিকেন্দ্রে থেকে পাওয়া নিবেশিত জার্মানি কাজে
লাগিয়ে অস্ত্র বানানো হবে, না সেওলিকে 'নিরাপত্তা' ভারপ্রাপ্ত সমাধি
করা হবে, সেটা ভারতীয় স্তরে নিশ্চিনত পশিদের ব্যাপার। যেমন, গ্রাফ
আল জাপান পরমাণবিক শক্তির ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল, ফেলনা
ওদের দেশে শক্তির অন্যান্য উৎস খুব বেশি নেই। তাই তারা অস্ত্র
বানানোর যিক্ত কোকেন। অপরদিকে জার্মানি দুর্ভরাষ্ট্র এক দুর্ভটন
শেভিয়েটে ইউনিয়নের পরমাণবিক কর্মসূচির বেশির ভাগটিই চালালে
হয়েছিল সামগ্রিক উৎপাদন মুটোনিয়াম সংগ্রহ করার দায়ে।

গোপনীয়, টেকনিক্যাল কারণে তাপশক্তি-উৎপাদনকেন্দ্রের
তুলনায় পরমাণুশক্তি-উৎপাদনকেন্দ্রে দুর্ঘটনা হওয়ার ঝুঁকি বেশি। কারণ
বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হলে তাপশক্তি কেন্দ্রের একটি বয়লারের যে-জাল

পড়াই সেটি সামলানোর ক্ষমতা তার আছে, তার চিন্তা বদলাবার যা ক্ষতি হলে তা অসম্ভব কষ্ট কম। কিন্তু অসম্পূর্ণ পরিস্থিতিতে একটি পরমাণু বিদ্যায়িতের ক্ষতি হলে অনেক বেশি। বিদ্যায়িতের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিদ্যুৎ হওয়ার পরিণাম প্রতি ঘণ্টায় কয়েক ঘণ্টা পাড়ে। কারণ সরবরাহ বিদ্যুৎ হওয়া নাহলে চুনি তাঁণ-করার তরলপ্রবাহ বা তরল অক্সাইডের প্রবাহ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেতে পারে, এমনকি চুনির মূল মজ্জা অংশ গলেও যেতে পারে। বেরিনারাজ সেখেরচেন্দ্রে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিদ্যুৎ হওয়া ছাড়া তিনমণির আওনে শেষে প্রায় বিলম্বাকৃত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল — একদল নারোজকে, একবার রাজস্থানে এক একবার কাকরপার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। নারোজ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একবার একটা ভয়াবহ ঘটনার হাত থেকে রোহাই পেয়ে গিয়েছিল কয়েকজন সাহসী প্রয়োজিকের প্রত্যাহ্বানমতভাবে। তাঁরা হাতে করে ভাল্ড খুলে দিয়ে বিদ্যায়িতের মধ্যে কোরেট-মিশ্রিত ভারি ভল্ট দেলে দিয়ে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া-মাসা থামিয়ে দেন। গোপালকৃষ্ণ ভানান, সেদিন বিদ্যায়িতের প্রায় গলে যাওয়ার কিনারে এসে পড়িয়েছিলেন।

পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে যেসব দুর্ঘটনা হয়েছে তাতে প্রাণহানি কমই হয়েছে — এই ঘটনাটা খুব ফসলও করে প্রচার করা হয়। এম সনটা কিন্তু সত্যি নয়। পরমাণু কেন্দ্রের উৎপাদন-প্রক্রিয়াটি খুব বেশি মহাঘর ঘরোয়াগতি। তেজস্ক্রিয়া-ভরিত বিশপ এজারর চিন্তা পরমাণু বিদ্যায়িত চালানোর প্রক্রিয়াগুলি সবই দূর-নিরস্ত্রিত। হজাভতই উৎপাদন কেন্দ্র চালানোর জন্য লোক লাগে খুব কম। যেমন, চেনোবিল বিদ্যায়িত খারা ৫০০ ব্যাড বা তার বেশি মাত্রায় তেজস্ক্রিয়ার সম্পূর্ণই হয়েছিল, তাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ — মনকরকম্বীর পরে। এদের মধ্যে ৫২ জন অল্প দিনের মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন। অন্যরাও তিনে তিনে দুইতিনে দুইতে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু দের বেশি লোক মারা গিয়েছিলেন পর্যায়ক ক্রিয়ায়, অসুখ তেজস্ক্রিয়া প্রভাবে। এরা কিন্তু পরমাণু কেন্দ্রে থেকে অনেক দূরে বাস করতেন। চেনোবিল কেন্দ্রের ৩০ কিলোমিটার বাসারের মধ্যে থেকে ১,৫৫,০০০ লোককে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে কতজন কাগজের মারা যাবেন তার সঠিক সংখ্যাটা কিন্তু কোনোদিনই জানা যাবে না, যেহেতু ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁদের অনেকই কোথায় যে ঢলে গেছেন তার হিলি পাওয়া যায় না। এ নিয়ে হজোজার একটা আশঙ্কা করা যেতে পারে। চেনোবিল বিদ্যায়িতের খারা শিকার তাঁদের চিকিৎসা করেছিলেন এমন একজন আমেরিকান চিকিৎসকের হিসেব অনুযায়ী, সেভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপের অনার ৫০০০ এথেকে ৫০,০০০ জন পর্যন্ত কাগজের মারা যেতে পারেন। [স্মারিন, ১৯৮৭] পরমাণুশক্তির এক প্রখ্যাত প্রবক্তা, নোবেল-বিজয়ী আলভিন ওয়াইনবার্গ চেনোবিলের ঘটনার পর বলেছিলেন যে, ‘পরমাণুশক্তির খারা সমর্থক তাঁদের এ ব্যাপারটা মেনে নিতে হবে যে এই শক্তির বিপদগুলো একটু অন্য ধরনের। তাঁদের মানতে হবে যে মাটির মধ্যে একটা অল্পো ভিনিসকে পুড়ে গেছে সে-মাটি হজোজর করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ভারি করার ব্যাপারটা লোকের কাছে বিশেষভাবে তীতিজনক বলে প্রতিভাত হয়।’ [ওয়াইনবার্গ ১৯৮৬]

নিরস্ত্রিত পর্যবেক্ষণ

পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ করার পরমাণু শক্তি বিভাগের অধীনে অনার পরমাণু শক্তি কমিশন, তার কাছ হতে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড এবং পারমাণবিক উৎপাদন কোম্পানি ক্যাকর্ম ও পদেপদা প্রদারক করা ও তার ওপর নজর রাখা, সেটিও এই বিভাগের অধীন। এতই বিভাগের অধীনে কাছ করার সুযোগ নিয়ে উৎপাদন তেজস্ক্রিয়ের পরিচালনা কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ নিরস্ত্রিতভাবে অগ্রহণ করেও অন্যায়সেই পার পেয়ে যায়। নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ প্রকল্পের প্রধান এ গোপালকৃষ্ণর অভিজ্ঞতা সেই তথ্যই বলে। এতই বড়ি যখন পরমাণু শক্তি কমিশনের সভাপতি আর পরমাণু শক্তি বিভাগের সচিব হিসেবে কাজ করেন, তখন এত বিস্তারিত পরিদর্শিতই সৃষ্টি হয়। লোকের স্বেচ্ছামত পরমাণু বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই পরিদর্শিতব মতো অস্বাভাবিক কিছু শূন্য পান না।

তথ্যসূত্র :

- Alagh, Y. K. (1997): ‘Economics of Nuclear Power in India’, *Am-Power*, Vol II, No 1-3
- American Physical Society (1978): ‘Report to the American Physical Society’s Study Group on Nuclear Fuel Cycles and Waste Management, *Reviews of Modern Physics*, Vol 48, No 1, Part II, January
- Bose, D. K. (1989): ‘Nuclear Power in India’, *International Energy Studies*, *Wile Eastern Ltd*, New Delhi, 469-74
- (1981): ‘Accounting of Nuclear Power’, *Economic and Political Weekly*, XVI (32), August 8, 1313-18
- (2000): ‘Decline of Nuclear Power’, *Economic and Political Weekly*, XXXV (24), June 10-18, 2011-13
- Central Electricity Authority (1998): *Fuel Map of India*, Government of India, New Delhi
- Clark, Michael (1990): ‘The Cost of Nuclear Power’, 4th Report of the House of Commons, Select Committee on Energy, headed by Michael Clark, LK Extracts by Dipak Banu Choudhury, Editor, *Utpa*, Utpa, July
- Flavin, Christopher (1987): ‘Reassessing Nuclear Power in *State of the World*, 1987, World Watch Institute, Prentice-Hall of India, New Delhi
- Geological Survey of India (2000): *News Cool Ring*, January, Vol 20, No 1, 14-20
- Jones, P. M. S. and G. Wente (1991): ‘Cost of Nuclear and Conventional Base Load Electricity Generation’, IAEA Bulletin 3, International Atomic Energy Agency, 1990, Reproduced in *Indian Journal of Power and River Valley Development*, May
- Kema, A. K. (1999): ‘Nuclear Generation Cost in India’, *Am-Power*, Vol 13, No 1
- Person, F. A. and D. W. Keith (1998): ‘Fossil Fuels without CO₂ Emission’, *Science*, Washington, November 6
- Ramanna, Raja (1985): ‘Can Nuclear Energy Claim to be the Only Source of Power in the Future’, U.C. Desai Memorial Lecture Administrative Staff College of India, Hyderabad
- Reddy, T. S. Gopi (1999): ‘In the Comfort of Secrecy’, *Bulletin of Atomic Scientists*, November-December
- Srinivasan, M. R. (1990): *Selected Lectures of M. R. Srinivasan*, Nuclear Power Corporation of India, Bombay

সংসদে সংসদে বক্তব্য দেওয়াটা এখন হয়ে পড়িয়েছে এই যে সংসদে ১৯৫৭ হবে আরো নিম্নলিখিত, অর্থাৎ তাদের সুযোগ সুবিধা হবে ক্রমবর্ধমান। চিংকার-চোঁচমেচি, সোমণ, অধ্যাক্ষপ প্রদানের সম্ভাব্য হবার এবং বুড়ির ভেঁড়া খুঁসে যাওয়ার মতো অতি দুঃখজনক ঘটনা এখন তখন ওলক-মাইটির মতো কাগজগুলো এখন এতটাই জনপ্রিয় হয়ে গেছে যে সেগুলো আর মিত্র অচরণ বলে মনে করা হয় না। আর এক্ষেত্রে ফলস্বরূপ অধিবাসন দুঃস্থি হয়ে যাওয়াটাও এখন কামোকা হয়ে গেছে। অর্থাৎ ভেঁড়া-চোঁচমেচি, সংসদ চালানোর জন্য সরকারি কোম্পানির থেকে, অর্থাৎ আমের আমদানির পরেই থেকে বরফ কলতে হয় ঘটায় তিনি লজ্জা টানল।

সংসদেও যেমন ও তাতার বিবরণটি সংসদ বিশেষ জাওয়ান কিনা, আমান তা জানা নেই, তবে যাই হোক না কেন, সংসদেও কিন্তু নিজেদের জন্য অতিরিক্ত ৬২ কোটি টাকা ব্যয়িয়ে নিচ্ছেন। এই টাকাটা আসলে করপোরেশন পক্ষে থেকে। প্রতিবারই যেমন ব্যয় হয়ে থাকে, একবার এই বুড়ির কাগজ হিসেবে দেখানো হয়েছে "জীন্সওয়ালা নির্বাহের দায় ও দুঃখার্থিতর অত্যধিক বৃদ্ধি" যে হেতুনির জনতার প্রতিনির্মিত করণে কল সাময়িক্য শব্দ করেন, তাদের হয়ে কিন্তু এই প্রতিযোগে তারা চাননি। এই প্রতিযোগে তারা কখনো সম্পূর্ণ এবং একান্তভাবে নিজেদের পক্ষে। বামপন্থী সংসদেও অথবা কিছুটা নিয়মনিষ্ঠা হিসেবেই দেখিয়েছিলেন; কিন্তু, যেমনটা সর্বশেষ হয়ে এসেছে, কোনো বিবেকমণ্ডল মানুষ এই ধরনের ব-বননাতার যে আঘাতাই ছিল না।

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে এই অর্থ বৃদ্ধির সমস্ত কারণ আছে, সংসদেও যে পরিমাণ অর্থ আর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণাই নেই। মেট্রোপলিটন কর্পোরেশন একটা ধাক্কা আছে (সংসদের এটা নিচ্ছেন) বেশি করে প্রচার করে থাকেন। যে সংসদের সুযোগ-সুবিধা অগ্রহণ। যাক্ষর চিত্রটা কিন্তু এই একেবারেই উল্টে। আসুন, কিন্তু শুধা—যা সাধারণ মানুষের জান সরকার—তেনে নেওয়া যাক।

বর্তমান সংসদের ৫৪ জন সদস্যের মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা। এদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ সদস্য কোর্টফির, অর্থাৎ বেশি সংসদের স্বর্ণিগত সম্পত্তির পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি, আর প্রতি লক্ষ ভানে একজনদের সম্পত্তির মূল্য ১০ লক্ষ টাকা। চানবেন না, এটা কোনো গোপন অর্থসময়ের প্রতিফলন। নির্বাচনের আগে যে আকর্ষণক হালকাভাবে সংসদের পেশ করতে হয়, তাতে তাঁরা নিজেরাই এই কথা জানিয়েছেন, অথবা, সঠিকভাবে কলতে

গেল, যা তাঁরা জানাবেন বলে দিক করেছিলেন (উদাহরণ স্বরূপ, গাড়ির স্টারব উদ্দেশ্য থাকলেও তার নাম বাবা এ দিক হয়নি)।

পাঁচ বছর আগে সংসদের তাঁদের মূল বেতনের ৫০০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। এবার অধ্যাপকবর্গের এই বৃদ্ধির পরিমাণ হয়েছে ২২.৫ শতাংশ। এর ফলে তাদের মূল বেতন পড়িয়েছে ১৬ হাজার টাকা। এটা এমন বিরাট কিছু পরিমাণ নয় যে তাদের উদ্বল ওপর ভেদপড়বে। কিন্তু এটা হল চারটি ওপর ছড়ানো ভাড়া মশালার মত। প্রত্যেক সংসদ নির্বাচনী এলাকার জন্য মাসিক ভাড়া পান। এবার সেটা দ্বিগুণ হয়েছে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা হয়েছে। একই বৃদ্ধি ঘটাতে "ভবন ভাড়া"র ক্ষেত্রে, যা ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে পড়িয়েছে ১০০০ টাকা (একবার ভাবুন, অফিসে হাজিরা দেবার জন্য আপনাকে অফিস ভাড়া দেওয়া হচ্ছে)। এমনকি আপনি যদি সেই করে সারা দিনের জন্য নিপাড়া হয়ে যান, তবেও)। অবসরকর্মীরা ভাড়াও ৫০০০ টাকা থেকে বেড়ে ৬০০০ টাকা হয়েছে। এটা পাওয়া যাবে ভীকনভর, এমনকি কেউ যদি ঘটনাক্রমে মাত্র একদিনের জন্যও সংসদ হয়ে থাকেন, তাহলেও।

এটাই শেষ নয়। প্রত্যেক সংসদে বিদ্যানে প্রমোদর জন্য বছরে ৩৪টি টিকিট বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন। এর অর্থ প্রতি এগারো দিনে তারা একবার বিদ্যানে চড়ে উড়তে পারেন। এর সাথে দুই ট্রয় নব্বার বেড় লক্ষ টাকার উড়ান ভাড়া। এখন তাঁরা উড়ছেন না, তখন তাঁরা শীতপ্রচণ্ড নিমন্ত্রিত কনসার্স কিলসিটায় রেসপন্সবের অধিকারী—অথবা নিম্নরচায়। রেসপন্সবের ক্ষেত্রে সংসদেরা কোথায় যাচ্ছেন, কতদূর যাচ্ছেন বা কতবার যাচ্ছেন তার ওপর কোনো বাধ্যনিষেধ নেই। দিনা পরমার এই অংশ কিন্তু সারা জীবন ধরে চলানো যাবে। বিদ্যানে বা রোসে না গিয়ে ভাড়া যদি সন্তুর্কণে চলে, তবে তারা পাবেন প্রতি কিলোমিটারে ১০ টাকা (আগে ছিল ৮ টাকা)।

পাঁড়ান, পাঁড়ান, আরো আছে। সংসদের অধিবাসন বহুরে স্ব'মসের অধিকার সম্বন্ধ ধরে চলে, কিন্তু প্রত্যেক সংসদই পেয়ে থাকেন অভিজ্ঞতা এবং প্রায়শই বড়সড় ধরনের সরকারি নিবাস। যাক্ষরে এইসব বাড়ির যা ভাড়া, সংসদেরা যেন তার মাত্র দুই তি তিন শতাংশ। অর্থাৎ চালানো আর কর্তব্যের রাখার জন্য এরা পান ১৬৬ হাজার টাকা। আর কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি কেনার জন্য কেউ লক্ষ টাকা। সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে, এমনকি বিশেষে চিকিৎসার জন্য এদের একটি পরসঙ্গ নিতে হয় না। গ্যারেটাই হয় সরকারি স্বরূপ।

দুটি লাঙলানি এবং দুটি মোটরইল ফোন প্রত্যেক সংসদের গ্রাণা। এতে তাঁরা ১,৭০,০০০ ফোন করতে পারেন বিনামূল্যে। এক পাচনা না দিতেও এরা স্বরূপ করতে পারেন ৫০ হাজার ইউনিট এন্ড

৪০০০ কিলোমিটার ভঙ্গ। আর যেহেতু অত্যন্ত থাকলে মানবীর সাংসদদের মাথা খরস হয়ে যেতে পারে, তাই মানস ভবন ইচ্ছাকৃত ভাবে একটি বিশেষ ভোজনালয় আছে।

সন্ধ্যার ভাগ, সন্ধ্যা, পথ নামে ডোলা হেলেন পাম বাড়তে রকেটের গতিতে। একজন সাংসদ কিন্তু সংসদে ভোজনালয়ের সুখ, চিনে, ভাত, পট্ট, স্যান্ডা ও মিষ্টি সহ যাওয়া সম্বন্ধে পালনে ১৬ টাকায়। আর যেহেতু একটা নিয়মিত ভুক্তিভোক্তার মূল্য একজন মাত্র ১১ টাকা। ভোজনালয়ের এই অসীমিতি ঘটনা সম্ভব হয় এই কারণে যে কলকাতার পক্ষেই থেকে নেওয়া যে অর্থ এই ভোজনালয় চালানোর জন্য তরফুক্তি হিসেবে ব্যয় করা হয়, নতুন তায় পরিমাণ চার কোটি টাকা।

এসবের সাথে যোগ করুন সেই সম্বন্ধ-ভাগদান প্রকল্প, যার অধীনে প্রত্যেক সাংসদ প্রতি বছর 'নির্বাচনক্ষেত্রে উন্নয়ন' নামে দুই কোটি টাকা পেয়ে থাকেন। এই অর্থের একটি পঞ্চমাংশ সাংসদের পক্ষেই যাওয়া উচিত নয়। কী ভাবেন, যাওয়া উচিত নয়? বিগত পাকিস্তানের এক মন্ত্রী সবকিছু অর্ধের এই বিপুল ব্যয়কে অত্যন্ত সমস্ত কারণেই 'সংগঠিত সৃষ্টি' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থিকালে সমগ্রই অস্বাভাবিক। এটা বাড়ানোর দাবিতে সোচ্চার। এখানেই শেষ নয়। তাঁরা চাইছেন সরকার তাঁদের নির্বাচনের পদ্য বহন করুক। এর অর্থ, তাঁদের নির্বাচন প্রচারণার খরচ ভোগ্যের বেতিকা করলতারা।

এই হল আমাদের তথাকথিত জনগণের প্রতিনিবন্ধকারী সাংসদদের প্রকৃত রূপ। যে দেশের জনগণের তাঁরা প্রতিনিবন্ধ করছেন, আর্থিকভাবে মানব কল্যাণ সৃষ্টক তুলিকায় সে দেশের স্থান একেবারে নিচের সারিতে। এ দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ পেট নিয়ে পূরে বাত খাওয়া। কলিকতায় অর্থেকেরও বেশি মানুষ উৎসাহজনক অপুষ্টিয় শিকার। এর সাথে আরো নানা বন্ধনা তো আছেই। এ দেশে চরম খয়ের সাথে পুষ্টকোষ আয়ত্বতা করতে লাগে হয়, কোটি মানুষের পানীয় চঙ্গ, স্বাস্থ্যসম্পন্ন ভীকন ও একেবারে গ্রাথমিক চিকিৎসার কোনো সুযোগই জোটে না। শিশুসন্তান কেন্দ্রে বিধে এ দেশের স্থান একেবারে ওপরের সারিতে। আর মৃত্যুর কথা এড়াতে পেরেছে এমন লক্ষ লক্ষ শিশু কুলে না গিয়ে কোনোভাবে দিন ওচরানের জন্য অস্বাস্থ্যকর পোষ্য অর্থ রোগপ্রাণের সঙ্গেই।

কোনো এক সময়ে এদেশে মোহনবাস করতাম গাঙ্গী বলে একজন নেতা ছিলেন। আমাদের বর্তমান সাংসদের আর নেতারা তাঁর আদর্শ ও মূল্যবোধের কথা অত্যন্ত নিষ্ঠাবোধে শ্রবণ করেন এক মুকুটের প্রকার করেন—পদ্ম মিনিটি করে বছরে দুবার। এই অমূল্য টাঁর ব্যবস্থা পোষ্যক তদার করে গায়ে ভড়িয়েছিলেন এক টুকরো লম্বাণ। তাঁর দেশের গরিব মানুষের এর বেশি লম্বাণ জোটেনা বলেই তিনি এটা করছিলেন। নানা কারণে আমাদের কেউই অস্বাভাবিক বর্তমান নেতারা লম্বাণ পরে ঘুরে বেড়ান এটা চাইব না। কিন্তু এসব কেউই কি লম্বাণের আদর্শ অনুসরণ করে দেশের মাথাপিছু আয়ের চেয়ে বেশি বেতন নিতে অস্বীকার করেন? মাথা খারাপ?

সঠিক কথাটা তাহলে বলে ফেলাই দায়। আমাদের রাজনীতির জগৎটা পরগণায় ছেয়ে গেছে। একটা বিদ্রাব-চিহ্নর গোছের খটনা না হলে এর অবসানের কোনো সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ, যদি সবাই তেমন কিছু একটা খটনা সচেতন নাগরিকবর্গ, শোকাই আর

সংগঠনগুলির পক্ষে কিছু একতরফী হয়ে দৃষ্টি পর্ববর্তন ঘটানোর দাবিতে সজাগ হয়ে ওঠা অসম্ভবই সম্ভব।

প্রথম, অন্য মত ভাবগোচর এমন কাজ না করলে যেমন হোল না, সাংসদ ও বিধায়কদের ক্ষেত্রেও তা চালু করা যাবে। এদের ক্ষেত্রে তত্বের অর্থ হল সংসদীয় অধিবেশনের পুরো সময়টা উৎখাত থেকে সভ্যকালের জনস্বার্থপরিকার সম্বন্ধীয় বিষয়গুলিকে তুলে ধরা, অসংসদ্যনা করা এবং নিষ্ঠাকৃত প্রথম করা। এই প্রকৃত ভ্রমই হো উৎসাহ সাংসদ পাঠানো হয়। দ্বিতীয় যে পলি ভ্রমটিও সর্বকাল, তা হল—চলিচল, কলকাতাধারা তথ্য বোঝা মতো হয়ে যায়। তেমনই আমাদের জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রেও পৃথকীকরণ, তর্কব্যাখ্য, উপলব্ধি কর্তৃপক্ষের (এক্ষেত্রে সংসদের অর্থক) নির্ভর্য অর্থনা করা, তৎপন্ন কাগজ ঘটনো (এক্ষেত্রে অধিবেশনের কাজে বশদান) অর্থনা থানা যে দেশনাভার প্রতিষ্ঠানের (অর্থনা সংসদের/গণতন্ত্রের) অর্থনৈতিক ঘটনো নানা সাংসদদের শক্তিমানের বিষয়টি খুব পটভূমির উপর করত হবে। এই প্রতিষ্ঠান পরিমাণ সবসামান্য হতে থেকে সববর্তী নির্বাচন আশংক্যের অধিকার হাসানো পর্যন্ত হতে পারে।

ওয যদি এই দৃষ্টি কাজ করা যায়, তাহলে এখন হয়েই আমরা আমাদের অতিমান্য প্রতিনিবন্ধমূলক গণতন্ত্রকে পুরোপুরি হাসাকব একটা কিছু হয়ে ওঠা থেকে রক্ষা করতে পারি।

সান্দুবার : পৃথীল বধ্যোপাধ্যায়

অত্ম তত্ত্বাচার, মঙ্গলিতি, ২০ অক্টোবর : সেওঘলি মহতম বিভক্ত আলিয়া, মুকল আখালি'র মতো শিষ্টপরিচয় পাঠানো 'ভোট' নিতে সর্বস্বাকার পাটি সি পি এমের এখন ভাব কোনও ভুলমানে। ওকলো ফল, মিসই থেকে ওক ল্পে খইনি, ল্যুপনোয় মতো বর্মীতের খেতল—সবই পত ১-৩ দিন পর আসছে এখন সি পি এমের সবর পল্লর এ কে গোপালন তৎপন বন্ধত এ কে গোপালন তৎপন কল্লর প্রকাশ করাত, সীতরাম ইচ্ছোবিরের জন্য দেশের ল্পন সারি' শিষ্টপতি-কাবলী'দের পিফট পাঠানোর দ্বিতিক পাত্রেই ...

কিং ফিশার এয়ারলাইন্স-ইউনাইটেড ক্রমারিত ম-কোম্পানির মালিক বিভক্ত আলিয়া, মুকল আখালি'র মতো শিষ্টপতিরা ভোট পাটি সি পি আই'তে তোয়াক্কা করেন না। উল্ল 'ভোট' পাঠানো সি পি এম পল্লরই। ...

সেওঘলি'র মতওয়ে কাল্পনিক নেতাদের বর্তি ও মল্লর শিষ্টপতি-বাসলী'দের 'পিফট' পাঠানোটা নিমিত্তে প্রসঙ্গিত রেওয়াক। তবে অর্থ সর্বস্বাকার পাটি সি পি এমের কল্লর এইসব ভোট খটত না। কিন্তু এখন রাজনৈতিক পরিবর্তিতা অত্মব বকলো। এককিৎ পল্লিভবাস পুথুরে তত্ত্বাচার'র নেতৃত্ব সি পি এম কল্লর পুটিপতিদের বন্ধ হলে, অমালি'কে হলে, অমালি'কে ইই সি এ সরকারের প্রাণভোমবা রয়েছে তাইসই হাতত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেওঘলি 'পিফট' পাঠানোর তালিকায় নতুন সংযোজন হয়েছেন প্রকাশ করাত, সীতরাম ইচ্ছোবির।

বর্তমান, ২১, ১০, ২০০৬

মোলা-মুক্তি সমাজ এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজ

একই মুদার এপিঠ ও ওপিঠ

মিয়াসুদ্দিন

‘হী যদি হামীর কথা না শোনে, তাহলে হুঁতে প্রথম মোকালে, তারপর (খোলাপাটির) প্রলাভন দেখবে, আর তারও যদি সে (অনিয়া) সহ্যও যৌন মিলনে।’ রাজী না হই, তখন তাকে হাত দিয়ে বা লাঠি নিয়ে প্রহার করবে।’ (মুসলমানের উপনিষদে যাজ্ঞ-বল্ক্য)। ‘যে নারী হামীর মুখে ওপর জবাব দেয় তাকে তৎক্ষণাৎ প্রাণ করা যায়।’ (কো)।

‘পুরুষের নারীর কথা: কাণে আঘাত এতকাল অনুরণন ওপর মর্যাদা নিয়ন্ত্রণ, আর তাহারই তো সম্পদ বহু করে। সতী নারী অনুপাত, অচাঞ্চল্য হিন্দুসমাজে তাহলে হামীর অর্ন্তমানে (মস্তিষ্ক) রক্ত করে। যখন তাহাদের অস্বাভাবিক আশঙ্কা কর, তখন উপদেশ দেও, তারপর তাহাদের শব্দে বর্তন কর এবং প্রহার কর।’ (কোরান-৪ : ৩৪)। ‘হামী যদি হুঁতে বিদ্রোহ প্রতি তাকে এবং হুঁ তাকে অসমর্থিত প্রকাশ করে, যক্ষ্মন হামী অসমর্থিত সহিত লাঠি বাধান করে, তবে সেই হুঁর তার এই অবস্থায় অতিবাহিত হয়, যে, চিরদিনপ্রাণ নাহাতের তার প্রতি মানন (অভিসম্মান) বর্ষণ করে।’ (বোখারী, হাঃ-১১১৫)।

আম্রাহ ও ভগবানের মধ্যে এমনিভেই সঙ্গ-নেত্রের সম্পর্ক: প্রথম জন (শৈল্পিকদের) জন্য বরাদ্দ করেছেন মোহন, দ্বিতীয়জন বরাদ্দ করেছেন স্বর্ণ। সেই আম্রাহ আর ভগবান নারীর বেলায় কী ছিল। যেন হামীর কথা: নারীর অপমান ও অস্বাভাবিক করাত আম্রাহ আর ভগবানের যেন দ্বিভি নেই। তাই নারীর প্রতি হস্তস্ব অসত্য ও বর্ষণ বিধান রয়েছে কোরান-হাদিস এবং কো-পুরাণের পাতায় পাতায়। তাইই বুটো করে বুটাই দিয়ে এই লোকের গুরু।

এসব বিধান নাকি আম্রাহ ও ভগবান রচনা করেছেন। সূতরাং এসব বিধান অপরিসর্বজনীন। যদি তুমি নারীর কৃষিভা কিংবা নারীর মান-মর্যাদার পক্ষ লেখো—তবে তুমি স্বে-ধীন, যদি শম্মোদ্রা, তুমি মুসলমানদের পক্ষ, তুমি হিন্দুদের পক্ষ, তুমি ভেদে তুমি মুসলমান-সমাজে কিংবা হিন্দুসমাজে বসবাসের অধিকার হারিয়েছো, তুমি ভেদে তোমার শাস্তি-নির্দিষ্ট মুক্তাও। তুমি ভেদে, আম্রাহ ও ভগবান কমানীল, কিন্তু সীমান্তরানকারী জনা রয়েছে অর্ন্তমুক্ত শাস্তি। হ্যাঁ, এসেই নাকি আম্রাহ ও ভগবান অসহ্য রচনা করে আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে হার্টে পরিণত দিয়েছেন:

হ্যাঁ, এই খবটাই ছিল ভারতবর্ষে অষ্টম শতাব্দীর পর্যন্ত। খৃষ্টি-অসিয়ার বিধান ছিল, খারীর মুদার পর তার চিত্রায় উঠে সহস্রাব্দে কাওয়া স্বাধীন ক্রীর অন্য ধর্ম নেই। সেই বিধানে হামীর চিত্রায় ক্রীকে পড়িয়ে হত্যা করা হয়। এই বর্ষণ হত্যালাও যুগ যুগ ধরে সংঘটিত হয়েছে হিন্দু সমাজে ভগবানের বিধানের নামে।

খৃষ্টি পাশ্চাত্যে গুরু করল উন্নতির শতাব্দীর গোড়া থেকে। ইউরোপ থেকে ভারতীয় মুতপ্রায় খৃষ্টিয় মানব সমাজে এসে শৌচম মন জনগণের ওঠে। বুদ্ধবুদ্ধি ও বুদ্ধির আশ্বাসনের পতাকা ভাঙেপড়ে তুলে ধরলেন রাজা রামমোহন বাবু। তারপর ডিয়ার্জিও, অক্ষয় পত্র, বিদ্যালোগার, হুতুসুসন বহু, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেক প্রত্যেক প্রত্যেক সেই পতাকা বহন করে চললেন। ভারতীয় হিন্দু সমাজে এইসব মনীষীদের হাত ধরে ধীরে ধীরে কো-পুরাণের অন্ধকার যুগ থেকে খেরিয়ে এসে প্রকাশ করল আলোব যুগে, আধুনিক যুগে। ভগবানের নামে নারীর ওপর পুরুষেরা যেসব নারকীয় আইন আরোপ করেছিল সেগুলো একে একে ভেঙে গড়িয়ে তৈরি হল আধুনিক ও সত্য আইন। বিশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত খারীর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সেই সংস্কারের কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। সম্প্রতির উল্লিখিতরা আইনে নারীর কোনো অধিকার ছিল না — ভগবানের আইন: ১৯৪৭ সালে আইন কলনে (নৈতিক কোরান নারী ও পুরুষের অধিকার সমান করা হলো। ১৯৫৬ সালে পুরুষের বয় বিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণীত হলো। পুরোচিত সমাজ সহজে এসব যেনে নেয়নি। তাহলে আপত্তি চিংকার উঠারম্ভে অন্তরা ও মোকামিলা করেই সংস্কারের কাজ এগিয়ে ছিল হিন্দু সমাজে। কিন্তু খুবই যুগের বিবর্ত হলো, বিশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর সংস্কারের কাজ আর অব্যাহত থাকেনি। ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় অনুশাসনের নামে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসেছে ছাত-পাত, বর্ণভেদ প্রচার সংগতি-কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে নেই যেমন জোহাঙ্গো প্রতিবাদ, নেই সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন। হিন্দু সমাজে খোঁ দিচ্ছে বড়ো দল। এই বড়ো ও খুবিরতা সেয়ে যুগের যুগ ও লক্ষ্য হয়। রামমোহন-বিদ্যালোগারের পতাকা বইতে না পারারো লক্ষ্য বৈধি! খাত সে কথা, সেটা ও লোকের বিবর্ত নয়।

না, দুর্দাগির সমাজে মনভাগবানের কোনো প্রভাব পড়েনি। হিন্দু সমাজের মনীষীরা যখন সমাজ সংস্কার ও আধুনিক শিক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তুললেন উনিফোল শতাব্দীতে, তখন ওয়াহাবী আন্দোলন ও ফারাকী আন্দোলনে ব্যস্ত মুসলমানরা কিভাবে চেয়েছে আকবের মনোযুগের (শরিফতি) পাদনে নির্বিড়ভাবে। ১৮২৬ সালে আরও একটি সাংস্কৃতিক শিক্ষার জন্য কলকাতা স্থাপনের প্রতিবাদ করে গুরু আমহাটকে লেখা চিঠিতে রামমোহন বলেছিলেন, ভারতীয়দের জন্য চাই ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষার কলকাতা। অথচ ১৮২৯ সালে কালকাতা মাদ্রাসার বহন ইংরেজি শিক্ষাকে বৃদ্ধ করা হত আরবি ও ফারসীর সঙ্গে, তখন তাঁর প্রতিবাদে পল্লিত হই মোহা মুফতিদের পক্ষ থেকে। ফলত ইংরেজি শিক্ষার জন্য কালকাতা মাদ্রাসার হয়ে বিশেষ দুঃখি একই

মুসলিমদের ইরাজি শেখাবার চেষ্টা কার্যত ব্যর্থ হয়। মোসলম সে সময় ফতোয়া জারি করেছিল, ইসরাঈলী ও বাংলা কামেরদের ভাষা, কামেরদের ভাষা শিখলে জাহাঙ্গীর ঠাই হবে। মোসল-মুসলিমদের এই ফতোয়া মুসলিম সমাজের মৌলিক আধুনিক শিক্ষা থেকে বৃহৎ পরিণতি পেয়েছিল। এই ফতোয়ার প্রভাবে, এটা বুঝে লক্ষ্য রাখা যে, ১০০ বছর পর আজও মুসলিম সমাজ থেকে মুছে যায়নি। সেই কাল ফতোয়ার প্রভাবেই চম্পেছ আজও হাজার হাজার খারিজি জাহাঙ্গীর।

১৫৫৫-৫৬ আশোমনি ও ১৬৫৬ আশোমনি ইতিহাসের ধর্মীয় সংস্কার আশোমনি নামে খ্যাত। এই দুটি আশোমনি কেন এই খারিজি পেরোয়ে বৈধতা পায় না। প্রকৃত ঘটনা হলো এই দুটি আশোমনি মুসলমানদের যার পর নাই 'অতি' করেছিল। এই দুটি আশোমনির ধর্মীয় সংস্কারের কোনো আদর্শ ছিল না। দুটি আশোমনির পড়ে উঠেছিল প্রায় একই সময়ে এক প্রধানত একটি উল্লেখ দিয়ে। তাহলে, সমস্ত মুসলমানদের আরও নিবিড়ভাবে বিতর্ক ইসলামি অনুশাসন ও ইতি-মীতিতে বৈধ পদ্ধতিতে চান। দুটি আশোমনির ছিল আধুনিক শিক্ষা, মুক্ত-চিত্তা ও মুক্ত বুদ্ধির তীব্র বিরোধী। চরিত্রের দিক দিয়ে এই দুটি আশোমনি ছিল মূলত মৌলবাদী আশোমনি এবং তার ফলে মুসলমানরা কিছুসংখ্যক তুলনায় সবচেয়েই ভীষণ পিছিয়ে পড়ে। ১৬৮২ সালের শিক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বাংলার কলেজ ছাত্রদের ২২.৪১% একা হই ও নিউল কলেজ ছাত্রদের মধ্যে ৮৩.৫৫% লটারি ছিল। সরকারি চাকরিতে তার করণ প্রভাবে লক্ষ করা যায়। ১৯০১ সালের একটি তথ্য দেখা যায়, সরকারি উচ্চশিক্ষা কর্মসূচি ব্যক্তিগত ৯৯.৭৫% ই ছিল।

১৯০১ সালের হুজিরা যা ছিল, একশ বছর পর, ২০০৬ সালেও হুজিরা একই আছে তা জানান দিল সাচার কমিটির পর্যবেক্ষণ। এই পর্যবেক্ষণে জানা গেল, এমনকি সবচেয়ে পশ্চাদপন আদিবাসীদের ত্রয়ো পঞ্চাতে অবস্থান মুসলমানদের। মুসলিমদের এই করণ হাল এ জন্য নয় যে, তাদের প্রতি সরকার বৈষম্য প্রদর্শন ও অবহেলা করেছে। সরকারি বৈষম্য ও বন্ধন্যার অভিযোগ অসত্য নয়, তবে তা প্রধান কারণও নয়। মুসলিমদের পশ্চাদপনতার জন্য প্রধানত দায়ী মুসলিম সমাজই যার আলোচনা ও পরে করা হয়েছে। কিন্তু মুসলিম সমাজ তা আজও অনুমান করতে ব্যর্থ।

কারণ বলে নারী হলো অর্থেক আকাশ। কিন্তু মুসলিম সমাজের সেই অর্থেক আকাশে ওখুই অন্ধকার। মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের কালো জালয়ে ঢাকা সেই আকাশে আকাশের প্রবেশ নিষেধ। বাকি অর্থেক পুরুষের একটা অংশ খারিজিষ্ট এবং শিক্ষার আলো ও অঙ্গন থেকে বঞ্চিত। যারা সে সুযোগ পেয়েছে তাদের কাগজ অংশে আজও ধর্ম শিক্ষার নামে নিজেদের মধ্যে নষ্ট করেছে। এই হলো মুসলিম সমাজের এই একশ লক্ষ্যেও চল-চিত্ত। এরা সবচেয়ে মরিচ ও পশ্চাদপন হলে না তো করা হবে?

মুসলিম সমাজের ঘূর্ণাণ হলো, এই সমাজের বুদ্ধিবীর্ণতা এসব নিয়ে স্বাধাধ চর্চা করেন না এবং স্বাধাধ খারিজি পালন করেন না। তারা জানেন যে খারিজি আইনগুলো অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক

এবং বর্জনযোগ্য এবং তাদের আধুনিক ও গণতান্ত্রিক আইন একান্ত আবশ্যিক। তারা জানেন যে ধর্ম শিক্ষার নামে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলিম ছাত্রের মোশাব্বিগত অগণতান্ত্রিক এবং এই শিক্ষা সর্বজন করে তাদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। কিন্তু সমস্যা হলো, এসব কথা তারা বলেন না। বলেন না, তাই মোসল-মুসলিমদের আজও মুসলিম সমাজের মাধ্যমে বসে চড়ি যোবার এবং মুসলিম সমাজকে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে চান।

মুসলিম সমাজের বুদ্ধিবীর্ণতা কি এ বিষয়ে কিছুই জানে না? বলেন। তাই বলেন ও কখন বলেন? সেসব কথা করে কখনও করেন, এমন নিষ্ঠুর কথা একটু কথা বলতে হবে। প্রশ্ন হলো, যদি বুদ্ধিবীর্ণতা নই, কিন্তু একজন শিক্ষিত মানুষ তো বটে। মুসলিম সমাজের জন্য যদি তাই করতাই? এ প্রশ্নের উত্তরটি বলা যে, মুসলিম সমাজের জন্য পৃথক ভাবে জারি করা কিছু করিও নি। মৌলবাদী রাজনীতি করেছি, সমস্ত মরিচ ও পশ্চাদপন মানুষের মুক্তির ব্যর্থমিতি। যিনি অনেক 'অগণতান্ত্রিক বিরোধ' যন্ত্র বৃত্তে লসন করেছি, প্রচারণা করেছি: তাই পৃথকভাবে মুসলমানদের জন্য কিছু ভাববার প্রয়োজন হয়নি। বিশ্বাস করছি, আজও করি, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল সবচেয়ে মরিচা দূর হলে, মুসলমানদেরও হবে। কিন্তু একসময় বুঝলাম, এতলে কমতাজীন লাঠিগোলা সমসীয়া মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, সমাজ বিস্রম ও কখনও কথা নই, হাজারকণ্ডে কমতাজীন লাঠি খাটতে তাদের লক্ষ্য এখন। তাই নয় হাজারকণ্ডে। দলীয় রাজনীতিও। তখনই প্রচেষ্টা উন্মুল হলে, তবে এবার করণীয় কী? হিত করে তেলগাম, মুসলিম সমাজের একজন হিসাবে আমারও কিছু লক্ষ্যবস্তু আছে এই সমাজের প্রতি এবং সেই কঠোরই আমাকে পালন করতে হবে। মুসলিম সমাজের স্বার্থে কিছু করা বলতে যে ধারণা ও বিশ্বাস বিদ্যমান তা হলো ইসলামি আইন-কানুন, ইতি-মীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বহাল রেখে কিছু মরিচ মানুষ বা কিছু 'ফেইজ' জন্য কিছু কল্যাণমূলক কাজ করা। কিন্তু বস্তুত পক্ষে এভাবে সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের কোনো কল্যাণ সাধন হয় না। এই সমাজের জন্য প্রকৃত কল্যাণ করতে হলে যেখানে মূল গলম নিহিত আছে সেখানে কাজ করতে হবে। মূল গলম নিহিত আছে বর্মহাটা ও ধর্মীয় গোঁড়ামিতে। সেখানেই আঘাত করতে হবে। বলতে হবে 'স্বপ্ন' করে যে, ১৪০০ বছর পূর্বের পরিঘটিত আইন-কানুন এবং মূল্যবোধগুলি অস্বাস্থ্য, চূড়ান্ত ও শাস্ত্র এছাড়া অস্বাস্থ্যবাহী হলো চরম সর্বনাশের মূল এবং এই পথ অনুসরণ করার জন্যই তারা আজ এতো পশ্চাদপন। বলতে হবে, এসব আইন ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বর্জন করে আধুনিক সত্তা আইন ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আধুনিক সমাজ গঠন করতে হবে এবং এভাবে মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কোনো পথ নেই। এসব কথা বলা নিশ্চিতভাবেই বুঝ কঠিন এবং কৃতিপূর্ণ, কিন্তু মুশ্লিল হলো, ঠিক এসব কথাই বলতে হবে কারণ মুসলিম সমাজের পক্ষে প্রকৃতই কল্যাণকর কিছু করার জন্য অন্য কোনো মনুষ্য বিমুক্ত নেই।

এই কথাগুলি বলা যতটা কঠিন ও কৃতির কাজ বলে ধারণা ছিল, বাস্তবে দেখা গেছে কাজটা আরও অনেক বেশি কঠিন এবং অনেক বেশি কৃতিপূর্ণ। সেটা কিন্তু এজন্য নয় যে, মুসলিম মৌলবাদীরা আমার

পূর্ণ অনুমান অসম্ভব বেশি কমতাবলি ও শক্তিধর। আমার অভিজ্ঞতায় চিঠিটা বা সত্যটা যিকি বিপরীত। বলা ওলমতে যত পল্লিভাষী দেখেও ওল তত পল্লিধর নয় এবং তত প্রমত্তও নয়। তবুও কাজটা যে পূর্ণ প্রাপ্যের চেয়ে বেশি কঠিন তার কারণ আরো অন্যতর।

মুসলি এই শব্দ কাজটাই কবর বাসে বুতভাষে যখন মনসিধ করি তখন সত্যি উপায় নেই। কোথাকার। এত বহুরের কাগজে কোথাকারি মাথায় এবং দুই বিলাসপথে প্রতিক্রিয়ায় প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজ পথে বিচরণে মনুষ্য সম্পৃক্ত হয়ে নিয়ে ধর্মের যতন তুলে ধরা এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্প্রদায়িকতার নিয়ন্ত্রণময়ন করে হেরি করা। কাজটা শুক করতে নিয়ে বুতভাষ এই কাজের যোগ্য প্রতি আমি নই। কারণ যে সঙ্কট। এই সঙ্কট অকপট তা আমার নই। আমার প্রধান সমস্যা হলো আমি সেবার নই। প্রতিক্রিয়া নই এবং এ পুরো ইলেক্স জন্ম নূনতম যে প্রাজ্ঞতা ও সঙ্কট পরিকার আমার তাও নই। আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার যা সীমিত ও সেক্ষণিক বা দুর্বল তা নিয়ে বুতভাষ এতজন মহোদয়ের কাজ চালানো সম্ভব। কিন্তু আমার সমস্যার চেয়েও যেটা বড় সমস্যা তা হলো, যাঁক প্রাজ্ঞ, যাঁক যোগ্য এবং তা এগিয়ে আসলে কি যে উপায় পাশে পড়লে নিষ্ঠা মানুষ তা সাময়িকভাবে তাঁর দো সাময়িক ন্যায়বৃত্ত। আর, আমি তা অস্বীকার করি কী করে এবং সে লম্বা হওয়া কী করে। তাই সিক কবি, ইদনা উলি অসাদ, অলক, অলক, তবু কাজটা কবর। যেমন করে পারি তেমন করেই কবর, যতটুকু পারি ততটুকুই কবর। সেইমতোই কাজ শুরু করলাম। বাংলা টেলিভি চিঠি লেখা এবং দুর্দায় সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখার মধ্য দিয়ে এক মহা কঠিন কাজের এবং আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু করলাম।

ধর্মীয়তার বিরুদ্ধে লিখব, কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে লিখব না—তা হল না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, লিখব কোথায়। কী কারণ এসব তাই? সাম্প্রদায়িক দায়বদ্ধতা পালন করে কী কারণ? অনেক ভেবেচিন্তে ‘আজকালো’ চিঠি পাঠালাম এবং প্রবন্ধ পাঠালাম ‘ভাণ্ডারপুরের চিঠি’ নামক জেলার একটি সাপ্তাহিক কাগজে, ওলা হাঙ্গল। আমার সেক্ষণিকই শুরু হলো। শুক বলে মুসলিম সমাজে প্রতিক্রিয়া। ওজ্ঞানও। একটা বড় প্রতিক্রিয়া এলো ২০০০-এর আগস্টে। অতিয়া কেওয়ান আইনে লিখতে সোণা একটি চিঠি কেবল ১৭ই আগস্ট আজকালের ‘লিখবার চিঠি’র পাতায়। সেই চিঠিতে ছিল ‘মুসলিম ব্যক্তিগত আইন’র উত্তর সমালোচনা। এক ভাষণে লিখেছিলাম, “...একজন পুত্রের একটার পর একটা ভালক আর একটার পর একটা ক্রিয়ের অধিকারের সুযোগ নিয়ে অসংখ্য নারীকে ইচ্ছানুর্তে ভোগ করতে ও ভোগ করতে পারবে। এতো নারীদের ওপর পুত্রদের বিবিসমত কাগজকোষের চাংকাল বাবে। এই আইন সত্য সমাজ এখনও বানম করছে?” তাঁর প্রতিক্রিয়া হল সারা

দেশে। যে চিঠি আসে আমার নামে। প্রত্যেক চিঠিতেই কঠিন ও ভীতি প্রদান। আমার অকালে গ্রাম-গ্রাম এবং মসজিদ-মসজিদ কোথায় এই চিঠির ঘট্যাকর্ম বিলি করে এবং আমার বিরুদ্ধে উদ্বেলনা ঘটায় চেষ্টা করে। আমারকে সামাজিক বহুকেই ধরাধরা প্রহাস দেওয়া হয়। মনসিধ সেবারে ধর্মনি, তবে তখনই দেশেছিলোম একটা বড় কাজে পূর্ণাঙ্গ।

মুসলিম বুজ্জীবিদরা কখন কী বলেন, তা এবার একটু বলি। মোজাবা যখন তেহওয়াক ফতোয়া বিঃবা মুসলিম নারীর প্রতি অসত্য মত ফতোয়া প্রকাশ করে তখনই ইসলামের সত্যিকারের চেহারা বেরিয়ে আসে। যিক সেই বহুতওলিগুই পরিচারণা বুজ্জিগত অর্থনীতি ধর্ম এই বুজ্জীবিদ। তাঁরা বলেন, ওমম ফতোয়া মোজাবের মনগড়া এবং ইসলাম বিরুদ্ধ। ইসলামের গ্রন্থযোগ্যতা নিয়ে কখনই প্রশ্ন ওঠে তখনই ইসলামকে গ্রন্থযোগ্য করার মহান। ১) দায় নিতে দেখা যায় এসব তাঁর বুজ্জিধর বুজ্জীবিদদের। আসলে মোজাব সমাজ এবং এই বুজ্জিধর চেহেরিহালায় একই মূদ্রার এপিঠ-ওপিঠ এবং মুসলিম সমাজের চরম সর্বনাশে সর্বনাশ লিপ্ত।

ইসলামের গ্রন্থযোগ্যতা নিয়ে যখনই প্রশ্ন ওঠে তখনই ইসলামকে গ্রন্থযোগ্য করার মহান (!) দায় নিতে দেখা যায় এসব তীক্ষ্ণ বুজ্জিধর বুজ্জীবিদদের। আসলে মোজাব সমাজ এবং এই বুজ্জিধর ফেরিওয়ালারা একই মূদ্রার এপিঠ-ওপিঠ এবং মুসলিম সমাজের চরম সর্বনাশে সর্বনাশ লিপ্ত।

মহাযনের প্রতি এবং তাঁর বাকী সম্বন্ধিত কোরাণ-হাদিসের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস ও অনুগত্য প্রতীতি। এটা যতদিন থাকবে ততদিন ধর্মবিশ্বাস ও দেশে মহা থেকে দূর হবে না। তাই আমি বিশ্বাস করি মহাযনের সম্পর্কে এবং কোরাণ-হাদিস সম্পর্কে প্রকৃত সত্য ও ঐতিহাসিক সত্যওলিগুই উদ্বেলনা করা আবশ্যিক। আমি তা করতে পারি। কোনো ধর্মই পরমত পবিত্র। কোনো ধর্মই পরমত মহিবৃত্তার শিক্ষা সেই, ইসলামে তো ছিল পরিমাণও সেই। আমার

বিরুদ্ধে তাই অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমিও লিখতে পারি। অবশেষে এল সেই বড় ঝড়। ২০০৫ সালের ১লা অক্টোবর ‘ভাণ্ডারপুরের চিঠি’তে এবং ৬ই অক্টোবর টেলিভি কোর্সে সত্যিকারের দুটো প্রবন্ধকে দিয়ে। প্রথম প্রবন্ধে পরিচিত সমস্ত আদালত এবং সকল প্রকার ধর্মীয় ফতোয়ায়ক নিষিদ্ধ ও বেআইনি করার দাবি জানাই। দ্বিতীয়টিতে ‘ইসলাম’ ও ‘মহাযন’ সম্পর্কে ‘বিবর্তিত’ প্রায়ে তসলিফা যা-যা লিখেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য বলে বলিষ্ঠভাবে আমার মত প্রকাশ করি এবং এই বইটির ওপর থেকে নিষেধাধা প্রত্যাখ্যার কলকলতা উঠে আসতেই যায় সাপত্ত জানাই। এরপর মোজাবা কেঁপে যায়। প্রবন্ধ দুটির করতে হাজার ফটোকপি গ্রামে গ্রামে বিধে সংগঠিতভাবে প্রচার করে। মসজিদে মসজিদে আমার বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষি ভাষণ চলতে থাকে। তারপর ১১ই অক্টোবর আমার বিরুদ্ধে কলকল ভাষণেও সংগঠিত করে ফতোয়া ভাষি করে। ফতোয়া দেয়, (ক) শিয়ারসুন্নি কায়েম ও বুতভাষ, (খ) মুসলিম সমাজ থেকে তাকে বিচরার করা হলো এবং (গ) বুতভাষের যে পাণ্ডি অর্থক্য বুতভাষ, শিয়ারসুন্নিগত সেই পাণ্ডি সেওতা হলো। একজন হাদিসসম্মে খোষণা করলেন, যে এই বুতভাষ কার্যকর

করবে 'এক' ও সাথ টাকা পূন্যতার চেওয়া হবে। ১২ই অক্টোবর মোরগা আর একটা সভা করলেন। সেই সভায় উক্ত মহোদয় কার্যকর করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির নাম হলো— 'একমুদ্রার ইসলাম কমিটি'। ১৪ই অক্টোবরই আমার গ্রামের মাস্কররা আর একটা ফতোয়া দেয়। সে ফতোয়া হলো, (ক) গিয়াসুদ্দিনকে গ্রামের সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হইলো, (খ) গ্রামের কোনো মানুষ গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে বা সম্পর্ক রাখা করতে পারবে না এবং (গ) ধর্মগ্রাণ মুসলমানরা যদি গিয়াসুদ্দিনের ওপর হামলা করে, তার বাড়িতে হামলা করে তবে গ্রামের কোনো মানুষ গিয়াসুদ্দিনের পাশে ধাঁড়তে পারবে না বা তাকে রক্ষা করার প্রয়াস নিতে পারবে না।

ফতোয়া মুদ্রাস্তরের ফতোয়া, মুওয়েয করাস পাঁচ লাখ টাকা পূন্যকারের প্রয়োজন। তবু পুলিশের সহায্য পাইনি। পুলিশ একবার বেঁচে নিতেও আসেনি। কংগ্রেস দলের একজন ভেদা নেতা বিবুতি ছিলেন, মুসলিমদের ধর্মীয় ভাবাবোধে আঘাত থিয়ে গিয়াসুদ্দিন অসহনীয় অপরাধ করেছেন, মুসলমানদের ক্ষোভ ও ক্রোধ তাই ন্যায়সঙ্গত। পুলিশদের একজন ভেদা নেতা সাংবাদিকদের প্রায়ের উত্তরন করলেন, সে অনেকটা। অনেক শীতাপীড়িত সম্রাট ফতোয়ার দিল্প করলেন না। এই হলো প্রকাশন ও রাজনৈতিক মলওলোর অবস্থান। মোয়াজ্জব্ব কি নিজেদের পক্ষিতাই পক্ষিপালী? আসলে ওদের পক্ষি সমানবাই। প্রকাশন ও রাজনৈতিক মলওলো ওদের মসতফাতা, তাই ওদের মৌলানাদের মতো পক্ষিপালী দেখায়।

এদিকে এলাকার উল্লেখ্যকর পাগল চড়চড় করে উঠেছে। সর্বত্রই ঝটপা, একই অসোচনা। অসোচনা তো নয়, একপেশে উত্তর, গনগণের অসম্বরণ। এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। দমনভ করা পরিস্থিতি। আবার বাড়ির, পরিবারের, বৃহত্তর পরিবারের মানুষজন, স্বাধীন-স্বতন, সকলেরই মূখ ভয়ে ফাটলো, কারও গিলে তাকনো যায় না। সবাই আশঙ্কা করছে, বাড়িতে ওরা হামলা চালাতে আসবে। পাগলের গ্রামওলোর হিতকাজক্ষীদের কেউ কেউ এসে বলে যাচ্ছে, বাইরে খুব উত্তেজনা, কান পাড়া যাচ্ছে না, ক'দিনের জন্য যেন কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করি। বাড়ির মোকররও সবাই বাড়ি থেকে দূরে কোথাও রাতে গোপনে পাঠিয়ে দিয়ে চায়। একবার পরিশেষে কী করবে, কী করা উচিত, পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াব, নাকি আত্মগোপন করব—সিদ্ধান্ত নেওয়া সতিাই করিনি। অনেক ভেবে ছিন্ন করলাম, পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াব, আত্মগোপন করব না, যদি আত্মগোপন বাই তবো হার ফিরে আসতে দেবে না, লড়াইটা শেষ হয়ে যাবে।

আমি দীর্ঘ দিন, তিন মশক কাসের বেশি, রাজনীতি করতেছি। একটা দলের নেতৃত্ব করেছি। বাড়িগত বিশাল পণ্ডিতি ভেঁরি হয়েছিল। তার সবটা নষ্ট হইল। যীরা আমাকে, আমার কবওলোকে সমর্থন করেন, তাঁরাও প্রথমে ভয় পেয়ে নীরব ছিলেন। ধর্মীয় ও সাংসদনশীল বিষয় বলে ফতোয়ার প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। আমাকে সরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি যখন ভানলার পলাব না, অথচ আমার উপর হামলার আশঙ্কা আছে, তখন আমার গ্রামের

কিছু মানুষ হকালশ। আমাকে সমর্থন করল। আমার পাশে গেলেন। ফতোয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো। মোরগাস 'গাংলস' উঠে বসল, আগে হামলার কল বিলাসুদ্দিন কোথাও ওহামে সম্পর্ক না গিলেতে তা মিথ্যা, তারপর তার নিজের দলে। এই প্রতিবাদ ক্রমশ দৃষ্টি পেতে শুরু করল। সেই পরিস্থিতিতে ক্রমশ পাশে গেলেন। পরিস্থিতিটা ঠিকভাবে পা-ঠাছিল সে চিত্রটা বলা তখনকার আমার একটা সোপ। পেতেই তখন নিলাম, "আমি যে অফ্রাসে কান তরি, স্বাধীন স্বাধীনভাবে পলাব মিথিষ্ণ গ্রাম পলায়েতে এলাকায় চলি। ক্রমশ পা-ঠাছিল। কিছু দূরত আমার পাশে এসে বসিছিলেন, উল্লেখ্যকর দর্শক অথবা বিশাভ ভানলার দখল আমাকে আরব, তরিক করছে, তখন ওরা প্রতিবাদ করছে। এই দৃষ্টান্তের অভিশাপই যেমন আমার গ্রামের, তেমনই কিছু মানুষ আমার চলে প্রতিবাদ করছে যাদের বাড়ি অন্য অন্য গ্রামে। এই প্রতিবাদ দূরত ও মানুষদের ভূমিকায় আমি দূরত। আমার জীবনের নিলাপতা নিয়ে দৃষ্টান্ত। সেই তা বলব না, কিন্তু সে দৃষ্টান্তেরে দৃষ্টান্ত পেয়ে আমার এক পিগটি দ্বাষ্ট্রের অসম্ম। সে অসম্মটা হলো, ধর্মভক্ততার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি একা নই, আমার পাশে অনেককে পেয়েছি।" এই প্রস্তাবে ফতোয়া বাতলের বসেছিলো, "...তখনি আমি বলতে চাই, সিদ্ধান্তেলেই হয়ে কিছুইই আমার কলম থাকবে না। ধর্মভক্ততা, মুসলিম ধর্মই পোজাদি ও যাবতীয় ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমার লড়াই অমুদ্র। তদি থাকবে।"

দ্রা, সেই লড়াই জারি আছে। একথা রিত, এ লড়াইয়ে কিছু কিছু হারিয়েছি, ধর্মত আপনজনও হারিয়েছি, তবে পেয়েছিও কম নয়। বাজার বিভিন্ন দ্রব্য অনেক কিছু পেয়েছি, পাশে পেয়েছি কিছু দিল্লি ম্যাগাজিনকেও। মুসলিম সমাজেরই কিছু বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ দিল্লি তৈরি করেছি লড়াই করার জন্য সংগঠনও, হার নয় হলো—"ধর্মমুদ্র মানবকালী রক্ষ।"

জানি, এ লড়াই এক দীর্ঘস্থায়ী লড়াই। আর এ লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ কেমন মোরো সমাজই নয়, হুজুরের মুসলিম বুদ্ধিভীষণও প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক মলওলোও। তাই এ লড়াইয়ে পড়ি নিতে হল অনেক দীর্ঘ-কল্পের গথ। কল বাবা অতিক্রম করতে হবে এ লড়াইয়ে এবং পড়তে হবে কল অতিক্রমের মুখে। এ লড়াইয়েই বর্তা এবং প্রত্যেকসময়ের কথ। নৌয়ে নিতে পারি হাইকুলের হুজ-হুজীয়েন মাথেকও। আমি একজন হাইকুলের শিকর এবং আমার অভিজ্ঞতা হলো, ধর্মভক্ততার বিরুদ্ধে ও মানবতার শকে আলাপ-আলোচনার একটা অতি ওকল্পূর্ণ ক্ষেত্র হতে পারে হাইকুলগণি। আমজা প্রেক্ষিকতে প্রতিদিন কয়েকগত শ্রদ্ধে হুজ-হুজীয়েন পরোমন করি। পাঠ্যবিষয়েই নির্ভিচ পারেন সেই তালের কালে ধর্ম ও ধর্মভক্ততার প্রতিবাদ হরণপটা উন্মোচন করা যায়। একাজটাও করিনি, কিন্তু কল যাচ যদি সন্নিধ থাকে। এটা কলসে প্রশাসনীয় সাবকা পাওয়া সম্ভব। কীভাবে এই ওকল্পূর্ণ সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব এবং তার ফলে আমাদের শ্রদ্ধে হুজ-হুজীয়েন কীভাবে ক্রত সভ্যতাসম্মানী ও দৃষ্টিবাহী হয়ে ওঠে তা কলম করতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু এ প্রক্বে তা সম্ভব হলো না, পরে সুযোগ হলে নিশ্চয় সে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

পাঁচ, ছয়, সাত, আট

পাচু রায়

হাসনের মৃত্যুর ফলে বিদেশের কৃত্রিম পুতলা ওঠার একটা বেঁচেচাক আমলের মধ্যে আছে নানান আর্থসামাজিক ঐতিহাসিক কারণঃ এটা সেই কারণেই সম্ভবতঃ অল্পাধিকী নৃজীবনী সেনের সাধারণ মানুষের সাধারণ ব্যবহার আমলের মতন সেনের সাধারণ মানুষের সাধারণ ব্যবহারের থেকে ভালঃ তাবার ঠিক এই কারণে গোটা বাঙালিরা ভোগবাদী সম্প্রদায় চূড়ান্তে হাকাম অসামান্য ও চরম পরে সরাসরিঃ যেহেতু গত সংখ্যা প্রকাশের পর চলে গিয়েছিলো মর্জিন মূল্যে তাই সেনাকার পথ চলতে চলতে যে সব পুনরুজ্জী পোষ্যেই তাই নিয়েই এগোতে চলতে গিয়েছে।

৫. অর্থ হইল চেয়ার কথা

আমার পথ ছিল কলকাতা-হিংগো-শিকাগো-নিউ অরলিয়েন্স। কলকাতা থেকে ভারত ছেড়ে শিকাগোতে অ্যামেরিকায় ঢুকব। অর্থাৎ যাওয়ার সময় কলকাতা পোর্ট অব এন্ট্রি, শিকাগো পোর্ট অব এন্ট্রি। যেতার সময় তিন উঃশঃ শিকাগো থেকে নিউ-অরলিয়েন্স যাবো উতান। আমার সহযোগী ভরদ্বিজা বসন্ত চন্দ্রকান্তিরহিত। নেট থেকে জেনেছিলাম হিংগো বন্দর arrival থেকে departure-এ যেতে এক ঘণ্টার উপর লাগে। ঈশ্বরে যাব ঠিক পথ ঠিক চিন্তা ছিল। বন্দরে ঢোকার মূহ বিমান সেবিকাকে বললাম হইল চেয়ারের কথা। সারাক্ষণ ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের অডিওরেকর্ডার দুখ হওয়ায় কারণে কণাটা বলতে গেরেছিলাম। বিমান থেকে নামার আগেই জানিয়ে দেওয়া হয় হইল চেয়ার যন্ত্রতঃ এরপর মন্ত্রদ্বয়ের মতন সেনলান সাধা চামড়ার সেই স্ট্রিটের অভ্যন্তরঃ ঈশ্বরের মনোভাষা এবং দক্ষতার মানবীতি এক ঘণ্টার পথ অতিক্রম করানো তা আমি তো সারাজীবন মনে রাখব। হিংগোর পর ঢুকব মর্জিন মূল্যের শিকাগোতেঃ ইমিগ্রেশন, লাগেজ সংগ্রহ, কাস্টমস, বেশ মর্জিন অবস্থা। (গোমের উপর বিধেচিড়ার মতন শিকাগোতে টর্নভোর কারণে ঘুরেয়া উড়ান বাতিল হয়েছে। তাহলে শৌচ্যব কখনঃ রাতটাই কা কাগোলা সেখানঃঃ খপারীতি আবার বললাম বিমান সেবিকাকে শিকাগো নামার আগে। উড়ান দু'খণ্টা স্টেট। আমার পুণ্ডিত্যের অবস্থান ঘটানো হইল চেয়ারঃ একার সাধা চামড়ার এক ছিপছিপ দুখঃঃ তাহলে সবটা বললাম চলতে চলতেই। চলতে চলতেই সে বলল, শেষ সামনের বোর্ডে তোমার জন্য কোনও চিঠি আছে কিনা। রায় নামাঙ্কিত একটা খাম সেখানার। চলতে চলতেই পড়ল সেখানার। পাঁচতারা ছিলো ট্রোলি আমায়ের সক্রিয়কাসের এবং চৈশবচোড় ও লাভরশের ব্যবস্থা করেছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজঃ একারে ফেলোটির কেলো সেখার মতনঃ অসম্ভব তৎপরতার, সতর্কতার এবং আলাদাও কলিট মনোভাষা, সে আমায়ের ইমিগ্রেশন পার করাল, লাগেজ আলাদার পুরো

গতিতে নিয়ন্ত্রণ করে তুলে নিল, কাস্টমসে গেলো জলোজরীয় কাগজপত্র আমায় হাত থেকে নিয়ে ও ভরসা করে নিল এবং বিমান কলারের বাইরের কাস্টমসেও নিয়ে এসে জানাল, হিসটরি ফোটোগ্রাফ শটস দার একদম এসে পড়ারঃ চলে যাওয়ার মূহে তাকে বললাম, যদি তোমার কিছু নিই তুমি কি মর্জিন ছাড়ঃ সে সলক ছেলে সেসে সম্বন্ধি জানালঃ আমি তার হাতে তিন ডলার অর্থাৎ ১০০/১০০ টাকার মতন গুঁজে নিলাম। সে হাত নাড়িয়ে হাতে হাত গিলিয়ে অলেকা কপল বাস আসা পর্যন্তঃ বাসের বুক ড্রাইভার হাত করে শরম মনে ভরদ্বিজাকে বাসে তুলে সামনের সিট বসিয়ে নিলেন। লাগেজটা আমি তুলতে পেলাম শেখেন নিকে। বুক মানবীতি ভাড়াভাড়া আমাকে নিরস্ত করে বললেন, তুমি ঠিক মজিরে রাখতে পারবে না, ওটা আমায়ের করতে লাওঃ সেই যুক্ত এই বুক দুজনে মিলে ভারি ভারি লাগেজগুলো বাসে তুলল। নামবার সময় বুক একাই সব নালাগলেন।

দু'মাসের ভ্রমণে আমি এই দুই বিমানবন্দর ছাড়া, নিউঅরলিয়েন্স, মেমফিস, মানচিত্র, শারলট, সানফ্রানসিসকো এবং নিউইয়র্ক বিমান বন্দরে যাওয়াতে করেছি। সর্বত্রই ভরদ্বিজাকে নিয়ে একই অভিজ্ঞতাঃ প্রকৃতির সাহায্য নেওয়ার অভিজ্ঞতা আরও মধুর হয়েছে, কলকাতায় চলাচলের তুলনায় বিমান যাত্রায় ভরদ্বিজা অনেক রক্তক বোধ করেছেন। পরবর্তীতেও ক্রেক ইন করানার সময়ই হইল চেয়ারের কথা বলছি। নেট সেই বাড়ী তৎক্ষণাৎ চলে গিয়েছে, ফলে কোনও সেবিকাকে বলতেই হয়নি আমার অভ্যাপঃঃ বিমান থেকে বেরোনোমাত্র হইল চেয়ার মন্ত্রতঃ প্রসঙ্গত বলে রাখি আলোচ্য বিমান কলারছিল কলকাতা বন্দরের ৫/৭ ওগ যন্ত্রত বড়। লন্ডন, শিকাগো, সানফ্রানসিসকো, নিউইয়র্কের কথা আলোচনায়ই আনিই না। এবং উড়ান থেকে রক্তাক্ত আসা পর্যন্ত যে পথটা বন্দরময় অতিক্রম করতে হয়, ঐ সব বিমান কলারে সে পথটা তার ১০/১৫ ওগ যন্ত্রতঃ এবার বন্দরময় অভিজ্ঞতাটা বলি। কলকাতায় 'ক্রেক ইন' এর ভাড়াপায় যাত্রী ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না অথচ অ্যামেরিকায় যাত্রী নয় এমন যন্ত্রন পোড়িও কার্ড করে নিরাপত্তার বেড়াভাল আইনমর্জিক অতিক্রম করে উড়ান ওঠার আগে পর্যন্ত যেতে পারে। কলকাতায় রক্তা থেকেই আমি হইল চেয়ার চাইছি। এক্ষণে লক্ষ্যভ আমায়তে ভরদ্বিজাকে করে যখন চরম বিপর্য অবস্থায় কাউটারের কলকান্তি শৌছে গেছি তখন এল হইল চেয়ার। হইল চেয়ারে বসিয়ে দিয়েই মহানন্দ ছাওয়াঃ একারে 'ক্রেক ইন' কলারের সময় যাত্রীকে পেতেই চাইল, আমি হইল চেয়ার পেখিয়ে নিলাম। তখন হিংগোজি হিংগোজি উনি এলেন। ক্রেক ইন হল। ক্রেক ইন থেকে সিফিটরিটিঃ বন্দরময় পথটা খুব বেশি হলে মিলিট ডিয়েলঃ এবারে শৌছেই তিনি শেনোফেন আমায়ের আর যেতে হবে না। অথচ সমস্ত

বিমান কক্ষের বিমানের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যেতে এই সম্ভাব্যতা। নিয়ে গেছে বা মেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যেমন শিকাগোতে চেয়ার সব এক টার্মিনাল থেকে অন্য টার্মিনাল থেকে ট্রেন উঠতে হয়। এত দুশীল হইল চেয়ার থেকে কিছুদূর এনে অমানুষ বুটো টার্মিনালকে মাঝখানে পাড় করিয়ে বসল, আমি অন্য একজনকে নিয়ে আসছি যেমাত্র নিয়ে যোগাড় করা। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর। পাঁচটা ছাত্রাঘর যাতে এসে এবং সে কাব্যে বুঝও প্রকাশ করল। বাস ও টিনটি চালিয়ে কলকাতার বাসুদেই হাওয়া হইল। কলকাতা আমাকে ছেড়ে গিল। কলকাতা, চিত্র আস্তে যান। কলকাতা, কিছু দিন। এবং এই 'কিছু' মেওয়ার জন্য সে সিকিউরিটির অনেক আগে ছেড়ে বিল। কারণ 'অফিসার সেখানে বসবে'। আমি ৫০ টাকা দিলাম। সে বসল, দু'জন অধি। আমি আরও ৫০ টাকা। সে কলকাতা পাথ আশা করেছিল। মানে মিনিট ১০০ টি। চেয়ার সময় এই ইলি চাকর এই নিয়মটা বহাল রাখতে পেয়েছে। ১ মিনিট চালিয়ে ১০০ টাকা নিয়েছে। কলকাতা যাত্রা আসার সময় ইমিগ্রেশন করেন তারা জানেন, যে মতভাষা কাছিকে ছাড়া হয় প্রায় সেখান থেকেই লাইটটা ওঠে হয়। উনি ১ মিনিট হইল চেয়ার থেকে একেবারে হইল চেয়ারের জন্য নিষিদ্ধ কাউন্টার এসেই চেয়ারটা আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বসলেন, আগনি এগিয়ে যান। ছাড় ফিরিয়ে গেলি তিনি সেই। তাকলান পরমা কড়ি নিল না, বুঝে তাগো লোক তো। এখানে ইমিগ্রেশন অতিক্রম করে লাগেজ তুলতে যখন হিমসির খাচ্ছি তখন আবার তাই আবির্ভাব। তাকলান ছাড়া একদম বোধহয়। হইল চেয়ারে উপবিষ্টা বসলেন, শোন ও কী বলছে। উনি এখন আর থাকতে পারবেন না, অনেক নাকি পরামর্শের আছে। (হইল চেয়ার কার কার লাগবে তা তো জানি, একসঙ্গেই তো এসেছি!) ১০০টি টাকা নিয়ে তিনি উঠাও। ফার্সটটা এত মেটা মাগের যে লজ্জার মাথা ট্রেট হয়ে যায়। এই যে কিছু না করে কলকাতার বসে এতগুলো টাকা ওস নিল একদম তোলা কন্যার নয়, ভাবটা যেন আরো পাওয়া উচিত। এই ফার্সট কি শুধুই মরিয়া তনিত, না সাংস্কৃতিক কোনও বিভ্রান্তি!

৬. গ্রামীণের বিল্ড

ওয়ালমার্ট। সামওয়ালের মালিকানাধীন ওয়ালমার্ট বিশ্বের এক নম্বর এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বুটো বিপণন কেন্দ্র। আমেরিকার আয়তন ভাষান্তরে ১২ গণ। ভারতের লোক সাধারণ আনুমানিক সাড়ে তিন ডাগের এক ডাগ (৩০ সেন্ট) আমেরিকার জনসংখ্যা। এ দেশের প্রতি ১১ মাইল ১টা ওয়ালমার্ট। এবং যে কোনও ওয়ালমার্টে বিশ্ববাসী সব কীট যাকের সামনে যেত ঘুরে আসতে গেলেই কয়েক ঘণ্টা সময় চলে যাবে। কেনাকাটাও করে সব পাণ্ডুলের মতন। টুলিভিটি, গাড়ি ভর্তি বাজার করে সবাই। এমনকি মহা রাতেও। ওয়ালমার্ট ২৪ ঘণ্টা খোলা। মার্কিন মূল্যে শৌছে পরদিন সকালেই গেছি ওয়ালমার্টে। বিস্তার শহরের অসংখ্যজন হস্তচলিত এই বসসন্ধান পার্শ্বটো অতিক্রম করছে গাড়িতে বসে। জানালা দিয়ে চোখে পড়ল যুগান্তি বাড়ি এক সাধা মানুষ শীতের মধ্যে বসে আছে পার্শ্বলেন্ডে, হাতের প্রাকটো দেখা। 'I'm hungry'!

সানজেলিসকোর 'মিসারমানস ওয়ার্ল্ড' বলতে গেলে 'পশ' এলাকা — সর্বজনঅবগাথা টার্মিনাল। ঘুরে ঘুরে যখন ফিরছি

বেশ কিছু পরামর্শ দ্রাষ্ট করে মূটপাশে সেখানে এক টার্মিনাল 'কল' মানুষ প্রচলিত কোণে চিত্তকর করত এবং অতিতে লবি আসতে। হাত পড়বার মাত্র, এত পরমা তোলা ওড়ান, আর অমানুষ একটা পেতে দিতে পারত না।

নিউ ইয়ার্কের প্রত্যেকের পাশে ইটিমি। একটি নটশালসে সমস্ত মা লেখা পড়ছি। প্রচণ্ড হাট, কলকাতা হাওয়া। হাট। এবং মহাবয়রা সালা নাকী আমদানি দিতে এগিয়ে এসে বসল, সকল থেকে কিছু বাইনি। দু'তালস লেন। যে বাড়ির নিম্নে পঁড়িয়ে এই হস্তোপকরণ হলো সেই বাড়ি যা তার চারপাশের কোনও বাড়ির উপরের দিকে তাকলো যায় না, এত উঁচু।

ম্যাসাচুসেটস অর্ডিন্যান্স আরও লক্ষ। ম্যাসাচুসেটস কন সর্ভিস বেশ ভালো। বাসে চোপে মিউনিসিপাল ড্রাসি দাব দিক তাগেটি: আপ সেলিন্ট লকস হাওয়া-কুটি-হাওয়া কলকাতা। লপন আমদানি মাদুরি একটা ফুলহাটা সাংগেটাব কলকাতার। বাস আসতে বিশ মিনিট বেশি। লবি আসতে গেলাম। সেখানেই আগে বাড়ির হাওয়া থেকে একজন সল এবং একজন কলো মাকবয়সী প্রট হাত বাড়িয়ে নিল, এক তালস ডিক চাই। পাগিয়ে গেলাম। কিছু ভাবছিলাম দিয়ে নিই। চেয়ার সময় আমাদের দু'জনের জন্য দু'হাতে দুই সর্ভিস-মণ। আত্মা থেকে হাত দুটা বাড়িয়ে, আমার দুটা হাতই ভর্তি বেশে হাত গটিতে গেল। মানুষ দুটাের দ্বি এমন একেই আছে কলকাতায় লেনেস ও মিনতে পারব।

সেইদেশের অভিজ্ঞতা আরও অনাবদ। ম্যাসাচুসেটস টেলিভিশন কাথলিক চার্চ সন্তোষে তিনদিন হোমসেস আমেরিকানদের 'হাওয়া' একদিন সেখানে গিয়েছিল। আমেরিকান এখানে যেমন অর্ডিন্স চেয়ারন হয় হাওয়া অলঙ্কার, চেয়ারন নয়। আমেরিকান চেয়ারনদের মূল কাওয়াসেন তারা যথেষ্ট যত্ন নিয়ে তাগো হাওয়ার কাওয়াসেন 'অলঙ্কার' হাওয়া আর, কিছু বহিঃপ্রকাশ নেই এবং আপায়নের কোনও ট্রি নেই। এই পর্বে চলতে বিরতে আর লজ্জা করছি না, ওয় আমেরিকার প্রধান শহরগুলিতে গৃহহীন আমেরিকানদের সংখ্যা কত তার একটা পরিসংখ্যান সাগ্রহ করছি। উচ্চতর বাড়ির তলায় মহলা কিছু কম ভরা নেই (যেহেতু কলকাতা তলতলে হলে কী হবে)। শহরের নামই পাশের বন্ধনীতে গৃহহীনদের সংখ্যা দিলাম:

বস্টন (৫৮১৯), শিকাগো (৩৭১৫), ডেনভার (৫০০০), ডেট্রয়েট (১৪৮২৭), লাস আনজেলিস (২১০০০), নিউ ইয়ার্ক (৪৮১৫৫), সানফ্রানসিসকো (৬২৪৮), মিয়ামি (৫০০০), ওয়াশিংটন ডিসি (৫৫১৮) ইত্যাদি। (সূত্র: Homeless Counts in US major cities & countries, Weingart Institute)।

৭. হাউসের গণসংখ্যা

গণসংখ্যা অল্পসংখ্যের এক মহাভাষির হলে। পড়াশোনা ভাল লসল দি আর ই দিয়ে বছর পাঁচেক আগে পিএইচডি করার জন্য মার্কিন মূল্যে আসে। কলকাতা মলিকউলার কায়েলজির উপর। ভাল কলকাতা হইল। শিকল আত্মকলিকাতা বাতিসম্পন্ন। মার্কিন মূল্যে থাকল সুবলে কলসের বিয় হয় অল্পসংখ্যের এক মল্লী ভাগনির সঙ্গে। জাণি, এক

আসুন, বাংলায় ফিরি

আশীষ সাহিত্যী

জিন

চাঁচকলা, বামস আপ, সেবস্ত্র কিম্বাস

১৭৫০-এর ই. দাসবিহারী আভিনিউ, কলকাতা। বারালির কা গবেঁব, বব আবেবের, বব বেলেবর হিমানা ওটি। ঠাঁ, দিতই দাংকান। ঐ বাড়িরই একতলায় গেঁটি আর লুপি পরে, ঈশপির বড়ি বেয়ে কাঁচালিত আকাশ-ভরা সূর্যভার মাফকানে স্থান করে নিতেন চঞ্চল একজন মানুষ। বলাভেন, তিনি সুবুরের পিয়ারী। মাথার চুল থেকে পাতের নগ অশি বারালি ছিলেন মানুষটি। নাম সেবস্ত্র কিম্বাস।

১৯৫০ সালে তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে চীন গিয়েছিলেন। তার অনুবাস কর্তা পাওঘা য়াং তাঁর 'অন্তরঙ্গ চীন' বইটিতে। বইয়ের কুমিকা থেকে জানতে পারি, লক্ষ্য উৎসাহ পেয়েই সত্তেও সেবস্ত্র প্রথমে লিখতে যেটেই ভুলস পান নি, 'আলো কবিতার তো একটি বীমা অফিসের কেরানীগিরি—সাহিত্যচর্চা করার সুযোগও কখনও পাইনি।' তবু লিখলেন। লেখা পাড়ে এক সভায় মণ্ডিত বথোপাধ্যায় হাসিমুখে সাহিত্যিকের ভিত্তেস করলেন—'হারমোনিয়াম ছেড়ে হঠাৎ কলর ধরবার সখ হল কেন?' ওনে উনি লক্ষ্যায় 'সংকথাং তাঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে' পড়েছিলেন। অনেক পরে 'হাখিনতা' পত্রিকা থেকে সেই লেখা উদ্ধার করে সাহিত্যে চড়িয়ে বালেনা 'অন্তরঙ্গ চীন' নাম বিশেষ, ছাপলেন (১৯৭৮) কথাপিছের অকমী রায়।

কিন্তু না, সেই বইয়ের ইতিহাস নিয়ে, কিংবা সেবস্ত্রের পথ নিয়ে আলোচনার জন্য এসব প্রশঙ্গের অবতারণা করিনি। আসলে ঐ বইয়ের মধ্যে ওঁরা একটা মজার মন্তব্য আছে, যেটি এতদিন পর আমার পড়ে হঠাৎই মনে হল, আচ্ছা, এমন যাদের কয়েক-কুড়ি-পঁচিশ, তারা এ জায়গাটা পড়ে মানে বুঝতে পারবে তো? মন্তব্যটি এই :

শিকি-এর প্রথম দিনের অনুষ্ঠান কথাগুলি নাচ দিয়ে শেষ হয়ে গেলে।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সবাই মঞ্চে এসে থাঁড়ালেন—কে আগে থাঁড়ানেন তাই নিয়ে একটা ছোলাটেই হল বাট কিন্তু পরা ফেলা ছিল বলে কেউ টের পারিনি। পরী তুলবার পর একমল ছোট ছোলামেয়ে মঞ্চে উঠে একটা করে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে অভিনয়খন জানাণো—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভক্তগণের হাততালির আওয়াজ অন্তরঙ্গ হলো—হুমি—হুই—হুয়ান—ও সর্বশেষে ববনিকা পড়ল।

মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাছি—মঞ্চেব একজন কর্মী তখন হুয়েতব বুড়ো খামুলাটি কলা বোখাবার তালী করে আমার দিকে বেরিয়ে একটা হাসলেন। বোকার মতো আমিও হাসলাম—ভাবলাম এতো হাততালির

পর এটা আবার কি হোম? ততইই একজন লেখাবীর কাছে ভিত্তেস করে জানলাম 'বুধ চন্দ্রকল' কথাটি প্রকাশ করা হয় ঐ কাল বেরিয়ে—তখন একটা আশ্বত হলাম। হালখব কল থেকেই লেখতে লেখতে উঠে ছোট্টোসে ফিরলাম। (পৃ: ২৮-২৭, অন্তরঙ্গ চীন, ১৯৭৮)।

আজ বেবেয় মঞ্চে কাঁচালিবা, ছোট্টোবো: নির্ভিকলেন, কেউই আর ঐ 'কলা সেবস্ত্রে পেতে বাসে উঠে ছোট্টোসে ফিরলাম'এব তিরিক মজাটা উপভোগ করতে পারেন না, কারণ আজ কলা সেবাস্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আজ শব্দের বারালি সেবাস্ত্রেরেব কখনও কখনও বুড়ো আঙুল বেরিয়ে বাসে—বামস আপ, মানে 'সাদেম', কিংবা 'অতিফাটি অথবা 'পাশক'। এটি কিন্তু বিলিতি কেতাব অব্, অদিশে বেবেয় বিশাল চালু করার সময় ছড়ৎ আওয়াজের মধ্যে 'কল দিক আছে' বেবেবের জন্য ঐ দুটুরি খাংকল কবস্ত্র। হালখব ওটি সাদেসেব সর্বস্ত্রে চালু হয়ে যায়। হরতো চীনও ওটি 'বুধ চন্দ্রকল' অর্থে চালু ছিল বলাবই। কিন্তু আমাংকল এখনও এন অদিশে ক্যুতকল ততই বিলুপ্ত হল কার থেকে? কবে থেকে ঘটল বারালি চাঁচকলাব বিখ্যাত?

আমার ধারণা, চাঁচকলাব বিখ্যায়নে ঐ কুড়িই বামুংষ্ট সর্বকাল আর খামস আপ ভোম্পালিতে সমানতরুর ভাগ করে পেওয়া উচিত। কেনে ঐ ধারণা, বলে বলি। বামুংষ্ট সর্বকাল বাংলা ইকুল থেকে ইংরিজি তুলে সেবার ফলে অদিশে পলিতে নানরকম গাংক, মানে সেটের, ইংরিজি বিভিন্নত্ব তুল গাংকতে থাকে। এসব দুঃসম্পন্ননরকরা প্রাপণ্যে অভিবাবকনের ও শিওলের একটা তিনিস বেবেবতে গাংকলেন—ইংরেজি ভাষাটা পরে শিশুরও চলবে, প্রথমই ইংরেজি ভাববাসিটা রগু করা চাই (ক কেবস্ত্র অবলা ইংরেজি ভোম আসলে তাঁরা দিখুত্বনি কাছনা শেখান)। কেননা, কে না ভাবেন, চাকবির বামুংষ্ট লিকা নত, তিনিশিটাই হল আসল তিনিস। আর তাঁর প্রথম ধাপ হল, বা তিই অচলিত বারালি চালচলনের আর, তাকে অ-সভা বলে গণ্য করা, বারালিচ অচলিত ব্যবভাবওগোকে বনল ফেলা। কারব মনে দেখে হলো 'নমস্কার' বা 'ঐী ববব' না বলে 'হাই' বলা। বিনায় নেওয়ার সময় 'চলি' বা 'অদিশে' বরলে 'বাই' বলা। 'দিক আছে' বা 'আচ্ছা' বা 'কেব' না বলে 'ওকে' বলা। ছোট্টোরা অতি ক্ষত নকল করে। হাল অতিরেই হাই-বাই-ওতে-তে অজান্ত হয়ে গেল। অভিবাবকরা মহা খুশি। টাই-বাংলা কড়ি পলাত খাংক ইউ আর ওয়েলকাম ওনে কড়ি কড়ি আত-লিটার আনখ করে বলে না। সেসূত্রে 'হ্যালি বার্থ ডে টু ইউ' গাইতে গাইতে, সুইট আর শিঙিরি চন্দ্রলিনের 'পাটি বিতে বিতে, তাঁদা আকবিক অবেই আখাংরা হলেন। তারপর সুইট-শিঙি-নকট-নকট-টিঙি-টিঙি-বিশ্বাসের বখন আঠেবে-কুড়ি বছর বয়স হল, ততদিনে তখন বারালি ভাবকতিগোলে যে আনবেই সেনেদমিন ছিল তা কেনাংন তুলে

গেছে। শুধু ভুলসেই বললে কম বলা হয়, তারা জানল, হাই-বাই-টাইই হল সভ্যতা; যারা এখনো স্বেচ্ছতঃ বিশ্বাসের মতো বুজো আঙুল উঠিয়ে কাঁচকলা দেখায়, তারা সব পইইয়া, হেট্টোলেসক, অ-সভ্য, অ-ন-সিভিলাইজড। সভ্য আর পইইয়া আসল কবাব লেজো কলো পেয়ে গেলে বিশ্বাস-দুই কাঙালি মহাবিভ।

একজন আমেরিকান যেমন মনে করে, যারা হাত নিচে ধরে এরা জন নিয়ে শৌচতর্য করে তারা অ-সভ্য, পইইয়া, এ-ও হেডমিন-পাথের পাঙালি ছবিতে হাত নিয়ে চটকে চটকে ললা পাকিয়ে ইচ্ছির চাককানের ওঘাঘা লুপা লেখে নিউ ইয়র্কের সমস্ত মহিলাবা মতি ওঘাক ওঘাক করতে করতে হল যেহে ওঘাক আউট করেছিলেন। আঙুরের কলকাতার অনেক চতুরলোক/চতুরমহিলাদেরও নিশ্চয়ই ঐ লুপা লেখে ঠিককমই ওঘাক ওঠে, সেহাট চক্কলম্ফার কবিতবে কলুত লগতেন না। এদের পইইয়া বলা হাংব না। কারণ এরা মার্কো-হিষ্টি আকৃষ্টস্টে চমৎকার বাংলা বলতে পারেন—বিশেষ করে হিষ্টি আকৃষ্টস্টে। (হই-সুনানথের ‘মিশীশে’ গল্প নিয়ে করতে বছর আগে একটি টিভি ছবি হয়েছিল, তাতে নারিকা ডাবি সুন্দর কনফেট-মার্জিত উচ্চারণে ‘OK, OK, OK গো!’ ত্যাগাণ নিয়ে শিকড়ের টিউন মাত করে গিয়েছিলেন)।

বুজো আঙুল থেকে কাঁচকলা বিদ্যে নেওঘাঘা অন্য কারণ্ডি আমরা সবাই জানি। খাদ্‌স আপ নামত একটি পানীয় বাজারে ছাড়া হয়েছিল বুজো আঙুল উঠিয়ে। টিবা উপশুপ-এর পলয়ে তার ভিগলো দুই জনহিউ হয়েছিল। এরা নিশ্চয়ই মাল ছাড়ার আগে সিগনেল-গলক করেছিলেন। উথিত বুজো আঙুল কাঁচকলা লবঙংকা, কাঙালিদের এই পুরোনো ইকুশেন যে বিস্মিতের পাখে, তা ঠাণ্ডা তখনই ঝাঁক করতে শোয়েছিলেন। ঐ ইকুশেনে আজও চাপ খাডলে পানীয়টির কী কলা হত তাড়ুন তো!

সেহেতর বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ভোলেই পোতেন না, কাঁচওলাব বিশ্বল কী করে ঠাণ্ডা পানীয় হতে পারে। যত ঘাই হোক, কাঁচকলার মন তো আর উপাভাসে পানীয় হতে পারে না, অসমবিকলনা কলসও না। কিন্তু হাংকা-হিষ্টিয়ানাও ওগমগ পলিতমবাংলাব আঙুলি অধাবিতে ইংরেজি কান-হিষ্টি দুনিয়ায় সবই হয়। মহাবিভ কাঙালি, বাপের নামমবই মতো, ভুলে গেলে বুজো আঙুলের বাঙালি তাৎপর্য। তারা গল্প বলল সাংঘর্ষি খাদ্‌স আপ।

এতে বিশ্বাসের (মতান্তর বিশ্বের মর্জিমতনয়ন) লুপা কাঙালির লাভই হল। তাড়ুন তো একবার, আপনার মেয়ে যখন নিউ ইয়র্কে গিয়ে পৌছল, তখন বিমানবন্দরে বকুলের উত্তোলিত বুজো আঙুল দেখে ভূত বুঝে সে যদি আসমারি করতে তেড়ে যেত, কী কেসেংকাগিটাই না হত।

কই হয় শুধু কোচি সেহেতর জানাই। কোচি বক্ক যেনপানমতনয়ন কাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। তবে, এ দুঃখ ঘোড়ানায়ও একটা পথ আছে। ওর ডাকনাম জর্জ ছিল না। পুরোনো কালের বাঙালিরা অনেকই তা ওকে জর্জ বালে ডাকতেন। তবে আর কী, জর্জ টোগোডব বাঙ নাম নিয়ে ওর পানওলা রিয়েক করে বগলকটা কাপো ফড়ুয়া-পরা করেকটি কলক-বালিকাকে মাকে নামিয়ে বিশ্লেই গানওলাব গা থেকে বাঙালি দুর্গন্ধ একেবারে মুছে যাবে। চাই কি, মেঘার রিমুভার আর ডিওজোয়াটের বিজ্ঞাপন হিসেবেও সেওলোক ব্যবহার করা যাবে। তাহলে স্পনসর পেতে সুবিধে হবে। ফকল-পিয়াসী ছুটির উদযম মৃত্যোর সঙ্গে ‘হামি চান্যাল, ও হাই! হামি লিয়ান্দুসী, ও পিয়ান্দুসী’ গাইতে গাইতে বাঙালি ওখন ভগৎসভার যোগ্য হয়ে উঠবে। জর্জ বিশোয়সের পাঁচাছড়া আডুনা তখন আবার বাঁচায় চুকেবে। সবাই বলবে, হ্যালি ভেঁজ আর হিয়ার এগেন, খাদ্‌স আপ!

* লুপা লেখে ওঘাকট অংশটি মনে এঁদের সেওঘাঘা সেও সমকাল্যে পেরছি না, যেমন আসলে নিউইয়া ওইলার অমনি আসার মশারির পাশে, ঘামের কানের কাছে, গলকজবে কবাব সেই অমকজ হাব বলিগা উঠিল, “ও কে, ও কে, ও কে (শে!)” আসার বুকেম পড়তর হিত সনাম তালো ক্রমকণ্ডই লগিত হইতে লগিল, “ওকে, ও কে, ও কে (শে!) ও কে, ও কে, ও কে (শে!)” সেই শব্দই শব্দে মিত্রজ সেওটিব মাতো জমাব বেলকজাব হইটও সর্পিং হইয়া উঠিয়া তাহাও কণ্ডাব কটা মনোহরার দিক প্রদর্শিত করিয়া, পেলকের উপর হইতে তালো তালো চলিতে লগিল, “ও কে, ও কে, ও কে (শে!) ও কে, ও কে, ও কে (শে!)” (‘মিশীশে’, গল্পগোষ্ঠ)।

প্রকাশিত হচ্ছে বিপন্ন স্বদেশ, বিকল্প ভাবনা আর সিঙ্গুরের জন্য কবিতাগুচ্ছ

প্রাণ্ডিহান : কলকাতা বইমেলা, নিউ হরাইজন্স বুক ট্রাস্ট,

৫৭/১ পটুয়াটোলা সেন, কলকাতা ৯

দূরভাষ : ২২৪১৮৬৮৪

দুর্দশকালি নাম

সেন্ট-প্যারসেন্ট সফল

সেন্ট য়র (২০০৬) সংখ্যায় লিখছেন কসকতা তথা ভারতের নারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ডেমিক্যাল বায়োলজি (আই.আই.সি.বি)-র কয়েকজন বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আগেই ঐক্যে কাল্পনের ওপর বেশ কয়েক চলেছেন বলে চিহ্নিত প্রচার করলেন। কয়েকমাস আগে টিভিতে যখন এটা দেখলাম তখন মনে পড়ে গেছিলো কাল্পার চিকিৎসায় ব্যবহৃত 'সেন্ট-প্যারসেন্ট সফল' এক চিকিৎসকের কথা। আগেই বলেছি (দুন, ২০০৬) 'আজকাল'-এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ফিচার এর দর্শিত্য না থাকলে আমাদের দেশে 'অবিস্মারক' ও 'সফল' মানুষের যে এত ছাড়াই তা জানতে পারতাম না। তখন তাই নি এসব নিয়ে কোনোদিন কিছু লিখব।

'১০ সালের মারামাতি পর্যন্ত আমি 'আজকাল'-এ ছিলাম। মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যায় এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমাদের কয়েকপাতার একটি লেখা নিয়ে বললেন, 'আমি একজন চিকিৎসক, বয়স্ক মানুষের রোগীকে সারাইছি, বলতে পারেন 'সেন্ট প্যারসেন্ট সফল'। প্রতাপবাবুর কাছে গেছলাম উনি আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন। লেখাটা আপনি দেখুন বিজ্ঞানের পাতায় ছাপানো যায় কিনা'। প্রতাপবাবু বলতে বুকলাম 'আজকাল'-এর প্রধান সম্পাদক প্রতাপবাবুর গায়। চিকিৎসক ভদ্রলোক যতদূর মনে পড়ে, বেশ স্বচ্ছক (যদিও এসে বেশ মোকাবেলাই বলেছেন কাল্পারের 'সফল চিকিৎসক') , ঐ এলাকায় কান্ডাকি থাকেন এবং বেশ প্রত্যাকালী মানুষ। ভদ্রলোক তাঁর প্রবন্ধের পাতা উন্টিয়ে দেখালেন যে, তিনি যাদের সারিয়েছেন তাঁদের নাম-গায় সব লিখে রেখেছেন। তাঁর বক্তব্য, কাল্পার দেখানো মত্ন অত্যন্ত সেখানে তিনি যে রোগীদের সারিয়ে তুললেন। কলকাতা, তা আমরা বিজ্ঞানের পাতায় দিতে চান কেন? নিউজ-এ গেলেই তো পারতেন। ভদ্রলোক বীর-হিরণ্যকে বললেন, 'য্যাপারটা আমার কাছে তো পরীক্ষা-নিরীক্ষার। রোগীরা কী বললেন, আমি কী ভাবলাম এই সমস্ত বিবৃতিভাবে লিখেছি তাই বিজ্ঞানের পাতায় গেলেই ভাল হয়। ভদ্রলোকের কথাবার্তা ভাল লাগলেও বলতে দিখা নেই আমি তাঁর সাফল্যের দাবিকে মন থেকে সেমে নিই নি। তাই হোক তাঁর লেখাটা দেখার আগে ঠাণ্ডে বললাম, আপনাদের মেডিকেল লাইনে নানারকম পত্র-পত্রিকা আছে সেখানে দিলে তো ব্যাপারটা ভাল হত। বব্বের কাগজ তো আপনার কাজের বিচার করতে পারে না, পারবে না। আপনাদের দেখা দেওয়া মানে আপনার কথাগুলিকে সেমে নেওয়া। সেটা তো করা যায় না। মনে আছে, ঠাণ্ডে আরও একটি কথা বলি যা আমার একটা কৌনাদারক অভিজ্ঞতা। দেখা গেছে, বিজ্ঞানের পাতায় কবীর-লাবর, অসুখ-বিসুখ, পরীর-বাস্তব নিয়ে লেখা থাকলে মানুষ আগে

সেওলে পড়ে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও একতর নবর দেওয়া হয়। 'আজকাল'-এর বিজ্ঞানের পাতায় টিউরিং শিরোনামে এককম ববর দেওয়া হত। একবার একটা বিশৃঙ্খল গবেষণা পত্রিকাকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছিল যে, 'সহস্রত' ট্রোটর কাল্পারের চিকিৎসায় এক ধরনের মলমে ভাল ফল পাওয়া যায়। মনে আছে, ববরটি পেলেম না। তাঁর আর্ট অববেরই না এসেছিল। যখন ফোন বকলাম, এটা এখনও গবেষণার তরুর আছে, আমাদের দেশে কেন অন্যত্রও এই মলমটি এখন পাওয়া যাবে না। সেই কথার অববের 'আমি বড় কষ্ট পাইছি, কোথায় ওটা পাশ বকবের'—দুর্ভাগ্যে মতো কাগজ করে পড়ল। সেদিন ঠিককর আরও দুটি ফোন এসেছিল। আমি দিখ করে ফেললাম, এ বরনের ববর আসে কখনও কখনও। দেখা না। বিজ্ঞান-সংবাদিকতার দিক থেকে আমার এই সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল কিনা জানি না, তবে সেই কাগজ মতো মানুষের কী প্রত্যাপ থাকে তা আজও ভুলতে পাবি নি।

ভদ্রলোক আমার ঠিককর কথা শোনার পর তাঁর প্রবন্ধ লেখা রোগীদের নাম-চিকিৎসাতলে দেখিয়ে বললেন, 'আমাদের আমার সফল হতে হবে না। আপনি একটু কষ্ট করে রোগীদের বক্তিত দিয়ে তাঁদের জিজ্ঞেস করুন। তাঁরা কী বলেন দেখবের'। আমি বললাম, 'এতদূর নিখ আপনাদের কাজের সত্যতা খাচাই হক না, আর আমার যোগ্যের কথাও নয়'। মনে আছে ঐ সব রোগীদের সবসঙ্গে কিছু কলকাতার বাইরে—ওপলি, চন্দ্রনগর, এসবও আছে। তবুও বললাম, 'আমাদের শুধার না হয় ফেলান। তাতে কী হবে? রোগীদের জিজ্ঞেস করলে টাংকা না হয় কলবের, আপনি সারিয়েছেন। বস, এতই আপনার কথা দিলে ফেল।' আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, আপনার তথ্য কোথায়? রোগীদের কী হয়েছে, ঐক্যে বক্তিত কাল্পার, ঐক্যে সারাকলেন, কতদিন পর নিশ্চিত হইলেন যে, তাঁরা এবার নিরাশর—এসব বিবৃতি বিবরণই ক কোথায়? এসব কথা বলার পর ফেললাম কিছু না বলে উনি সেখানি নিয়ে চলে গেলেন।

ভদ্রলোকের কথা আজও মনে পড়ে। তাঁর কথাবার্তা, ঐটুকু সময়ে তাঁর ব্যবহার, হাং-ভাব আমার মনে এমন দাগ তেটে বেশকিছু যে, এখনও মনে পড়লে তাই, কেন তাঁরা এভাবে সহজ প্রচারের পিছনে ছোট্টন? খ্যাতির সোডে, নাকি পসার বাড়ানোর তাগিদ? এ ব্যাপার সংবাদ মাধ্যমের কি কোনো ভূমিকা নেই? ফিচার-বিশ্লষণ করে বৈজ্ঞানিক সাংবাদ, বিজ্ঞানীর দাবি প্রকাশ করব—বিজ্ঞান সাংবাদিকতার এরকম ঐতিহ্য তো এখনও গড়ে ওঠে নি। তাই তো সাংবাদ মাধ্যমে এসব মানুষের এখনও উঁচ।

রক্তপাত ছাড়াই অপারেশন :

এবার আসি আর এক চিকিৎসকের কথা। ইনি আমার

হোমিওপ্যাথ (আমার ভদ্র ভিলেন আন্দ্রেয়াশাখ)। আভলোক-এর সহকারী সম্পাদক হসীমবাবু (হসীম মিঃ)। একদিন আমাকে অনুগ্রহ করলেন, একটি সাংবাদিক সম্মেলনে যেতে। এক হোমিওপ্যাথ ডক্টরকে হসীমবাবুব সঙ্গে দেখা করে বলে গেলেন, বঙ্গপাত ছাড়া কীভাবে অস্ত্রোপচার হয় তা তিনি একদিন সাংবাদিক সম্মেলনে দেখাবেন। যাই হোক, ওখানে আমি ঘাই। আমার পৌছোতে ১২/৩০ মিনিট বেশি হয়ে গেছিল। বেশে ছাপরে। শিবে বেশি আমাকে বড়ী বিভাগের একজন সাংবাদিকও হাজির। চিকিৎসক মহোদয়ের সাংবাদিক সম্মেলনও শেষ হওয়ায় হুসে। দেখলাম ৭/৮ জন সাংবাদিক—হাতে সব যথার্থীতে কণ্ঠক, কলম, নতুন কবইল। ছোয়ার বসে আছেন ডক্টরকে, তাঁর স্ত্রী—পাশে একটি বহর অফিসের ফোন। ফোনটি তাঁর নয়। আমার ঘোরে বেশি হয়েচে। তাই কিছু ভিলেন করতে ইতস্তত করছি দেখে তিনি নিজেই সেরেসমুদ্র আমাকে বললেন, আমার দুশ বিবেক হল ‘Surgery without blood’ (বঙ্গপাত ছাড়াই অস্ত্রোপচার)। আমি সেটা ‘ফাইনেসিস’ কোরীর কোরে ফেখরি। এই বলে হাতে একটা কলো ব্যাডের কল নিয়ে পাশের ঐ বক্সা হোসেটিতে কলো ডাকলেন। আমি হো ব্যাপারটাও ইচ্ছাকৃত্যে গেলুম। ডক্টরেরের ডাকে বাজতি যেমন কলং কলং দুখ করে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসতে লেখে, মনে আসে, আমি বেশ চিকিৎসার করছি বলেছিলাম, এ কী করছেন? ব্যাপারটা কী আমাকে একটি বলুন। উত্তরে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের দেখিয়ে বললেন, ‘এঁদের সব ব্যক্তি, বংখাও করেছি।’ যাই হোক, ডাক্তারি আমি পড়িনি, তাঁর কথা শুনে খেটুকু বুঝেছিলাম তা হল—কোঁদের ভাং হোসেইই চমৎ থেকে পৃষ্ঠবাসের চামড়ার খাপটি অনেকখানি ভাংগা কুড় থাকে। চামড়ার এই খাপটির নাম ডাক্তারি ভাসম শ্রিপিউস (Pia-puce)। কয়েকমাসের মধ্যেই এই চামড়ার আবরণটি উড়িয়ে যায়। এটিই সাধারণ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু স্ট্রীমকালে এটিই মানুষের কলো অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই তাঁরা পৃষ্ঠবাসের উপরকার চামড়ার কিছুটা ফেটে নিতেন। এই ফেলন গ্রিফিয়ারেই বলে ‘সুয়ং’। এটি অনিবার্য ধর্মীয় শ্রম হিসেবে রয়েছে ইটলি আর মুসলমান শিতোর মধ্যে।

‘ফাইনেসিস’ বলতে ডক্টরকে বা বললেন তা হল, ঐ যে পৃষ্ঠবাসের উপরে চামড়ার খাপের কথা বলেছি তা কোলো কোলো শিতোর কোরে এত বড় হয় যে শিতো স্বাভাবিকভাবে প্রসার করতে পারে

না, প্রসারের সময় ঐ খাপের সামনের অংশ বেশদূর মতো। ফুলে ওঠে এবং ওখ মুখটি এতই বেঁটে হয় যে চামড়ারটিকে শিখর। টোকা পৃষ্ঠবাসের খাপের কাছে আসে যায় না। এরকম অবস্থাতেই বলা হয়ে ‘ফাইনেসিস’। শিতো একটি বড় হওয়ায় সবও যদি ঐ মতোয়া খপও তখন ডাক্তারবাবুব অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন। এটিই হল ‘ফাইনেসিস’ অপ্রাচলন। এটা ভগিত্তে না নিলে পরে অনেক জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে, এমন কি পৃষ্ঠবাসে গ্যাংগ্রিন, ক্যান্সার হওয়াও সম্ভাবনা থাকে।

ডক্টরকে ঐ ‘অপ্রাচলন’টা ‘বঙ্গপাত ছাড়া’ কলো যাক দেখাবার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে ডেকেছেন। ডক্টরকে বললেন, ‘আমার কোলো ঘুরি কাঁচি লাগবে না, বড় পড়বে না।’ তাঁর কথায় এটি তাঁর একটি ‘অভিভাব’। আমি একটি আগা এটাকে কলো ব্যাডের কল বলে ডেকেছিলাম, ‘লেখলাম সেটা একটা সল পাইল, ভিতরটা খপা। সেই পাইলটা বেশিই বললেন, “এই হোসেটির ফাইনেসিস। এর চিকিৎসা আমি করব” — বলেই পাইলটার ভিতর হোসেটির সিমকে ঢোকাতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলেছিলাম, ‘খাদুন। আপনাকে ‘অভিভাব’ গবেষণার নামে এই বাজটাতে কষ্ট দিচ্ছেন। আপনাকে কিছু লেখতে হবে না। আমার কলোটা প্রসার উত্তর বিন। ফাইনেসিস বলতে আপনি যা বোঝালেন সেটা যে ঠিক, আমরা সাংবাদিকরা জানব কী করে? ঐ বাজটার যে ফাইনেসিস হয়েছে সেটিই বা আমরা বুঝব কীভাবে? আপনি কোলো চিকিৎসককে এখানে অনেন নি কেন? কোলো চিকিৎসক সম্মেলনে আপনাকে বক্তব্য বোঝাবেন? হোমিওপ্যাথিতেও হো নানারকম জার্নাল আছে—কোথাও আপনাকে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন?’ এসব প্রশ্নের উত্তরে তিনি ওখ বলেছিলেন, গিলির একটা জার্নালে তিনি প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন—কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেল তা এখনও প্রকাশ হইনি। ব্যক্তি সব প্রশ্ন তিনি সিক্তর দিচ্ছেন। আমি ওখ বলেছিলাম, ‘এভাবে অনুগ্রহে বিভ্রান্ত করবেন না।’

এরপর উপস্থিত সকলেই তাঁর সেওয়া ফাইল-কাগজ-কলম ফেরত দিতে গেলছেন। মনে আছে তিনি ফেরত নেন নি। ভালো লোকেছিল যখন যেখান কোলো সংবাদপত্রেও সেই সাংবাদিক সম্মেলনের কথা বোঝায় নি।

এও সেই পসার বাড়ানোর চেষ্টা ছাড়া আর কী? সাংখ্য-নাথানওলিকে এসব ব্যাপারে সতর্ক হতেই হবে।

কলকাতা বইমেলায়
উৎস মানুষ
থাকছে
আসুন, দেখা হবে

অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ও মননে

...এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানে ঠাঁহার আত্মচরিতের ব্যাখ্যার কথা আমি ভাবিচ্ছি। তিনি কলকাতা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ইতিহাসে প্রাচ্যসমিতির দ্বারা পদ কালটিভেলন এর সময়ে ও বেশি ইনস্টিটিউট এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি যখন এসব পদ অলংকৃত করছিলেন তখন এই সময়ে কোনো ব্যক্তিগত দলের আশ্রিত ছাড়াই স্বাধীন কণা ছিলাম। তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একচেটিয়া উপাচার্য ছিলেন। লক্ষ্য করিলাম, উপাচার্য হিসেবে তিনি কেমন নির্ভর এবং স্বাধীনভাবে মানুষ ছিলেন। কোনো রাজনৈতিক দলের দৃষ্টি করিবার জন্য তিনি কিছুই করতেন না। সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বেশ জাদুঘর ও উপাচার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন চকবাস, এখন সেই প্রায় সকল উপাচার্যই চকবাস। ...অমি জানি, তাঁ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রাথমিক তরুণ ইংরেজ শিক্ষার পাশ্চাত্য উপাচার্য হিসেবে ঠাঁহার অতিমত প্রকাশ করতেন। এই প্রাচ্যসমিতির সার্বক হইয়াছে। এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক তরুণ ইংরেজ পড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। এখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইয়াছেন।

সুশীলকুমার দলগুণ

প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ, আমদানি পণ্ডিত

৩ নুভার্ভার ২০ তম বর্ষ পুর্বে (১৯৩৫) ওভেরসাইট



সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

(১৯১৪-১৯৩৫)

যাঁদের কাছে পড়াওনা করছি তাঁদের ছাড়া সবাইকে 'সার' বলতে পারতাম না। সুশীলবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের নিমিত্তে মনে হইয়াছিল ইনি 'সার'। পরবর্তীতে পরিচয় ক্রমশ বাড়ার পর মনে হইয়াছে সুশীলবাবু যিনি 'ওক্স'র এক অনন্য নম্রি তিনি। প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়ও অসুখভাবে। তিনি উপাচার্য। আমরা ছাত্র। বিভাগে বেশ কিছু সমস্যা হইছে। আমাদের মধ্যে একজন হঠাৎ পরামর্শ দিল, তিসিকে জানাই। সেদিন ছুটির দিন বোধহয়। আমরা কজন (জন চারেক) তাঁর বাড়িতেই ফোন করলাম। নিজেই ধরলেন। সমস্যার সামান্য আভাস দিওঁই বললেন বাড়িতে যেতে সকাল পৌনে দশটা নাগাদ। বুকেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ আমরা পাকা। আমরা গেলাম সে সময়টা ওঁর মেয়ে বের হবার সময়। সংক্ষেপে কিছুটা বলতেই কলসেন, আপনারা কী করতে চান? আমরা বললাম, সেজন্যই আপনার কাছে এসেছি। কেউ কেউ বললেন কোটে যেতে। সার বললেন, 'সেখি কী করা যায়। আপনারা এখন কিছু করবেন না।' ওঁর ওঁঠবার সময়, আমরা উঠি। সুশীল ব্যক্তিত্বের অনেকটা প্রমাণ পাওয়া গেল। '—আপনারা কোনরকমে যাবেন? আমি কোন ভায়পায় নামিয়ে দিতে পারি।' উপাচার্য চারজন অকিঞ্চিৎকর ছাত্রকে বললেন—'তাঁর বাড়িতে সুবিধামত ভায়পায় নামিয়ে দিতে পারেন। মনে রাখতে হবে আমাদের চারজনের কারোই কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বাধ ছিল না।

এরপর বয়স বর কারলেন, এবং পরের বিকে কেবল দেখা করবার জন্যই, সারের কাছে গেলি। বাসী কী দুজনই নিরামিষ খেতেন। ওঁর বাড়িতে গেলে একটা মিঠি আর জল পাওয়া যেত—সে যেই দ্রব্য। কখনও চা। এক বৃদ্ধা হোটেল চেয়ারম্যান তখনইলা ওঁদের দেখাওনা করতেন। অনেকই তাঁকে বলতেন ওঁদের গার্ভিয়ান বা অভিভাবক। আমার মত অনেককেই সেই ভ্রমহীলার অনুযোগ ওনতে

হয়েছে ওঁদের দুজনের সম্পর্ক। যাওয়া লাগার সময় সেই নিজেদের লিখে লক্ষ্য নেই ইতালি। সেই ভ্রমহীলা হঠাৎ একদা সেল চলে যান তারপর ওঁরা আর কাউকে পাননি। আমি সবদিক তখন নিজেই বইয়ে দেখা হলে সারকে তাঁদের গার্ভিয়ানের কথা জিজ্ঞাস করি। তিনি চলে গেছেন ওঁর খুব ব্যস্ত হইয়ে (এক বোধহয় কিছুটা বেকার মত) প্রমাণ করলাম, 'আপনাদের তাহলে চলছে কী করে?' ওঁর হাত-বলন্ত সহজভাবে বললেন, 'ভালই তো চলছে। আমরা এখন বোজ কিছুই বই। বুকেলাই। ও (অর্থহীন মাতাম) রাস্তা বেশ পছন্দ করে। নানাব্যক্ত সমিতি দিয়ে কিছুই বোজ লাগে হয়। তেমিষ্টির সোত তো। আমিও তেমিষ্টির সোত, কিন্তু রাস্তা আমরা রিত আসেন। আমি বসন্ত মতি। বেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে নানা কথা চিন্তাভাবনা করতে করতে মেতে ফেলা যায়। রাস্তায় খুব বেশি মনোযোগ লাগে।'

সারের ছাত্র-বাংলা ও ছাত্রদের প্রতি যথার্থ অনুভূতি মনোভাবের অনেক গুণ আছে। নিজে তো বড় কয়েক ছাত্রের গবেষণায় প্রবৃত্ত সাহায্য করতেন, কিন্তু অনেক সময়েই বিসর্গ 'গবেষণে নিজের নাম লিখেন না। একধিকবার নিজের কানে ওনতেই অধ্যাপকদের বলতে, 'ছাত্রদের নিজে চলুন, লাভ বই কতি করেন।' একবার কোনো একজন অধ্যাপক গাইডের সঙ্গে তাঁর গবেষণা ছাত্রের মনোমালিন্য হয়। গবেষণা ছাত্রের পিএইচডি কাজ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই অধ্যাপক কিছুতেই সেটি জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছিলেন না। সারের কাছে ব্যাপারটা শোঁদ্যারের পর সার ছাত্রটিকে বলেন সরাসরি ডি.এস. সির জন্য খিনিসিট জমা করে দিতে। ডিএসিসির জন্য কোনো 'গাইড' বা 'সুপারভাইজার' তো লাগে না।

সারের একটা অসুখ অভিজ্ঞতা হয়েছিল কল্যাণীতে উপাচার্য থাকাকালীন। সন্তান বোম, জ্ঞান ঘোষের মত সারেরও ছিল অস্বাভাবিক দ্বার। এক ভ্রমলোক দেখা করতে গেলেন, সেখানেই বোকা ঘান থেকে, অনেক দূর থেকে এসেছেন। তিনি সারকে বললেন, 'আমার ছেলে এবার বিএজি পাস করেছে। সে এম এজিতে পড়বার জন্য নবাবপুর করেছে।' ঐকুণ ওনে সার তাবলেন বোধহয় ছেলেটি যাতে

'জাম' নামে তার সুপরিচিত করতে এসেছেন ভক্তগোষ্ঠ। মাঝে হজাবতাই কলোনে, 'সে তো ভর্তির কর্তি' আরো, তারা দেখে। হেলে রেজাপাঁ কেমন করেছে।' ভক্তগোষ্ঠ তখন সাধারণ অবাক করে বললেন, 'হেলেবে বোলাই ভাইটি, পেতেও হয়েছে। আমি বলতে এসেছি—আপনি ওকে ভর্তি করেন না।' ভক্তগোষ্ঠ জামলেন তাঁর কিছু চায়ের ভ্রমি আছে। গ্রামে বেশির ভাগই কৃষক পরিবার। তিনি হেলোলের কৃষি বিজ্ঞান পড়তে পরিবেশছিলেন তাকাল তাঁর আশা ছিল হেলোলা শিক্ষিত হয়ে গ্রামে থেকে তাদের নিঃসৃত হবে। এরা এলাকার চাষাবাসের উন্নতি ঘটাবে তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে। বড় হেলোটও পড়ানোয় দু'ব ভাস। সে এম এটিকে ভাল রেজাপাঁ করে বিশেষ চলে গেছে। গ্রামে থাকেন। ভক্তগোষ্ঠের ভাব হোট হেলোলাও এমএকি করে কয়েকটি গ্রামে থাকে—কড চাকরি করতে কিংবা গবেষণা করতে। এমএকি না করতে পারলে সে কড়িতে থেকে চাষবাস দেখবে। স্যার আমাকে বলেছিলেন—এই ঘটনাটি শুধু মরুপট্টী তাই নয়, আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যার চিহ্ন। হেলো, হেলো, গরবি হবেই হেলোলেদের নিঃসৃত উন্নতি, জ্ঞান-বিনা তাদের নিজের জনগোষ্ঠীর (Community) কাছে লাগায় না, তারা উপরে দূরে নিলে যায় (আপনার ট্রাটি)। স্যার দু'ব অসহায়ের মত বলেছিলেন, নানাভাবে—ভর্তি হতে পারছে না, এমন কাজকে ভর্তি করে নেওয়া হতে যা যায়। কিন্তু ফার্সি, সেকেন্ড হওয়া—তাকে বাস পেওনা যায় কি করে? ইন্দোনেশিয়ায় কিছু একটি ভাল ব্যবস্থা ছিল। কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্রদের অন্তত এক বছর গ্রামে গিয়ে কোন কৃষক পরিবার থেকে হাতে কলমে কৃষিকাজ করতে হবে। স্যারও ছাত্রদের সঙ্গে গিয়ে এক কৃষক পরিবারে ছিলেন।

স্যার নাকি নিজে ঐ ছাত্রটিকে ডেকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। চল কী হয়েছিল তা আর স্যারের কাছে ওঠিনি। সম্ভবত, কৃষি কর্মীদের কাছে গিয়ে চলে বাওয়া আর যোগাযোগ থাকেনি।

স্যারের সমস্যা (অর্থাৎ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রকাকারীসিনি) বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসে এবং নির্বাচিত সেনেট ও সিভিলিটে ভোটে দিয়ে একটি পরিচালন কাউন্সিল তৈরি করে দে। তাকে সব প্রতিনিধিই 'মনোমীত'। পূর্ববর্তী কংগ্রেস আমলের বাগায়ে সব মানুষজনই এত কষ্ট ছিলেন। এ নিয়ে হ্রস্ত কোনো ভালোভাবেই হয়নি। সিভিলিয়ন পক্ষ তখন অধিক করে সেটে, সিভিলিটের নির্বাচন হয়। সে জন্য প্রসঙ্গ। ঐ সময় অর্থাৎ তিনি উপাচার্য হবার পর হেলোলে কোনো কোনো মহল থেকে প্রসঙ্গ চাপ আসতে থাকে—পূর্ববর্তী উপাচার্য অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ শেখের আমলের নানা অনিয়ম, বৈন্যম, অতর্ক, কুসংস্কৃতির তদন্ত করা হোক, তখন কলিটি গঠন হোক।

সুদীল বাবু সেটা হতে যেননি। স্যার দু'ব পরিভাষারভাবে বলেছিলেন—'প্রাইমারিস' তত্ত্বের কোন কারণ পাওয়া যায়নি। বিতীতত, এরকম পরের তিনি, তাদের ভিতরি কাজকর্মের তত্ত্বের কলিটি করলে এটাই বীতি হয়ে পড়াবে। অসল থাক বা না থাক একটা তদন্ত কলিটি তৈরি হবে।

স্যারকে বিরক্ত হতে দেখেছি কৃষ কন্ম। কিন্তু নীরবে কষ্ট পেতে দেখছি। অর্থাৎ পরের ঐ উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় কোনো কোনো মহল থেকে (সরকারি) তাঁকে অনুদোষ করা হয়েছিল কেন সিভিলিয়ন লোক থেকে নয়। সেখানে বিশেষ 'ব্যবস্থা' করা হবে, কারণ আইন অনুযায়ী পঁয়ষট্টি বছরের পর উপাচার্য থাকার ব্যাব না। স্যার রাজি

যেননি। আমি এটা জানতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেফটেকেরপন কন্মকলন সেফটেকীয় ছাত্র সাধারণ আছে গেছিল মাঝেতে থাকার জন্য অনুদোষ করতে। অনুদোষের বেশে লোককে তো প্রকট করেতে চায়, হাড়তে চাপ না। ঐ সময়ই তাদের একজন পলসিগি, 'সাপ' এখন আমলের লোক হয়ে গেছেন। আমি হেলোলায় মনে মনে সাধারণ ঐ অর্থ সমস্যাটা বা বুকেছিলাম—স্যার কখনই তারারই 'লোক' হননা। তিনি অনুদোষের লোক। কিন্তু সবাইই সঙ্গে থাকতে পারেন। লোক কেমনা কাজ সেবেলে এবং বুকেতে পারলে তার লোক হতে থিখা করেন না।

ঐ সময় একটা কানাদুখো বা ওজন চাচ্ছিল—ওকে নাকি আবার উইএম একপ্রকার করে লোকোও পাঠাবার কথা হতো এবং বিতল থেকে অন্য আরও অনেক 'অফার' আছে। তিনি নাকি চাইলেন মাতাম এবং তাঁর পুত্রদের কোন ব্যবস্থা, তাহলে যাবেন। একটু ঝটকা সেগেছিল। সেজা ওঁকেই চিঞ্জামা করে ফেললাম। ঐ প্রস্তাবের দেখান বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সবাই বিশেষ গেলে চলেই কী করে!'

স্যার ১৯৭৭-এ ইন্ডিয়ান ম্যাননাল স্যারেল আফায়েতহীর 'ফেলো' হন। ম্যাডাম হন তার অনেক পুত্র। নানা সোরাগ্রেতে অটিকে যাচ্ছিল। কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু নিজে কোন চেষ্টা বা গরি করেননি। না নিজের জন্য, না ম্যাডামের জন্য। বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধিতম অবিশেষে তাঁকে কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ের শাখা সভাপতি করা হয়। তাঁর সভাপতির বক্তৃতাটি অসাধারণ। মতের দলবলে কোনো সময় তাকে সাধারণ সভাপতি করার কথা ওঠে। একবিষয়ের অন্য ব্যক্তি হন। যারা তাঁর হয়ে গরি করছিলেন তাঁদের মধ্য থেকেই কেউ কেউ সভাপতি হন। স্যার তেও নিজেই ব্যাপারে একবারেই থাকতেন না।

২০০৬ সালের গোড়ার দিকে স্যারের শিক্বে শেখবাবর মেখা। মাঝে মাঝেই পলীর ব্যাপার হচ্ছে। নিজের কোনো পেনসন নেই। ম্যাডামের পেনসন ভরসা। এসইউসি আইইসর হেলে মেখো তাঁর খোঁজবখর নেয়, মেখোপেনা করে, তাদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা। ম্যাডামের আলোকেইমার ভাল হবার নয়। বেশির ভাগ সময়ই লোকজন চিনতে পারলেন না। স্যার কলোনে, 'সারা রাত সভাপন থাকতে হয়।' নাহলে ম্যাডাম নিজে উঠে ঠিকমত বাধকমেও যেতে পারেন না। অর্থাৎ সারা রাত স্যার ঘুমোতে পারেন না। চোখের দুটি কন্মে এসেছিল। কষ্ট একটা কীভাবে গেলো নিজে লেখার উপর রেখে থিখা হয়ে পড়তেন।

অধ্যাপক সুদীলকুমার দালগুটী (তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন ডিরেক্টর) লিখেছেন, 'সুদীলকুমার সুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের শেষ স্বাধীনচিত উপাচার্য।' ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ডুতন্তের প্রাক্তন অধ্যাপক শিলির সেন এক প্রকাশ্য সভাতে কলোনে—ডাউল চ্যাংলোর বলগে উদ্বোধন সুদীল সুখাতি। এ বিষয়ে কোনো সম্বন্ধের অবকাশ নেই যে সুদীলবাবুর সময় পর্যন্ত উপাচার্য্য হোড়াবে কাজ করতে, ভাল হোক, মন্ম হোক, বেঙ্কুর হোক, অনিচ্ছাত হোক, সেভাবে কাজ করেন না যা করতে পারেন না পরবর্তী উপাচার্য্য।

সামাজিক মানবিক কনুদী প্রোগ্রামার উৎস, সাহসী সং নীতিনিষ্ট প্রীতনভাপন বড় অধ্যাপক সুদীলকুমার সুখোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার রেনেসাঁসের শেষ প্রাঙ্গণের একজন।

সুদীল কুমার সেন

সমাজ বদলের স্বপ্ন ছিল আমৃত্যু



চিত্ত সেন
(১৯৪৪-২০০৬)

সমাজের বেশির ভাগ মানুষ নিজের ক্ষুদ্র গতিব মতোই আবর্তিত হয়। কতিপয় মানুষ এই বার্ষিকপন্থার ক্ষুদ্র গতি ছাড়িয়ে নিজের গতিবিধির পরিসর বাড়িয়ে নিজেকে বৃহত্তর স্তরে উন্নীত করেন। এমনই একজন বড় মানুষের মানুষ ছিলেন চিত্তম্বর ঘোষ।

অসি নিবাস যশোহর জেলার নরাইল মহকুমার কুড়িগ্রামে। চিত্তা নদীর ধারে বাড়ি ছিল। পিতা হোমেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন অবিতত বাংলার এক বিজ্ঞান সন্থার কর্ণধার, কলকাতার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ছিল। বালিগঞ্জ প্রেস ছিল তাঁর ঠিকানা। কলকাতার তৎকালীন সম্রাট প্রতিষ্ঠিত অনেক মানুষের সঙ্গেই হোমেনবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। মা বনমা ঘোষ বুলনা জেলার বাণেশ্বরটি মহকুমার অবস্থাপন্য ঘরের মেয়ে ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অঙ্গলে অনেক ভবিষ্যতের মালিক ছিলেন।

১৯৩৪ সালে আসন্ন প্রসব রনাদেবী কলকাতার ম্যাকডাউন রোডের সেবাসদনে ভর্তি হন। সেখানে পাশের বেডে ছিলেন সেনবন্ধু চিত্তরঞ্জনেন কন্যা। বাসন্তী সৌরী মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন তাঁর কন্যার পুত্রসন্তান হবে; হুঁ নাতির নামও তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন “চিত্তম্বর”। পাশাপাশি বেডে থাকার জন্য রমা ঘোষের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাসন্তীদেবীর মনোকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল—নাহনি হয়েছিল। ওদিকে রমা ঘোষের হয়েছিল পুত্রসন্তান। সেনবন্ধু-ভাষার ইচ্ছাতেই রমার সে জেলের নাম রাখা হয় চিত্তম্বর ঘোষ।

নরাইলে ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে চিত্তম্বর সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তারপরই সেনভাষার যত্নগ্ণা শুরু হয়। তারই মধ্যে টি বি-তে অকৃত্য হয়ে ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে হোমেন্দ্রনাথ শেষ নিশ্বাসে ভাগ করেন, অল্প বয়সে বিধবা হন রমা ঘোষ। নানারকম সমস্যায় পড়ে এগার বাংলায় চলে আসেন তিনি, ওপারে পড়ে থাকে জমি-জমা সম্পত্তি সবকিছু। ছোট ভাই হরেন্দ্রনাথ ঘোষের কাছে মালবাজারে গিয়ে ওঠেন রমা, আর প্রথম পুত্র চিত্তম্বরকে পাঠিয়ে দেন পিন্দি লাক্ষাগ্রভা মন্ডের কাছে কোচবিহারে। সেখানে মিনারীদেবীর স্কুল নুপেন্দ্র নারায়ণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন চিত্তম্বর। বাহা তাদের ছিল বলে তাঁর ছোটবেলার নাম ছিল “স্যাভো”।

কৈশোর থেকেই কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহন চলতে থাকে চিত্তম্বরে। অনেকদিনই একবেলা খাওয়া ছুটলে আর-এক বেলা ছুটেবে কিনা তার নিশ্চয়তা থাকতো না। ফলে, দারিদ্র্যকে সঙ্গে নিয়েই বড় হয়েছিলেন তিনি। তাই বোধহয় পরবর্তীকালে দুখী মানুষের দুঃখমোছনের জন্য সর্বদা তাঁর প্রাণ কাঁদতো। সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখতেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখে এখানেও পরিবর্তনের প্রত্যয় দৃঢ়তর হয়েছিল। এইই তাড়নায় সৌরী নিয়োদী,

উপন সে প্রবুধ কমিউনিস্টের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি, এবং ১৯৫১ সালে অবিতত “কমিউনিস্ট পার্টি”র সদস্য হয়েছিলেন।

কোচবিহারের থানা অফিসালদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যে অফিসালেন পুলিশের ওলিতে চমচমন মনো হান। “পত্রিকা” পরিচর্যা তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৫২ সালে। ১৯৫৩ সালে শ্রুতিপুত্র চলে আসেন হোমেন্দ্রনাথের কাছে। সেখানে ‘গলপটা সংঘ’র সঙ্গে যুক্ত হন। সলিল চৌধুরি, হোমেন্দ্রনাথ, শবু মিত্র, শুকতি সান্নিহর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ১৯৫৬ সালে চা কলপনে চলে আসেন, মালকাজিবা চালাস মেট্রোলি অঙ্গলে সাংস্কৃতিক অফিসালনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। ওই বছরই, ১৯৫৬-র ৭ অক্টোবর পণ্ডিত দ্বালা সাংস্কৃত্যালনের সাথে আলোপ হয় চিত্তম্বর ঘোষের; তাঁর জীবনসংশ্রমের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁরই সহায়তায় বিকস্টি ভাষা লিখতে শুরু করেন। নতুনকো জানবার দুরীর আকাঙ্ক্ষা ছিল চিত্তম্বরে।

১৯৫৬ সালেই রমা ঘোষ চলে আসেন বারাসতে, কারণ তাঁর মনল লাক্ষাগ্রভাও কিছুদিন আগে বারাসতে চলে এসেছিলেন। কোচবিহারের লিচুবাগানে বাসা ভাড়া করেছিলেন। বাংলাদেশ থেকে আগত বিচ্ছিন্নিজরাও এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়ার পর রমা মাসীমার (রমা ঘোষ) বাড়ি পার্টির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে নিয়মিত আসতেন রাজেন্দ্রের রাও, জেড এ আহমেদ, পি সি জৌদী, তুপেন ওস্ত, এস এ ভাসে, ধরনী গোস্বামী, অমিয় দাশওস্ত, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ডিম্বোদন সোহানীশ, রেণু চক্রবর্তী, ভবানী সেন, হরেন সেন, বিজ্ঞানত্ব মুখার্জি, গীতা মুখার্জি, ইলা মিত্র প্রবুধ বর নেতা।

১৯৬২ সালে “সারা ভারত আদ্বিবাসী মহাসভা” গঠন করেন চিত্তম্বর ঘোষ। ১৯৯৫ সালে বারাসতে Legal Aid প্রতিষ্ঠা করেন, সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন City Civil Court-এর বিচারপতি সনৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, আভ্যভ্যক্টে বেকবুদার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি দিলীপকুমার বসু, মানববিচার কমিশনাল চেয়ারম্যান মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়, বারিষ্টার শ্রীতানাহ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেকে। বর সাধারণ মানুষ সুবিচার পেয়েছেন এই সংস্থা থেকে।

১৯৯৮ সালে মালবার পঞ্চানন্দপুরে ছুটি ঘন গঙ্গাভাঙনে সর্বভাঙে মানুষের পাশে ঠাঁড়বার অসীকার নিয়ে; গড়ে তোলেন এক পত্রিশালী গণ-আন্দোলন। ৫০০০ জন সাইকেল মিছিল করে পহন যেরাও করেন। মানিতত্বকে থেকে ফরাভা পর্যন্ত ৫০ কিলোমিটার পন্থাভা করে সরকারের দুষ্টি আকর্ষণ করেন। নৌকাপথে হাজার হাজার মনুষ্যকে নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে ফরাভা বায়েজের জেনারেল মানেজারকে স্মারকলিপি সেন। ধীরে ধীরে এই আন্দোলনের সান্নিহ হয়েছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী, সমাজবিদ, গণকর্ষী ও নেতৃত্বানীহ পরিবেশকর্মীগণ। শ্রী ঘোষ পরিচালিত আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ছিল এরকম :

নীহারিকা একটি নাম

আমাদের নিজে যেমন খাওয়া অস্বস্তিকার, তিক্ত ড্রেসমিন অস্বস্তিকার সমাজের অস্বস্তিকার অস্বস্তিকারিত ভাবগঠিত পল্লবপত্রি আছে তদ্রূপ অস্বস্তিকার একটি ভগ্নত্ব। এই ভগ্নত্বের ফলে বসিফিক হওয়া শুধু অস্বস্তিকারের থেকে আর সেই অস্বস্তিকারের দাবীতঃ কলহিতঃ কলিফিতঃ থেকে বড় হয়। অতীতঃ অস্বস্তিকার পুথিবীটিকে তার দূর থেকে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এই ভগ্নত্বের বসিফিক বড় অস্বস্তিকার, দুঃখ। এখানকার ছোটদের কেউ ভাষা কথা বলে না। ভাষা গান গোনাও না। রক্তকণার গন্ধ ওনিয়, মাথায় ঘ্রাত পুণিয়ে এই হেলসেমেরের কেউ ঘুম পাড়ায় না। ভাতের পর একটি বড় হাবা সঙ্গে সঙ্গেই এরা কুড়তে পারে যে আমাদের পরশ পাবার অধিকার ওদের নেই। আমরা যখন, অবজ্ঞা ও করুণা কুড়িয়েই ওদের বড় হতে হইবে।

সেই অস্বস্তিকারের দূর থেকে এখানকার ছেলে মেয়েদের আস্তাকুর ভগ্নত্ব নিয়ে আসার দুঃসাহস দেখানেন, একজন প্রাথমিকিত্রাণী মানুষ। চন্দ্রসুন্দর গড়িঙ্গি-এর থেকে হঠাৎ নিজেস্ব কর্মক্ষেত্রে হিসাবের বেয়ে নিজেস্ব হেলসেভাটা ও আস্পাশনের লাল-বাতি (Red light) অঙ্কলগুলি। এইসব অঙ্কল থেকে ৩০টি হেলসেমেরে নিয়ে আত্ম থেকে ও বছর অগ্ন্যবসারগঠের অনুশীল্য গ্রামে ঘুরিয়ে কিছু মানুষের সাহায্যে ও সহযোগিতায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন নীহারিকা আশ্রম। নীহারিকা গড়ে এই মানুষটি শুধু যে ৩০টি হেলসেমেরের কাটা-বাওয়ার কল্যাণকর করলেন তাই নয়, সূচনা করলেন এক সামাজিক আন্দোলনেরও।

এই আন্দোলনের আবাসিকদের সুস্থ-সুন্দর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং এই সামাজিক আন্দোলনের আরও ব্যাপক করার ব্রত নিয়েই শুরু হয়েছিল নীহারিকার পথ চলা।

সেন্সি-বিশেষী কোনও বড় প্রকল্প আর্থিক সাহায্য ছাড়াই এই ৩০ জনের থাকা বাওয়ার ও পড়াশোনার ব্যয়িত নীহারিকা নিজে পেয়েছে শুধু চারপাশের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু মল্ল-খাতব ও গড়ানুধারীদের সাহায্য ও সহযোগিতার ফলে।

নীহারিকায় আর্থিক অতাল আছে, মস্তুর অতাল আছে, অতাল আরও অনেক প্রত্যক্ষভীমি ছিল। কিন্তু অতাল সেই অতাল। এখানকার ছেলেরা মেয়েরা সন্তোষে ৬ মিনি নিরাবির বেয়ে, একমিনি অবিবর কর। অনেক সময়ে সেটাও হয়ে ওঠে না। বুলগার (Bulgur) বা জামতাজা গমের খিচুড়ি দু-বেলা বেয়ে ওদের পেট ভরতে হয়। তা সত্ত্বেও ওরা ঘাইনাল পরীক্ষার স্টার পাও। ফার্সি ভিত্তিসান পায়। কেলান্দার জেলার চ্যান্ডিশরান হয়, গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় হয়। ছবি অঁকার পুরস্কার পায়। ওদের সবার গির 'আবেল' ওদের বড়

ওওয়ার হুম দেখান। সেই হুমকে বাস্তবায়িত করার জন্য চলে ওদের আশ্রম প্রস্তুত। ওরা ওদের জন্য বাকল দু-হাতা দুই এক মাস না বেয়ে, টোকা বীচিয়ে সুনাচী-র দুর্গভাসনে জন্য টাকা পাঠায়। নিজের দুসল টিফিনের টৈমিক বাকল ২ টাকা টিফিন না বেয়ে বিজ্ঞানচলক থাকাই হাতে তুলে নিতে চায় তার ছোট ছেলের ছাতি অপারেশনের জন্য।

মে-বৈশাখের জেলার মতই এই মাঝে কখনও কখনও হয়ে যায় কিছু দুসল। আর তার জন্য কিছু শরিফ বকুনি, মান-অভিমানের পালন ও চলে দু-চার দিন। তারপর আবার যে কে সেই। সকাল বেলা উঠে মাঠে ঘোড়ানো, তারপর পড়তে বসা, ফুলে ঘাওয়া, ফুল থেকে ফিরে খেলা, টিফিন খাওয়া, আবার পড়া, রাতের খাওয়া, ঘুম। কেটে যায় দিন থেকে রাত। এত কিছুই মধ্যেও একা পালন করে নবীত্র-নজরুল কহরী, রাস্তা বরান উৎসব, তাইফেটা, পালন করে নীহারিকার চন্দ্রমণি।

গত ২০শে জুন নীহারিকার ছেলেরা মেয়েরা পালন করল আশ্রমের ৫ম চন্দ্রমণি। শাহিবিসেভিনি প্রকার পক্ষি করে ফুল ও ওদের গায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে মাঠ পরিত্রমা করে গাছ পোতা হল। তারপর শুরু হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঘরোয়া ভাবে দিন আড়াইয়ে পরিবেশিত হল আন্তঃবিভাগের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ। একেবারে উগ্রতমানের প্রথম সান্ধির অনুষ্ঠান না হলেও, সকল আবাসিকদের আত্মিক প্রস্তুতায় যে অনুষ্ঠান পরিবেশিত হল, তা আমাদের গরিব রাখে। শুধু তাই নয় এদের এইসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রকৃতভাবে ঘোষিত হল—

‘আমরা কলব জয় নিচ্চয়।’

এই অস্বস্তিকারকে জয় করার ইচ্ছা ও মনোবল তৈরি করে দেন ওদের আবেল। তিনি “Simple living, high thinking”—এই আবেল শুধু কিশোরী করেন না, নিজের জীবনে তা মেনেও চালেন। এবং আমাদের ছেলেরা মেয়েদেরকেও তিনি এই মন্ত্রে শিক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁর এই অগ্রান্ত পরিচয়ের নিছনে কাজ করে একটাই প্রত্যাশা— এই যৌনপ্রসারী হেলসেমেরের পড়াশোনা শিলিরে মূল সোতো বিধিরে সেরার কাজে সাহায্যের হাত বাড়ানো মেদের মানুষ। আমাদের গোষ্ঠী তথা Community-র মানুষ কবে কোন্ বিশেষী সংস্থা সাহায্য করবে সেই আশা বসে না থেকে মেদের মানুষ, দেশীয় সংগঠন যদি সাহায্যের হাত বাড়ায় তাহলে এই অস্বস্তিকার ভগ্ন থেকে উঠে আসা হেলসেমেরেরা আলোর দিশা নিচ্চয়ই বুঝে পাবে।

উৎস মানুষ প্রতিবেদক

কৃতজ্ঞতা : কুনাল লামা, পূর্ববী ঘোষ

ওরা বনাম আমরা

বিজয় ভট্টাচার্য

গত ২০ বছর ধরে সুন্দরবন অঞ্চলে সাপ আর সাপের কামড় নিয়ে কাজ করে চলেছে 'কানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা'। হাট মার্চে গ্রামে গাঞ্জে, বীপ থেকে বীপান্তরে, গরিব-ওরে। বঞ্চিত অসহায় মানুষদের মধ্যে। প্রচারণার আলোয় মিডিয়ায় উঠে আসেনি এবং আসেনি বলেই কোথায় কাজের কাজ হয়েছে: ১৯টা ব্লক ভ্রূড়ে নীরব তাদের চালিয়ে যাওয়া দুঃপূর্ণ স্তরের কাজের মধ্যে কোনো ঠিকি থাকেনি। বইপত্রের শিক্ষার থেকে অনেক বেশি শিক্ষার উপকরণ পেয়েছে 'যুক্তিবাদী সংস্থা'র কর্মীরা তাদের দীর্ঘ কাজের ধারার মধ্যে দিয়ে। ওরুতে সাপের চেনা-পরিচয়, সাবধানতা সচেতনতা; এরপর বিব, মংশনের ওবুধ আর ওবুধের অপ্রতুলতা, চিকিৎসার পোচনীয়ে অবস্থা এবং প্রত্যন্ত গ্রাম-গ্রামান্তরে ওকা ওনিদের প্রতিপত্তির চিত্র—ধাপে ধাপে কাজের পরিধি ছড়িয়েছে।



সবাই জানতো, বিশেষত শিক্ষিত শহরবাসী মানুষ ও বিজ্ঞানভীরাও যে, সাপের কামড় মানেই মৃত্যু আর সাপের ওকা মানেই ডাও বুড়কক। ওমিকে ওকায়াও আঘাতমানে দূরব বজায় রাখতো শিক্ষিত শব্দে বাবুদের থেকে। সংস্থার সদস্যরা কাজে নেমে বৈজ্ঞানিক চোখে খোলা মনে দেখতে নিষেছে, সত্যটা বুঝতে নিষেছে। নানান দ্ব্যর্থক ঘটন-অর্থন নতুন বোমের বিকাশ ঘটিয়েছে। তাকে বলে, পরিমাণগত বিস্তার থেকে গুণগত বিকাশ ঘটে। তারই সুবাদে নতুন বোমে প্রাপ্ত হয়েছে কানিং যুক্তিবাদী তাদের দুই দশকের কর্মধারা থেকে। আজ সুন্দরবনে সর্প-এবনের মোকাবিলায় অন্যরকম ছবি ফুটে উঠেছে কেবল যুক্তিবাদী সংস্থার লাগাভার লক্ষ্যনিবদ্ধ কর্মসূচির ফলস্রুতিতে। অন্তর্ভুক্ত গ্রামবাসীদের আপনজন ওকায়া এখন নিজেরাই সামিল হচ্ছেন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্য নিতে। অন্তত সুন্দরবন অঞ্চলের বিত্তীয় এলাকায় এখন 'ওরা' আর 'আমরা'র দূরব কমছে। অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ধারাগুলিকে একসূত্রে সাজিয়ে নিলে যে

উত্তরলের ছবি ফুটে ওঠে 'তা' দেখার মতো, দেখার মতো। আপাতত পাঁচটি ধারার গম পলি....

ধারা ১

স্টেশনের গায়ে কানিং যুক্তিবাদী সংস্থার ঘর। ২০০৫ সালের কোনো এক দিন। ফোন বেজে উঠল: 'হ্যাংস! এটা কি যুক্তিবাদীর অফিস?'

—হ্যাঁ, কেন? 'একুনি এম্বুলেন্স পাঠাও। সাপের কোথী এয়েছে, এখন তখন অবস্থা, নে যেতে হবে।'

—কানিং হাসপাতালে বললেই তারা এখন এম্বুলেন্স পাঠাতে পারবে না। তাহলি কী করব? অনেকটা কাল পেইরে তার পক্ষ বস্তা, তারপর ভাবনে করে কানিং হাসপাতাল নে যেতে আড়াই তিন ঘণ্টা সেগে যাবে। এতকাল ধরে বুকে চাপ লিছি আর মুখে দুখ সে যুক্তি সে পেইতে রেখেছি। অরু সোক হইতে গেছে: এক যুক্তিমা বলতেছিল ওকে একটু শান্তিতে মরতে নে, অমন করে বুকে কিলোসিস কেন? 'তবু আমরা ধর্মিনি। কিন্তু জানে নে যেতে যেতে তো মরে যাবে ...'

—আমাদের হাত-পা বাঁধা গো, রোগী মরে গেলেও হাসপাতালে নিয়ে এসো।

ফোনের ও প্রান্তে বক্তার নাম কবিল ভদ্রসর, বয়স ২৬; বাবা বাবুরালি ভদ্রসর, ৬০। কানিং ২ ব্লকের হোমরা গ্রামের জনশ্রিয় ওকা। হাসপাতাল থেকে দূরব ১২ মাইল।

ধারা ২

'প্রাতঃ ভরা গ্রাম, আমতাতলা নাম' এই শিরোনামের প্রচারপত্র নিয়ে কানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মীরা মাত্রসা ১ ঘণ্টা পাড়ি নিয়ে, এক ইটু কাল ভেঙে, দুটি মাধ্য নিয়ে, বিলম্ব হয়ে বাসন্তী গ্রামে হাতির। মোটামুটি সেখাণ্ডা জানা এলো। ২০০০ থেকে ২০০৪-এর মধ্যে ওই গ্রামে সাপের কামড়ে ৩ জন মারা গেছে। শেষ বছরে মরেছে মধিরা প্রধান (১১), পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ত। মধিরাকে কলাচ সাপে কামড়েছিল, কেউ বুঝতেই পারেনি। সন্তানে কল—বেণা ভুতে ধরেছে। ওকা-ওনিন করা হয়। শেষে কানিং হাসপাতালে। বাঁচানো যায়নি।

সংস্থার সদস্যরা ওকাদের নাম জানতে চাইল, সব এ ওর দূর চাওয়া-চাওকি করতে লাগলো, তার মধ্যে দুতের বাড়ির সোকজনও ছিল। কেউই সাহস করে নাম বলতে চায় না, যা ইওয়ার হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু আত্মবিশ্বাস না মোটেও।

গোদাধা খানার কৃষিবিদ্যারী গ্রাম। মুম্বইবনের চমল লাগেয়া।
কানিন থেকে তিনটে মণী পার হয়ে সংসার মলমল সেখানে গিয়ে
পৌছয় বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফল বিক্রয়ক সমীক বকতে। তিনদিন থাকতে
হয়েছিল সেই বিদ্যাবিহীন গ্রামে। দ্বিতীয় দিন সম্ভ্রায়, একটা বাতায়
নোড়ে চলে। পান্ডিত বকত মলমল বসে। একজন চিকিৎসা করলেন—
‘বদুদা, তবু তো নতুন লাগেয়া, তা কোথা থেকে আসা হচ্ছে?’
পরিচয় দিয়ে আসার উল্লেখের কথা বলা হল।

—আমাদের পাটির এই চরী নেতায়ক ওবের ওকা কোলে
ওইয়ে বেতের ফেললে। ওর বউও পাশে থেকে মাথার হাত ঘুলিয়ে ওবুধ
বাইয়েছে। উঠতে গেলে চোপ ওইয়ে কেয়েছে। এ সব চক্রান্ত, যাতে
অন্যদের পাটির ওকার কায়ে না যায়।’ অন্য একজন ফৌস করে
উঠলেন—‘কেউ কি টিচ্ছে হবে মারে, বসুন তো বদুদা’ ওকা আমাদের
পাটির বলে হত ‘সো...’

ধারা ৪

—শিবির উঠন দশা, ওনসক কী যেন কামড়ছে।
যুক্তিবাদী সদস্য দুই চোখে এক মহিলাকে দেখে ধড়মড় করে
উঠে বসে : আপনাকে হো তিত চিনতে পারলান না।
বরফর করে কেঁদে ফেলেন ভদ্রমহিলা—চিনতে পারছেন না।
আমি আপনাদের মওলকর ছি।

—হাসপাতালে পরিয়েছেন?

—না, সোকা আপনার কায়ে এসেছি। একুশি চলুন।

সদস্যটিকে নিয়ে দ্রুতগতিতে হাসপাতালের পাশের রাস্তা দিয়েই
নিজের বাড়িতে এসেছেন ভদ্রমহিলা। ভদ্রলোক আয়তন বিতাদের
অকিসার। সংসার পরিচিতি। বোকা গেল আকুল কামড়ছে নেওটি ধীর।
কিছুতেই হাসপাতালে যেতে রাজী নন। ...ওইনিই অফিস ফেরতা এসে
হাজির সংসার অফিসে। হাসপাস, ভাকলান ঘাই, আপনাদের সঙ্গে একটু
গাফো করে মনটা চাষা করে নি।

ধারা ৫

সেপ্টেম্বর ২০০৫। কানিন শিও নালদা তুলে যুক্তিবাদী সংস্থা
আয়োজিত ‘সাপ ও সর্পাঘাত চিকিৎসা’ বিষয়ক দুদিন ব্যাপী ২য়
কর্মশালা—ওকা ওলিনদের নিয়ে। এই কর্মশালায় মহকুমা শাসক কথা
নিচেও আসতে পারেননি, তাঁকে কথা কেওড়া হয়েছিল। বাধা নেওয়া
হয় অন্য একটি সংগঠন ও একটি স্বায়মতিক দলের পক্ষ থেকে।
প্রশিক্ষণের এই উদ্যোগের বিলম্বে প্রচার করাই ওষু নয়, আইনগত
বাক্য নেওয়ারও ধর্মিক ছিল। কর্মশালা চলাকালীন চারজনদের একটি
বল এসে শাসনীর সুরে বলে গেছে—ওয়ার্শপ চালালে ফল ভালো
হবে না; এর জন্য দায়ী হতে হবে যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্কারকেই ...
ইজ্ঞাতি। এমনকি কর্মশালা চলাকালীন দুচারজন ওকা ‘আমাদের ডেকে
এসে অপরদন করা হচ্ছে’ অনুযোগে দ্বিগুণ হয়ে ওঠেন। শোঁলা তুলে

নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার উল্লেখ করেন, ‘আমের কণ্ঠে তাদের নিবন্ধ করা
সম্ভব হয়।’

পরদিন দুপুর ২টায় শাসপত্র হাতে নেওয়ার পর
অংশগ্রহণকারী ৩৪ জন ওকা প্রাচীরে হাতে মিছিল করে আসেন
বাসিন্দাঘাট পর্যন্ত; মুখে শ্লোগান—

প্রত্যেক ব্রহ্মহত্যাকার জীবনশর্তী AVS মহত্ব রাখতে হলে
প্রত্যেক ব্রাহ্মহত্যাকার সাপে-কটা চিকিৎসার পারদর্শী জ্ঞানবাবু
বাধতে হবে

ওকা ‘ওলিন’ সেকার সম্মান দিতে হবে
দিল্লীতে চলেতে ছিন্ন করে আমরা যুক্তিবাদীর হাত শক্ত করবই
এই অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন, আপনাদের গান-ধাবণার সঙ্গে
যেলে না। প্রত্য তবু উঠায়েই, ভটকও আসছে।

—আজ্ঞা আপনারা ওকা-ওলিনদের এই যে শাসপত্র ছিলেন,
এরপর তো ওকা চুটিয়ে ব্যবসা করল, হাতুড়ের হাতে মুড়া ঘাসে
বেড়ে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন
করি—তথ্যগুলো সংস্কার সরাসরে ব্যবসিছিলেন মহকুমা শাসক।

আমাদের উত্তর ছিল—সুশরকন বকলের ১৯টা ব্রহ্ম বহুর
ঘড়ে ১৮০ থেকে ২০০ জন সর্প ধ্বংসের মারা যায়, সংসার নিজেদের
নেওয়া হিসেব। এই মুড়ার দাম কে বা কানো নিচ্ছেন? এস ভি ও
সায়েব শুন পুষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বেশ বিচক্ষণ। ... এই বুনা থেকেই
ওক করা যাক।

* * *

যা বইপড়ে পড়েছি যা ওনেছি তা একটু পাশে সরিয়ে রাখা
যাক। আপনার চারপাশের আলোকিত কুন্তের বাইরে বেরিয়ে আপনি ও
বন্ধ সোলাচল ২ নং ঘরার অন্ধকার গ্রামটিতে গিয়ে হাডির হয়েছেন
এক পরিচিতির বাড়িতে, সেবা শোনা বোকার ইচ্ছায়। আপনারা
অভিধি, সমসারের কোনো ঘাটিতি নেই। কিন্তু চারপাশে বড় অন্ধকার।
এতই অন্ধকার যে বন্ধ সোলাচল বলেই ফেললেন—‘দ্বাস,
আগতেভাকারের বোনায না ফেলোলেই হত। কোথায় সাপ-গোপ জন্ত-
টন্ত ওং পেতে আছে কে জানে!’ আপনি কিন্তু তখনো ভগমণ। চারদিকে
জ্বাঙ্কের ঘাঙ্কর ঘাং, কি খিঁব ডাক, মমকা হাওতা, মায়ে মাকা বৃষ্টি,
আহা! এই না হলে প্রকৃতির রূপ! ...যাত্র ১টা নাগাস কাওয়া নাওয়া
সাপ করে উঠানো মুখ ধুতে গেছেন, পেছান একটা বাক্স নিয়ে
হারিয়েছেন বলে আসছে হঠাৎ আপনার পায়ে কী যেন অকড়কলো। ‘এই,
শিগুণির আলোটা সামনে ধর তো!’ সকাই ছুটে আসে। কেউ কেউ
একটা সাপকে দেখতে গেলে বাবাভা আলোর ল্যাফতে লাকাতে
কোণের মধ্যে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাবে। বোঁজাযুক্তি সার। সফলই বিবৃত।
আপনি তো ভয়ে সোঁড়া? আপনাকে ধরে বাড়িমার কলানো হলো। উঠের
আলোর দেখানো দী, সাপের কয়েড়ের সাপই খটে। একজন তাত্ত্বতর্কি
গামছা পাকিয়ে ইঁদুরে বাঁধতে গেল; অমনি আপনার পিছার আসল
কলে উঠল— না না, বাঁধন লাগবে না, বরফ...। —বাবু, বাঁধন দিয়ে
নিব মাথার উঠানে না। বন্ধ সোলাচল আপনাকে ধমক দেন—গামা জে,

জোর জ্ঞানের কথা। কোথায় আছিল আগে ভেবে বেশ। আলোর থাকলে অনেক কথা বলা যায়। সত্যই তো, বলা তো যায় না যদি বিশ মাজার গ্রামবাসীরাই পরম মনস্তার গামছাটা বেঁধে দিল।

একিৎ খনখন কুণ্ডি নেমেছে। খুব ঘাটী থাকল ওটা। কবলেয় আগনি, তিন্তু কপালে বিশ্ব বিশ্ব ঘাস। নদী ডাঙা, আবার নদী ডাঙা, চারটে ধাপ পেরিয়ে তখন কানিং হাসপাতাল। আশনার মোবাইলও এই পুর গ্রামে কাজ করে না। গৃহকর্তা এই কুণ্ডি কলার মধ্যেই বেরিয়ে গেছেন গ্রামবাসীদের ডেকে আনতে। কেউ আগুনকে পাখর বড়াস কবলে, কেউ বা উপশেষ নিয়ে। সোলাচল উৎকর্ষায় পাড়ারি করছে। নদীরাটা যেন ডার ডার লাগছে। একবার উঠে বসলেই আবার ওঠে পড়ছেন। মাঝে মাঝে কনকড়ালের জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখছেন। এবার অঙ্কুরের ডেম কসে কতখর আর টর্চের আলো—৭-৮ জন মানুষ এসে উপস্থিত। মাঝখানে একজন সোলা এসে বসে আগুনের পাটা কোলে তুলে নিয়ে কেউ কোঁচা স্প্রেতে লাগলেন। শুধুনি আগুনের মানসমণ্টা বসে উঠছে এক একটা ঘটনা যেখানে ওকার হাতে মারা যাবে একের পর এক। ভয়ে ওঠিয়ে পা টেনে নিয়মের নিজেসই অতলত। বাঁচার আর কোথায় আশা নেই। সংসারটা ভেঙেই গেল। ছেলেরায়ে দুটোর পড়াওনিয়র কী হবে। শিরগাড়া দিয়ে গাও। স্রোত হইছে, মাথা ভিম্বিম, সব অঙ্কুরের চোপে চোপে বসছে, আগনি যেন জ্বাল হালিয়ে ফেলছেন। —কী হল, বাবু! কেমন লাগছে? কথা বলুন ... বিদ্যনার বগা গ্রামবাসী ধরে কাঁকানি দিয়ে আগুনের সখি ফেরে। সোলাচল সোলাচল আর অনেকগুলো মুখ আগুনের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। অরুনি বসে উঠলেন— না হ্যাঁ, তিরে অহি। কানিং, কানিং শব্দে ... মাথার আগুন বলা ওটা নিশিকাত্ত বেরা বসে উঠলেন—কোনো ভয় নেই বাবু, আমি তো অহি। কানড় মেখে আর ওদের কথা চান তো মনে হচ্ছে কলার্টোডা কামড়ছে। অত খাবড়াবন না, আমি অহি তো। এরপর ইকতাক করে মানব আর কল আনিবে উনি কাটা চারগাটা ধুয়ে মুখে দিলেন।

সবাই বলে অসোচ্চনা চলছে। একটা কলা রাগা পেরিয়ে ভালেন করে নদীর ঘাট, সেখানে আবার কলা বাড়িয়ে ভাবে নৌকো। এই অঙ্কুরের নৌকো চালানোটাও তো বেশ কঠিন। সোলাচল বলে ওঠেন—এত রাতে ভাল নৌকো পাওয়া যাবে তো? পেশন থেকে একজন অতয় যেন—চিন্তা নেই, লোক এখানেই আছে। আগনি যিনিবন করে বললেন—টাকা পয়সা নিয়ে ভাবতে হবে না। এমিকে নিশিকাত্ত ওমা সারা যাবে হাত বুলিয়ে যাবে, কীখনটাও আসগা করে মিছে মাঝে মাঝে, একটা ডালোও লাগছে আগনার। সোলাচল রীতিমত সোলা-চল; এভাবে এত কড়ি নিয়ে কানিং ফওয়া সম্ভব? দু আড়াই কটা তো হয়ে গেল, বিশ্বধরে কানিল এর মধ্যে কিছু কি হয়ে যেত না।

শেষ অবধি গ্রামবাসীরা সকলে মিলে ঠিক করে ফেলেন—দুটো বৈশ্বের মাঝে কাণ্ড তুলিয়ে বেঁধে ডাড়া বসিয়ে চারজন কীয়ে করে নৌকা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এত কষ্ট করবে ওমা। মনটা আগনার আলম আর কুতজ্ঞতার ভয়ে উঠল, কিন্তু আগার ভয়ও ধরল—রাডায় কাপড় যদি ছিড়ে যায়? নৌকা যদি ডুবে যায় এই কড়-জলে? ...দুশিত্তা নিয়েই সোলাচল গ্রামবাসীদের কুতজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুর পাশে ওঠে পড়লেন, কেবল জেগে রইলেন নিশিকাত্ত বেরা।

ঘুমের মধ্যে সাপের দুঃখর বেশে গাভ কানিল আগনার। পলিৎ কিচির মিচির কানিলো ভোর হুহুহুহু। জাপ নেমেই বেশলেন অগেণে রাডার সেই ভয়ালোক (নিশিকাত্ত) ঠায় পাশে বসে পাখর বড়াস করলেন। সোলাচলও উঠে পড়ছে। বিশ্বর ভেট্টে গেছে। ক্রুত সবাই তৈরি হয়ে দিল। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বহন নেওয়ার মুখে রাত-জাগা মানুষটির হাতে একশ টাকার একটা নোট চুকতে দিতে গেলেন। সাপের তিন্ততার হাত সত্যিই নিজে তিনি বললেন—বিঃ বাবু, এই টাকা নেওয়া মহাপাপ। এতখানেক সজ্জা সেবেন না। ভকুত ওমারা দেবা দেবা, টাকা পয়সা নেহ না। আগনারা হামিশুর্শি মার কোলকতা ফিরে যাচ্ছেন এর চাইতে বড় পাওনা আর কিছু থাকতে পারে বাবু? আগনারা হতবাক বৃজানই। বুকে ভড়িয়ে ধরলেন নিশিকাত্ত।

এরপর কোয়ার পাতা। নৌকায় বসে গভজালয়ে ঘটনাওলা এসে ভিড় করছে।

—আজা সোলাচল, নরুর গিড়ে মুখ দেখাও কি করল। পেল ওকার সাহায্যে বঁচা...!

—চুপ কর। ভবে তো আশনার হয়ে দিল। এই সোকাটা আগার পরই তো সেকলান গলা দিয়ে সর কোলা, খেঁকিয়ে ওঠে সোলাচল। —যে সোকাটা সারারাত মাথার কাছ জোপে রইল, টাকা নেওয়া পাশ কলম, তাঁর সম্পর্কে বলাতে তোর সম্মতা করবে? এই তারসে শিকার অকলন?

—না, তা নয়। আসলে যদি বিশ্বধর কনকড়াতো, তাহলে তো ...

মাত্রি একতম ওলেন কথা ওঠলিল। সে বলে উঠল—বাবু, এই নিশিকাত্ত ওকা অনেক জ্বাল। কানিং—এর মুচিকামী সংহার থেকে ট্রুনিং নিজেছে। সোলাচল বলল—আরি ওনার সঙ্গে কথা বলেছি, বলশ আয়বিশ্বাস আর বিশ্বস্তপ। ওনার থেকেই অহি আশস্ত হয়েছি যে ওটা বিকটীম সাপের কান্ড। তুই কি ভাবহিল বিশ্বধর হলে ওটা ওখানে ফেলে রাখতো?...

একম অসংখ্য ঘনিহার কথা সোলাচলো যায়—আমাদের সংহারে ২০ বছরের 'সাপ ও কামড়' নিয়ে কাজকরির অভিজ্ঞতার সুবলে। আমরা বেশিই সাপের কান্ড এমন একটা দুটিনা দেখলন, চিত্তবিস্ময়ে লৌলুনার আগে একজন মধ্যাহ্নকালীর প্রয়োজন হয়, যিনি পাশ থেকে ভরসা যেকন—কোনো ভয় নেই, আমি তো অহি! অন্য কোনো অসুপের ক্ষেত্রে এমনটা না হলেও চলে। আসলে সর্পশাসনে আচমনা মনের ওপর দুভাত্ত আসে দোটা দুভাত্তে ধরায়িত করে। সচতন বিজ্ঞানকর্মী আর গ্রামিণ ওকা এই ভূমিকাটা সবচেয়ে ভালো পালন করতে পারেন। ধারা ও-এর বিকে ত্রাকিয়ে সেদন একজন উভশিত্ত কাক্তিও আগে মনে পড়ছে বিজ্ঞানকর্মীর তথা মধ্যাহ্নতার জন্য, যদিও বাড়ির সামনেই ছিল হাসপাতাল।

ধারা ও-এর বিকে ডাকল। ওকা রোগীকে নিজের কোলে বেঁধেই কোথাক ভাইয়েছিল বলা সে সেখানে এভাবে রোগী কাঁচ। সে-ও রোগী কাঁচতেই চেয়েছিল। বিশ্বধর কানিল, মারুকবিল শরীরে

ভুলসে, কোনো খেতড়েই যে কাজ হবে না সেখান থেকে কেউ মাথা তুলে ফেলেয়নি। তবু মানুষ ওকাজ আছে যায় কারণ, হাতের কাছে ডাক্তার মেলেনা; ডাক্তার যুক্তিও আছে—ডাক্তারের হাতেও তো কত রোগী মারা যায়। ধারা ২-তে যেখনি, ওকাজের লোকে এতটাই অস্বাভাবিক করে যে তার হাতে রোগীর মৃত্যু ঘটিলেও সেটাকে তারা অপরাধ বলে মনে করে না, তাই নান বসে কোনো কঠিন সহ্যে চায় না।

বিশেষ করে—আমরা সে না হয় হল। কিন্তু হাসপাতালে ওষুধ না থাকলে কী হবে?

মোলচল চটপট জবাব দেয়—কেন, এই যুক্তিবাদী বিজ্ঞান সম্ভার অস্বাভাবিক হয়েই তো এখন আরেক রকম হাসপাতালেই হাসপাতার কারডের ওষুধ AVS পাওয়া যাচ্ছে, আমি একটা বছরের কাগজে পড়েছি।

—ঠিকই। তবু ক মানুষের যুক্তি ডাক্তারবাবুর সাপে কটার চিকিৎসা ভালো জানেন না। তাহাড়া আমাদের সংস্থা বীপে বীপে 'সাপ ও সর্পাভাৎ বিষয়ক কর্মশালা' চালাতে গিয়ে দেখেয়ে আসেন ওটা যেখানে এই ওয়ার্কশপগুলোতে অংশগ্রহণ করছেন। গ্রাম দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ এখন ওকাজ ওপর নির্ভরশীল, তাই ওকাজের মাধ্যমেই বিষয়কে কামড়ানো রোগীদের হাসপাতালদুখী করা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখা এখন ভর্তুকি হয়ে পড়ছে। ধারা ৫-টা আরেকবার দেখলে বুঝতে পারবেন কাউটা কত কঠিন। সেই কর্মশালায় ০৪ জনকে শংসাপত্র (certificate) দেওয়ায় চারদিনকে খেল খেল হব উঠেছিল। অজ্ঞাত আমাদের এই কর্মশালায় ফলাফলটা দেখা যাচ্ছে ধারা ১-এ। পু-পু-কবের ওকাসিমে পারদর্শী বাবুরাশি আর হেল কবিল জমাদার; কর্মশালায় ট্রেনিং নিয়েছেন। তাদের কাছে অন্য ওকাজ হাত ঘুরে রোগীট আসে; এখন তখন অবস্থা। ট্রেনিং-এ দেখা পছন্দি প্রস্ত্রোগ করেই হাসপাতালে নিয়ে এসে রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে কিরিয়ে আসেন ঠায়া। ... আমাদের ধারণাই ছিলনা যে, প্রকৃত ওকাজ কখনো পরমা-কঠিন নেন না। আর ডাক্তারেন না ওকাজের প্রাথমিক চিকিৎসার কথা শিরে তুলে লাগানো ঘটনা একটা-দুটা মাত্র। ২০০৪ সালে ক্যানিং ১, ক্যানিং ২, গোসলা, কালসী থেকে আমরা এরকম ৮ জন ওকাজ পেয়েছি যারা ১১টি বিষয়কে কটা রোগীকে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন এবং চিকিৎসকদের AVS চিকিৎসার ঘারা তাদের সুস্থ করে বাড়ি ফেরাতে পেরেছেন।

মোলচল বলে ওঠে—ওই ওকাজের নামওলা কলকেন, শহরে গিয়ে দেখাবো।

- লিখন : ১। পশিম আলি নম্বর, আকতলা, ক্যানিং ১
২। নবির আকম, মোহতলা, ক্যানিং ১

- ৩। আব্দুরব্বালা সর্বর, নলিমাশালি, ক্যানিং ১
৪। বাবুরাশি জমাদার, পশিম হোমরা, ক্যানিং ২
৫। কবিল জমাদার, পশিম হোমরা, ক্যানিং ২
৬। কানাই শাঁখুই, বেলোখালি, ক্যানিং ১
৭। নিমজ্জন হালদার, নলিমাশালি, ক্যানিং ১
৮। নিশিকান্ত বেবো, কামারশাড়া, গোসলা

২০০৬ সালের ৮ ও ৯ জুলাই ক্যানিং শিও নালন্দা বিশ্বদ্যালয়ে ওকাজের নিয়ে চতুর্থ কর্মশালা হয়ে গেল। এতে ২১ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন বীপ থেকে, তার মধ্যে ১২ জন ছিলেন যারা একাধিকবার কর্মশালায় ট্রেনিং নিয়েছেন। প্রশিক্ষক ছিলেন ডাঃ ভদ্রত মল, ডাঃ জয়ন্ত ভোব, পাঙ্কু রায়, অশোক কখাণাধার।

মোলচল দুখ গলার বলে ওঠে—শেখের তুতকনে আমি চিনি। ওনারা কী করে এই কর্মশালায় ...? ওনারা তো আগে ওকাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন।

সংস্থা—ওমন, আমাদেরও আগে স্রোগান ছিল 'ওকাজ থেকে সাবধান'। এখন অভিজ্ঞতা আর বিশ্লেষণে সজিটিকে চিনেছি আমরা। আরো ওমন, ২০০৬-এর ওই কর্মশালায় দ্বিতীয় দিনে সহস্রতে ওকাজের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্যানিং মরুকমা হাসপাতাল পরিবর্তনে। হাসপাতালের সুপারসহ অন্যান্য ডাক্তারবাবুর উপস্থিতি ছিলেন; ছিলেন গবেষক, ছিলেন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা।

—ঝাঃ, মার্লপ তোঃ কুন্ডতে পারছি, আমরা চাই বা না চাই ওকাজ আছে মানুষ যাচ্ছে, যাবেও। কাজেই তাদের হাত ধরে যদি হাসপাতালের মাধ্যমে স্রোগে জীবন ফিরে পায়, তাহলে আর কী চাই! ...আমরা, আপনারা তো দক্ষিণ ২৪ পরগনার 'মানচিত্র' একটা করেছেন। পেপারে খেবেছি সরকারের 'সর্বশিক্ষা অভিযান' এই মানচিত্রটা দক্ষিণ ২৪ পরগনার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছে। আর কিছু কি করেছে?

সংস্থা—করেছি। ২৩ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র 'সুখস্ববনের সাপ' আমরা তৈরি করেছি। এই সিডি কবেই জনপ্রিয় হয়েছে। এছাড়া দুখ সস্তাতি প্রকাশিত হয়েছে 'মানচিত্রে বাংলার সাপ'। দুই বালায় প্রধান প্রধান সাপ, সাপের কামড়, কুসংস্কার, প্রতিরোধক বাথবা ইত্যাদি এই মানচিত্রে পাওয়া যাবে। এইভাবেই, বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টায়

সাপের কামড় আর মৃত্যুদুখ নর

এই যোগ্যতার লোকে ঘিরে অখণ্ড সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে চললে ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা।

আবার আজ্ঞা উৎসমানুসের : ২০০৬

উৎসমানুসের আবার আজ্ঞা : বলপূর্ণ আশঙ্কায় মনে হতোইল। কখন আজ্ঞা মানতে গেলে সাধারণ ধার চ্যুতিয়ে আজ্ঞা মানার কলসের সংলগ্ন করতে হয়। কিন্তু উৎসমানুস কোথায় পায়ে এই রক্ত : না আর তাদের একটি ক্ষুদ্রী অতিস ঘর, না আর পরিকা বিক্রিত একটি সেতান, না সোকাবল, না অর্থকল, কোনওটিই নেই যাদের, তারা আজ্ঞার কথা বলছে! তাও নাকি আবার রানায়চীরে বরেন্দ্রনগরে সারাদিন বসে আজ্ঞা পেওয়ার বাধ্যতা হয়েছে!

যাই হোক, গত পরিবার ও মেডবর ৩টিটি পায়ে পৌছে গোলাব বরেন্দ্রনগরে পুতুর বাড়িতে। গিয়ে বুঝলেন যে ষষ্ঠিই মানুই সব কিছুই উৎস।

দুশর শান্ত নির্জন পরিবেশে অতীতগন-অধি পরিবেশের পুতুর বাড়িতে চাকলা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অতীতগনের সমস্যা নিয়ে আশ্চর্যের তল্যে আছে সোব আশে চায়া ঘেরা পুতুর পাতে ঝাঁপ ডবে আজ্ঞা-সেওয়ার লঙ্গো ও বাধ্যতাই। রক্তা থেকে সামতেই একদল সঙ্গা বড় হয়ে ওঠা তরুণের আত্মিক অস্তরখানায় মানটা চারে গেল।

বেইট্টেশনের নয় মিটিয়ে মুচি-আসুরের আর মিটির পায়েই হাতে নিয়ে গাছতলায় এসে বসে গেল। ইতিমধ্যেই রানায়চী সংলগ্ন হালিসহর, কাঁচাঝাড়া, কলাশী, মনপুর, সৈহাটি, সেদপুর, হিঙ্গুলি, হবিবপুর বরেন্দ্রিয়া, গাজনখাট ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আজ্ঞালাভীরা এক একে এসে হাভির হয়েছেন। সুলালিত কঠোর একটি বাউল ঘনে দিয়ে আজ্ঞার দৃশ্য হল। তারপর হালিসহর পরিবারের পক্ষ থেকে উৎস থেকে মোহানা—মোহানা থেকে উৎস—প্রকৃত দুখাভির গানটি পরিবেশিত হল। টুকটাক কণাবর্তী চলাতে থাকলেও আজ্ঞার মোহাল কিছু জমছিল না। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে হাভির হলেন উৎসমানুস টিম, যাদের পরিচয় কণাক থেকে প্রতিকার রূপ পায়, সেই সব মানুষ-জন, ট্রেনের গওগেল ইত্যাদি আলো কাটিয়ে ১১টার সময়ে হাভির। ঠিক এই সময়েই হাভির হলেন একজন মানুষ, বাংলার সোক-সংস্কৃতির প্রায় হারিয়ে যাওয়া এক ধারাব্য বিনয় এক শিল্পী। তিনি মূলবাড়ি গ্রামের শ্রীগণেশ ঘোড়াই। তাঁর দুই হাতে ধরা আছে দুটি কাঠের পুতুল, আর গলায় রয়েছে গান। সোফল বাপ ও কুকির যারের দানপড়া কল থেকে মনভঞ্জন পর্যন্ত সবটাই অসাধারণ দক্ষতায় পরিবেশন করলেন অখাত গ্রামের অখাত এক মানুষ গুলপাবা। এদের জন্য পুতুলনাচ সংস্কৃতি এখনও টিকে আছে। জানি না বিশ্বায়ন আর জিনায়নের যুগে কতদিন টিকে থাকতে পারবে।

এরপরই ৩৩ হল পল্লিয পর্ব। মূলত আলিপুসুয়ার থেকে দুশরজন, যেমিনীপুর থেকে পুর্নালী। এই সব জাণ্য থেকে এসে উপস্থিত মানু।

আজ্ঞাবাজদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন উৎস-মানুসের অনুবাহী পাঠক। তাঁরা আজ্ঞালাভের ওরুতেই জানতে চাইলেন কেন উৎসমানুস বন্ধ রয়েছে। কেন আবার নিয়মিত বার করা হচ্ছে না। অনেকের এই জন্য কোচ-মুঃও প্রকাশ করলেন। উভর পরিকার পক্ষ থেকে জানানো হল উৎসমানুসের বর্তমান পরিস্থিতি বেরফল, জাতে নিয়মিত পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। গত ভিন-৪৮ বারকে কলকাতা শহরে উৎসমানুসের জন্য কোনও ঘর ভোগাড় করা যায়নি। এছাড়া লেখা

সংগ্রহ, চাপার কাজ, তরঙ্গ কঠোর অতান, পত্রিকা বিপদ-কলহবস্তৃ কথা, মিষ্টি ও অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি অনেক রকম বাস্তব অনুশিষ্ট : সমাধান সম্ভব নয়।

ঘড়ির ভাঁটা ১টা ঘর হুঁস। ওক হল মূল আলোচনা। আলোচনা বিপর্যয়িক হল আজ্ঞার প্রকৃত তাদের সমস্যা প্রকাশ করে মত চবিত্ত শেষতে পাচ্ছে না বলসেই কি তার কণাক এগিয়ে আসলেই... কণাকটা একলায়ে মেনে নিলেন না বলেই... অনেক রকম মতবাক উঠে এসে। একজন বললেন আলোচনা বিষয়টি সঠিক নয়, তার প্রথম আর এখনো সমস্ত অযোগ্যজন করেছে তরুণরাই। আজ্ঞার বিনে তরুণ প্রচেষ্টাকে ভালো কোনোও কাজে পাওয়া না যাওয়ার জন্য কী! অমর, বড়রা, কলসেন এক অস্বাভাব্য। আজ্ঞার বাক-মায়ের ছেল-মেয়েদের সমাজ-সত্তন না করে করেন আত্মকেন্দ্রিত : নিজের নিজের জীবনের কিন্তু-আপ করার শিকারী তারা। তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকেন। তাই তারা জীবনযাত্রার বইয়ে আর কিছু দেখতে পায় না, অপর একজন কলসেন, আজ্ঞার বিনে সামনে কোনও আশ্রয় নেই, সঠিক সিদ্ধান্তই আমরা বুঝা ওদের সামনে কোনও উদ্বাহরণ সুচি করতে পারছি না, তাই ওদের মোহ না নিয়ে নিজেদের ভ্রুটি নিয়ে আসলেই শেষ। এই রকম চাপানউতোরের মাধ্যমেই উৎসের এক বৃদ্ধ মাস্টার বসন। তিনি ৬২ বছর বয়সে মৃত্যুর এগার থেকে এসেছেন ওধুমত আজ্ঞার টানে। তিনি বললেন, অর্শর মুখে নিতে হবে; নিজের পথ নিজেকেই মুখে নিতে হয়। এরপর উৎসের এক তরুণ বন্ধু : তিনি বললেন, এখন সব কিছু ছুড়ে ভলগে ভোগবানের বনা। স্বচ্ছন্দ তার আমলের যুগ সমাজকে সেই কন্যায় চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইবান থেকে বেগত হার আমলের নিজেদের। এরপর একজন শ্রীণ উৎসমানুস পাঠক বললেন, ৬০ ও ৭০-এর সময়ে বয় ছেলেমেয়ে যে কোনও ভাল কাজে চালিয়ে পড়তা কাটা তখনকার বুঝা অনেক বড় দেখতেন ও ছোটদেরও সেই বয় দেখতেন। বয় সমস্ত করার জন্য নিজেরা অনেক ত্যাগ ঠিকার করতেন। এখনকার বড়রা বয় দেখেন না, তাই অন্যদেরও দেখাতে পারেন না।

আর এক শ্রীণ বন্ধু বললেন, শহর তোলকাতায় নানবিধ আকর্ষণ। আমোদ-প্রমাদের চালাও বাধ্যতা, তার ওপর সামনে নেই কোনও আশ্রয়। তাই শহরের ছেলেদের মধ্যে ভাল কাজে আসার প্রকণতা কম হলেও শহর থেকে মূর্খ মহঃসল ও প্রানাক্ষরের হোসেরা এখনও ভাল কাজে এগিয়ে আসে। আসলেই চলার ঠিকত ঠিকত একদল করে উঠে গিয়ে পুতুরে ভাত খাওয়ার পবীতি মেয়ে অঙ্গশিলা, কারল কলাব কথায় বেসা গড়িয়েছিল অনেক। আলোচনা তার নিজের পতিতে চলতে থাকল আর অন্যগিকে ভাল-চাত-তরকারি-মাছ ও চাটনি নিয়ে আজ্ঞাবাজদের আশায়েদের কাজও এবই সমস্ চলল।

বিকল্পে যখন ওঠে, তখন যাওয়া-নওয়াবার পাত মিটিয়ে সবাই আবার গা ভলয় আসার পর নিম্নের সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে তারা একদল নতুন বড় হয়ে ওঠা ছেলেমেয়ে 'কল-আজ্ঞা' নামে একটি নাটক পরিবেশন করল। এক কথায় অনেক নাটক, ছেলেদের বেসা শেষ হয়ে মেয়ে এল আছকার। অবশ্য বিশেষে যুগসমাজ যে ভাল কাজে এগিয়ে আসে একঘণ্টা সারাদিনের আলোচনা থেকে উঠে এস।

পূর্বী ঘোষ

আদর্শ মানুষের খোঁজে এবারের আড্ডাবাজার

ও নভেম্বর মন্দির ভেলায় কন্যাটি শব্দের একপ্রান্তে চুপি নীরবে ঘাবে অস্ত্রশীপ ট্রাস্টেট বাড়িতে ব্যবস্রনগর গ্রামে অনুষ্ঠিত হল উৎসবমানুষের আড্ডা। বড় বড় বুটো পুতুল তার মাঝে সবুজ ঘাসে টেপেতে ওক হল আড্ডা। আয়োজন চাকর বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা।

১০টা থেকে আড্ডাবাজার। এক এক করে আড্ডাগুলো এসে পা দুড়ে বসলো। আসব চমকেই মাইত এসেছে। হল পুরস্কৃতিক, পুরস্কৃতিক ঘোষ। ওকতে 'কত' এর গান: অস্ত্রশীপনের অমিকণ বসুর সুখের কর্ম বিবর্তনী। হারিসহসের সুকৃৎশর গানের পর প্রীমা মহিলা সমিতির কণ্ঠের বাকী সবথর্তা: দুব মেথিনীপুত্রের এগারো বৃদ্ধ মাস্টারমশাই নির্মলেশ্ব মহাপাত্র কলসেন—কেন এই আড্ডা, কেন উৎসবমানুষকে বঁড়িয়ে রাখতে হলে। এব মহা সগন্ধপাতের আনন্দবিকা থেকে কোন এসো পাড় বায়েক— বিবর্তন, কেনন হলে আড্ডা।

কল্যাণ মুখার্জি এবং অশোক বংশের শাখায়রতে পরিকল্পনার তার দিয়ে কখন যে পুরস্কৃতিক ফলভাসনে নিয়ে কল পাড়িয়ে চা ছান। নেই। আলিপুরদুয়ার থেকে তখন সেনকে আড্ডার যোগ দেওয়া শেষে ছড়িয়ে পড়েছি তখনলকে। কী যে টান এই আড্ডার। সুদূব গোস্বামী, আমিত্র, হিমালগজ, বনিসহাট, বারাসাত, উজনঘাট, বড় মুন্সিরা থেকে মনন ভট্টে পায়ে পেটে, কেউ জানবিরহায় আসছে—আমরা আমাকে ভাসছি। হঠাৎ দেখি একটা দিহিল আসছে বিশেষবের। ওরা শান্তিপুত্র মাস্কল ক্রব থেকে আড্ডার যোগ দিতে এসেছে দিহিল করে।

কেউ এসেছেন সোনারপুর থেকে ব্যতিক্রমভাবে, কেউ এসেছেন চন্দননগর, চিটুড়া থেকে, আবার কেউ পরিবার নিয়ে চলে এসেছেন হাওড়া থেকে। নন্দ এসেছে তার সারাদিনের ইকরি বন্ধ করে, বিকাশ এসেছে মাস্কের কাছ বন্ধ করে, মীলুলা তার কারখানা সোচ্চপাও শিকের তুলে। উৎসবমানুষের আড্ডা যেন দশিঙা-মুন্ড নির্দল আনবের একটা দিন। যাগা কোলোনি আড্ডায়ে পুণ্য যেখনি তাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষেত্রবাকী, বিবর্তনী কী — যা নিয়ে আজকের আড্ডা। বরকর বিদ্যুৎ চলে ফাওয়ার চলে মাইক বন্ধ হয়ে যাওয়ার অধাপকল প্রও বিরক্ত। তারওপর বেশি কোল করে আসার ফলে টিফিন খাওয়া হয়নি। তবুও কোনো সরস্যা যেন সমস্যা নয় এই রকম একটা ভাব। চটে কসার জায়গা নেই—কিছু মানুষ খাঁড়িয়ে ধাঁড়িয়ে পিচিচয় দিলেন। তাদের চট্টের বাবদা হল। পরিত্যা উৎসবমানুষকে বঁড়ানোর সপক্ষে কলসেন, কেউ কেউ সাহায্যের হাত বাড়ানেন কলসেন, যেমন বলেন সব আড্ডায়। এলিকে নীরবে যে মেয়ে দুটি উই দিহিল করে চললে আড্ডা বন দিলে, তাদের কথা না লিখে পরা যায় না—সংস্কৃতি আর সুখিত। হঠাৎই মাইকে গলগলের গলা ওনে বুকতে পারলান পুতুল নাচ ওক হরহলে। একসময় সবাই নিলে ভোরে হালি চানে এলির বেশি

আড্ডাবাজার। এতই মশওল যে, দুপুতুল খাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছে। গলগল পশ্চিম মেথিনীপুত্র থেকে। মাস্ক কাছ করে আর যখন কাছ পড়ে না তখন গ্রামে-পাড়া পুতুল নাচ দেখিয়ে যেভায়। বই মাস্ক চাষ করতে যাবে না বলে শিটিয়ে বইতে মাস্ক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার বার্থ পুতুল পুতুল। পুতুল আর মহিলা এক সাথে কীম কীম দিহিয়ে লড়াই করলে যে ফসল ভালো হয় তা তার পুতুল নাচের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছে। গলগলের পুতুল এখন বলায়ে—মৌরোগাড়ি চাই না, চাই মাটি টাটা চাই না, চাই আটা। গলগলের পুতুল নাচ শেষ।

আড্ডার বিষয় ছিল—নতুন প্রজন্মের কাছে প্রভা করবার মত মানুষের অভাব। গোল-মডেল পাওয়া যাবে না। আড্ডাবাজারের মাঝা ২২০ ছাড়িয়েছে। কেউ বললেন আড্ডায় এসে তাঁর নাকি দু'সহর করে বরস করে যায়। গোল মডেল তো এখনও আছে মইসল উৎসবমানুষের আড্ডা করছে চাকর বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। ওরা তো নিজেদের আড্ডাই করতে পারত। যুগলকান্তর অমকল বলা এবং কলতে কলতে আকোণ ভাড়িত হয়ে মাঝা ঘুরে যাওয়া প্রতিটি মানুষকে ভাড়িত করে। আড্ডার শেষে প্রজ থাকলেও কী হল মারামিন এই তর্ক-বিতর্ক করে তার উত্তর কিন্তু আনেকটাই বেরিয়ে এসেছে। এই পড়াপালা সম্মতে হঠাৎ করে একজন খুব সুখর গোল মডেল কোথায় আছে। এই ভাবনা একমত দিক নয়। সংগঠিত আলোচনার মধ্য দিয়ে যারা সমাজ পরিবর্তনের কাজে মুক্ত থাকবেন তাঁদের মধ্য থেকে সভ্যকারের গোল মডেল তৈরি হয়ে যাবে। আড্ডা শেষ।

নাটক 'জল-আতঙ্ক' পরিবেশনায় শ্রীমার দুব হল। থাঁরা করলেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকই জেলি গোজের কলহের কথী। আর এই নাটকটি কোনো একজন ব্যক্তির লেখা নয় বা নির্দেশনাও কোনো ব্যক্তির নয়। সবাই নিলে লেখা নাটক এবং সবথর্তাই কালেকট্রিট।

এবার যাবার পালা—সবাই যেন মাস্কল শুলি। মাস্টারমশাই প্রবীণ মানুষ, ছড়িয়ে ঘরে কলসেন, মাস্কল হচ্ছে। অশোকমাকে কলসান, এবার খারাপের নিকটা একটা বসুন। কলসেন 'তোমার টেপানে পথ নির্দেশিকার ব্যানরেটা এত ছোট ছিল যে চোখেই পড়ে না। আর মাইকটা এত বাকী' আসলে অশোকম হতাবে এখনই টেট কাটা। আদামের মাস্কল ভাল লাগে এই টেট কাটা মানুষদের যারা মাইকটা খালাস বলে টেটমেন্ট করে, আবার আদামের খাওয়া ঠিকমত হল কিনা খোঁজও নেয়।

এরপর হিসেব পেশের দিন সিল্কা স্ট্রিটের ঘরে পঙ্কজ মাস্কল থোলি একোম ঠিক—চালওপের মত হিসেব দিচ্ছেন। আসলে জাড্ডায় আগে আমি ছিলান লোক খোঁজা করা মস্তির মত।

বিবর্তন স্টাডীয়ার

বইমেলায় ময়দানের পরিবেশের ক্ষতি

তারকমোহন দাস

বিগত কয়েক দশক ধরে সারা পৃথিবীতেই শহরকে সবুজ বাগার উদ্ভাসে নতুন করে ওক হয়েছে, শহরের জনসংখ্যা ও পেট্রোল-ডিজেল চালিত যান-বাহনের বৃদ্ধির জন্যে এটা করতে হয়েছে অনেকটা ব্যয় হয়েছে। এটা হিসাব করে দেখা গেছে শহরের আয়তনকে অনুপাতে শতকরা ১৮ থেকে ২২ ভাগ মণ্ডলের আয়তন (ঘাস ও বৃক্ষসমৃদ্ধ) থাকে প্রয়োজন। কলকাতা শহরে এটা নেই। কলকাতা শহরে প্রায় ৬ পার্সে সার বাসি ভবন পরিমাণ শতকরা ৬ ভাগের বেশি হয়ে না। গড়ের মতোই বাসিন্দা বাসি ভবন আছে যেখানে ঘাস ও গাছপালা আছে। গড়ের মতোকে তাই বলা হয় কলকাতার কুসংস্কৃতি। এই গড়ের বেশ কিছু অংশ জুড়ে প্রতিবছর বইমেলায় আয়োজন হয়। লোক লোক মানুষ এই মেলায় আসে। প্রতিবছর এই বইমেলায় আয়োজন হলে শহরের পরিবেশের অসার ক্ষতি হবে, বাতাস, মাটি, জল আরো বেশি দূষিত হবে, শহরের মানুষ, পাখি ও অন্যান্য জীবজন্তু ও গাছপালায় অপূরণীয় ক্ষতি হবে সে বিষয়ে সম্ভাব্যে অবকাশ নেই। বইমেলা পরিবেশের ঐ ভাবে ক্ষতি করে থাকে? প্রথমত, বাতাসের অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য নষ্ট করে, বাতাসে ডাসমান ধূলিকণা সমেত অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ঘাস সমেত সবুজ আবরণের কাছই হল বাতাসের ভারসাম্য রক্ষা করা। ঘাস তার পাতার গোড়ার আরিত্বপূর্ণায়ে হেয়ারের সাহায্যে বাতাসের ধূলিকণা থেকে সার সংগ্রহ করে, তাই পাথরের বাক্সে বাঁধে বাঁধে ওপর ও ঘাস জমাতে পারে। এতে বাতাসে ধূলিকণার ঘনত্ব কমে। বইমেলা বছরের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন হয় রিক্রী, কিন্তু মাসের এই বিরাট অংশের সবুজ আবরণের যে ক্ষতি হয় তা সারা বছরেও পূরণ হয় না। অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী ন্যাথন বেকহ্যামের লেখা (The Value of an Urban Tree) থেকে জানা যায় একটি লম্বা খেলার মাঠের ঘাসের আয়তন ৬০০০ থেকে ৮০০০ মানুষের সারা বছরের জন্য অক্সিজেন যোগাড়। একাড়া তাকার কার্বন ডাই অক্সাইডেরও পরিমাণ কমায়, বাতাসের ধূলিকণার পরিমাণ কমায়।

দ্বিতীয়ত, লোক লোক মানুষের সন্নাগমে সার বাতাস ও পরিবেশের অবস্থা আরো খারাপ হয়। শব্দ দূষণের ফলে পাখিরা ছাড়াপাশ করে। তৃতীয়ত, মাটিতে প্রায় কোটি বর্কম চতাক ও জীবাণু আছে যা বাতাস থেকে দূষিত কার্বন মনোঅক্সাইড শোষণ করে বাতাসকে দূষিত করে, পেট্রোল চালিত যানবাহন থেকেই এই দূষিত পদার্থ বেশি নিঃসৃত হয়। তাই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বড় বড় রাজধানীগুলি প-প্যাসে মাটি ও ঘাসের আচ্ছন্ন রাখা হয়। মেসান ফুটপেটলগুলিতে এই মাটি ঢালা দেবার ফলে মাটির কাজ বড় থাকে, দূষিত গ্যাসের পরিমাণ বাড়ে। চতুর্থত, বইমেলা আচ্ছন্ন ঘাস মেলায় পলিলগ্ন হয়েমে। এখানে যত লোক বই কেনে তার থেকে বেশি লোক থাকার কেনেমে। এই ঘূত স্টলগুলি যথেষ্ট ধোঁয়া ও আবর্জনার সৃষ্টি করে। ঘূত স্টলগুলির এই ধোঁয়া ও আবর্জনা এলাকার জল, মাটি ও বাতাসকে দূষিত করে।

উপরের এই কারণগুলির জন্য ময়দানে পরিবেশগত যে দূষণের সৃষ্টি হয় তা মেলায় পর মাঠ পরিষ্কার করাশেই সেই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মাঠের পরিবেশ মুক্ত হয় না; কেননা এ ঘাস-জল-মাটি বাতাসের

যে পরিবর্তন ঘটে, তাতে পৃথিবীতেই তাইসে আরও কত সময় লাগে--
ফল অংশেই কিন্তু আরো একটি বইমেলায় সময় চলে আসে:

গড়ের মাসের বইমেলা আচ্ছন্ন তার নিজেসব চরিত্র ধারণে ফেলসে। অংশে যখন উত্তর করা হতে, তখন বড় বড় ষ্টলগুলিই লোক লোকের ঘরে নিজেসব শয়নভবন এই মেলা যেতে। এখন সেগুলিতে এই লম্বা লম্বা হয়, এটা উত্তরে ভেতরে ভেতরে ইচ্ছা হয় না। তখন ঘণ্টা লম্বায়ে পঁচাত্তর ভেতরে ঘণ্টা লোকের ষ্টল পড়া-পাঠ্যের প্রতিমা নকশের মত বইগুলি ওপর একবার ফেস ঘুরিয়েই বেরিয়ে আসেন। কখন তালসে অনান্য ষ্টলও প্রো একবার করে চকতে হয়ে। উত্তর হলে প্রতিমা নকশের মত পুস্তক নকশে একা একা-বিহীন করে ঘূতি কটাবার মত একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে আজকের এই বইমেলা।

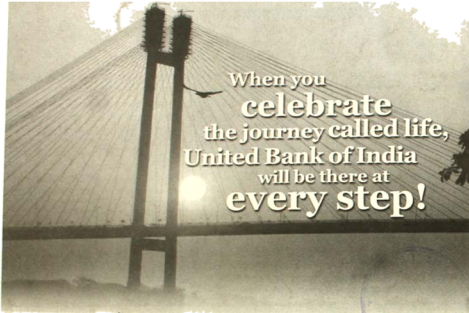
গড়ের মাঠের দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বই মেলাতে সন্ট লোক নিয়ে বাসার কথা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও তাই দূষণ সৃষ্টি হবে। সন্ট লোক যেতে মেলায় উল্লাসভাবের প্রধান অংশের কথা ভাব্য লম্বা এবং বাতাসেরও অসুবিধা—এই দুটি অসুবিধা কিন্তু একটি অভিনব উপায়ে দূর করা যেতে পারে—গড়ের মাঠে মেলা করার নকশার নেই, মন্টসেতেও নয়। বইমেলা করা যেতে কলকাতায় অতি অকুরিমে বই-এব জীবাণু লোকের সৃষ্টিই। একদাটা গ্যাস অনেকটাই ব্যতীক উত্তরে জীবাণু কথা ভাবে কিন্তু এ মেলা প্রতিদিন হবে না, হার তিনেধার জাদুঘরির প্রতি বর্ষিকবার, কয়েক স্ট্রিট ঘন ঘন থাকে। লোকেরগুলিই সন্টসে গুলিয়ে বিজ্ঞান বিদে পুস্তকপ্রেমীরে আহুত জরাজতে পারেন। মেসান স্টল সেবার যে বরড হয় সেই আর্যে সন্টার, বেশি ডিসকন্টই দিয়ে পুস্তকপ্রেমীরে প্রকৃত উপকার করতে পারবে। এখন দুটি সন্ট উত্তরে পারে। এক, মেলায় যে আয়োজনা সভা ইতারির অয়োজন করা হয় তার জায়গা ভোঝাব; উত্তর হল, বিকলিগ্যাম ও প্রেসিডেন্সি কলেজের বিরাট অডিটোরিয়াম পাওয়া যাবে। লোক সমস্তকে কয়েকটিয়ে দুল, ফিল্ম কুল, মেসার কুল, আনবার্ট হলও হবে, বিকলি প্রা, মিটিমা মাগভিন ও কলেজ স্ট্রিট ঘাসের লোকমে নেই টাকা ভোঝাব বসাবে; উত্তর হল, এ জায়গাগুলোই একদা ভাবে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে পাঠা পুস্তকের প্রকাশীর কথাও ভাবা যেতে পারে।

এই মেলা আরো-বিহার করবার একটি কল্পণে পরিণত হবে না, সুতরাং বইমেলায় প্রকৃত উদ্দেশ্য সঞ্চিত হবে, পাঠকের সঙ্গে, পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হবে, যোগাযোগ আরো দৃঢ়ী হবে। পরিবেশ দূষণের প্রকট সেতাবে আসবে না। একটি ভাবনা-চিন্তা করলে এই বকম অনেক উপায় উদ্ভাবন করা যায়—মাঠে পরিবেশ দূষণ কম হয়, বই মেলায় প্রকৃত উদ্দেশ্যও সঞ্চিত হয়।

কিন্তু বিকল্পটি কী?

- ১. পৃথিবীতে ঘাস, বইমেলায় মাঠে কতটা ঘাস না, দূষণ হয় না?
- ২. কলকাতার সন্ট পুস্তক বিক্রেতা না করে, বইকলকাতােই সন্টসে কেন?
- ৩. বইমেলায় কতটা বইমেলায় বিক্রেতা কলকাতায় কি বিকলি আরো?
- ৪. কলকাতায় বইমেলায় সন্টসে কতটা সন্টসে?

উত্তর: কলকাতায় উপলব্ধি



When you
celebrate
the journey called life,
United Bank of India
will be there at
every step!



At **United Bank** keeping up with your dreams is a way of life. Answering your needs, sometimes even before you know you have them. Providing schemes and products tailor made to make your dreams easier to realise. For at UBI we are committed to working hand in hand with you through each stage of the journey called life.

United Loan Schemes:

Housing, Education, Consumer, Car, Trade, Mortgage, Personal, Loan against LIC Policy/ NSC/KVP and many more ...

United Deposit Schemes:

Saving Bank, Current, Fixed, Re-investment Plan, Recurring, Flexi, Bonanza Savings, Gold & Platinum Current Account, Tax savings

Other Advantage U facilities:

Internet Banking, ATM, Visa Debit Card, RTGS, General Insurance Products, Life Insurance Products, Money Transfer with Western Union, Tax deposit and many more

Toll-free Helpline : 1800 345 0345



United Bank of India

(A Govt. of India Undertaking)
The Bank that begins with U

Visit us at : www.unitedbankofindia.com

উনিয়ন সোসাইটি'র পক্ষে স্বল্প ভাট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, স-টকস, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং

উৎস আলোক

P-48



এবং

ধর্ম মানুষকে 'মানুষ' করে না
লুণ্ঠ হয়ে যায় বাংলা সংস্কৃতি
নাচের ছন্দে শিল্পকর্মী
'বিদেশ যাওয়াই সফল জীবন'

সূচিপত্র

২০০৭ বইমেলায় আয়ত্তা	বঙ্গশ ভট্টাচার্য	৫
নবীগ্রাম : চন্দ্রভূমির মাটি আর ধ্বংসভূমির	পার্বীণা রায়	৪
কবিতা যেখানে এক হয়ে গেছে	চিত্তরঞ্জন পাল	৯
বেলায় জমি পান : সরকারের মিথ্যা ভাষণ	সৌমেন নাথ	১১
সবুজ পোনার বেশে মুড়া মিছিল	প্রবীর মুখোপাধ্যায়	১৭
ফুলবাড়িতে গণ-বিক্ষোভ	অশীষ চট্টোপাধ্যায়	২১
১৪ই মার্চ	প্রসংকা রায়	
নাট্যের ক্রান্ত : কারাবানার এ্যাসেম্বলি লাইন	জয়া মিত্র	২২
চলতে বিরতে	পাণ্ডু রায়	২৪
আজকের রাজনীতি ধর্মনীতি — গ্রাম	এম. এ. সফিউল্লাহ	২৬
করছে ন্যায়নীতি	অশীষ সাহিতী	২৯
আসুন বাসোয় ফিরি	বিদ্যাসুন্দিন	৩১
ধর্ম মানুষকে বিশ্ব, মুসলিম, খৃষ্টান আরও		
কত কী বানায়, কেবল 'মানুষ' বানায় না		
ছোটদের পাভা		৩৪
বদা, পাড়ানো, শোওনা, চলাফেরা	ডঃ জ্যোতিষ	
	আগরওয়ালা	৩৭
সংগঠন সংবোধ		৪০

সম্পাদকীয়

(‘আমরা দলকে এখন প্রতি (দুপারাই) নিজে নিজে
এই পাঠ্যক্রম’ — নবীগ্রাম প্রসঙ্গ মূল্যে গবেষণাপাঠ্য/
আনন্দবাজার প্রবন্ধ/১৬ মার্চ ২০০৭)

চিনতে গেলে গেছে বলে মাল ভিত কেটে নিল ধর্মপের পরে
দু'হাতে দু'টা পা ধরে হিঁটে ফেলল শিউটে
ঘাড় দু'টা কোণ মেলে যার স্বামীকে ফেলল রাখল উত্তোনের পাশে
‘মরা অতি মুখে একটি ভাল বিয়ে ছিল না
সেই সব মেয়েদের ভিতরে যে-লোকটির দলছে
সেই আগুনের পাশে

এনে হাফা, ওগির অর্ডার তেওরা শব্দভর দু'চোখী বিশ্বত,
তারপর মেগে ধ্যাও কে বেশি তে কম
তারপর ভেবে দেখে কারা বসেছিল
কীকন নরক করব, প্রয়োজনে প্রাণে মারব, ম্রাণে।
এই বলে মদ্রু আর মুখে রক্ত ফুলে
নেচে যার শব্দভর শব্দভর
আর সেই নৃত্য দিকে দিকে ছিটকে পড়ে জ্বলন্ত শব্দভর।

জয় সোম্বাণী : শাসকের প্রতি
বিত্তীয় সংখ্যা : ৪/১৯ ২০০৭

মজল নবীগ্রাম আমাদের সময়ে অনেক রক্ত দুয়ারে হুসে দিয়েছে,
অনেক মুখোশ হিঁটে দিয়েছে।

১৪ মার্চ বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ আর জাভার বাহিনীর
অধিনায়ক রক্ত-হিম-করা স্বপ্নাস, নারীধর্ষণ, শিঙহত্যা, আর সেইসঙ্গে
মুখামুখী বুদ্ধ ভট্টাচার্য ও তাঁর বামগণী সহযোগীদের উক্ত কৈফিয়ৎ,
তথ্যবিকৃতি আর মিথ্যাসচরিতঃ বাংলার বিবেকবান মানুষদের পিছনিত
করেছে, কিন্তু করেছে। দলে দলে পথে নেমেছে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে
উজ্জল হয়েছে, সর্বস্তরের মানুষ — পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, প্রমজীবী,
কবি শিল্পী নাট্যকারী, ছাত্রছাত্রী সব। অনেক বছর, প্রায় তিন দশক,
পরে পশ্চিমবঙ্গবাসীর নির্নিপুণ নির্বিকার নিশ্চুপ অবস্থাবে প্রতিবাদের
হাতিয়ে যাওয়া ভাষা কিরিয়ে এনে নিয়েছে নবীগ্রাম, অনেক রক্ত অনেক
প্রাণের বিনিময়ে।

কিন্তু মেরি হল বলে আমাদের দুম ডাকডেতে। বাংলায় বান
শাসকদের আজকের এই দাঙ্কিত নির্মম মুখ দেখা গেছে আগেই, বার
বার, গত তিরিশ বছর ধরে। আমাদের নির্বিরোধ সধনশীল বর্ষক হওয়া

সম্পাদনা □ অপেক্ষ বন্দোপাধ্যায়

উৎস মানুষ

ISSN 0971 - 5800

অস্থায়ী কার্যালয় — শ্রাবণী, এস ৬/২, স-টপেক, কলকাতা ১০০

ফোন : ২৪৭০ ৬২৩৬, ২৩৩৪ ০৩০৪

মোবাইল : ৯৪৩৩৮৮৮৮২, ৯৮৩৩৬৫২০৫৮

অভ্যাস করে ফেলেছিলাম। সময়ে এভাবে থেকেছি, তুমিও রেখেছি বিবেকের সংশয়কে — কেউ হুতাশের, কেউ ভয়ে, কেউ সরকারি সুবিধা অনুগ্রহ শওকার সোত্রে, কেউ ভবিষ্যৎ সুযোগ হারানোর হিসেবি আশঙ্কায়। সেই ১৯৭৮-৭৯-তে মরিতকৃষ্ণির ছিন্নমূল মানুষওগিবে ওপর কামরুপের পূর্বদিশের নারকীয় ‘অরুণাশান’ মনে পড়বে— কোনো জনগোষ কোমো নষ্টিকরনী প্রতিবার সংগঠিত হবার সৈনিক। তাবপর কত ঘটনো ঘটনা, নিরন্তর মানুষের ওপর সরকারি সশস্ত্র শক্তির আক্রমণ ... বিজ্ঞান সেতু, বি য়া দী বাণ, কানডলা, চাঁদমনি আব পেনানী চা কাশন, কাড়গ্রাম, মিনে-দুপুর্বে মানুষ হত্যা, চিংড়িহাটা, বেলেঘাটা, চাঁদমালা, গোবিন্দপুরে অসমসুবিধা জাওবে বস্তি উচ্ছেদ; নানুর, সেনাপুর, ছেতি আভিবিবার কমডা শ্বালের সহস্র। শেষে এই শিল্পুর, মণীগ্রামে জন্মি বদলের নৃশংসতা — এতের পর এক একমাত্রক কামরুপের অত্যাচারের নমুনা। সেইসঙ্গে বড়োয় লগাভার তিরিশ বছরের পাসনে সর্ববাণী কৌশলী দুর্ভিত আর বচনব্যবশ্য, ‘ভলসোক’দের গাইয়ে দেওতা, ‘সল’-এর সর্ব্বই কসগিরি, ‘আমাদের লোক’দের মন্ত্রাইনি অধিপত্য। ... এতদিন পরে বোধহয় মানুষের জন্ম হওতা কোত আক্ষেপ বিতৃষ্ণার ছাপ এসে পড়লো মণীগ্রাম আওনের ফুলকি। এতদিন পরে গড়ে ঘাটে মরলেন প্রতিবান বিস্কোত বিস্কোবিত হতে সেক্ষরি আমরা, সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্রে, যে প্রতিবান আশোলাসন কলকাল ভুলতে কলকিলামে আনরা।

আর তাই আবার স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে জাগে, সুদিন ফেরার স্বপ্ন, তিরিশ বছরের কলকাতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন। যদিও একটা রিক যে এই উক্তিও আশোলাসনের শিলা এখনো স্পষ্ট নয়; গান, কবিতা, নাটক, ছবি, পোস্টার, সিটি, বই, পত্রিকা আর ইন্টারনেটে মেইলের এক দুর্ঘমণীয় জোয়ার এসেছে তিকই, কিন্তু তাবপর? কোনবিধে চালিত হবে এই জনজগৎপেরের মোত? কেউ ১৯৭৯-৮০-র পূর্ব ইওরোপের ‘সলিডারিটি’ আশোলাসনের কথা ভাবতে শুরু করেছেন, কেউ অস্ত্রের বিস্কো জব্ব নিয়ে প্রতিবোধের আওচাভ ভুলতে চাইছেন বিজ্ঞিতভাবে — বোকা যার চটজলদি শিশার বোঁজে অধিরতাও আসছে। বড় বিষর হ’ল আভেকের এই শিল্পুর-মণীগ্রামের প্রতিবান আশোলাসনের আপকতা কিছু থাকেই নয়। বিস্কোভের উতাপ এখনো মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। ওগলি বামে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাওগিতে তার ডেই বিশেষ ছড়ুতে

পারেনি। কলে আভেকের আওন ক্রমে জ্বলিত হয়ে যাওয়ার অশঙ্কা থাকেই। আমরা স্বভাবত বিশ্ববর্ণগ্রহ। অত্যাচারের বিস্কো জ্বাটী প্রতিবোধের প্রতিব্রা নির্ধারিত না হলে স্বতঃস্ফূর্ত বিবেক-বহুভার প্রকাশ ক্রমে সিস্ক হতে পারে, বিস্কুতি ক্রমে ক্রমে সেরে যিরতিয় মানুষওগির মুখ। তত্ব হত।

এলিক মণীগ্রামের নারকীয়তার এক-সেতু মাস থেকে না যেতেই বুজকর বাম সরকারের ‘ডায়ালেক কংগ্রেস’ চালু হতে গেছে। অশপ্রকার, নিখোচাখোষ, অশমুখিত, তথ্যগ্রহণ গোপের পরিকল্পিত পদক্ষেপ শুরু হয়ে গেছে। বামপাটির পদমন্ত্রী মেসব বিবেক-বর্জিত বুদ্ধিজীবী, কবি, শিল্পকবি, ক্রীড়াবিদ, চিত্রশিল্পী, চিত্রগাথকা আর সুবিধাশোভী পাঠস্কৃত্যোনে শিক্তিকুল বেশ কিছুদিন জোরের মতো মুখ শুলিয়ে ছিলেন, তারাও হাঁবে হাঁবে মুখ শুলিয়ে শিল্পানের গায় নিয়ে, তিস্তারি ছড়ানোর অপচেষ্টা নিয়ে। কেউ বলছে না সামগ্রিক উন্নয়নের কথা; বলছে না ওগু কৃষিজমি কাঁচানোই নয়, চাই জমি, জল, স্বাধুতি, বিশপনের উন্নয়ন, চাই মানুষের সর্বিক জীবনমানের উন্নয়ন, চাই নাগরিক অধিকার আর নারীর স্বর্ধনা ও নিরাপত্তার উন্নয়ন, চাই শিশুর স্বাস্থ্য আর ন্যূনতম খাদ্যব্যবস্থার উন্নয়ন।

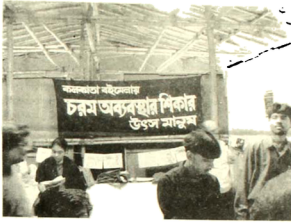
তবু অনেক বিধাযশ্য কাটরে অনেক মানুষ যখন গড়ে নেমেছে, একটা সরকার-অনুসারী অনেক বুদ্ধিজীবী যখন তাঁদের বোধভঙ্গের কথা অতপটে ঘোষণা করছেন সুভাষা সর্বে, তখন আমরা মাথালা জনপদ মুকে কল পাই, স্বপ্ন দেখার জোর পাই, স্বতঃস্ফূর্ততার গভীরতা দেখে একবিষ শতাধীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশার সম্ভারজন্মি ওলাতে পাই যেন। অনেককালের পরে আসা আসে বলেই বোধহয় লড়াও পশ্চাতে আসে। মোহভঙ্গ হওতা ‘মানুষ’রা আবার ফিরে যাবেন না তো প্রসোভানের পরিক্রিত পথে? কিছু একটা আভাস যেন আসে। গত ১৪ মে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ‘‘সংস্কৃতিবান’’ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নাট্য অ্যাকাডেমির প্রতিব্রা সঙ্গমের ‘বহুতপূর্ণ’ আলোচনা হল। কথার কুননে মনে ভাঙমনোর ডেটী।

মনে আসে ‘রক্তকরবী’র ফাওলালের শক্তিত মলোণ : ‘সম্বিদী, ভালো করে বুঝতে পারছেন। আমরা সরল মানুষ, দয়া করে আমাদের ঠিকিও না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।’ আমরা সত্যিই অসহায় বোধ করি। বড় কঠিন যে এই লড়াই।

সিরাটল উপজাতি প্রধানের চিঠি

গত জানুয়ারি ২০০৭ উলস মানুষ-এ আমরা প্রকাশ করেছিলাম ‘ওলাসিটনের বড় সাগ সর্গদের কাছে সিরাটল উপজাতির প্রধানের চিঠি’। কবিতার ছন্দে দেখা সেই চিঠির বাংলা অনুবাদকের নাম আনবা উলসে করতে পারিনি। এটি অনুবাদ করেছেন জ্ঞান মিত্র। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘ছদ্মযশাগর’ পত্রিকার বইমোলা ১৯৯৯ সংখ্যায়।

২০০৭ বইমেলায় আমরা



৩২তম কলকাতা বইমেলা অন্যান্যবারের মত মরনামে হল না। সব ভুল। পরিবেশবাদী ও কোর্ট ভল ঢেলে দিল। ফাঁস হল গিন্ডের কারফুপি। কোনো কোনো বগুড়ার চড়াই অনিয়ম। মানুষ যেগুলো বুঝলো ক্ষমতার অপব্যবহারের স্বরূপ। আইন কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখায় যে গিন্ড, তারাই মেলায় যোগদান করার সময় কত নিয়ম দেখায়। এসব ভুলভোগী মাঝেই জায়েন। অথচ বছর বছর মেলায় যোগদানের টাকা বাড়ছে। ডেকরেটারার যা খুশি দর হাঁকছে। কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আর গিন্ডের ভাবখানা যেন — নিজেটা বুকে নাও বাপু।

তবে গিন্ড বলে কথা। এক সোর্ডও প্রতাপ মন্ত্রী সতীক ঠাঁপিয়ে পড়লেন। মেলা চললো সন্টলেকে যুবভারতী স্টেডিয়াম চব্বরে। কঁচে গল্পস। কবে লটারি কবে মেলা এসব খোঁজ করতে গিন্ড অফিসে যাতায়াত করে করে যোগদানকারীরা ক্রান্ত। কোনো সন্টল নেই। দুম করে ৭ই ফেব্রুয়ারি লটারি হবে বলা হল। শেষমুহুর্ত পর্যন্ত বেশিরভাগ যোগদানকারী জানতে পারেন নি। কোলা ব্যারেটায় লটারি। মেলায় যাঠে অস্বাস্থ্যকর অফিসে গিন্ড কর্তাদের টিকিটও দেখা যায়নি। জানা গেল লটারি বিক্রেতা চারটম হবে। চারটিকে শুধু খাঁদের পাহাড়। আছ কে যেন বলেছিলেন “বইমেলা না খাঁস মেলা”। লটারি শেষ পর্যন্ত ওটিকট্রেড যোগদানকারীর উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। গিন্ড কর্তারা নিজেদের প্রকাশন সংস্থার জন্য সেবা জায়গাগুলো বেছে নিয়ে বাকিগুলো ফেলে রাখল যারা লটারিতে আসেনি তাঁদের জন্য। মেলা চালু হলো ৯ই ফেব্রুয়ারি। ৭ তারিখে স্টলের সীমানা বেঁধে দেওয়া হলো।

টাকা জন্য পেওরা হয়ে গেছে। গিন্ডের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে যাতে করে সবাই ঠিকমত স্টল চালু করতে পারে। কিন্তু কোথায় ঈঃ ভুলপেত হল বই প্রকাশক। আর্থিক কঠিন হল সবাই। মেলায় যেকার টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে না। স্টল দুচারটে কোনো মতে চালু করা হয়েছে। আর মাত্র ছুটে স্টলের কাছে বাস্তব মানুষের ছুটোছুটি।

এত অব্যবহার মধ্যে উৎস মানুষ স্টল নিয়েছিল (৭৪০)। তবে অন্যান্য বারের মত সাচ্চালো যায় নি। বই ও পত্রিকা নাইলন ভাবে জোলায়। স্টলের ভেতরে জোলায় হল ফেস্টুন ভাঙে দেখা ছিল — “কলকাতা বইমেলায় চরম অকবছার শিকার উৎস মানুষ”। অনেকেরই নজর কেড়েছিল উৎস মানুষের প্রতিবাদের ভাষা। বই মানুষ সমর্থন জানিয়ে গেলেন। কেউ কেউ তো বলে ফেললেন এমন সোজাসুজি গিন্ডের কাজের সমালোচনা আর কেউ করেন নি অস্ত্রত মেলায় যাঠে। টেলিভিশন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ঘুরে গেলেন। প্রচার শেল প্রতিবার। হু-একজন আবার গুনিয়ে গেলেন “এসব প্রতিবাদ প্রতিবাদে কিসাসু হবেনা — যত প্রতিবাদ আপনাদের, আর কেউ তো তেমন করে বলছেন না”। অস্বীকার করি কি করে? সত্যিই তো, গিন্ডের বিরুদ্ধে মেলায় যাঠে। এত জেরালো অভিযোগ প্রকাশে অধিকাংশ সংস্থাই তোলেদেন নি। প্রগতিবাদী গণমুখী প্রকাশক সংস্থাদেরও ভূমিকা একই। একি শুধুই আনুশ্রাব্য হারানোর ভয়, না কি অন্য কোনো বৃহত্তর হিসেব? আসুন একটু ভেবে দেখি। চুপ করার মাওল শেষ পর্যন্ত কীভাবে দিতে হবে চারপাশ সেবে একটু বুকে নিই।

বরুণ ভট্টাচার্য

নন্দীগ্রাম : জন্মভূমির মাটি আর বধ্যভূমির কাদা

যেখানে এক হয়ে গেছে

শর্মিষ্ঠা রায়

‘এখন গভীর রাত:

অন্ধকার তোমার বুকের ওপর কঠিন পাথরের মতো,

তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছো না।

মাথার ওপর একটা ভয়ঙ্কর হিমে আকাশ এখন বাঘের মতো
ধাধা উড়িয়ে আছে।

তুমি ভেঙেবে পায়ে এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও

আর আকাশের ভয়ঙ্করকে শান্ত গলায় এই কথাটি জ্ঞানিয়ে দাও
তুমি ‘ভয় পাওনি।’

নন্দীগ্রাম, বিস্রোহী সহযোগতার পবিত্র পদবুলিতে রঞ্জিত ভূমি, মা বোনের রক্তে উথলি হলদী নদী, স্বপ্ননেসন পিতুর রক্তে ভেঙা রক্ত মাটি, — তোমায় উৎসর্গ করলাম কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতা। দুবাচারী ২০৫ এর দশটকে তুমি হার মানিয়েছ, দুবার নন্দীগ্রাম, ওদের বুঝিয়ে দিয়েছ যে তুমি ভয় পাওনি। ‘ওরা ১০, আমরা ২০৫। কেন ওদের কথা ওনতে হবে?’ এই অনুরণন গত কয়েকমাস ধরে ওনতে ওনতে একটি কথাই মনে হচ্ছিল ফিরে ফিরে। মনে হচ্ছিল কৌরব রাজসভায় শ্রীশীর বহুব্রহ্মণ্যের কথা। পাকিস্তানি সেই চরম অপমানের দুশোর সামনে নভমন্তকে বসে ছিল নিতামহ ভীষ্ম সহ যুদ্ধভীষীকুল। ঠিক যেন আজকের যুদ্ধভীষী। রাজ অনুরোধ হারাবার ভয়। সেদিন বোধহয় একই কথা বলেছিল দুবোধন। আমরা একপো, ওরা পাঁচ। কেন ওদের দাবি মানতে হবে? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও ছিল একশো বনাম পাঁচের লড়াই।

নন্দীগ্রাম জমি রক্তার লড়াইয়ে জয়ী।

যে পথ সিন্দুর সেবিয়েছিল, এ তারই উত্তর। কিন্তু নন্দীগ্রাম নাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের বিশ্বাসের মূল ধরে। কানীপুর-বরানগর, কেশপুর-গড়বেড়া বা যেটি আজগিরিয়ার পরেও মানুষ বৃষ্টি তথাকবিত

বাম নামধারী সরকারের বিশ্বাস হারাতে চায়নি। উন্নয়নের নামে বেবাক গুলিয়ে দেওয়ার আশ্রয় হশগুল সরকার — পাটী তথা বিক্রি হয়ে যাওয়া সংবাদমাধ্যমের ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে মানুষের কাছে প্রতিদিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিনবত্ব, শোনা যাচ্ছে বহু শিশুকে চপার দিয়ে হত্যা করে দু’পা টেনে ছিড়ে টুকরো করে ফেলার কথা, শোনা যাচ্ছে ট্রাক ভরে শ’য়ে শ’য়ে মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ‘নিখোঁজ’ করে দেওয়ার মতো ঘটনা। এখনো বিক্রি না হওয়া কিছু সংবাদমাধ্যম, রাজ্যপাল, আদালত — মানুষের সামনে বতই তুলে ধরছে প্রকৃত ঘটনাকে, ততই দুগায় বিবিম্বায় ঝুঁকতে যাচ্ছে মানুষ।

কেন নন্দীগ্রাম?

সালিসদের কেমিক্যাল হাবের জন্য দশ হাজার একর (ত্রিশ হাজার বিঘা) জমিতে ‘সেজ’ তৈরির পরিকল্পনা করেছিল রাজ্য

সরকার। তার সঙ্গে ভাড়াভ নির্মাণ, মেরামতি ও কবর উন্নয়নের জন্য কথা ছিল সাতো চার হাজার একর জমি নেওয়া হবে। এক লাফে এত পরিমাণ জমি ছাড়তে হলে শুধু বরফসলি ভুমিই যাবে না, হাজার হাজার মানুষ উৎখাত হবেন তাদের বসতভিটা থেকে। এর মধ্যে পড়ছে ‘চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শতাধিক বিঘালাব, মাদ্রাসা, ১২২টি মন্দির, ৪২টি মসজিদ। ততদিনে সিন্দুরের লড়াই চলছে, একই রকমের হরিপুরে পরমাণু বিস্ফোরণের জমি সার্ভে হয়ে গেছে। মানুষ রাগে ইসছিল। অপেক্ষা ছিল ব্যঙ্গের ছুপে আওনতী হুড়ে দেওয়ার। এই কাজটাই করলেন লক্ষণ শেঠ। হলদিয়া উন্নয়ন পর্বতের চেয়ারম্যান হিসেবে ও জানুয়ারি জমি চিহ্নিতকরণের জন্য নোটিশ জারি করলেন। মুহুর্তে ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিসোটা বাঁট ঝাঁটা বা ছিল সবল করে মানুষ নেমে পড়লেন পথে।



‘হুম্মদ’

সৌজন্য : অশোক ফানার্জি

গড়চক্রবেড়িয়ায় সেদিন তুলকালান কাও বেঁধে যায়। পুলিশের সঙ্গে লড়াই লাগে হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীর। পুলিশের ভীষণ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সাময়িকভাবে শিখু হঠে পুলিশ। কিন্তু মানুষ সিঁদুর দেখে চলেমন। ওরা দু'হাতের পারের, আবার বড় বাহিনী নিয়ে ঢুকবে পুলিশ। এই আশঙ্কায় ওরা গ্রামে ঢোকায় প্রধান রাস্তাওলি কেটে দেন।

সরকারপক্ষ থেকে একের পর এক ভাষা আসতে থাকে: নশীগ্রামে নাকি ছদ্ম অধিগ্রহণের কোনো নোটিশই রাখা সরকার বেয়মি। ওজব রটিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করেছে বিরোধীরা।

অতিরিক্ত ৬ জানুয়ারি। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল কুখ্যাত নীহাভি গৃহহত্যার সাক্ষাৎগ্রন্থ নায়ক বিনয় কোটারকে দেখাল।

বিনয়বাবু বললেন, 'গোটা নশীগ্রাম নিয়ে ওই চারটে গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঘিরে নিয়ে লাইফ হেল করে দেওয়া হবে ওদের।' ৭ জানুয়ারি রাতে কেশপুর, গাণ্ডবেতা, পাশকুড়া, খেজুরির বাছাইকরা ক্রিমিনালদের নিয়ে গঠিত সিপিএমের হার্মানবাহিনী ওই গ্রামওলার ওপর কীপিয়ে পড়ে। 'মেহনতী মানুষের মুখপত্র'-র মতে সেদিনকার 'বিদ্রোহ' নিহত গ্রামবাসীর সংখ্যা ৭ ও অন্য মতে ১১। উত্তেজিত

জনতা, যে বাড়িটি থেকে ওলি বোমা ছোঁড়া হচ্ছিল তার ওপর চড়াও হয়। সংঘর্ষে মারা যান ওই বাড়ির কতী শব্দর সমস্ত। বাড়িটি ভটিগ্রস্ত হয়। তারপর জনবোয়ের ভয়ে পালিয়ে যায় এই ক্রিমিনালরা।

এরপর গুরু হল আড়াইবাসের তাওবনুতার এক আসর। গ্রামওলার ওপর হামলা চালিয়ে জনতার ভাড়া খেয়ে এইসব দুষ্কৃতরা আত্মর বের তালপাটি খালের ওপারে লক্ষ্য শেঠের তৈরি ক্যাম্পে। যেখান থেকে পুলিশের সহায়তায় এমন কোনো রাত নেই যেদিন ওরা ওই গ্রামওলিকে লক্ষ্য করে ওলি ছোঁড়েনি। ৯ মার্চ বর্ণা কাজলী নামে এক ফুলচ্যারীর ডান হাতে ও নীলিমা দাস নামে এক মহিলার গায়ে ওলি লাগে বলে খবর।

মেডিক্যাল টিমের রিপোর্ট

১৮ মার্চ। শ্রমবীহী বাহা উদ্যোগ, পিপলস হেলথ, জনবাহা স্বাধিকার মঞ্চ, পিপলস রাইট টু হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন, ও মেডিক্যাল কলেজ ডেমেক্র্যাটিক স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে একটি মেডিক্যাল টিম গেল নশীগ্রামে, চিকিৎসা বিত্তে ও পরিহিতির পর্যালোচনা করতে। মাত্র আশের বিনই ক্যাম্প করে ফিরেছে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার। মানুষের কোভ কী পর্যায়ের আছে, আঁচ পাওয়া গেল নমকুয়ার থেকেই। মেডিক্যাল টিমের গাড়ি গেমের কোভ উপরে দিতে থাকেন দোকানদারেরা। 'কী হবে ওখানে দিয়ে?' 'অপান করে দিয়েছে চারটে গ্রাম', 'মাত্র ১৪ জনের মৃত্যুর গল্প বলছে, বাকিদের বিচার কে করবে?' ইত্যাদি।

১২তায় পৌছোয় নশীগ্রাম হাসপাতালে। ভিত্ত, ভিত্ত, পারীকিক ও মানসিকভাবে বিকৃত মানুষের ভিত্ত। বুকেটের কত, পাঠির আঘাত নিয়ে সেদিনের ঘটনার সাক্ষী হয়ে হাসপাতালের বেতে ওয়ে আসেন মল্লধা বিবি, আসেন পঞ্চাল বছরের আরতি মওল। ভাঙ্কাকোয় পুলিশের লাথিতে পাঁজর ভেঙে যাওয়া ২৪ বছরের তপন জানা সেদিনের গল্প শুরু করতেই প্রতিবাক করে উঠলেন সাক্ষী প্রসেনজিৎ সঁতরা। 'ওরা পুলিশ নয়। চিনি। পুলিশের মতো' একটা গোপাক ওদের শরীরে ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা যে ওদের গায়েব মাপে করা হয়নি তা বোঝাই যচ্ছিল। গায়ে চহল। হাতে লাগে ব্যাড। ওরা খেজুরির ব্লক থেকে এসেছিল।' পাশেই ওয়ে আসেন নিরঞ্জন কব বা কলাই আড়ি। তাদের মুখেও ওনলাম একই ধনি।

গড়চক্রবেড়িয়ার সাহিমা বিবি। কামতে কামতে বর্ণনা দিচ্ছেন সেদিনকার পারাবিকতার। পারাবিকতাই কেন বা বলি? কোনো পত তার নিজের প্রজ্ঞতির সঙ্গে এমন ব্যবহার করে? মেয়েদের চুল ধরে গাড়িতে তুলেছে। ধর্ষণ করে খুন করে লাশ গায়েব করে দিয়েছে

বইয়ে ওয়েটিং করু কেউ বুক চাপতে ঠাঁততে। অনেক লোক ভরমতে ঠাঁতে ঘিরে। গড়চক্রবেড়িয়ার সাহিমা বিবি। ঠাঁততে ঠাঁততে বর্ণনা দিচ্ছেন সেদিনকার পারাবিকতার। পারাবিকতাই কেন বা বলি? কোনো পত তার নিজের প্রজ্ঞতির সঙ্গে এমন ব্যবহার করে? মেয়েদের চুল ধরে গাড়িতে তুলেছে। ধর্ষণ করে খুন করে লাশ গায়েব করে দিয়েছে।

সাহিমাকে সাহুনা দিচ্ছেন গোদুলনগর অধিকারিপাড়ার বনত দাস অধিকারি। ভূমি উত্তেজে প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে আরাম। জিলাদা করলাম, কোন আক্কেলে সেদিন মেয়েদের আর বাচ্চাদের অপনাবা ওই হিহে পতওলার মুখে ঠেলে নিয়েছিলেন? অপনাবা কি পুলিশ বা পুলিশকেই ওই হার্মানবের কাহে মনবিকতা আশা করেছিলেন?

বসন্ত পোনালেন এক অদ্ভুত ওখা। বললেন, 'ওসির সঙ্গে কথা হয়েছিল আমাদের। উনি আমাদের বিত্তে ছিলেন, যে উনি নিজে আসলেন। গেলাতলি চলবে না।'



নশীগ্রাম হাসপাতালে

সৌজন্য : শশিমন্ডর ক্ষেতমন্ডর সমিতি



শৌচনা : অশোক কান্দু

হত্যা বস্তুর একথা জানেন। কিন্তু আমরা এই দুর্ভেঁ যা তথা পশি তা সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৪ মার্চ 'একদিন' পত্রিকার সাংবাদিক রাত্রী চক্রবর্তী লিখছেন, 'জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আন্দোলনকারীদের প্রতিরোধ সামলাতে জেলা পুলিশ ২৫ হাজার কার্তুজ চেয়ে পাঠিয়েছে। পুর্নালিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বর্ধুড়া জেলা থেকে প্রচুর সংখ্যক পুলিশকর্মীকে নন্দীগ্রামে পাঠি ফেরাতে আনা হয়েছে। মেদিনীপুরের প্রতিটি থানাকে দুটো বাস এবং ৮টি থেকে ১০টি ট্রাকের চাওয়া হয়েছে। এছাড়া পুলিশের ওলিতে বা আন্দোলনকারীদের প্রতিরোধে কোনো পুলিশকর্মী ভয়ম হলে চটভলসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ১০টি অ্যাম্বুলেন্স নজর রাখা হয়েছে'।

আর ২৫ মার্চ সৈনিক স্টেটসম্যানের মহাশ্বেতা দেবী হান্নীয় প্রেস রিপোর্ট উদ্ধৃত করে বলেছেন মেদিনীপুর পুলিশ প্রশাসন ঘটনার কিছুদিন আগেই রাজ্য প্রশাসনের কাছে চেয়েছিল ৪০,০০০ গুলি এবং ৪০টি অ্যাম্বুলেন্স। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, গ্রামবাসীদের ওপর আক্রমণ ছিল সুপরিকল্পিত।

নন্দীগ্রামের ঘটনা যখন ফ্যানসিট শক্তির সমস্ত রূপকে নষ্ট করে গিয়েছে, তখন সরকারের কাছে বিক্টি হওয়া স্ত্রীব সংবাদমাধ্যমগুলি প্রচার করতে থাকে, দুখ্যমন্ত্রী নাকি কিছু জানতেন না। কিন্তু ২১ মার্চ বিকেলে স্বরাষ্ট্রসচিব প্রসন্নরঞ্জন রায় যখন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে কনসেন, 'দুখ্যমন্ত্রীকে সবই জানানো হয়েছিল', তখন এদের চক্রান্তের হাঁড়ি হঠাৎই সশব্দে ফেটে যায়।

প্রসন্নর, ২০ মার্চ সৈনিক স্টেটসম্যানের পাতার পাওয়া তথ্যও যথেষ্ট চাক্ষুষকর। ওরা বলেছেন, 'আক্রমণের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বিস্তারিতভাবে গণহত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই পরিকল্পনার কথা জানত জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও গাড়ি। সি পি এমের পরিকল্পনাগুলি এই ঘটনার আগাম আঁচ করলেও তথ্যবহুতা আঁচ করতে সক্ষম হয়নি।'

১২ মার্চ সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের শিকা কর্মাধ্যক অশোক তুঙ্গা, উচ্চ মধ্যমিক সংসদের উপসেটা তাপস রাজপণ্ডিত ও জেলায়

ডি আই অফিস দাস মহেশবপুর শিবনারায়ণ শিকারতনে গিয়েছিলেন। এই কেন্দ্রে মোট ৪৭০ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। শিকারবিভাগের এই নগদী তুল কর্তৃপক্ষকে বলেন, এই অফিসে গভঃগোল হতে পারে। এই কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের তাই বি এম টি গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তুল কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ করায় ওই অফিসারেরা বলেছিলেন, 'এই পরীক্ষা নিছিয়ে যায় কিনা দেখুন।'

মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই এলাকার পুলিশ পাহারা ব্যাপক বাড়ানো হয়েছিল। প্রচুর বাইরের লোক ভেড়া হাঙ্গিল জননীভাতিয়ে। পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে, এই জননীভাতিতেই আত্মনা পেড়েছিল যাকব্বাহিনী। কী হতে যাচ্ছে, পুলিশ প্রশাসন জানত।

৯ মার্চ আর এস পি'র সাসের অবনী রায় এমন ঘটনার আঁচ করে নিম্নোক্ত প্রিয়রঞ্জন দাসদুর্গীকে ফোন জানিয়েছিলেন, নন্দীগ্রামে একটা সর্বনাশ হতে যাচ্ছে। সেই সতর্কতার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রিয়রঞ্জনের নিয়মশেষে সুরত মুখোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এই কারণেই 'আমি বুঝতে পারিনি নন্দীগ্রামে এতবড় ঘটনা হতে পারে' বলে দুখ্যমন্ত্রী যা বিবৃতি দিয়েছেন তাকে সত্য বলে মানতে পারছেন না এলাকার মানুষ।

এগিয়ে চলেছি আমরা মহেশবপুরের দিকে। পথে আমাদের সঙ্গী হলেন কানোবরিয়া স্ট্রটমিল সংগ্রামী ইউনিয়নের প্রদীপ রায় ও হান্নীয় মানুষেরা। প্রত্যেকের মুখেই সৈনিকের স্বীকৃতিসত্যার গল্প। পুকুরের তলে ডুবন্ত অবস্থায় পিটিয়ে মেরেছে বাজারের। রক্ত লাল হয়ে গেছে পুকুরের জল। জঙ্গোং মাটিতে জানালেন, সি বি আই তনব্বের ডয়ে ৫১ জন বন্ধুকাধারী পালিয়েছে। আমাদের গাড়ি ঘিরে এগিয়ে এসেন চার পাঁচ জন হান্নীয় মানুষ। গাড়ির জানালা দিয়েই ডায়েরি বাড়িয়ে নিলেন পশ্চিমবঙ্গ সোস্যালিস্ট পার্টির রাজা কমিটির সদস্য আবদুল্লা রেজ্জাক শাহ। তাঁর ডায়েরি অনুসারে জানা গেল, অস্ত্রত পাঁচশো জন ধর্ষিতা হয়েছেন সেদিন। নিহত শ'খানেক। নিখোঁজ পাঁচশো, আর আহত ৬৫০। নিহতদের খেজুরির জঙ্গলে, বাসোপসাগরে ফেলে গিয়েছে। নিধার নিকে নিয়ে গেছে। কোলাঘাটে ফেলে এসেছে।



নিহত গুলি

শৌচনা : পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সমিতি

শ্রীর বড়ি মাটিতে পুতে দিয়েছে। জননীইটভাটার আওনে বর মানুষকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন ওরা।

এগিয়ে এসেন পরিচয় মওল। মেয়েদের ওপর অত্যাচারের বর্ণনা বিতে দিয়ে এখনও কৈশব উঠছেন ওরা। পুহবধু সখিতা দুনিয়া জানায়ে সেনাচূড়ার আশুতি দাসের স্তন কেটে নিয়েছে। জানাসেন, মেয়েদের যৌনাসে কল ঢুকিয়ে ফাটরে দেওয়া হয়েছে জরায়ু।

আমাদের ঘিরে ছোটোখাটো ভিড়। দু একটা সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরাও একোণ ওকোণ থেকে ছবি তুলল। কতদিন ঘরে ইড়ি চড়েনি। এগিয়ে এসেন পুহবধু সন্ধ্যা দাস। গোনায়েন নিষ্ঠুরতার আর এক অভিনব কাহিনী। তলি খেয়ে লুটিয়ে পড়িয়েছেন এক ভরলোক। সামনেই ধাঁড়ানো একজনকে পুলিশ নির্দেশ করে ওর বডিটা বন্ধ্যা ভরতে। লোকটি ভেঙালি ক্যাম্পে পুলিশের রায়া করে। বক্ষম তামিল করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে ওলিবিড় লোকটি তারই ভনীপতি। সে বোধহয় কৈশব উঠেছিল। চিংকার করে উঠেছিল। কিন্তু পুলিশের বক্ষম তামিল করতেই হবে — নাহলে তার অবস্থাও ওমনি হবে।

পথে শ্রীর সঙ্গী বাড়ছে আমাদের। এই দুহুর্তে আমরা একসঙ্গে তিরিশ জন। চারটে গাড়িতে গ্যাসগমি করে চলেছি সেনাচূড়া। আমাদের সঙ্গী হয়েছেন স্থানীয় সমাজকর্মী ওভেশ্বর করণ আর কুওরাম হুইয়া।

আমরা চলেছি গোফুলনগর মালপাড়ার রাস্তা দিয়ে। দূরে দেখা যাচ্ছে খেজুরির জননী ইটভাটার চিমনির ধোঁয়া। পুড়ছে সভ্যতা। পুড়ছে আমার ডাইয়ের, বোনের, সন্তানের রক্ত, মক্ষা, মিলু। পাড় ভাঙছে। ধস নামছে, ভাঙছে মানুষের বিবাস। ভাঙছে তিরিশ বছরের আনুগত্য। ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নিঃশীম আকাশে। ক্রোধান্থ দূরলে এক হয়ে যাচ্ছে আমার জন্মভূমির মাটি আর বধ্যভূমির কসা।

দুলাল মালদাস ও ভবানী মালদাসের ঘরে এসে উঠেছি আমরা। কোলের ছেলেটাকে বুকে চেপে রেখেছেন ভবানী। আতঙ্ক, কেউ যদি কেড়ে নেয়। আঙুল দিয়ে বেধালেন মাঠের দিকে। ওখানে মানুষ মলবদ্ধ হয়ে গৌরাস পূজা করছিল। মেয়েরা ও বাচ্চারা ছিল সামনে, ওরা দ্বিধারের কাছে শাস্তির জন্য গ্রাধন করছিল। মেয়েদের ও শিশুদের



সৌজন্য : অলোক হানটরি

সামনের সারিতে বেছে ওরা এটাই বুদ্ধিযেছিল যে সামান্য শাস্তিপূর্ণ। এমন সময় আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। মেয়েরা হাত নেড়ে চৈতন্যে জানায়, তাদের যেন আক্রমণ না করা হয়। সামনে ছিল কালীচন্দনপুর ও সাইলখালির সোকেরা। কোনো সময়ই সেনা পুলিশ। তখনই তারা রবার বুলেট ও টিচার গ্যাস শেল হুঁড়তে থাকে। ভবানী কলসের, সমস্ত এলাকা ভরে গেল ধোঁয়ায়। ১০ মিনিটের মধ্যেই মানুষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওলি চলতে থাকে। সবই কোনোরের ওপরে।

এরপর ২৪ ঘণ্টা ধরে গ্রামতলো বেগেও করে রাখল ওরা, যাতে বাইরের কোন লোক না ঢুকতে পারে। একটি বিশেষ চ্যানেলের এক সাংবাদিক ছাড়া আর কোনো সংবাদমাধ্যমে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আর সেই সাংবাদিক ওদুনার খবর করেছিল কতজন পুলিশ আহত হয়েছে তার তিরিশি। যা জোতিবাপু একেবারেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

মহেশপুর থেকে আমাদের সঙ্গে এক বছর পনেরোর একটি মেয়ে। সঙ্গে ব্যাগে জামাকাপড়। ওভেশ্বর জানায়ে, ১৪ মার্চ থেকে ওকে তাঁরা এ গ্রামে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। যে কোনো দুহুর্তে ধর্ষিতা হয়ে যাওয়ার ভয় এইসব মেয়েদের।

এসে লৌহাময় সেনাচূড়া। একটা গোটা গ্রাম যেন পাগল হয়ে গেছে। পথে ঘাটে যাকেই দেখছি বকবক করছে আপন মনে, বামমর্দ, লকণ শেট, বুদ্ধদের ভট্টাচার্যের বাপান্ত করছে। এক মহিলা: পথ অতিক্রমেন। আলুথানু বেশ। কোথা থেকে আসছি, যেমন কলসের, যদি পারেন, ওকে গবি থেকে নামান। আজ আমাদের ওপর দিয়ে যা গেছে কাঙ্গা জা আপনায়ের ও হাতে পারে। পণ্যদের মতো কীভাবে লগলেন, ওর শিশুসন্তানকে হত্যা করেছে হার্মানবাহিনী।

সেনাচূড়া। শ্রীমারী ফুলে কসছে আমাদের মেতিভাল ক্যাম্প। হুঁজান ডাকার সারি দিয়ে রোগী দেখছেন। কণা হল ভতাবে দাস, রেনুকা বালা মাইতি, অনুরাধা মওল, মাধুরী পাত্র, যা প্রশস্ত বোয়ালের সঙ্গে। একমাত্র ৮০ বছরের রেনুকা বালা ছাড়া প্রায় সব্ব্যতাই ওলিতে আহত প্রতিবেশীদের বিচারে ছুটে গিয়েছিলেন। সেখানে লাগির বাড়ি বেতে হয়। কারও রীত ভেঙেছে: কারও সারা শিরে লালগে চকটী কাঁধ রক্ত, তারও হাতে পায়ের গভীর কত। ওরা আশি বছরের রেনুকা বালা মাইতিতেও ছাড়েনি। ভিকে করে বান বুদ্ধা। দুদিন সেটুকুও জোটেনি।

মাটিতে পড়ে কঁদছেন মাধুরী পাত্র। ওর কাছেরী শোনা ফেল সেনাচূড়ার কেজি ও গ্রাইমারী ফুলের বাচ্চাদের কথা। কতজন? সঠিক সংখ্যা জানা যাচ্ছে না। সেনাচূড়ার অধিবাসীরা বলছেন নেভ্যে। ওয়ের ওরা চপার দিয়ে কটে। তারপর পা ধরে দুডাণ করে খিড়ে খিড়ে গাড়িতে ভরে। আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ চোনের জল রাখতে পারেননি। মাধুরীরা এ দৃশ্য চোখে দেখেছেন। এ দৃষ্টি বুকে নিয়ে বাকি গ্রীষ্মটা কাটতে হবে।

১৪ তারিখের কঁদানে গ্যাসের জ্বালা আতঙ্ক অক্ষম কাজি, শেখ ভেহিরের চোখে। এতদিন পরেও কেন ছলছে চোখ? কী ছিল ওই গ্যাসে? 'ওরা কি আমাদের অঙ্গ করে দেওয়ার বড়বস্ত্র করছে?'

এসেছি শহিদ সুধিয়া জানার বাড়ি। দারিগ্যার মধ্যেও লক্ষ্মীদুহুত সাঝানো ঘর। সামনে তুলসীমঞ্চ। নানা রঙের জবা ফুটে

আছে উঠানে। দুখোবের জল খাব মানে না সঙ্গ মা হারা ১৬ বছরের
কিশোর সৌম্যকান্তি। বাস্তবিতাই শিশুহারা হয়ে গেছে ছেলেটি।

সুবিহার বাড়ির সামনের গলিয়া ডুমি রক্স কমিটির দুগাল
মণ্ডলা দাঁড়িয়ে আছেন। জটলায় বেতেই খোনা গেল, ওরা পাড়ার
সুকা গ্রামণিকের সিপিএম করা ছেলে সহস্রবকে আটকে রেখেছেন
সমবায় সমিতির ঘরে। ওর সারা গায়ে নবের আঁচড়ের দাগ। সহস্রব
টাকার করেছে যে ও একটিক বেশ অবস্থি।

কাছেই বাড়ি ভরত মণ্ডলের। জানুয়ারিতে ভরত প্রাণ
মিয়েছিল। আর মাঠে ওরা কেড়ে নিল ভরতের জ্যাটুতো ভাই ২৭
বছরের প্রতিষ্ঠিতবান দুটবলার কথা পুষ্পেশ্বরকে। ভরতের স্ত্রী রিক্ত,
ওদের বাচ্চা দুটো, পুষ্পেশ্বর মা সুহাসিনী সেকীর কল্যাণ নিধব হয়ে
দাঁড়িয়ে গেছি আমরা। পুষ্পেশ্বর কাকিমা মূর্তি বান্ধেন। আমলের
ডাক্তারবা ওজরা করে ইস্তক সুহ বদলে। জান কেনব পর পুষ্পেশ্বর
কাকিমা ছবিরানি মওঃ
বলেন, 'বুদ্ধ আর লক্ষণ
শেঠের ঠাঁসি দেখে যেতে
চাই।'

ভিড়ের মধ্যে
দাঁড়িয়ে আছেন ওকলের
দাস। জানায়েন, ভাই চুয়দেব
গুলি খেয়েছিল। তার পর
থেকে নির্বোজ। ওনেছিলে
জনকা হাসপাতালে ভর্তি
হয়েছিল। কিন্তু জনকা,
তনমুক, পিঞ্জি লেখাও খুঁজে
পাওয়া যায়নি তাকে। পরদিন
সংবাদপত্র থেকে জানা গেল,
তার সেই পাওয়া গেছে।

এসেছি অবিকারী পাড়ায়। এই সেই জাঘণা যেখানে মূল
নিধনবজ হয়েছিল। আমলের ওবুরের গাড়িকে বিপে শত শত মানুষ।
বেশিরভাগ মহিলায়ই বৃকে গভীর ক্ষত। সমস্ত মেয়েদের আক্রমণ
করতে ওরা বেয়ে নিয়েছে দুটো জাঘণা, বুক আর তলগেট থেকে
লেনর পর্যন্ত। ডুমি উচ্ছেদ কমিটির নেতা স্বদেশজ্ঞান অবিকারী বৌদি
হুজুর অশরয়ে জাবতী দাস অবিকারীর ঘরে ছুটে আসে হাওরায় চরল
আর পুলিশের পোশাক পরা চারটে মূশেরে জ্ঞত। একমল কনুকের
খোঁচায় বৃকে দুটো করে দেব, আর একমল কোমরে তলগেটে মারতে
থাকে লজ্বি। সঙ্গে অপ্রাণ গালিগালাজ। বৌনাসে লাঠি ঢোকানোর চেষ্টা
করা হয় উপস্থপরি।

ঘিরে ধরলেন আরতি মণ্ডল, জাহ্নবী মণ্ডল, পাঠকা জানা,

জ্যোৎস্না গিরিরা। আহত বৃদ্ধা ছবিরানী মওল এসেছেন ততোধিক
আহত স্বামী সুদীল মওলকে নিয়ে। বললেন, 'ধনঞ্জয় একটি মেয়েকে
বর্ষণ করে খুন করেছিল। তার যদি ঠাঁসি হয় তবে বুদ্ধ আর লক্ষণ শেঠ
পার পারে কোন মুক্তিতে? সে কি কেবল ধনঞ্জয় গরিব বলে?'

চোখের সামনে গুলি খেয়ে পড়ে গেছেন প্রতিবেশীরা। কেউ
জল চাইছেন। ওদের সরিয়ে আনতে গিয়েছিলে সুতপা
দাসঅবিকারীরা। মারমোর খেতেও ছ'সাতজনকে উদ্ধার করে এক
প্রতিবেশীর বারান্দায় এনেছিলেন। ওরা সজ্ঞান পেয়ে যায়। তারপর
দুটো বাঁশ দিয়ে অর্ধদুতনের গলার ওপরে নীড়ে করে বাঁধে। সবলের পা
একটা বড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। তারপর মাটির ওপর নিয়ে টেনে নিয়ে যায়
ওরা।

এল কবিতা। কবিতা দাস। ২২/২৪ বছরের মেয়েটি। কোলে
ছ'মাসের ছেলে। রক্তিক চলিশ পরগনার খণ্ডরবাড়ি থেকে স্বামী



ভরত মণ্ডলের মা
সৌজন্য পশ্চিমবঙ্গ ক্রান্তমুখ সমিতি

হেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি
এসেছিল মেয়েটি। দুপুনে
বাড়ির লোকজনকে খোতে
বিচ্ছিন্ন। এমন সময় ঘরে এসে
ঢোকে দুপুনে জ্ঞতওগো।
বাজটার শেঠের ওপর পা
তুলে ওকে মারতে যায়।
কবিতার বর এসে বাজটাকে
বাঁচায়। তখন ডেবালা
বাজারের সাগরী শীটের ব্যাটা
চনা শীট ওকে জোর করে
নিয়ে যায় গোয়ালে। দুটো
গোস্তর খোঁটার মধ্যে ওর
মাথাটা ঠেসে ধরে ওর চরম
অপমান করে। ওর মা আত্মর
দাসের বৃকে গভীর ক্ষত করে

নিয়চ্ছে অস্ত্র নিয়ে। শেষ ববর পাওয়া পর্যন্ত, কবিতা ও ওর মা কেস
করেছে থানায়।

এলাকাবাসীর কাছে মূল পাণ্ডবের নাম পাওয়া গেল —
জয়দেব পাইক, অনুপ মওল, বাসল মওল, নব সামন্ত। গোত্বলনগরে
১৭ তারিখেও মেয়েদের ওপরে অত্যাচার হয়েছে। বাজার বন্ধ করে
ওদের ভাঙে মারতে চাইছে সিপিএম-এমএই অতিশোধ করছেন
নবীগ্রামের মানুষ।

হ্যাঁ। এর পরেও বলাছি অত্যাচারী নপুসেকের দল এর পরেও
লোডে পারে নি নবীগ্রামের মানুষকে। ওদের চোখে সেবেছি অতল
প্রত্যয়। ওঁরা প্রমাণ করেছেন এ মাটি কুবিগ্রাম, প্রদোখ, মাতসিনী
হাজুরার মাটি। এ মাটি পূর্জয় খাঁটি।

স্বেচ্ছায় জমি দান : সরকারের মিথ্যা ভাষণ

১৩ মার্চ ২০০৭ সোমবার উপস্থিত হয় সরকারের জমি স্বেচ্ছা নেওয়ার বৈঠক। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার পূরণে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। ... উপলক্ষ্যে এই বছরে গারো জিলায় ১০০ হেক্টর জমি স্বেচ্ছায় দানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অধিবাসীকে হাতে ব্যান্ডাজ হস্ত বন্ধকার লুট চাঁচায়ে কঠোর অত্যাচার করা হবে। ... ২৭ এপ্রিল রাজপুত্র-পেশদারদের পূর্ণ একাধিকার 'উন্নয়নের জন্য' জমি অধিগ্রহণে স্বেচ্ছা প্রকাশ করা হবে; ৪০ একর জমির ২২৫ জন কৃষিকর্মী মালিক জমি বিক্রিতে অধীকার করেন সম্মিলিত ভাবে। প্রকৃত ফল হবে: ... এমপি বীজক নিষ্পেষণে ঐতিহাসিক সংস্কারের পরিণতি'।

"সোনার ঘান বুক ধরে
জমি মোদের মা
ভূস্বামী আসুক, পুলিশ আসুক
জমি সেব না।"

গোপালনগর মোহাড়া দুর্গাশ্রমিকদের কাছে কৃষি জমি নষ্ট করে দিলে
ব্যানেরে জলজ্বল করছে এই হুড়া-সোণাম। বেড়াওঁড়ি, বাসের ভেড়ি,
কাচেরেলিগা, মিহের ভেড়ি, গোপালনগর এই গ্রামগুলিতে গেলেই
শোনা যাবে 'জমি আমাদের মা, মরতে হয় মরবে, কিন্তু মাকে আমরা
বেচ না'। 'জমি আমরা বিক্রি, সেবনা', 'টাটা ভূমি মূব হটা' ইত্যাদি
সোণাম। কৃষকরা নিজেদের জমির দলিল, পরচা হাতে করে
সাংবাদিকদের সামনে দেখিয়ে কলছেন, 'জমি আমরা বেইনি, সেব না'।
২ ডিসেম্বর, ২০০৬ পুলিশের বর্বর অত্যাচার এবং জোর করে জমি
অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে বাড়ি বাড়ি কালোপতাকা টাট্টিয়ে গ্রামবাসীরা
বিজ্ঞান জ্ঞানিয়েছেন। ৭ বছরের শিশু থেকে ৮৫ বছরের বৃদ্ধা গ্রামে
গ্রামে অনুশনে কলছেন জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে।

এইসব সত্যকে অস্বীকার করে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী,
শিক্ষাসচিব প্রথম থেকেই বলে আসছেন সিসুদের মানুষ নিজের জন্য
স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছেন। 'স্বেচ্ছায় জমিদান'-এর মিথ্যাকে সত্য বলে
প্রমাণ করতে 'স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় জমি বিক্রয়' শিল্প স্থাপন ও
নগরায়নের কর্মটির' পক্ষে ৪২ জনের স্বাক্ষর সংগৃহীত প্রচারণার বিলি
করেছেন। হলের মূব সংগঠন পণ্ডিতব্রত মূব ফেডারেশন ও ছাত্র
সংগঠন এস এফ আইকে দিয়ে স্বেচ্ছায় জমি করিয়েছেন 'স্বাধীনতা
টাটা মোটরস'। সামনে পেছনে পুলিশ নিয়ে ২০০ সোজের মিছিল
করিয়ে সোণাম বেড়া হয়ে 'টাটা-মূব লাগ সেবাম'।

একটি রাজ্যের নির্বাচিত সরকার যদি মিথ্যাবাদ্য, পরাম্পর-
বিরোধী বক্তব্য রাখেন, নাগরিক হিসেবে সত্যানুসন্ধানের দায় থেকে
মায় আনাসর। প্রথম থেকেই কথা হুকিল, 'সরকার জোর করে জমি
করছে না'।

২৫ অক্টোবর, ২০০৬ আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছে,
মুখ্যমন্ত্রী জানান সিসুদের ১০০০ একর জমির মধ্যে ৮০০ একর জমির
জন্য ভাট্টা বেছোত্র চেক দিয়েছেন।

৩ নভেম্বর, ২০০৬ লেখা হয়েছে সরকারি হিসেব অনুযায়ী
মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ প্রচাণজনীয় ১১৭ একর জমির মধ্যে ৮৫৭ একর জমির
সম্মিলিত দিয়েছেন।

অর্থাৎ ৭ নভেম্বর, ২০০৬ এর কাগজে শিউ ও বসিভাসনিক
মহাসচী সেন জানিয়েছেন, ১০০ একর হাতে এসেছে। ... মন্তব্য
নিষ্প্রয়োজন।

২ ডিসেম্বর, ২০০৬ পুলিশের বর্বর অত্যাচারের পর নানা
মহলে প্রাণ ওঠায় সরকার একটি স্টাটাস রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেখানে
বলা হয়েছে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬০৫ একর জমির জন্য চেক প্রদান করা
হয়েছে। অর্থাৎ ঐ তারিখ পর্যন্ত ৬০২ একর জমির মালিক চেক বেননি।
কিন্তু ঐই স্টাটাস রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত
৯৫২ একর জমির মালিক জমি দিতে সম্মতি জানিয়েছেন।

সরকারের স্টাটাস রিপোর্টে জমির মালিকদের সম্মতি
প্রদান-এর বিবরণী কতটা অসত্য তা প্রমাণ করতে
অধিবাসীরা জমির ৭৮৭ জন অসম্মত মালিক তাদের জমির
মাগ নে, জমির পরিমাণ উল্লেখ করে প্রাণমণ্ডর ও
চন্দনবন্দর আমালাতে হলফনামা পেশ করে জানিয়ে
দিয়েছেন, 'না, আমরা আমাদের জমি অধিগ্রহণে সম্মতি
দিইনি। আমরা জমি সেব না।' তারিখ ৯ জানুয়ারি ২০০৭।

গোয়েবৌয় কারবার ১৫২ একর জমির কথা নানাভাবে
প্রচারের পর অবশেষে কৃষি থেকে বেডাল বেরাঙ্গা: ৩১ ডিসেম্বর,
২০০৬ সরকারের দ্বিতীয় স্টাটাস রিপোর্ট বলা হল, ঐপনিবেশিক
ভারতে টেরি ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ সঙ্কটে আইনে সম্মতি
কলন্তে কী বোঝায়। এই আইন অনুযায়ী সরকার কোনো জমি
অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে জমির মালিকের সম্মতি চানদের কোনো
অধীকার নেই। অধিগ্রহণের জন্য তা আশীর্বাদ নয়। একদা কোনো
নির্বাচিত কর্মও নেই। অতএব মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার সভায় ১৪-১৫
বছরের কিসোরদের বুক ব্যাক লাগানে হালা, 'সিসুদের কারখানার জন্য
জমিদাতা'।

চিরঞ্জয় পাল



চন্দননগর ও শ্রীবাসুপুৰ অঞ্চলতে পেশ করা হস্তকৰ্মাৰ ৭৮৭ জন কৃষকৰ নাম-ধাম ও
ভূমিৰ বিস্তাৰিত বিৱৰণ আমাৰা প্ৰকাশ করতে চলোছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভৱ, পাঠক-
সাধাৰণেৰ কাহ্নে স্নেহলিল পেশ করা হবো সত্যতা বিচাৰেৰ জনা। স. উ. ম.

উৎস মানুষ প্ৰাপ্তিস্থান

বই-চিত্ৰ (কফি হাউসেৰ তিন তলা),
বুক মাৰ্ক (কলেজ স্কোয়াৰ পূৰ্ব),
অমৰ কোলে (বি বা দী বাগ),
কেদাৰ মোদক (শ্যামবাজাৰ পাঁচ মাথা মোড়),
ৰাসবিহাৰী মোড়,
সৈকন্ত প্ৰকাশন (আগৰতলা)

মোবাইলে যোগাযোগ

৯৮৩০৬৫৯০৫৮, ৯৪৩৩৮৮৮৮৬২, ৯৩৩১০৪৪৩৩৫

সবুজ সোনার দেশে মৃত্যু মিছিল

সৌমেন নাগ

কাঙালীর মা অত্যাগী দুখার্তী গিমির মতন ছেলের হাতের মুখামিতে বর্ণের রথে চড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। ছোটলোকেরা এমন স্পর্শের ফল কী হতে পারে তা অবশ্য অত্যাগীর জানার কথা নয়। জানার উপায় ছিল না। পরে চট্টোপাধ্যায় অত্যাগীর জ্যেষ্ঠ স্বপ্ন ভার জ্যেষ্ঠ স্ট্রটলেক বুদ্ধিরে দিয়েছিলেন। মাঝের স্বপ্ন দেখার ফল কী হতে পারে তা অবশ্য বুঝেছিল তার ছেলে কাঙালী।

কী স্পর্শ আমলাশোলের শব্দ শবর আর ভার্নিবাড়ির গীত ধরাইকেন। বাবুর আসনে বাগানে, মইধাবু, আমলাবাবু, মলিক কবু। পাতিবাবু, ইউনিয়নবাবু। তাদের গাড়ির ধুলোয় দুটি পাভা আর একটি ঝুঁড়ির তরল সবুজ সোনার এই কোণের পাভাগুলি ধূসর হয়। এখন নাকি এই রাজ্যের সর্বহারার রাজত্বে গরিবের মা-বাপ টাটকা লক্ষ টাকার গাড়িতে চড়ে সব পেয়েছি আসরের বাবুরা চাষা-ডুসার মীরেট মগজে টাটা বুকের বুদ্ধির ব্যাধায় মোক লাভ ঘটাবে।

বাবুরা আসবেন। তাঁরা অবশ্য ছোটলোকের মতন খান না, লাক বা ভিনার করেন। কিছুদিন আগে পাতিবাবুর বড় কঠা জোড়ি এসেছিলেন কয়েকদিনের জন্য। ছিলেন হলং এর সেই বনবাংলোতে। তাঁর নাকি এখানকার মৌরলা মাছ পছন্দ। সঙ্গে তৈ। হেলিকপ্টার পাঠিয়ে শিলিগুড়ি থেকে খাবার আনিবে লাক আর ভিনারের গ্রেট সাজান হয়েছিল সঙ্গে সুগন্ধি সচ চালের সুগন্ধি তাত।

কুখার্তী পিণ্ডে নাকি বহু পূর থেকেই খাবার গজ পায়। ছোটলোক চামা-দুসোরা না খেতে খেতে জো মানুষের আদুরে অনুভূতিকে ধরে রাখতে পারে না। মানুষের সাধারণ আহ্বারের অভাবে কীট-পতঙ্গ খেতে খেতে কীটের অনুভূতিগুলি সে রুণ করে ফেলেছে। তাই কাঁটালওড়ি-ভার্নিবাড়ি চা বাগান থেকে আমলাশোল ... সেই অতুচ্চ মানুষগুলির নাকে যে ভেসে আসে বাবুদের ভিনার টেবিলের ধ্রূপ। কাঙালীর মা অত্যাগীর মতন ভায়াও স্বপ্ন দেখতে শুরু করে মূটো ডাঙের। 'এক মূটো ভাত কেও এক আচ্ছা ফ্যান কেও বাবু'— ভখনা এই আঁতি বাবুর ভিনার টেবিলে ভেসে এসে যাতে কনকালোর পরিবেশে কনকতার ভারী কাতাস ভেঁরি করতে না পারে তার জন্য স্টিরিওফোনিক ব্যবস্থায় বেজ চলে বিট্রোফেনেস সুরমূর্চনা। কুখার্তী ফরাসীসে কুখার কথা তান ফরাসী

বানি উপদেশ দিয়েছিলেন কটি না পেলে কেক খাবে। আভতের প্রস্তুতিয়েও লাভও তাই শুভ মহলে বসতে পাবেন, ফিমুর ক্রাসাট ইটোব কমতা হারালে ভাবনার কী অলস? টাটকা গাড়ি যে আসবে তাতে চড়ান।

আমলাশোলা মূলত উত্তরবঙ্গের চা বাগানের মৃত্যু মিছিল নিয়ে। শুধু এই বর্ণিতা-শিল্প নিয়ে আমলাচনা করতে গেলে কুখা ও অনাহারে মৃত্যুর প্রমত্ততা অনিবর্ত্যত্বকেই এসে পড়ে শিল্প নিয়ে গুণু নয়, যে ভেঙ্গে প্রসন্ন আমলাচনার ওক হুওয়া কথা তার অর্ন্তী ইতিহাসের উৎস থেকে। চা বাগানে ঢুকেই গেলেই যে সামান্য নিকিবে আছে মৃত্যু মিছিল, অনাহার আর অর্ন্তীন, তাই এই কুখা তার মৃত্যুর ভনসতে সামান্য রেখেই ওক করতে হচ্ছে চা বাগিনার হাতাকারের ইতিহাস।

ইতিহাস

১৮৮৮ সালে আসামে চা বর্ণিতা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে ওক হয়েছিল এলস ১'-এব শিল্প সাম্রাজ্যের অভিযান, দুটি পাভা অব এণ্ডি ঝড়ের চনা সেদিন কিত্ত। এই যে খাপন সবুজ পাহাড় ও বনভূমিকে চা-অবলম্বনেও তবে তুলতে হুমিও মানুষের পাওরা ব্যব নি ১৯০১ সালে আসামের চা বর্ণিতা প্রতিকের সংখ্যা ছিল ১,০৭,০০০। এর মধ্যে হুমিও কর্মীরা সংখ্যা ছিল ২০০০-এ২৬ কাম: শতকরা হিসাবে ০.৬৬ শতাংশের নিচে। উত্তরবঙ্গ অর্ন্তে পতিলা, ভলপাইওড়ি (ভুমার) এলাকায় এই অনুপাত ছিল প্রায় শূন্য। চা বর্ণিতা পলন ও প্রসারণের জন্য চা মালিকদের যেভাবে হোট নাপুখ

মধ্যপ্রদেশে দালাল পাঠিয়ে গরির অধিবাসীদের দল দল করে নিয়ে আসত তার ইতিহাসও সেই ঔপনিবেশিক বর্ণিতা শিল্পকেই ইতিহাস— যে ইতিহাস আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় আর্থ, ভুলো বা রাবার বর্ণিতা শিল্প স্থাপনের জন্য নিম্রো দাস ব্যবসার ইতিহাস, যে ইতিহাস ফিলিপাইনসে বা শ্রীলঙ্কার বর্ণিতা-শিল্পের জন্য তাহতীয় প্রমিক চালানোর ইতিহাস, সেই একই ইতিহাস এই এলাকার চা বাগান স্থাপনে প্রমিক আহবানির মধ্যে বুঁজে পাওবা থাকে। এতই বর্ণিতা, একই শোষণ, বর্ণনা ও অত্যাচার। History of the Indian Tea Industry বইতে

এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ কনিফারেন্স ১৮৬৫ সালের ১শা মে থেকে ১৮৬৬ সালের ১শা মে, অর্থাৎ এই দিন বছরে, ভারতের মহাভাগের অধিবাসী জনক থেকে ৮৪,১১২ জন অধিবাসীকে চা বাগিচাগুলিতে নিয়োগের জন্য নিষেধ আদেশ হয়েছিল। এদের মধ্যে দুইটা ঘটনাই ৩১,৪৭৬ জনের। এই হিসেব থেকেই সোখা বাঘ সেদিন স্বী নিম্নতম অত্যাচার ও অসহ্যকার অর্থহীন এই অধিবাসী শ্রমিকদের কাজ করতে হত।

এই চা বাগিচা শিল্পে অপরকর্তি ঘটনা কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক পণ্ডিতদের চোখ এড়িয়ে যাবার কথা ছিল না। উত্তর দিক থেকে দুই কোটির এই বিশাল এলাকা ছুড়ে চা বাগিচার পত্যনে অনেক লোক শ্রমিকের তব রকম জোর কার্যে দূর ভাগ্য যা থেকে ধরে আনতে হল, অথচ চা বাগিচাতে স্থানীয় কৃষিপুরুষ কেউ এগিয়ে এল না। এরা চা-চায়ে ছিল অসহিষ্ণু এই মুক্তি খুব একটা লাগ করত না, কারণ যে সমস্ত অধিবাসী শ্রমিকদের এখানে আনা হয়েছিল তারাও এম আগে কোনদিন ওষু যে চা গাছ দেখিনি তাই নয়, এই অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের এদেশকার চলাকায় ও মটির সঙ্গে আত্মীয়তা থাকলেও আগন্ত অধিবাসীদের কাছে তা ছিল একেবারেই অজানা। হবু ভাঙ্গা এই নতুন জীবনকে গ্রহণ করে এলাকা ছুড়ে গড়ে তুলল এক ভিক রাজত্ব। পাশ্চৈ ব্রিটিশ এই পোকার আর্থ-সামাজিক ও জনবিন্যাসের চর্চিত।

টেনসি: কিন্তু ওল্ডপুর্ণ।

নম্রালবাহি প্রাসাদসমূহে প্রথম কাম্বোজের পুণ্ড্রিশের ওসি চালনায়ে যে আন্দোলনের খুদিশ সারা বেশে হুড়িয়ে

পড়েছিল, সেই উৎসাহকে কৃষক বিদ্রোহের ওক বলা হলেও একটা প্রা থেকে যায়, সেদিন নম্রালবাহিতে থাকা বইসি হয়েছিলেন তাঁরা সেই অর্ধে কৃষিশ্রমিক ছিলেন না। এরা ছিলেন চা বাগিচা থেকে উদ্ধৃত শ্রমিক। সেদিন এই এলাকার প্রকৃত কৃষক রাজবাসী সমগ্রায় যে এই আন্দোলন থেকে নিজেদের অনেক দূরে রেখেছিল সেটা কিন্তু এই আন্দোলনের জনকদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। আরও উত্তরবঙ্গের গা আন্দোলনে চা বাগিচা ও সাধারণ এলাকার মধ্যে একটা পৃথক পৃথক বিভাজন রেখা আছে। বর্তমান প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু এই প্রসঙ্গে না হলেও আরওদের চা বাগিচা শ্রমিকের মুখা মিলিত এবং অলিক তথ্যবিশিষ্ট সেবা ও আন্দোলনের অবাস লুইরে বিষয় নিয়ে আলোচনাতেও এই প্রসঙ্গ টিকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

স্থানীয় কৃষিপুরু রাজবাসী সম্প্রদায় যে এই চা বাগিচা শিল্পে অংশগ্রহণ করত তার একটা কারণ অর্থনৈতিক কম মজুরি। করিমগঞ্জের মহকুমা শাসক ১৮৮৩ খ্রি: লিখেছিলেন 'The rate of wages of (Emigration) Act Labours was less than Rupees three during the last season. Bengalees in the adjoining villages earned without difficulty Rupees seven per month.'

সামগ্রিক দৃষ্টান্তেই রাজসিংহকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিকিমের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেও রাজসিংহ পার্বতা অঞ্চলসহ সমভাগের নগরায়ন গড়ে উঠেছিল চা শিল্প বিকাশের সঙ্গে ভাল বেলে। ১৮৩১ সালে কেন্দ্রবলে নেপথ্যের পাহাড়ের কঠিন বৃক জোড় সামগ্রিক প্রয়োজনে যে রাজ্য নির্মাণ হয়েছিলো তা আর পাহাড়ভিত্তি বেড় নায়ে পরিণত। ক্রমবর্ধমান চা সামগ্রী পরিবহনের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল আরেকটি সড়ক ও সেই সঙ্গে রেলপথও। ১৮৬০ সালে যে বাস্তব নির্মাণের কাজ শুরু হল সেটি দিলকট রোড (হেনরিজ বোর্গেস) নামে আর সকারই জানা। ১৮৭৮ সালে কলকাতার টম মিলনে ও বামসে কোম্পানির রেললাইন পাতার দিক দিয়ে সেওয়া হয়েছিল। ঘন দুপন ও খাপন সম্বল এই পাহাড়ের বৃক চিহ্নে রেললাইন পাতার কাজ ছিলে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর, তবে তার থেকেও বড় সমস্যা হয়ে বঁচেছিলে শ্রমিকের অভাব। এইসময় এক অজ্ঞাত রহস্যজনক কারণে সমগ্র অঞ্চল ছুড়ে বেগা দোষ ভাবাবে পুঁজিক। অথচ পুঁজিক ছিল এখানকার মানুষের অজানা। যা কিছু ফসল ফলত তা এখানকার চাচির খেঁচাবার

পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই পুঁজিকের রহস্য আরো কানা কাঁধে যখন সেবা যায় বামসে ও টম মিলনের পক্ষ থেকে যোগা করা হল রেললাইন পাতার কাজে যোগ দিলে খাবার ও বেশন পাওয়া যায়। আর চতুর বনিয়া। ইংরেজ শাসকেরা 'রিভিগ অপারেশনের' নামে প্রায় বিনা মজুরিতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেলস্টেশন স্থাপনের কাজটি করে নিয়েছিল। বাস্তবিত্য পূর্ণের সৌন্দর্যে ময় আভকের ভ্রমণবিলাসীরা

জানেন না ওষু দুটো ভাতের আশায় কত মানব এই রেললাইন পাতার কাজে বৃক পোত দিয়ে আর কোনোরূপে ফিরে যেতে পারে নি।

১৮২৩ সালে মেজর বরাবী ক্রসের ভবনী চোখে আসামের বনভূমিতে জঙ্গি চা গায়েব অস্তিত্ব ধরা পড়ার পর থেকেই রাজসিংহ সহ উত্তরপূর্ব ভারতের সামগ্রিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটিই পাশ্চৈ যায়।

পঞ্চম না হলেও ইতিহাসকে পাশ্চৈ সেওয়া যায় না। তাই আভকের আসামের বিচ্ছিন্নতার দাবি নিয়ে ততই বিরোধ জলুক না কেন, ইতিহাস বলে — আসাম কোনো অর্থেই ভারতের ভূখণ্ড ছিল না। এমন কি ইংরেজ সরকারও এই জঙ্গল-ঢাকা পূর্ণ অঞ্চলকে কখনো আনার জন্য খুব একটা উৎসাহী ছিল না। বলা যায় ১৮১৭-২৪ সালে বার্মার আক্রমণে পুণ্ড্রিয়ায় নিরাপত্তার অগত্যা সেবা দিলে ইংরেজ কোম্পানি একরকম বাধ্য হয়েই তখন পর্যন্ত রাজ্যে আসামের প্রায় অস্বাভাবিক এই ভূখণ্ডকে ১৮২৬ সালে জঙ্গলের সমাজ্যের অস্তিত্ব করেছিল। প্রথমে নির আসামের কামরূপ এবং বারস জেলার একটা অংশ তাদের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অঞ্চল থেকে যেটো রাজ্যে আশ্রয়ের পরিমাণ ছিল তির লক্ষ টাকা। আবার আসাম সম্পর্কে তাদের নজর না থাকায় কারণ সেখানকার জেলাগুলির যেটি আর ছিল

এক লক্ষ টাকা (Assam In the Days of Company (1826-58) H. K. Barpujari)। কিন্তু আমাদের মতিতে চা বাগানের সম্ভাবনা কেবল কোম্পানির সব বিধা কেটে যায়। ১৮৩৬ সালে সমগ্র আসামকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করা হয় আসাম টী কোম্পানি (১৮৩৮)।

ঘটনটি উল্লেখযোগ্য কারণ সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের নিছক এই ব্যক্তিগত শিল্পেরই যে মুখ্য ভূমিকা ছিল এটি জানা না থাকলে আজকের চা বাগানের অবস্থানকে কেহো বুঝিল হইবে।

১৮৪১ সালে ডাঃ ক্যাম্পবেল তাঁর বাসভবনে নিছক পাখের চা গাছ লাগিয়েছিলেন বসি। এই কেম্প ১৮৫৬ সালে পেন্স-এর কাছে থাকে চা বাগান স্থাপনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল চা বাগানের গোড়াকান। ১৮৪১ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে উঠিয়েছিল ৯১টি ডে। জলপাইগুড়ি অর্থাৎ তুয়ার্স এলাকায় ১৮৭৪ সালে গাজেলডোবায়া (হর্টম্যান তিন্ভায় তলিয়ে গেছে) প্রথম প্রথম চা বাগানের পত্তন ঘটিয়েছিলেন। এর পর ১৯০০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা নৌহে গেল ১৫০-এ। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে দেওয়া যায় ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম তরফে স্টক চা কোম্পানি ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যোগেশচাঁদ চা বাগান। এর উদ্যোগে ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর শিষ্য ভগবান চন্দ্র বসু। প্রথম ব্যক্তিগত চা শিল্পপতি ছিলেন নোয়াখালি থেকে আগত জলপাইগুড়ি আমালতের পেশকার বান বহদুর রহিম বক্স। ১৮৭৭ সালে তিনি স্থাপন করেছিলেন ৭২৮ একরের জলঢাকা চা বাগান।

এখন চা-বাগান

আজ চা বাগানে তাক নেই। ভূমিকের কেহো দুটি হাত কাজ চায়, সমনের বাগানের চিন্তিতে কেহো নেই। অল্পত পাকস্থলি খাবার চায়, কর্মহীন হাতে ভাত নেই। মানুষগুলি কীভাবে চায়, কুসম্মুসে কুওয়া টানার ক্ষমতা নেই। কেন এমন হল? কেন এমন হবে? এই বাগানেই তো সোনা ফলত।

চা বাগান ছুড়ে চলছে মুত্থা মিছিল। বছর দুয়েক আগেই অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৭০০-একও বেশি। একমাত্র কাঁঠালগুড়ি চা বাগানেই মারা গিয়েছিল ১৫০ জন, রহিমাবাসে এই সংখ্যা ছিল ১০০। এবার ভার্নিকালি চা বাগানে ইতিমধ্যেই ২০ জন না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। এই মুত্থা মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে ছড়িয়ে পড়েছে, কাঁঠালগুড়ি সিপাইকোরা, রামকোরা, চানুটি, রামপুর, বামনডাঙা, টুপু, শামসিং, টিনুলা, শিকারপুর, ফালগিনি থেকে আরো আরো চা বাগানে। ওরা সবাই যেন সমাজতন্ত্রকে ডেকে কেটে টাটা-সালেদের নব্বা সমাজতন্ত্রের শ্বশান ঘাটের খাটী হতে নির্বাক নিশ্চল হয়ে মাটির খুলোর ওয়ে আছে।

মানুষ যে মরছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না। তবে সরকারের পরি একা কেউ অন্যায়ের মরছে না। গত দু'মাসের মধ্যেই মুত্থা তালিকার মধ্যে ওদু ভার্নিকালি থেকে নাম উঠছে রামেশ খাতিয়া, ফুলা ওঁরাও, বসন্ত ববাইক, দুঃখী ববাইক, বদু ববাইক, ভূমিকা টোয়রা, অনুপা দর্শি, জসমতি ববাইক, মহাপল দেবহা, পুনিয়া নাগবানী, মিসপা খাতিয়া, জগিয়া ওঁরাও, অগন্ত নাই, গমহস্ত ওঁরাও, মীতা ববাইক, জোহান বরা, বিও মুত্থা, গেসনার খাতিয়া, অগালা ববাইক লিপিদিয়া ববাইক, বিনিরা ববাইক, ... তালিকা যে প্রতিদিনই বেড়ে চলছে, সরকারি ভাষা অন্যায়ের নয়, নজরত্বা অথবা অশুভিত্তি মনে গেছে।

বাগান বন্ধ। হালিক রাজধানীতে ব্যাজার আহায়ে 'শিল্প আমলের ভবিষ্যৎ' উপন্যাসের আসলে বৃত্ত: শব্দসম গম্ভীর মত উপ করে চলেছে। প্রতিকূল ১৫০ কোটি টাকা প্রতিভাটী ফাত মল্লি থেকে কেটে নিয়ে যেমসম্মু গানের করে নিয়েও একজনের বিকল্পও আইনো হাত এগিয়ে আসে নি।

বেকার কর্মিক। ডিকার পাত নিয়ে কতরা পরজায় ইতিহাসে লাভ নেই। সবায় হুগুই যে ডিকা পত্র। ভাত চওগান গ্রহই নেই, ঘান দেবারও লোক নেই শূন্য পাকস্থলি: দেখানে অশুভি, বহুভম, রক্তপাতের জাফান লেখকে।

শিল্পগুড়ি শহরে চলে প্রায় ২৫ হাজার বিল্লা। চালক মূলত জমি থেকে ক্রমাগত উচ্ছেদ হয়ে আসা রাজকর্নী সম্প্রদায়।

বক চা বাগানে ওদু যে আনিবানী প্রমিতেরাই অন্যায়ের বহুহু তা নয়, বাবু কর্মচারিদের সামনেও অন্যায়ের হাতছানি। তাদের ভাতের উৎসটাও তো এই চা ভূমি। তাদের আরেকটাই অনাহার-ক্রিষ্ট শরীর নিয়ে অধবিকসুলত লক্ষ্যায় বে-অন্ত হয়ে চাগাছের কোপের গোড়ায় কলত পারেনি বাট, তবে তাদের মুখেও অনাহারে মৃত্যুর ছায়া ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অন্যায়ের বাঘা অন্যায়ও। চা বাগানকে কেন্দ্র করে যে যোঝান, সেখানে নেই বনিকার। শায় দেবার টাকা নেই। ডাক্তারের ওখারে রোগী নেই। ওদুও বেকার ক্ষমতা নেই। সিনেমা হাউস নরক নেই, টিকিট কেনার পক্ষা নেই। সামনের বরানওয়ালায় ডালা নেই, বাসম নেওয়ার পক্ষা নেই। বাসে নেই প্রমিকের ভিত, টিকিট কেনার পক্ষা নেই। শহরের ছোট বড় ব্যাবসায়ীরা আতঙ্কে লিগ ওদুহে, মৃত বাগানে তাদের সরবরাহ বন্ধ। চা বাগানের মুত্থা শাট ওদু চা প্রমিকের মুত্থা নয়, চা বাগানের মুত্থা উত্তরবঙ্গের মুত্থাদেবী। অথচ এখানে বাস করে সারা রাজ্যের ছোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ।

মুত্থা হিয়জনসহ মানবিক প্রথমেই কারো দুঃখজনক হলেও মৃতদেরেরে খুণ দেখলে যেমন শকুরের উল্লাসধ্বনি চাপা থাকে না, তেমনি এই চা বাগান শিল্পের মুত্থাও এনে দেয় মুনাফা মুণ্যায়

কারবাগিরের মনে উদ্ভাসের জোয়ার। চা বাগানে লাভ হচ্ছে না এই অল্পমাত্র হুসে যদি শিলিগুড়ি শহরের উপরন্তু ঈশানগি চা বাগান উদ্ভূত ঘটিবে ১২৫ কোটি টাকার সরকারি ভূমি (রাষ্ট্রা সৰ্বস্বত্বের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব পত্রের হিসেব অনুসারে) মাত্র ১৪ কোটি টাকারও কমে বাগানেরই মালিক বীপনের চম্পাধাৰ্য্যদের 'লক্ষী উইনিশপে'র হাতে প্রমোচণি ব্যবসার জন্য দেওয়া হয়, তবে চা বাগিচাৰ ফটকাৰাচ মালিকরা যে এই শিক্ষাত এইভাবে হুত্যা করে দুনুতা লুটের খনি শিলিগুড়িয়ে সরে পড়তে চাইবে তাতে আশঙ্ক হবার কিছু নেই। ঈশানগির এই উচ্চতম বাগানবীর পলিগুতে গুলি চাঙ্গিয়ে ঐত্বতা করতে হয়েছে দুজন প্রতিকতে। ঈশানগির উদ্ভাসের এই হাফে-বতির সাহসই এই সরকারের দিম্বুর ও নন্দীগ্রামে পুলিশী অভিযান ও গণহত্যার কাড়তি সাহস স্বপ্নিয়েছে নিকই।

সরকারি হাত ধরে বাগান চুরির মোজাব

'পুতুর চুরি' বাগানারাটি কে প্রথম বাংলাৰ অভিযানে যোগ করেছিলেন জানি না, তবে চা-বাগিচা চুরি কেন্দ্র করে ঘট চলেছে তা উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে অস্ততঃপক্ষে অজানা থাকার কথা নয়। সেনানী চা বাগানেই ইতিহাস ত্রো হাতের কাছে মজুত আছে।

১৯৬০ সালে গ্রেট লেপল্যান্ডের টি কোম্পানির বীপনে যোগ সাব ওডালটার ডানকান ও সি ওডলিৰ প্রতিষ্ঠিত ডানকান ব্রাদার্সের কাছ থেকে ২ লাখ টাকার বিনিময়ে ১১৭৫ একরসর লাগণ চা বাগানটি কিনে তাঁর বেহের নামে এই বাগানটির নতুন নামকরণ করেন সেনানি চা-বাগান। উদ্ভাৰযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, এই চা-বাগানের জন্য সেই জমির মীজের বেদা ১৯৫৫ সালেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আইনগতভাবে এ জমির মালিক তাই সরকার হলেও এইভাবে মালিকানা হস্তান্তর মীচ পুনৰ্বীকরণ না করেই চলে। সরকার সব জেনেও চুপ করে রইল। ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক ও এই চরম অনিয়ম থাকে সন্তুে জনগণের টাকা ধরার নামে বহুবারি নিতে বিধা করেন। বীপেনবাবু ১৭ বছর বয়ে যখন বাগানটি হস্তান্তর করলেন তখন ব্যাঙ্ক, টি বোর্ড, জমির বাজনা, পি এফ ইত্যাদি ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল ৪০ লাখ টাকা।

এই সাহের বোকা বাখায় নিয়েও কিন্তু বাগান ভ্রম করার লোকের অভাব ছিল না। বিষ্ণু কুমার খেমকা ও তাঁর ভাই কৃষ্ণকুমার খেমকা বাগানটি কিনতে এগিয়ে এসেন। তাঁরা গ্রেট গোপালপুরের সেনানি ও রূপালি বাগান দুটো কিনে নিলেন। এই সঙ্গে কিনলেন এসেরই অন্য বাগান ওডহোপ। এর এক বছরের মধ্যে (১৯৭০) সেনানিও রূপালি দুটি বাগানই বন্ধ হল। পরের বছর (১৯৭৪) বন্ধ হল ওড হোপ।

এতে কিন্তু খেমকাদের ক্ষতির বদলে লাভই হল। বীপেনবাবুদের কাছ থেকে এই চা বাগানগুলি নিতে খেমকাদের এক পরমাণু দিতে হয়

নি। বীপনে বাবু যা লাভ আশেই করে নিয়েছিলেন, একর ছিল তার লাভের চেয়ে বেশি।

বীপেনবাবু এই বাগানটি কিনেছিলেন ২ লাখ টাকায়, প্রতি বছর সব বছর বাবুর কম করত ২ লাখ টাকা লাভ করলে এই ১৭ বছরে তাঁর ঘরে এসবে ৩৪ লাখ টাকা। এছাড়া অমরের জন্য বেলসাইন ও প্রতিরক্ষার জন্য জমি অধিগ্রহণ বাবুর বীপেনবাবু ইতিমধ্যেই যেটা আকের কতিপুথনের টাকা পরটে ভরে নিয়েছিলেন।

খেমকারা বীপেনবাবুর কাছ থেকে সম্পূর্ণ 'বাগে' বাগান কিনেছিলেন। তাঁরা এক বছরের মধ্যে সেনানি কম্পানির অস্থায়ী সম্পত্তি, যেমন ট্রাইব, ট্রাক, নিউটন সাহেবের বহু দুলাবান সাংগ্ৰীদ বাংলাে ভেঙে বাজারে বিক্রি করে নিলেন। কয়েক হাজার মন চা ব্যাঙ্কের সম্পত্তি (Hypothecation) হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রাধিকারি ব্যাঙ্কে বিক্রি করে নিলেন। এছাড়া বাগান চালাবার নাম করে ব্যাঙ্ক থেকে ৪ লাখ টাকা স্বপ তুলে বাগান খেতে চলে পেলেন। জমিকদের পাওনা মেটাবার পরিবর্তে কোম্পানির প্যাডে এবং একখানা টেলিগ্রাম আরফত জানিয়ে দিলেন তাঁরা বাগানের ঘাৰ্শ্বেয় সেনাসহ বাগানের মালিকানা প্রবিকসে

হাতে অর্পণ করে দিলেন।

এই চুরির মধ্যে জড়িয়ে আছে চা
বাগানের কাটকাব্যাজ মালিক, বহু
প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা,
রাজনৈতিক কেউ কিছু, মহী ও
ব্যাঙ্ক আমলা

এভাবেই ঘটে চলেছে একের পর এক চা বাগান চুরি। এই চুরির মধ্যে জড়িয়ে আছে চা বাগানের ফটকাৰাচ মালিক, বহু প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, রাজনৈতিক কেউ কিছু, মহী ও ব্যাঙ্ক আমলা।

চা বাগিচায় আছে ছোট বড় ৩২টি ট্রেড ইউনিয়ন। একেব নেতৃত্বে নেই

আনিকানী প্রতিকেরা। বাবু নেতাওই প্রাক্ষণ প্রোগ্রোজিতের মনন ভগবানের দরবারে শূদ্রের প্রার্থনা পৌছে খেবার কাজ করে। শূদ্রের প্রক্শাধিকারের নিষিদ্ধকরণের মতন এখানে প্রকৃত প্রতিকদের প্রবেশধিকার নেই। প্রতিকেরা নাড়ি ক্রয় করতে বাবু নেতাদের হাতে চোদা নামে 'ডোলা' হুসে নেয়। মালিকেরা লুটের টাকাকে অধাৰ করতে তার ডাঙর বাবু প্রতিকনেতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবানের ঘরে পৌছে দেয়।

এই লুটের মৃগায় চা বাগিচা শিলি থাকতে পারে না। যে বাগিচা ছিল বাগিচা-শিলি তা আন্ধ পলিগত হয়েছে দ্বিধক গনি ব্যবসায়। তাই এই মালিকানা হস্তান্তরের ফটকাৰাচিতে এক মালিক এসে চা বাগানের ছাল চামড়া ছাড়িয়ে লুট করে পরের মালিককে লুট করার জন্য হস্তান্তর করে চলে যাচ্ছে। এখন আর তাই অধিকাংশ বাগানে প্রতিকগণগ্রাস্ত ম্যানেজারের দরকার নেই। নিয়োগ করা হয় গনি ব্যবসায়ের মূলিদের। তাদের সঙ্গে বাগানের উন্নতির পরিবর্তে বছরের বার্ষিক উৎপাদন-তিত্বিক চুক্তি হয়। নিয়ম হচ্ছে, যে গাছ থেকে পাতা তোলা হবে তার থেকে ৭ থেকে ১৮ দিনের মধ্যে পাতা তোলা। একে কচা হয় 'ফ্রাশ'। অথম ফ্রাশের পর পরের পাতা তোলায় ফ্রাশের চেয়ে পরিপুষ্ট তিনটি পাতা যাবে ব্যক্তি পাতা তুলতে হবে। এই তিনটি পাতার পাশাপাশি আরো একটি পাতা রাখা হয় একে বলে রানি পাতা। চায়েৰ সেবা করলে বোজাৰ গোডেন ফ্রাওয়ার অরেঞ্জ শিকে (GFOP).

চায়ের ওপমান নিয়ে উঠছে নাকি অভিযোগ। হাতছাড়া হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজার। কে রাখবে চায়ের ওপমান? তাদের লজা তো পরিমার্জ। ভাই দ্বিটি পাত্র একটা কুড়ির কথল বুড়ো চা পাত্র মিশিয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে দিলেই হল। তারপর তো চলে ঘাবাব ব্যস্তা খেলাই আছে। বাগানের সর্ব্বর লুঠ করে প্রমিকদের পাওনা মেসে ব্যাস্তর টাকা সহ অন্য দায় আরেক লুঠের মালিকের হাতে দিয়ে সবে পড়লেই হল।

লাগানচুরির এই সব কৌশল এখানকার একটা ছোট্ট ছেলে জানলেও সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা রাজনৈতিক কঠোরত্বের কাছে রহস্যজনক ভাবেই এসব নাকি অজানা। এই সমস্ত মালিকেরা নিজস্বের পরিবারের নানা ভ্রমের নামে কার্য পূলে তাদের নামে বাগানে কাঁচামাল যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি সরবরাহের ডুবা হিসেব দেখিয়ে সিমিট্রিড কার্গার অর্থ নিজের পকেটে পুরছে। বাগানের নামে সরকারি ভর্তুকির সার এনে বাগানে ব্যবহার না করে বাজারে বিক্রি করা, টি বোর্ডের অনুমোদনের টাকা কাগজ কলমে স্বরূপ দেখিয়ে নিজস্বের পকেটে গোরা এমন এখন অভিযোগের পরিবারে নিম্ন হতে পড়িতেছে।

মালিকেরা কপট আর্দ্রানস ব্যবহে চায়ের নাকি লজারনের পায়ে না। বাজারে ক্রেতার অভিজ্ঞতা যে অন্য কথা বলে। আসল ঘটনটা পুঙ্কর চুরির নড়নই চা চুরি। এক কাস্ট্রির সেল বা নিলাম-বাজারের বাইরে চা বিক্রি করে যে ডাবাব চুরির ঘটনা উঠে ফুলে তো নেতা, মন্ত্রী, আমলা সবাই চায়ের। নিলামকেন্দ্রের বাইরে ১০০ টাকা ফেলি করে চা বিক্রি করে বাতায়-কলমে ৩০ টাকা দর বেকানো তো এখন সহজ ব্যাপার। নিলামকেন্দ্রেও আছে সিভিকিটে। গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান সমস্ত ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাইরে ১০০ টাকার ব্যবস্থা করে নিলামে দাম ৪০ টাকা ধরলে বাকি টাকটা হিসেবের বাইরে পকেটে গোরা যায়। এতে ঠকছে শেদার হোসদাররা। সরকার হায়াচ্ছে রাজস্ব, প্রমিকেরা ঠকছে মিথ্যা সোফাসানের হিসাবে। ফেলে ফুলে উঠছে মালিক, এক শ্রেণির নেতা ও আমলাদের কালো টাকা।

প্রমিক সমন্বয় এবং বাম সরকারের বেইমনি

চা বাগিচা চুরির এই ঘটনটা সেনালি চা বাগানের প্রমিকেরা ও শুধু ধরে ফেলেছিল তাই নয়, তারা হাতে কলমে দেখিয়ে নিচ্ছেল এই চুরি না হলে চা বাগানে সতিই সোনা ফলে। সেদিন সোনালি চা বাগানের প্রমিকেরা সতিই এক অজুতপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলে। মালিক বাগান ছেড়ে চলে গেছে। ২২৫ ধর প্রমিক। তাদের সঙ্গে চাগায়ে বাড়ির বন্ধন। তাদের হাতের হস্তে এই পাছতুলি নিশ্বাস নেয়।

১৯৭৩ সালে পুজোর মুখে মালিকেরা যখন কাউকে না ছানিয়ে বাগান ভাণ্ড কর চলে গেল তখন প্রমিকদের নিম্নহারা অবস্থা। কিন্তু মিলা তারা ঠিক করে নিল। সোনালি থেকে জলপাইগুড়ি সবারে পুরন্ত ৩০ কিমি। এই দীর্ঘ পথ তারা পায়ে হেটে জেলাশাসকের কাছে বাগান

খেলার দাবি জানাতে এস। এই পথে শুধু পুঙ্কর প্রমিক নয়, মালি প্রমিকেরাও দিলে সন্তানত্বের বেঁচে সন্নিহিত হয়েছিল। জেলাশাসক তাদের কাগজে দিলে দিলে 'যা পার কর' পরামর্শ দিলেন। আসল সেই দীর্ঘ পথ পায়ে হেটে ফিরে এল তারা। সবে ফিরে চিন্তার মেঘে।

সেটা শীতকাল। চা বাগানের পাড়া পোশা হয়ে প্রমাত বসন্ত ও বর্ষাকালে — মার্চ থেকে নভেম্বর। তার পর পাড়া চোলা বসন্ত। প্রমিকেরা ইতিমধ্যেই ছিল করে ফেলেছে তাদের 'যা পার' ভাবনার তিতানা। পরামর্শ চিন্তার খেপের। মাঝে উঁচু করে কাঁচা পদার্থ। প্রমিকেরা পরিচয় নিয়ে কাজ। হিত হল এই কামাস ছাড়াই নয় (Shade tree) ও খর ছাড়াই ঘাস বেড়ে তারা কাজ এক করবে। বৎসানানো মন্তুর দার হল — ০.৭৫ পেসো নির্মিত।

চা বাগানের মালিক তো তাদের প্যাডেই জানিয়ে দিয়েছে সমস্ত পদসহ তার বাগানটি প্রমিকদের হস্তান্তর করেছে। সোনালি চা বাগানের প্রমিকেরা সবাইকে চমকে দিয়ে খেপেই করলেন সমন্বয় নির্মিত পড়ার কথা। কোর্ট পঠিত হল শুধু প্রমিকদের নিম্ন। এমন কি চিন্তার খেপেও তার সমস হালন না।

প্রমিকদের কোনো প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই চুকে পড়ল বাম রাজস্বের পুন্নি। তত্ত্ব সিসায় বিদ্ধ হল চা বাগানের প্রমিক। খেমকাঠের বলিয়ে দেওয়া হল মালিকানার চেয়ারে

চার বছরের মধ্যেই চা বাগান ঘটে গেল বৈশ্রবিক পরিবর্তন। বাগানের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসিয়ে গেল মালিকানাধীন প্রকাকারীম বেকারত্ব। যেমন বেড়ে ফল অন্য সব বড় চাগাগানের প্রমিকের সমান। কেসা হল নতুন জিপ, নতুন টায়ার ২০ হাজার টাকার চলসরবরাহের আধুনিক ব্যবস্থা হল। বাকেরা প্রতিভেট ফল ভরা হল।

প্রমিকেরা নিজেরা বসে ঠিক করলেন তাঁদের বোনাস। তাঁরা হল বেঁচে এসে পছন্দ করে নিলেন তাঁদের ছাড়া, বর্ধতি ও ছুতো। এ যে অধিকারের শপথ। তার থেকেও বড় কথা তাঁরা প্রমাল কালেন চা নিয়ে প্রমিক পরিচালনা, প্রমিক আর্থনির্ভরতা ও দায়িত্বশীলতার কথা। ভারতীয় স্টেটব্যান্ড জলপাইগুড়ি শাখায় জমা হল ১,৩৫,১৬৫.৬৬ টাকা (আ্যকার্টউট নম্বর ১৬২৩)। জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যান্ড (আ্যকার্টউট নম্বর ১১১) জমা হল ১,৪০,০০০ টাকা। মোটামুটি হল ব্যান্ডের ৭৭ মিটিয়ে দেওয়া হয়ে।

ইতিমধ্যে রাজ্যে হুপিট হয়েছে সি পি এর নিমন্ত্রিত বামফ্রন্ট সরকার। প্রমিকেরা আশায় বুক বাঁধলে। চা বাগানে 'প্রমিক রাজ' প্রতিষ্ঠার রাজ্য সরকার নিম্নই এগিয়ে আসবে। কিন্তু হুল প্রভটা যে অন্যভাবে। সোনালি চা বাগানের এই সমন্বয় যে সমস্ত চা বাগিচা মালিকদের কাছে এক ডাবাবই বাড়ী নিয়ে ছাড়ির হয়েছে। এই সমন্বয় টিকে থাকলে এখানকার ৩০০ চা বাগানেই তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। এই সমন্বয়ের সত্যতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে মালিকের চা বাগান চুরির সব গোপন রহস্য। এতে যে শুধু মালিকের সর্বনাশ তা নয় মালিকের এই চুরির ভাগে যে নেতা, মন্ত্রী, দল বা আমলাবা পুট হয়, তাদেরও যে সর্বনাশ। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতাপ মনতে ভেঁকে আনা হল সেই পাখিরে যাওয়া খেমকাঠের। জানিয়ে দেওয়া হল

শ্রমিকদের হাতে চা বাগানের মালিকানা আইন বিরোধী। ফিরিয়ে দিতে হবে বেঁচে ওঠা এই চা বাগানকে শ্রমিকদের হাতেই। শ্রমিকদের কোনো প্রতিষ্ঠিত সুযোগ না দিয়েই ঢুকে পড়ল বাম রাজত্বের পুলিশ। তত্ত্ব সিলায় বিচ্ছিন্ন হল চা বাগানের শ্রমিক। খেনকারের বসিতে বেওয়া হল মালিকানার চেয়ারে।

বিশ্বাসঘাতক

একদিন কুবর ও শ্রমিক রাজ কায়েমের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই বিশ্বাসে এই বাংলার কুবর ও শ্রমিক সেদিনের ঘোষকদের নিজেদের সুফের বস্তু ঢেলে লাল দীঘির লালবাড়ির ক্ষমতার সিংহাসনে বসিয়েছিল। আজ সেই ঘোষকরাই বলছেন পুঁজি রাজাই ভবিষ্যৎ। অতীতে টাটা-বিড়লা-আম্বানি-মার্কিন পুঁজির বিরুদ্ধে যে লড়াইয়ের ডাক ছিল তা ভুল ছিল। ভুল হয়েছিল বিশ্ব ব্যাঙ্কের অবাধ বাণিজ্যনীতির বিরোধিতা।

অনাহারের মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে বিশ্বাস ভঙ্গের যন্ত্রণা যে কম উত্তর

নয়। তাই আজকে যে চা বাগিচায় অনাহারে মৃত্যু ঘটে চলেছে সেই শবের চোখের নিখর দুষ্টিতে যন্ত্রণার থেকেও যন্ত্রণার ছাপ যে অনেক স্পষ্ট। বিশ্বাসভঙ্গকারীরা নাকি মানুষের সেই চোখের ভাষাকে অনেক দ্রুত পড়তে পারে। তাই তারা আজ সেই যন্ত্রণার দুষ্টির সামনে পাঁড়াবার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। সেয়াল লিখনের অর্থ কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গকারীরা পড়তে পারে না। তাই এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকলেও তারা আত্মবিক্রমের তাগিদে যারবার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তবু বলা যায় অতীতের সূক্ততির সুখে কিন্তু বর্তমানের পাপের ফল শোধ করা যায় না। যে মানুষেরা ক্ষমতায় এনেছিল তারাই যে আজ প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে চাইছে।

কেন এমন হল? কেন এমন হবে? উত্তরটা খুঁজতে আরেকবার আত্মনার সামনে পাঁড়াবার সাহসটা অর্জন করার চেষ্টা করুন না কমরেড। একেবারে তলিয়ে যাওয়ার আগে ডেসে থাকার একটা সুযোগ হয়ত এখনো পেতে পারেন।



ফুলবাড়িতে গণ-বিক্ষোভ

বাংলাদেশে বিদেশি প্রত্যাক্ত বিনিয়োগ প্রতিরোধের পথে

শ্রীর মুখোপাধ্যায়

জনগণই ইতিহাস রচনা করে। জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মুখে আশপাশেই পরম শক্তিশালী আত্মরক্ষিত পুঁজিকৈ ও শিল্প হুঁড়ে হয়। এই সত্যই আবার কাঙ্ক্ষাবর্তিত করে দেখানেন বাংলাদেশের মিনার্জপুর জেলায় ফুলবাড়ির লড়াই মানুষেরা। বিশ্বায়নের নামে প্রত্যাক্ত বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সমাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠ করার যে প্রক্রিয়া অব্যাহত চলছে, ফুলবাড়ির মানুষের এই সংগ্রাম ও বিক্ষোভ তার বিরুদ্ধে এক বিরাট পদক্ষেপ।

গত ২৬শে আগস্ট ২০০৬ বাংলাদেশের ফুলবাড়িতে ন্যাশনাল কমিটি ফর প্রোটেক্টিং অয়েল-গ্যাস-মিনারেল রিসোর্সেস এন্ড পোর্ট-পাওয়ার-এর লড়াইকালে হিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক এক বিশাল মিছিল করে জ্ঞানিয়ে দিল যে তারা ফুলবাড়িতে ব্রিটিশ কোম্পানি এশিয়া এনার্জি করপোরেশনকে খোলা-মুখ করলো বনি (Open Pit Coal Mine) প্রকল্প চালু করতে দেবে না। শুধু এ অঞ্চলেই নয়, দেশের কেনও অঞ্চলেই এশিয়া এনার্জি করপোরেশনকে তারা স্বাগত জানাতে রাজি নয়। মিছিলে ছিল স্থানীয় কৃষক ও সাঁওতাল অধিবাসীরা, অনেক মহিলা, তাদের অনেকেই হাতে ছিল তীর-ধনুক, লাঠি, কাষে, হাঁসুড়া এমন সব চিরাচরিত কৃষক-মহল্লের হাতিয়ার। অগ্ন্যগ্ৰহণকারীদের মেজাজ খুবই চড়া থাকার সত্ত্বেও মিছিলটি কিন্তু যথেষ্ট সুশৃঙ্খল ছিল। এই বিশাল জমায়েত শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হল। কিন্তু মিছিল যখন এশিয়া এনার্জি করপোরেশনের অফিসের দিকে যাচ্ছে তখন বাংলাদেশ রাইফেলস-এর পুলিশ চালাতো বুলেট। পাঁচজন মারা গেল, তিনজন বেশি লোক আহত হল। এর ফলে প্রতিবাদ শুরু হওয়ার পরেও ছড়িয়ে পড়লো সারা বাংলাদেশে। এই এলাকার লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গার্ডেনিং বন্ধ পালন করলো। অবশেষে সরকার বাধ্য হল ন্যাশনাল কমিটির সাথে এক সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করতে। এই সমঝোতাপত্রে বলা হল যে বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলেই কখনো খোলা-মুখ বনি চালু করতে অনুমতি দেওয়া হবে না। সরকার আরো ঘোষণা করলো যে, ফুলবাড়ি করলাখনি প্রকল্পেই বাতিল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং এশিয়া এনার্জি করপোরেশনকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ফুলবাড়ির মানুষের এই লড়াই আমাদের সামনে অনেকগুলি জটিল প্রশ্ন তুলে ধরেছে। তৃতীয় বিশ্বের উপনিবেশ-পরকর্ষী পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের রাস্তা কী হওয়া উচিত এ নিয়ে অনেক

গবেষণা আর আলোচনা হয়ে চলেছে। বিগত শতাব্দীর চল্লিশের শেষ এবং পঞ্চাশের গোড়ার থেকে আধুনিকীকরণের প্রবক্তারা বলতে লাগলেন যে এই সব দেশে পুঁজির অগ্রদূতসভা এত বিরাট প্রতিরোধ : বাটের গোড়ার দিকে ঢকলু ভরলো বাটো পুঁজিতে চিহ্নিত করলেন বিকাশের ‘অনুশ্লিষ্ট উপাদান’ হিসাবে। এর থেকে বেরিয়ে এসে এই সব বিশেষজ্ঞদের হেঁচকি করা সমাধান — পুঁজিবাদী অর্থনীতি থেকে অনুন্নত অর্থনীতিতে পুঁজি প্রবর্তিত করতে হবে। বিশেষ থেকে সামান্য কল: এই পুঁজি এই সব দেশের প্রাকৃতিক ও প্রাণ-সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কী ভাবে তাহলে এই বিশাল পুঁজি ভাঙে বাঙালি দেশে? হল — পুঁজি আসবে বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে আর বিদেশি প্রত্যাক্ত বিনিয়োগ হিসাবে। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বিদেশি প্রত্যাক্ত বিনিয়োগ সম্পর্কে এ সব দেশের সাধারণ মানুষের একটি স্বাভাবিক বিবরণী ছিল, কারণ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে তাদের শ্রেণ্যবর্গীর ভূমিকা সবাই দেখেছে। তাই প্রথম দিকে বৈদেশিক সাহায্য সরকারের মাধ্যমে অথবা বিশ্বব্যাংক বা এই জাতীয় তত্ত্বাবধিত আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে চোকনানো হয়ে লাগলো। পরকর্তীকালে, বিশ্লেষণ করে দেখাযেতে যুক্তবাক্য ভেঙে যাওয়ার পর থেকে বিশ্বায়নের নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অব্যাহত পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগলো। আধুনিকীকরণের অর্থ ঐচ্ছিকো বিদেশী পুঁজির সাহায্যে দেশের প্রাকৃতিক, সামাজিক আর প্রাণ-সম্পদ লুণ্ঠন। এতই সঙ্গে অনেক সদস্যের সমাধান করতে পারলো মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্বপুঁজির অর্থনীতি পরিচালনা করে। একদিকে নিজেদের দেশে মূলধনের ‘প্রত্যাশিত’ প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধের দ্বারা অনেক কয়েক যাবতীয় ফল যে সংকট উপস্থিত হয়েছিল, পুঁজি বর্ণনায় করে সেই সমস্যার প্রতিফলন করা গেল। দ্বিতীয়ত, এই পুঁজির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের বিশাল প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদের ওপর নিজেদের প্রত্যাক্ত মালিকানা কয়েম করা গেল। তৃতীয়ত, এই সব দেশে জনমিকের প্রাকৃতিক সুযোগ নিয়ে কম হস্তাক্রিতে উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা গেল। এছাড়াও বিশেষজ্ঞগণ ও পরিকল্পনাবিদগণ উৎপাদন সাহায্যতালী এসব দেশে হানাহারিত করা গেল।

অবশ্যে এই প্রক্রিয়া কার্যকরী করার ক্ষেত্রে শিষ্টাচারবাহক ব্যবস্থার করা হলো খুব সাফল্যের সঙ্গে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নয়ন প্রসঙ্গ বন্ধনি আলোচনা করা হয়েছে তখনই এসেছে বৈদেশিক

সাহায্য আর প্রত্যক্ষ বিশেষি বিনিয়োগের (এফ-ডি-আই) প্রবণ। এই দুইভাবে শৃঙ্খিত অনুগ্রহবোধের মাধ্যমেই এই দেশগুলির অর্থনীতিকে রক্ষা করা যাচ্ছে এবং পরিব্রাজ্যে দুটিত্বকে প্রতিহত করে পঞ্চাশশতা অতিক্রম করা যাবে; অতীতের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এই মতবাদই আজ প্রধান স্থান দখল করে আছে। এই মত অনুসারে প্রত্যক্ষ বিশেষি বিনিয়োগের মাধ্যমে এই সব শিল্পের প্রকা স্বেপ আসবে বিশেষি মুদ্রা, সর্বাধুনিক কৃষকীশল, লক্ষ শ্রমবাহক, নতুন নতুন গান-ধারণ আর আধুনিক পরিচালন কৌশল। এর ফলে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় এবং সবল হবে। এই ধারণাগুলি মাঝারি সত্তা এমন ভাবে গঠে যাতে যে মীতিনির্ধারণের, এমনকি অর্থনীতির ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এক বিরাট অংশও বিনা দ্বিধায় প্রত্যক্ষ বিশেষি বিনিয়োগকে আমন্ত্রণ করে বলেন। এই কারণে ফুলবাড়ি বা অ্যানা অঞ্চলে যেসব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে সেগুলিকে এটা সমর্থন করতে পারছেন না। এঁদের মতে দেশের সামর্থ্য এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করতে পারতো এমন এক বিশেষি এক-ডি-আই প্রোজেক্ট ফুলবাড়ির অথবা মোকসের প্রতিবাদে বর্তিল হয়ে গেল। এঁদের মতে মোকসা কিছু না জেনে বুকে একটীরে মত প্রতিবাদ করতে লাগলো। আর সাধারণ লোকের চাপের কাছে সরকারে পিছু হটলেন। এই অঞ্চলের উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যাপ্তা বন্ধ হয়ে গেল।

আজ অনেক প্রশ্ন আমাদের সামনে আসছে। যেমন, কী কারণে মোকসা নিরোধের বন্ধ দিয়েও এই প্রোজেক্টকে রক্ষা দিল? কেন এটা এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশন অথবা বোলামুখ বনির বিবেচনিত্য করছে? এটা কি যে কোন ধরনের কর্তব্যবহির্ গড়ে তোলাই বিবেচ্য? আজকের দিনে প্রত্যক্ষ বিশেষি বিনিয়োগের মাধ্যমে যেভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাই কি সর্বোত্তম পন্থা? ফুলবাড়ি কমলা প্রোজেক্ট আসলে কী ধরনের প্রোজেক্ট? এই প্রকল্পগুলির উত্তর খোঁজার মধ্যে হুড়তো সন্ধান পাওয়া অনুন্নত দেশে এক-ডি-আই-এর ঢোলক উঠার তাত্ত্বিক কারণ আর বাস্তব পরিস্থিতি।

নবম দশকের প্রথম অর্ধে অর্থবি বাঙ্গলাদেশের বৈদেশিক বণিজ্যে প্রোজেক্টের মাধ্যমে বা অন্য সনাকভাবে এই তথাকথিত বিশেষি সাহায্যেই প্রাধান্য ছিল। অশির দশক থেকে প্রেরিত বিশেষি মুদ্রার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে বিশেষি মুদ্রার আয়মনিতে এর ছান সবার ওপরে চলে আসে। প্রকৃতপক্ষে দেশের মধ্যে বিশেষি মুদ্রার প্রচলন সুনির্দিষ্ট করার এটাই একমাত্র বাস্তব পন্থা। ১৯৯০ সাল থেকে বিশেষি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ বাঙ্গলাদেশে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। প্রথম প্রত্যক্ষ বিশেষি বিনিয়োগ হল কর্ণাটকি ফ্যাটলিফাইয়ার কোম্পানিতে (KAFCO)। এর পরে উম্মেদযোগ্য বিনিয়োগ করেন এলো তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবসার এবং তারপর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও টেলিযোগাযোগে। আজকে কিন্তু KAFCO ও এরকম আরো কয়েকটা প্রতিষ্ঠান দেশের ওপর বিরাট আর্থিক ঝোঁকা হয়ে পড়িয়েছে।

প্রত্যক্ষ সত্তা এবং বৃত্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলে বাঙ্গলাদেশের বাস্তব অর্থনীতিকে থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে যে

কেলমাত্র প্রত্যক্ষ বিশেষি বিনিয়োগের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পের বিকাশ সম্ভব — প্রচলিত এই ধারণা একেবারেই ভ্রমগড়া। প্রত্যক্ষ বিশেষি বিনিয়োগের পরিমাণ উন্নয়নকে ততটা প্রভাবিত করে না যা ভ্রমটা করে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী, কোন শিল্পে এবং কোন অঞ্চলে এই বিনিয়োগ হবে এবং কী লক্ষ্যে এই বিনিয়োগ হবে এই সব প্রশ্নগুলি। কারণ এই প্রশ্নগুলির উত্তরন ওপরেই নির্ভর করে এই প্রকল্প শেষ পর্যন্ত অনেক মানবীয় মুদ্রার বিনিয়োগে একটি অসফল প্রয়াসে পর্যবসিত হবে না সত্তা সত্যই উৎপাদিতা শক্তির বৃদ্ধি ঘটাবে।

বিশেষি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হ্রাস বাঙ্গলাদেশে করতে হলে সামাজিক সম্পদ সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার। সামাজিক সম্পদ বলতে সেই সব সম্পদকে বোঝা যেগুলির মালিক দেশের সব নাগরিক। এই সম্পদের ওপর অধিকার ও কর্তৃত্ব থেকে কোন নাগরিককেই বঞ্চিত করা যাবেনা। প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস, কমলা এই সব বাঙ্গলাদেশের সমস্ত মানুষের সম্পত্তি — আর সেই কারণে তা এই দেশের সামাজিক সম্পদ। সেইজন্য বাঙ্গলাদেশের সরকারকে এই সামাজিক সম্পদের রক্ষাকর্তা ও তত্ত্বাবধায়ক বলে মনে করা হয়। এই সামাজিক সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে তখনই রূপান্তরিত করা যাবে যখন দুটি শর্ত পালিত হবে — প্রথমত, এই রূপান্তর কেলমাত্র জনগণের এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির স্বার্থে করা হবে, আর দ্বিতীয়ত, যারা এই সম্পদের হ্রাস মালিক সেই জনগণের দ্বারা এই রূপান্তর অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে।

সামাজিক সম্পদ নিয়ে বিভিন্ন অনুসন্ধানের সেরা গেছে যে সামাজিক সম্পদের ওপর মাইক্রো-স্তরে সাধারণের অধিকার খুবই সীমিত। মাইক্রো-স্তরে (ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্তরে) সামাজিক সম্পদকে ব্যবহার করার অধিকার স্থানীয় বাস্তবনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির একচেটিয়া করে রেখেছে। আর ম্যাক্রো-স্তরে (সামাজিক স্তরে) সামাজিক সম্পদ, যেমন বনজ সম্পদের মালিকানা হ্রাসিয়ে নিচ্ছে আন্তর্জাতিক শক্তিতলি। সেই কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের মত সামাজিক সম্পদের প্রকটিকে একই গভীরভাবে বিচার-খিপ্রাণ করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে কল উদাহরণ বিবেচন সর্ব প্রথম থেকে পাওয়া যায়। এই আন্তর্জাতিক শক্তিতলি হচ্ছে প্রধানত বৃহৎ কর্পোরেশন যেনা যাদের সমর্থনে আছে বিভিন্ন শক্তিসাধী রাষ্ট্র আর বিশ্বব্যাংক, যেমন বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা (IMF) এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB)। বিশেষি সাহায্য কীভাবে সংস্কার নীতিকে কার্যকরী করার জন্য ব্যবহার করা হয় তার উদাহরণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না। তথাকথিত দাতাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সংস্কারের নামে জাতীয় সংযোগসিক পূর্বল করে নেওয়া হয় যাতে করে বৃহৎ কর্পোরেশন সংস্কারে এসব ক্ষেত্রে পড়তে পড়তে গারের আর তাগদর হতে চলে আসে দেশের সামাজিক সম্পদগুলি।

বাঙ্গলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে চারটি কল্যাণকর আবিষ্কার করা হয়েছে তার মধ্যে ফুলবাড়ি সর্বশেষ আবিষ্কার। আর দ্বিতীয়টি এই কল্যাণকর সংস্কারে সব চুক্তি বা সমঝোতার স্বাক্ষরিত হয়েছে দেশনে। আজ অর্থবি এইচলি জনসমক্ষে আসেনি। ১৯৯৪

উৎস: *ভাষা* — ১৯৩৭

আজার, এই টাকা আর করার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কী মুলা দিতে হবে বাংলাদেশকে? এই.সি. পুরো ছবিটা আঁড়াল করছে এবং সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ না করে একটি আংশিক চিত্র তুলে ধরেছে। এই.সি.-র নিবন্ধই হিসাব অনুসারে খনি এলাকায় বিস্তারিত হবে ১০৫ বর্গ কিলোমিটার। আর যদি ঢালানোর জন্য কলসহব নিত্য করে দেওয়ার ফলে প্রত্যেক ও শ্রমজগতেরে মহাবিহত হবে ৫৬৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা। এই এলাকা অত্যন্ত উর্বর, এখানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়, এবং প্রায় প্রতিটি ছবিই তিন-চলনি। স্থানীয় অধিবাসীরা খুব পরিভ্রমী এবং অর্থনৈতিক বিক থেকে উৎপন্ন। অ-কৃষি ক্ষেত্রেও ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেবে রাখে। এখানে জনসংখ্যা খুবই বেশি। এখানে কলসখনি গুরু হলে গোটা এলাকায় কৃষিবাহ্য, পচপালন, মাছচাষ এবং কলস সম্পদ উপযোগ ব্যবস্থা একেবারেই ফেটে পড়বে আর অনিশ্চিতকালের জন্য গোটা এলাকায় অন্য সব উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। এই এলাকায় এখন যে সব শণ্ড উৎপাদন হয় তার মধ্যে আছে আমন, আউশ, বেগুন ও ইরি জাতের ধান, গম, সরিষা, আলু, যব, কলা, আখ, পাট, লাউ, পেঁচাঙ, প্রায় সব উর্বর-তরকারি, আর আছে অসংখ্য ফলের গাছ ও সেইসব গাছ আর ফেলে ভালো জাতের কাঠ পাওয়া যায়। এখানে আছে নদী, বাস, বিল আর হাজারেরও বেশি মাছচাষের খাম। এখানে অনেক সেকেন্ড ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। গোটা এলাকায় সব অর্থনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে আর এই.সি.-র হাতে এটা সামান্য ক্ষতি। ক্ষতির পরিমাণ এই.সি. হিসাব না করলেও স্থানীয় লোকেরা করেছেন। ঠাঁসের হিসেব অনুসারে উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কাজকর্মে মোট বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ১৮০০ কোটি টাকার।

এই রক্তাশীল হিসাব থেকেও দেখা যাচ্ছে যে এই প্রকার গুণ্ড বাংলাদেশের কলসই গ্রাস করবে না, কমপক্ষে ১০ বিলিয়ন টাকা মোট ক্ষতির বিনিময়ে বৈজ্ঞানিক সহ্য এই.সি.-র জন্য মুদ্রার পাহাড়ও তৈরি করে দেবে। আর এই দুর্ভোগকে এই.সি. সেবাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির পক্ষে এক বির্যাট আশীর্বাদ হিসাবে। এই প্রকল্পের ফলে প্রাণি ও উদ্ভিদ জগতের বিনাশের ফলে, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার ফলে এবং অর্থনৈতিক অসুস্থতার ফলে যে বিরাট ক্ষতি হবে তার হিসাব আর কর্তব্য ও ডবিত্যন্তে লোকের কর্মচাতি এর সঙ্গে যোগ করলে মোট ফলাফল কত হবে তা কল্পনা করাও দুসসাধ্য।

এই.সি. বলছে যে, খনিতে কাজ করার জন্য বয়-মোড়ার ২১০০ জন ও শীর্ষমোড়ার ১১০০ জন লোকের প্রয়োজন হবে। কিন্তু ২ লক্ষেরও বেশি লোক যে তাদের রোজগারের রাস্তা হারাবে সে প্রদাশে

এই.সি. আশঙ্কাজনকভাবে নির্বাণ। আজার এটাও বিবেচনা করা দরকার যে যে কলসের সুযোগ তৈরি হবে সেগুলি তিন্ত সাধারণ বা পরিচিত কাজ নয়, বরং বেশ বিপদজনক কাজ। লাভকতির হিসাব করার সময়ে মুদ্রাক্ষয়েরা এই সব বিষয়গুলি বিবেচনার বাইরে রাখে।

এই.সি. আর এও কমিশনজোশী দাদাল ও সহযোগীরা এই জটিল প্রকল্প ব্যস্তকায়িত করতে সমর্থ হলে ঐ বিশেষ কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে আত্মশাখীয়া টাকা মুদ্রা হিসাবে নিয়ে যাবে আর এর পৌ-বরা দাদাল আর কুলি রাজনীতিকেরা কলসখনির অর্থে ফুলে ফোঁলে উঠবে। আর অন্য দিকে আজকের সবুজ, ভীক্স ও প্রাণবন্ত ফুলকায়ি চিরকালের জন্য এক নষ্ট হয়ে যাওয়া পতিত এলাকা হিসাবে পরিগণিত হবে। আর এখানকার অধিবাসীদের অবস্থা কী হবে তা কল্পনাও করা যায় না।

এখন আর কোনো সম্মেহ থাকা উচিত নয় বিশেষ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের অনুশ্লিতির জন্য নয়, বরং এর উপস্থিতির জন্যই আজ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এক বোকা, আর দেশের মানুষের কাছে এত বিপদ হয়ে ঈড়িয়েছে। বিশেষ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের নামে স্থায়ী দাদাল ও বিশেষদের এক চক্র দেশকে লুট করার কাজে নেমে পড়ছে। ফুলকায়ির অধিবাসীদের এই অত্যাখান এবং নির্যাসের প্রাণের বিনিময়ে এই.সি.-র লুট চক্রান্ত বার্থ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এরকম একটি ধসোছড় প্রকল্পকে বন্ধ করে দেওয়া গেছে শুধু তাই নয়, অন্য গোপন জনৈতিক বিশেষ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগগুলিকেও সঠিক পরীক্ষার সামনে নিয়ে এসেছে। ফুলকায়ি প্রকল্প এই গম-বিলাসী ও গমহত্যার প্রকল্প। ফুলকায়ির মানুষের সংগ্রাম সঠিকভাবেই সরকার ও বিশ্বের কর্মপরেট কর্তাদের কাছে এই ব্যাটা সুস্পষ্টভাবে পৌছে দিয়েছে যে বাংলাদেশের জনগণ আর বিশেষ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের নামে দেশের সম্পদ লুট করে দেশের মানুষকে দারিদ্র্যে

র দিকে ঠেলে দিতে যেবে না। দেশের লোকের সম্মতি ছাড়া কোনো চুক্তিকেই তারা মেনে নেবে না।

(এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত শুণ্ড সংগৃহীত হয়েছে ইন্টারনেট পত্রিকা Countercurrents.org-এর ২২শে সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে প্রকাশিত *FDI in Bangladesh, People's Uprising In Phulbari And The Right To Live By Anu Muhammad* এই প্রবন্ধটি থেকে। প্রকৃতপক্ষে কর্তৃমান প্রকল্পের অনেক অনুচ্ছেদ অনু বোহাখানের প্রকল্পের সরাসরি বাংলা অনুবাদ। কিন্তু উপস্থাপনা ও উপনীত সিদ্ধান্তের দায় একান্তভাবেই বর্তমান প্রকল্পকারের)

ঘেটবেলা থেকেই মাছটার অসন্তুষ্ট খাই খাই ব্যতিক। কপ মা কোপান দিয়ে কুল পাড় না, সাতপুতুর চখে বেড়ায়। সাতদিনের খাবার এককোলায় শেষ। শেষে একদিন বাপ মাঁকে বলে, ‘চলো, একে বড় পুকুরে নিয়ে যাই। সেখানে শেষে পরে বাঁচবে।’ তল্শি তল্শা বেঁধে সবাই মিলে চললো বড় পুকুরে। সেখানেও কদিন যেতে না যেতেই একই অবস্থা। ‘মাছ’ সবায় চেয়ে জোরে সাঁতার কাটে, সবায় আগে পাত বাসি। সেখতে সেখতে বড় পুকুরের পাড় গায়ে চেপে বসতে লাগলো। হাঁসওঁস অবস্থা। মা বাপের মন, কী করে বলে ‘অত খাদ না’। এনিকে সামর্থ্যও শেষ। মাছটাও পেছায় বড় হয়ে গেছে। মাঝেমাঝেই জলের ওপর লাফিয়ে ওঠে — বিশাল শরীরটা রূপেগলি ভিলিক দিয়ে যায়। মোকে তারিফ করে — ‘কত বড় মাছ।’

মাছটা খানখান করে — ‘আমি সাগরে যাবো। সেখানে অনেক খাবার, অকুব্বত জল।’ বাবা-মা বলে, ‘আমাদের সখি কোথায়? ভাড়াড়া হোর ঘেট-ঘেট ভাই-বোনেরা রয়েছে, তাদের খাবার জন্য জমিটুকু ত’ রাখতে হবে।’ মাছ বলে, ‘একবার সাগরে গাঠিয়ে নাও, তারপর সেখান থেকে এক বিশাল নৌকো নিয়ে এসে সবাইকে তুলে সাগরে নিয়ে যাবো।’ মা-বাবা মন শক্ত করে।

শেষে মাছের সাগরে যাওয়ার দিন আসে। মা তাকে সজিয়ে দেয়। বাবা তাকে এগিয়ে বেস। সঙ্গে পাথরে লেগে ভাই-বোনেরা জন্য রাখা খুখুঁড়োটিবু। মা চোখ বুজে বলে, ‘বোকা আমাদের জন্য ভাবিল না। আমাদের ত’ দিন শেষ হয়ে এলো, ঘেট ভাইখোনগুলোকে নিয়ে যাস।’

সবাই দিন গেলে। ... মাছ একদিন কিলে এসে ঠিক নৌকায় সবাইকে তুলে নিয়ে সাগর পাড়ি দেবে।

মাছের সলঢ়া শব্দ সেই। কছরের পর বছর পেরিয়ে যায়।

এনিকে পুকুরের জল শুকিয়ে এসেছে। খটি চোখে না এমন জলে সবাই মিলে সাঁতারায়। মা’র তুলে পাক করেছে। কাবার চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এসেছে। ভাইবোনেরা কাবার মধ্যে গাড়ি-ওগলি করে বাঁচার চেষ্টা করে।

শেষে একদিন উৎসব জোগে যায়। হাঁপাতে হাঁপাতে ভাইবোনে দুটা এসে মা-বাবাকে খবর দেবে বাসের আহ্বান আসছে। ... দুই দিনের একটা কালো বিন্দু সেখতে সেখতে বিশাল একটা উজোজাহাজের চোকা দিয়ে সঙ্গা আকাশ গর্জনে হোসপাড় করে এসে নামে। উজোজাহাজের পরকা দিয়ে এসে-একে নেমে আসে মাছ, মাছের বৌ, মাছের দুই হেলো। মাছের পাঁকেটা বাবার জন্য পিকচার পোস্টকার্ড, মাছের জন্য সাগরপারের পারভিউম, ভাইবোনেরা জন্য চকলেট। মাছ তত্ব হাতে সোক্তাঙ্গার সিকে হাঁক পাড়ে — ‘কলচলো এই জমিতে লাগিয়ে নাও। এবান থেকেই মাছের তেল বাব করা হবে।’

কান-মাছের চোখে আনন্দাঙ্গ। ভিজেন করে, ‘ওগুলো কী পে বোকা?’

মাছ মিষ্টির সববতে সলঢ়া চুদুত সিকে বলে, ‘সব বালাবত্ব করে এসাম। এবার উত্থানের জন্য আমায়ের আব খুরে বেড়ায় হবে না। এখনেই সব বিলিতি কল বসবে। আসের মতে চাকরি হবে। খুতো বসবে বলে খালাস ব্যবস্থা হবে। এই কাগজ কটাতে চটপট সই করে প’ও।’ মাছ কাগজ বার করে।

কপ ওমো ‘ওতে কী লেখা আছে পে বোকা?’

মাছ বলে ‘ওতে লেখা আছে তোমাদেরই ভালোব জন্য তোমাদের এই খারাপ জমিচলো কোম্পানি এমন নামে কিলে দিতে চাইছে যা কেউ কখনো চিন্তাও করতে পারেনি। ওখুবার আমায়ই কথায় এটা সন্তব হয়েছে।’

কপ মাছের সিকে তাকায়।

মা মাছের সিকে তাকায়।

ভাইবোনে মাছের সিকে তাকায়।

ভারপর সবাই বলে ‘ভবি আমরা শেষ না রে।’

মাছ সসের সোক্তাঙ্গার সিকে তাকিয়ে বলে — ‘চলো ও বসি।’

নাচের ক্লাস : কারখানার এ্যাসেম্বলি লাইন

ফ্রাংকা রামে

অনুবাদ : জয়া ফিরে

[‘কৃষিকর্ম থেকে উচ্ছেদ হওয়া মেহেরা দলে দলে কারখানার কাজ পাবেন’]

নেপথ্যে ঘোষক : ইদানীং বিশেষত আধুনিক কোম্পানিগুলিতে, উৎপাদনের ক্রমসূত্রটি হতে পরিভ্রমিত হইল ও হামনি, আমরা দেখে এসেছি ক্রাশানের বেশ কিছু কারখানার দল হোরে অপারেটরদের মেশিন চালানোর প্রতিশ্রুতি দিতে প্রায়ই কৃষকী নৃত্য শিক্ষকদের নিয়ে আসা হয়।

নাচের টিচারের প্রবেশ। মঞ্চ সম্পূর্ণ খালি।

টিচার (উইংসের দিকে ফিরে) : চল এসো। তোমাদের যে ভিন্নজনকে গতকাল বাধ্য হয়েছে চল এসো তারা —

তিনটি কর্মবয়সী মেয়ে-শ্রমিক ঢোকে, কিছুটা বিলাপাত, জড়োসড়ো হয়ে শিক্ষকের পাশে সারি বেঁধে দাঁড়ায়। এরা শিক্ষকের নির্দেশমত নড়াচড়া করবে।

টিচার : এসো এসো সেখি, শেনা মেয়েবা। দ্যাখো, তোমাদের দিখে ওই যন্ত্রপাতি ছোড়া মেবার কাজে পারিয়ে দিয়ে কোনো লাভ নেই যদি না তোমরা কাজের মেঝেবার চকিলাটা সহজ তদ্বি পুরোপুরি শিখে নিতে পারো। একবারে লনের সূত্রের সঙ্গে করে ফাটার মতো। খুব সোজা। এতটুকু ক্রান্তি আসেনা। বরং এমনকী মেঝেবে ইতিমত অতিজাত্যপূর্ণ সব ভঙ্গি — নাকল লাগবে ... কিছু ঠ্যাঁ, খুব বন দিতে হবে। আমাদের কাজের মন্ত্র হোসো ‘আনখের সঙ্গে কাজ’। আমরা কাজ করি অনাথ —! চলো, ওক করা বাও ...

আচ্ছা, বরে নেওয়া যাক যে ওপরের কনভেয়ার বেল্টটা যাক্ষে এ - এইখান দিয়ে আর নিচের বেল্টটা যাক্ষে এরকম জায়গা দিয়ে। ওপরের বেল্টের ওপর ঠিক দশ সেকিমিটার দূরে দূরে তোমরা গাবে এরকম দুটো করে ছোট্ট স্ট্রু। অত্যাতে নিম্নোলের দুই হাতে কুছলো তুলে নিয়ে নিচের বেল্টের ওপর দিয়ে চলে আসো এইটের সূত্রটোলোর মধ্যে স্ট্রু দুটো বসিয়ে দেবে — প্রথম এই হাত তারপর ও হাত। একটু ফ্রাকটিস করে দেখা যাক — এই এক ... দুই, এক ... দুই, তুলছ ... লাগাছ, তুলছ ... তুলছ ... লাগাছ ... উর্ভ ত্যাডাক্সো নয়, ত্যাডাক্সো নয় — আরামদে করো ... এক দুই ... এক দুই, বা : ওড, ওয়েল তান। সহজ ... তাই না? তোমো ... লাগাও তোমো ... আচ্ছা এবারে দ্যাখো ... ওপরের বেল্ট দিয়ে একটা কাঠি আসছে ... যাক্ষে ভৈরি দিগারেটের মতো ... ঠিক !

এইটেকে তোমার তুলে নিতে হবে পাও দিয়ে ... এই যে ... এরকম — আঁমু ... সেগো ওই যে আসছে আঁমু ... এই ... বা : চমৎকার! আসছে ... এইবার — হাত য় করছিল সেটা বন্ধ না করেই ওই পাতে থাকা ফিউজটা তোমার বর্ষিক থেকে সমগ্রমত এসে পড়া টুকবোটান শিখন দিকে ফিট করে দেবে। আবার দুটো করে ফিউজ এসে পড়বে ... একটায় একটা পাড ... একটায় দুটো ... আঁমু একটা ... আঁমু ... আর একটা। এবার কী? না কপাল দিয়ে কষ্ট করে ছোট্ট দাঙ্কা মেঝে ফিউজটাকে পাডে বসাতে হবে ... এই একটায় একটা দাঙ্কা ... এই তারপরেরটায় ... দুটা ... টুক ... টুক টুক ... আসছে ... মেগে মেগে ... কোনো ত্যাডাক্সো নেই ... ঠ্যাঁ ... আচ্ছা আবার ওক থেকে ... এক দুই ... এক দুই ... ঠিকঠাক ... টাচার্ট হওয়া চলবে না কিন্তু ... আরে এতো রেফ খেলো — একদম সহজ আর সহজ ... নাকল মজা ... তাই না? ... এবার তিন নকল ... একর নাকল খেলো ... দ্যাখো নিচের বেল্টটা দিয়ে দুটো করে ছোট্ট ওয়াশার আসছে ... নাকল দুটো দিয়ে ও দুটোকে টেনে তুলে নাও — খাস তানো — আরে! তানো চলবি ... ঠ্যাঁ এই তো হয়েছে ... বা : ফস্ট ক্লাস ... আচ্ছা এবার খেয়াল করো — ওয়াশারতলের পা থেকে সর তামার তার বেরিয়ে আছে ... ওগুলো হাসকা টান দিয়ে সোজা করে নাও — ঐ যে বর্ষিক থেকে ইন্টিনটা বেরিয়ে এসেছে ওটার সকেটের মধ্যে এবার তার দুটোকে আলতো করে ঝড়িয়ে নাও ... তিনটে পাঁচ নাও ... এক ... দুই, তিন — বাস্ ঠিক আছে।

এইবার নাক থেকে ওয়াশার দুটো বার করে ফেলো ... ছোরে কাছো ... এই জো ... এবার ডান হাতটা একসেকেন্ড এলিকে আনো ... এই তারটা নিচের বেল্টের বেরিয়ে আসা সকেটে লাগিয়ে নাও ... এই যে ... আ—ছে ... বেশ ভক্তিমুগ হয়ে ... করো সেবি ... এই রক—ম ... বা বা লক্ষীমেয়ে সব — এবার ... হাতের পাডটা আসছে একটু বুলিয়ে ওই ঐ দিকের নাট দুটোকে জায়গা মত বসিয়ে নাও সেবি — আসছে করে ... বাস্ কাস ... আরে ... সাফদান — ডান পায়ের নিচে ওই ফালি বারের ছুরির প্যাডেলটা আছে। ঠট করে হাতটা সরিয়ে নাও — না হলেই ... কুছলে কি না ... যাচাং বায়ু ... তোমার

হাতখানা আঙুল টাঙল সুখ ফেটে ওই মেহেতে পড়ে থাকবে
... সে একটা বিচিকিখিচিরি কাণ্ড ... মাসিকও বেগে যাবে
এমব নোঁবান্দা বেগলে ... সময় মত হাত সরায় ... ঠিক।

আসে এইবার ডান বাই দিখে বাঁ দিকের পিসিনটায় ভোর
একটা থাকা মারো ... ভাইত বেনটা ধামলে — বাঃ —
একদম ঠিক। এইবার পেছন দিয়ে বাঁ দিকের পিসিনটায়
দুটো থাকা মারো ... আরে ভান্দান শোয়ে তোরন ঢলিয়ে
ঢালার মতো করে ... এবার বাঁদিকে একটা থাকা ... ঠিক ঠিক।
এই কান ঠাঁটু ভাঁক করে শেটটা ধামনের বিকে খানো ...
আরেকুই ... আরেকুই ... বটফল না সামনের ডিন হ্যাডেলের
বহারের সুইচটা টুটে পাকো ... এবার টেলো ... কোমরটা
নাচাও ... বেশি ডান্দারনের মত ... বাঃ দারুন ... আবার ...
এবার কটকা দিয়ে পেছনে মারো ... নিতম্বের ঠিক পেছনে
লিটার হ্যাডে লটায় একটা থাকা দিয়ে ... হাঁ করে আছ কেন?
মুখলে না ... আরে বাবা ... পাছা দিয়ে পেছন দিকে একটা
থাকা মারো ... হ্যাঁ — এইবারে একটা চক্কর পুরো হল। হ্যাঁ
মারো ... হপ্পু।

দুটো থাকলে তো পুরোটাই না বোঝার কিছু নেই। একেবারে
সোজা সম্মুখ ... কাজের সঙ্গে সঙ্গে হাঁ দারুন ... এয়ারসাইজ
হচ্ছে ... পুরো চর্বি করে যাবে ... হিপক্লিপ হয়ে যাবে ... এই
মিনিব এয়ারসাইজের জন্য কতো মেহে কতো টাকা ঢালতে
রাখি, জানো? আচ্ছা চলো, ফের শুক ... চল এসো দিকের
দিকের ভায়গার ... শুক থেকে আর একবার ... আঁতে আঁতে
... এই ওপরের বেণ্টের হু দুটো তোল ... দিকের বেণ্ট
ওখানে লাগাও ... এই সাবধান ... এইবার দাঁতে করে তোলা
... বাঁদিকে লাগাও ... আরেকটা তোলা ... বাঁম ... কপাল
দিয়ে থাকা মারো ... মারো ... হ্যাঁ ঠিক ... রেডি ... ওয়ালার
দুটো নাকে টেনে নাও ... তার দুটো টানে ... সোজা করো ...
বাঁ দিকের মেনিন প্রাকটিকি জড়াও ... বামো ... ডান হাত ...
নাক ঝাড়ো ... ওয়ালার দুটো বার করে ঘাটো ... অলতো
হাত মোলাও ... বাঁ হাতে নাটটা টেলো ... ডিন নাক কাও ...
হাত সরায় ... ফালি কববার মেনিনের শ্যাডেলটা চাল নাও

... নাও ... ঘায়া ... ঠিক। পাছা দিয়ে ডান দিকের পিসিনটা থাকা
মারো — এবার বাঁদিকে ... হ্যাঁ ... এবার একটা হেলিয়ে মারো
... আবার ... ঝায়ে ... ঠিক ... এই ডিন নম্বর বেসানোটো
ডানদিকে ... বাঃ ... একেবারে ঠিক ... এক্সেলেন্ট।

এবার পেরতিস্টা এলিয়ে নাও ... ত্রিলের বকশ হ্যাডেলের
ওপর মারিটা টেলো ... কোমর তোলাও ... হ্যাঁ টা লা লা লা
লা ... বাঃ বেডি থাকা ... হ্যাঁ ... পাছা দিয়ে লিটার
হ্যাডেলটা থাকা মারো — বহু ... না না ধামলে চলবে না ...
আবার শুক থেকে ... হ্যাঁ কোমর বকর তুল না করে বহি
এটুকু চালিয়ে ফেটে পাকো, তাহলেই তোমাদের কারখানার
কক্ষে নেওড়া হবে। এক ... দুই এক ... দুই ... ক্রুরের ওপর হাত
... তোলা লাগাও ... তোলা লাগাও ... এবার দাঁত দিয়ে ...
এক দুই ... হ্যাঁ বাঁদিকে ... টেলো শাও ... কপাল দিয়ে থাকা ...
এক এক দুই ... নাক ঝাড়ো ... দিকের বেণ্ট থেকে
ওয়ালারওতো টেনে নাও নাকের দুটো ... তারওলা বাঁ
দিকের ম্পুলে ডড়িয়ে নাও ... নাক ঝাড়ো ... ঝাড়ো ... এত ...
দুই ডিন ... বাঁ হাতের পাছা অলতো হুটিয়ে নাটটা
বসাও - উপ্প ... কাটার রেডের পেডেল পা দিয়ে টেলো
... ইব্ব ... ঘায়া ... নাতি ... কোমর নাচাও ... মোলাও ...
মোলাও ... আরে এ তো ছাট সেন্সি বাতের ডিন ... লা লা ...
লা লা লা ... বাঁদিকে দুটো ... ডানদিকে ... পাছা উঠু করে রেডি
... লিটার বহু ... ঠিক — দারুন ... করে যাও ... করে যাও ...
খেলো না ...

মেয়েরা ক্রম হচ্ছে ডমিডলির সঙ্গে ডান নাকার টেন্ডা করতে
থাকে। মাইক্রোফোন বেচাকের হল শোনা যায় :
যোথক — ইডালির মিলান লম্বের দিলেন কারখানার এ্যাসেম্বলি লাইনে
কাজ করা প্রমিকরা প্রতি দিনে চার হাজার পাঁচশ বার এইভাবে পরীক্ষা
করবার করেন। তারমধ্যে ডিন হ্যাডার বার পাছা দিয়ে কাটার মেনিন
জোরে খাড়া মারতে হয়। বার ফলে অধিকাংশ মেয়ের কোমরের হাড়
মারামুখ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও এসা নরান ভাটাল শ্রীবোলে ভোগেন। এই
মেয়ে-প্রমিকদের অনেকেই পেপডিক সন্নিভে অস্ত্রোপচারের মরুন
সক্জানধারণে অক্ষম হন।

* পেডিক সন্নি - প্রতিদিন ও উল্লসিধ বহিনঃহন। এই প্রকার কচাট
হতে গড়ে দুইশটি, দুইশটি, বেলনের ক্ষেত্রে ইউটোনাল - এরফে অনেক
কটি নম্ব হোলেবে। হেডাঃ দুখতা অও থেকে কল বদলী ও হুপ্পি এইবার
খেলোঃ পাঠের দিকে যায়।

জাফো রানে। ইডালির বিবিসি সংগ্রামী নট্যকার। একই সঙ্গে অভিনেত্রী এবং পরিচালকও। চল্লিশের দশকে জন্ম। নরানহিসাবী সরকারের
বিদ্রোহে দল্লক পুর্বে, করখানার কারখানে, মাজার বেড়ে এককি সার্কলের অঁকুর সাহনে নিজে আসেন। একই করগে এক-ফিরিয়ে মলোলে
বলক গড়ে তোলেন। কিন্তু অবিদ্যা রকমের বিক্রি সে সব চল্লিঃ। তাগের উৎকণ্ডে একটি — এক ট্রেটরা বাসিঞ্জিক পুঁজিকে আঘাত করা।
ক্রিস্টোফার কোব্রা-এর ইয়েট্টী অনুকল থেকে বালসা করা হল।

‘কৃষিকবি থেকে উত্তম্ব হওয়া মেয়েরা দলে দলে করখানায় কাজ পাবেন’ এই উচ্ছল ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে মাসরা এই মেট নট্যটি
চালানায়। অভিনয়ের জন্য কোনো অনুষ্ঠিত নেবার দরকার নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তম্ব করলে ভলো লাগবে।

সৌজন্য : কুমারসানার

নয়, নয়

পাচু রায়

গতবার যেমন মজিন্দা দুপুত থেকে ফিরে এসে চলতে ফিরতে আমার ঘড়িত ঘোড়ে ঠিকি লক্ষ্যে দেখা ঘটনাটিনি লিপিবদ্ধ করেছিলাম আমার দুর্বল অক্ষর বিন্যাসে, এবার সেই ঠিকি লক্ষ্যে দেখা সেই ঠিকি লক্ষ্যে দুর্বল অক্ষর সমষ্টি নিয়ে আবার এলাম গত ভিন মাস চলতে ফিরতে মনোযোগে গড়িয়ে যা পাশ ফিরে ওয়ে অন্ধকার অতি দূর থেকে কিসা কনের গায়ে দেখা ঘটনাটিকেই ফিটে যেতো নিয়ে। এই যথাবতী সময়ে ঘটনা এক এবং অকিটীয়—নকশীগ্রাম। সিন্দুর এবং নকশীগ্রাম। তার পাশাপাশি চলছে বইমেলা, কখনো আলাদা আলাদা, কখনো গায়ে গা মিশিয়ে সেই সিন্দুর - নকশীগ্রামের সঙ্গে। একেবারে একেবারে এসে গেল উলম্বের বিখ্যাত ফেট। বড় উলম্বার চলে গেলেন হ্যাঙ্গি ফ্রেন্ডের যুটি চাড়িয়ে দিয়ে। দেখা হাক সংবাদকুর্ভার সাংবাদিকসকল এই সব ঘটনাকে যে কোষে দেখেছেন আবারও চলতে ফিরতে সেভাবে দেখলাম কিনা।

কেন চেয়ে আয়ো গো মা মুখপানে!

জনতা তার অস্তরের অন্তরস্থলে যে প্রকল পরাক্রান্ত প্রতিষ্ঠান বিরোধী, তার কলকাত্ত প্রহাণ সিন্দুর নকশীগ্রাম। 'সূত্রী সচেতনতা সন্তোষ হেতুজনীয় শিক্ষার অনুপস্থিতি, শিশুশ্রমের নেতৃত্ব' এবং পুষ্টিবাহনের সার্বিক আশীর্বাদনা ও দেশের মধ্যে একমুখের রেজিমেণ্টেড হ্যাংকেটে মার্সবাবী পাটি এবং তার প্রশাসনের সীড়ানি অন্ধ্রমণের বিলম্ব বীর বিরুদ্ধে ক্রমে মীড়ানো সিন্দুর নকশীগ্রামের লড়াই (অপার্টে যাবহারে ব্যবহারে ঊর্ধ্ব 'লড়াই' লব্ধি যেন সিন্দুর নকশীগ্রামে অন্য মাত্রা অর্জন করল আবার!) জনতাকে দুহাত তুলে গলা ফাটিয়ে লাল সেলায় জানাব। ঠিকই, এরা কোনো যন্ত্রণা করেন নি (করেছেন বটে বসেনও নি) এরা সীড়াবহাদর বিরুদ্ধেও পূর্জা ওঠেন নি। এরা লড়াইয়ে প্রাণ নিচ্ছেন নিজের জমি রক্ষার জন্য। জমির মালিক কৃষকদের দিচ্চ ভূমি রক্ষার লড়াই। কিন্তু এই লড়াইয়ের ট্যাংকে ঘটনাটিকে অনিবার্য নিয়মে উন্নয়নসম্মত সামান্যিক রাষ্ট্র এবং যথাবতী তাদের ভীষের রাজ্য সরকার। উন্নয়নের এই মডেলটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা সি পি এমের উল্লেখ নয়, এমনকি ভারত রাষ্ট্রও এর জন্মদাতা নয়। এই রোল মডেলটি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, লালিতন আমেরিকা ও যুক্তিপূর্ণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে লাও করার 'মহান' যাত্রা সে সব দেশের সরকারকে অর্পণ করেছে মহাপ্রভু সামর্য্য। এই মডেলের আদিক প্রয়োগ ইতিপূর্বে খটেছে আমাদের রাজ্যে রাজ্যরাষ্ট্রে প্রকৃষ্ণে বিভিন্ন উড়াল পুল নির্মাণে, প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনায় সভক প্রস্তর করার কাজে, ফিটুটা হলও হলগিটা প্রকৃষ্ণে ইত্যাদি ইত্যাদি। হলগিটায়

উল্লেখ হলে যাওমা কৃষক চাকরি পায় নি। সে যে কোথায় গেছে তার টিকানা কেউ রাখেনা। ব্যাঘ্র পরকর সেই এই ভোট নির্ভর মন্ত্রায়ে আদৌ। কিন্তু চাকরি হয়েছে। আমাদের আপনায় যখন 'শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, আই টি আর মানেজমেন্ট পাশ করা' যুবকদের। সেই সঙ্গে যাবন হুয়েছে, সেই শিপিএমের দামাধরায়ের কথা আমরা আলোচনায় জানছি না। সিন্দুরে টাটার কারখানা হলে ওই যুবকদের চাকরিব সুযোগ ছানবে। সেই সঙ্গে যারা শিপিএমের উচ্চ ধরতে পারবে তাদেরও আয়ের সাহায্য হবে। ফলে চলতে ফিরতে যে প্রমটা এসে যায় এবং এসে গেছে তা হ'ল কতদিন ক্ষেতমজুররা, তাগাজীবীরা খরিত কৃষকরা খাখোলান করতে গিয়ে পেটে ফিল দিয়ে ব'সে থাকবেন। খুটি শেতার কাজে, পাঁচিল তৈরির কাজে, কারখানার নির্মাণ প্রকৃষ্ণে কোনো দক্ষ কারিগর নয়, ক্ষেতমজুর তাগাজীবীর মতন মানুষদেরই কাজে লাগছে এবং লাগবে। মজুরিও খুব একটা খারাপ নয়। তাহলে আলোচনের যথার্থ এই কৃষক সমাজ নিজের এবং তার পরিবারের সমুদ্র বিপর্য্যেত মেনে নেবেন কোন পারিপার্শ্বিক অসুস্থান থেকে এবং কেন? ভেভাগা, নকশালবাদি ইত্যাদি নিয়ে অনুগ্রহ করে জল ফোলা করবেন না যা মেটো ব্যক্তোব্যাক্ষীতে যাবেন না। টাটার প্রতাপিত কারখানার জমিতে দীর্ঘ পাঁচিশের কিছু দূরে ঘাসেরবেড়ীতে ব'সে ছালামতী তাগণ— উচ্চশিক্ষিত সোণান—কলকাতা থেকে অসো অধিকতার উত্তেজিত নৃনয়ওলের তিরেদে মধ্যে ওই অকলেরই এক যুবক নেতার কঠ থেকে আন্তরিক উচ্চারণে এই আশঙ্কা ব্যক্ত যখন হ'ল, তখন আমাদের ভাবনাটা যে উদ্বাহী নয়, চলার পথের মাটির উপর পাড়িয়ে, এটা ভেবে একটু ভাল লাগলেও, ফেরার পথটা খুব খারাপ, খুব বিপর্য্যেত হ'ল। চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। সেইসব মারেরের মুখ, খারাই মূলত একেধিগেনে আমাদের সত্যা, সামল হেডফিলন দিগিলে, বালেন উকীপিত কঠে কী প্রকল আত্মবিশ্বাস লড়াইয়ের কী দূর্গত প্রত্যয় দেখেছি! দীর্ঘ দীর্ঘ এক তরফ পাগোয়ারীর বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ, নারীর এই লড়াই ব্যাকার আমাদের মতন না ম'রে বেঁচে থাকারের মধ্যে এক অন্য ভাবার নির্মাণ ঘটিয়েছেন।

মেনে ভেবে উঠছে অন্য আরো অনেক মুখ। সে মুখ আমাদের চার পাশের বা যেন বন্ধুদের মুখ, খারী আশা করে আছেন টাটার কারখানা, এস ই জেড, ভিভালেনের কারখানা, নকশীগ্রামের কেমিকাল হাব ইত্যাদি ইত্যাদি হ'লে তাঁর ছেলের তাঁর মেয়ের একটা ভাল মতন হিয়ে হলেও হ'তে পারে। কম টাকা খরচ তো হ'ত না। ভয়িত তো লাও হয় সেই প্রাক্তকালে খুসে ছাতির সাহায্যে। তখন থেকেই খরচের বহর বাড়তে থাকে, বাড়তেই থাকে। তারপর উচ্চশিক্ষায় যদি মানেজমেন্ট

পড়াবার বাসনা রাগে তখন বার ৪০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ মুন্স। এই বিপুল ক্যাশিটেশন কি দিয়ে পড়াবার পর মায়েবা বাবরা যেমনবা প্রেমিকরা কি চাইলে না তার এই বিপুল বায়ে নির্মিত সত্যের জ্ঞাতা ত্রিভুজ আধুনিক কাব্যরচনার পঞ্চম পাক। খুবই অসম্ভব কথা যে, আই আই টি খড়গপুরের ছাত্র অধ্যাপকরা নবীগ্রাম কণ্ঠহারের বিকল্প দিচ্ছেন করেছেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখনপূরের ছাত্ররাও লড়াইয়ের মধ্যখানে আসছেন। প্রেসিডেন্সির আই সি তো আছেই। কিন্তু টেকনোলজির ছাত্ররা বা ক্যাশিটেশন কি দিয়ে যেখানে যেখানে লড়াইয়া হয়, সেখানে ভেদন প্রতিক্রিয়া কোথায়? এই সরকার উন্নয়নের নামে যে খুবকার লাগিয়েছিল তাতে ম্যানেজমেন্ট ও টেকনোলজির ছাত্রদের অবস্থা ঘনবর্ষীয় ময়ূরের পেন্ডম ভোলার মতন হ'লে আশ্চর্য কি। কারাট্রেব যোগ্যতা আপাতত পঞ্চম টুলসে মাতুলি এক লেক ছিলেন। অবশ্য একলা মনে হচ্ছে আপাততই। কাব্যরা একে ব্যক্তিই, মাতোনাও প্রবলভাবে চান সত্যনকে সামনে রেখে 'প্রতিবেশীর ঈর্ষা' কারণ হ'তে। কেন চাও না।

১৪ মার্চ, নবীগ্রাম। পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ এক অভ্যন্তরীণ নারকীয় সংযোগ — ১৪ মার্চ নবীগ্রাম। 'আমিন হিত্তে মনবিকৃতের বসি আমি কেউ হই, হতন হারানো দশমানে তোদের চিত্তা আমি জ্বালবই' — কার কথা যেন এটা, কার? ভাবনেন আমাদের সংস্কৃতি বনাট্ট মুখ মন্ত্রী, কার রচনা উদ্ধৃত করলাম? কয়েক সরকারের একলা 'নারীখাতী শিতখাতী' বলে প্রোবান নিতে আমিই ওসেছি ওঁর কণ্ঠ। আর আর? কেন নবীগ্রাম নবলের প্রশ্ন এস? নবীগ্রাম তো ছিল নবীগ্রাম। তারা তো সব গ্রামেরই মানুষজন। তাহলে কিসের দখল, কেন নবলের প্রশ্ন, কাকে নবল? ঘরছাড়াবের জন্য? এমন ক মানুষ তো এর আগেও ঘরছাড়া হয়েছে, অন্য দলের মানুষ, তখন তো নবলের প্রশ্ন আসেনি। তাহলে এখন কেন? নবলের নামে কেনন ক'রে এমন কাণ্ড ঘটতে পারে মনুবা নামধারী কিছু ব্যাবিত উদ্ভূত? কেনন ক'রে পারলো ওয়া? কে শেখালো পারতে? কেনন ক'রে কখন শেখাল? কার নেতৃত্বে শিবসো এসব?

কিন্তু মাঝা মেটে হয়ে যাওয়া এই ঐতিহাসিক লক্ষ্যকর দুর্ঘট্টে বলতে হয় আরও একটি লক্ষ্যকর কথা। আর কতকাল তাদের অজ্ঞাতে মানব চিত্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে নারী ও শিশুদের? আর কতকাল! যে শিশু নারীরা বর্ষবদের ওলিতে প্রাণ হারানো নবীগ্রামে, তাঁরা কি আসৌ জ্ঞানভেদ এমন পরিণতি তাঁদের কখনও ঘটতে পারে! এই কথাগুলো আমার প্রথম ওনিয়ছিল 'নতী আনন'-এর চন্দন সেন ১৭ মার্চ মুন্সীরা সামনের সামনে নবীগ্রামে কণ্ঠহারের বিকল্প এক নারী শিশুদের 'শিশু' করারও প্রতিবাদী সভার উদ্বোধন পর্বে। ১৪ তারিখ নতী আননের পর 'মাথায় বেলে' গিয়েছিল বিষয়টা। অনেককে কলগওছি। কুমারকে বলেছিলাম। নবীগ্রামে সিন্দুরের উচ্ছলবিদ্রোহী সমস্ত জ্বায়েভেদের সাধী কৃষ্ণা বামোপাধ্যায়। পোড় খাওয়া নকশাল কৃষ্ণা কলকিন, সেই অস্ত্রময় সময়ে নারী শিশুদের তাল করার বিরুদ্ধে ও প্রতিবাদ জানিয়েছিল। জ্ঞানিয়ে বিপাকেও পড়েছিল। পরে শাশ্বতী যোগ দে কণ্ঠাই সিংহলেন। সেই মেয়েদের কথা — নবীগ্রাম হ'য়ে যাওয়া মেয়েদের কথা।

আমি অনেকের কথা বলতে চাই না, নিজের তথ্যই বলি। লক্ষ্যকর কথা। শেষে এই আমি নবীগ্রামের লড়াই মানুষদের সর্বভাষাতো সমর্থন করলেও কোথায় আবার অজ্ঞাতে আমি যেন হ'য়ে গাই নিশিএম-এর এইসময় প্রচুরের শিকার! আমবা কেউই সিন্দুর নবীগ্রামে কৃষক বসীসেব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ উচ্ছল অনুশম নবীরা ভাবা। আমাদের হয়ে ও জনগণ উদ্ভিগিত করে সেইসব মুখ। নবীগ্রামের লড়াই নারীরা সামনে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত মিষ্টবাই নিয়েছিলেন, কেউ তাদের বাধা করেনি। বেছ্যে মাঝা উঠু করে আগে গেলেন দৃষ্ট পলাক্ষেপে। অথচ ঐ 'অন্যাসে বলতে পারি, তারা বেছ্যে মুন্সীরা খুশোখুই হয় নি, তারা নরিত জানতই না যে, পুলিশের কুলট তাদের হৃদপিণ্ডকে বিদ্ধ করবে। তারা নরিত 'চাল' হ'য়েছিল পরিণতি না কেনেই। হায় পুরুষ, হায় পুরুষত্বের ছত্রছায়ায় লসিত অবোধ নরী, পুরুষের 'বীর' তাম্বা নিতে 'বুনি' সতত লাগাতিত, অথচ নারীকে বীরসন্য বলাও তোমার কত বড় সঙ্কেত, ঐ বিপুল লস্টে সবারোহে। ১৪ মার্চ যে ভাবেনা! আমার 'মাথায় শেখিলা' তার জন্য আমি ওণু লস্কিত নই, আমি মন্তজানু হ'য়ে সেইসব বীরসন্যের কাছে কমাগ্রাণী। পরে আমাদের খুশপানে আর চেয়ে খেতে না না!

২৭৪ জ্ঞানি, কিন্তু ৭৪১ জ্ঞানি না

আসলে এখানেই শেষ করতে ভাল হ'ত। কিন্তু বই মেলাও তো একটা অধ্যায়। বই মেলাব, বই প্রেমিকের, উৎস মানুষের এবং নবীগ্রামের। যে আঁতরালে যে উজ্জ্বলতা ১৪ মার্চের সমাধি, সে উজ্জ্বলতার জন্য এক সপ্ন আমার শেফালম বই মেলায়। স্বাধীন ভাবায় এর প্রতিবাদ করেছিল উৎস মানুষ। ওগুয়ার স্টল নির্মাণ না করে নর, কালো কাপড়ে ফুল ফুল ক'রে লেগা ছিল প্রতিবাদের ভাবা প্রবে থেকে শেষ দিন পর্যন্ত। মানুষ ভিড় ক'রে এসেছে, পাশে ধাঁড়িয়েছে, ডিটরে ঢুকেছে। নয় নয় ক'রে বিক্রিও বাগান হয় নি। আমরা উচ্ছলতা বই মেলায় চলতে থিততে মানুষ যে পরলে গিয়ে গেছেন উৎস মানুষের ঘরে তা মাথায় ক'রেই আমাদের আগামী পর চলা। ২৪ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছিল বই মেলা। কিন্তু তার আগেই নবীগ্রামের লড়াই দু'বকের সমর্থনে একাধিক মিছিল। 'এবং বিসংবাদ' এর পীততত্ত 'স্বাকর স্বেচ্ছাচনা সিন্দুর নবীগ্রামকে নিয়ে বই মেলা'। এই মার্চ আমাদের যুগল দার অবলো অভিজ্ঞতা। আমাদের স্টল নবর ছিল ৭৪০ আর আমাদের পাশের স্টল (যাদের কাছে আমরা প্রতিদিন মেলা ছাড়ার আগে আমাদের বই জন্য রাখতাম) 'অবলো এর খবরটি ৭৪১ ছিল। বাংলা গল্প ও উপন্যাসের স্টল 'অবলো'। সেখানে এক সম্ভাব্য বাবা কিনিতে এসেছেন বাবো বই, সঙ্গে তার ছেলে। ছেলের সঙ্গে অলাপ কিনিতে মিলান যুগল দা'। অনেক কথাই শেষে যুগল দা' ছেলেকে স্টল নবরটি পরতে বললেন। তৎক্ষণাৎ সে বলল, 741, এবার যুগল দা' বললেন, সাংখ্যটা বালোর বল। অনেক ভেবেও '৭৪১' ছেলেকে কিছুই করতে পারলো না। তবুও আশ রাখব এই বলক আগামীদিনে 'SEZ-বাকির কণ্ঠকার' মায়াভালো বিস্ময় হ'য়ে যাবে। (কৃতজ্ঞতা 'দেবদ লিখন' জনকবল্লভ, অমিতভ সনাল, অর্জুণদেব। ২০০৭)

আজকের রাজনীতি ধর্মনীতি — গ্রাস করছে ন্যায়নীতি

এম. এ. সফিউল্লাহ

মনের গভীরে

‘কী হল যে খেলা, ওয়ে হয়েছিল যে, পরিসমি শরীর ধারণ করছে নবিতা’ — মক্কানের লালটো স্রেহমাখা হাত রেখে বিবেকের মা জানতে চাইলেন।

— ‘না না, শরীর তিক্তই আছে; পড়তে আত্ম ভালো লাগছেন: মনটা বড় ধারণা করছে — মৈদুলের বাবাকে ওরা’; কিশোর বিবেকের কষ্ট রুদ্র হয়, সে আর কথা বলতে পারেনা।

কালো কোর্টের আড়ালে

চলন্ত ট্রেনের একটা কানরা। করেকজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কী নিয়ে যেন আলোচনা-আলোচনা হচ্ছে। একজন বললেন — ‘এভাবে বিচার হলে, নিরপেক্ষ বিচার হবে না’। আর একজন বললেন — ‘বিচার নিরপেক্ষ হবে হয়েছে? আসলে তো টাকার পক্ষে বিচার হয়।’ তৃতীয়জন বললেন — ‘ঠিক বলেছি, কোর্ট তো বেশিরভাগ কেসেই চলে টাকার খেলা’। পাশের জন বলে উঠলেন — ‘কথোতেই আছে না — A first class Lawyer is a first class liar.’

সত্যতার অসত্যতা

‘..... আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও আমাকে যাঁচাও কে আছে যাঁচাও মাগো’ ওরা অতর্কিতে আর চিৎকার করতে দেখিনি; মুখটা ত্রুণ ধরে তার বাকবদ্ধ করে দিয়েছিল। আর তারপর?

শাসক স্বপ্ন সন্ধানস্বাধ

একটা গুলি ওর উরুতে এসে লাগল। প্রচণ্ড যন্ত্রণার জ্বালাসেবের সেইটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অদূরে ছিলেন বৈদ্য মানসীদেবী। ছুটে গেলেন জ্বালাসেবের কাছে — সে কথা বলতে পারছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো করেকজন পুলিশ, আরম্ভ করল — বেখড় লারিপেটা। ভুলুটিত যন্ত্রণাকাতর মানসী দেবী অবাক বিস্ময়ে দেখলেন — ‘পুলিশের পদে হাওয়াই চরল’।

* * *

সৌমা দেখলো — মা তার মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ততক্ষণে মানুষের আর্ত চিৎকার হাজার আর কান্না চারখিক ডারে উঠেছে। সৌমার মায়ের রক্তাক্ত সেইটা স্বপ্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল —

ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে এগারোটা — পাঁচ মিনিট পর তিনি মালা গেলেন। সৌমার চোখে অন্ধকার নেমে এসে।

* * *

‘নিহিলে আগে আমবা কিছু হাতছাড়াই ছিলাম — পিছনে মহিলারা। তেবেছিলাম ওরা হয়তো অনাঙ্গের আফগণ করবেনা কিন্তু’ যন্ত্রণাকাতর কষ্ট, তমসুক হাসপাতালের বেডে ওয়ে ওয়ে রাজপালকে অনুযোগের সুরে কথাগুলো বলছিল নবম ক্রেশীর ছাত্র সামান্য।

* * *

বিবেক আর মৈদুল — দুটি বিশ্ণবাক সহপাঠী। সেই বছর থেকেই ওরা যেন আর পটভূমির থেকে আসলো। বস্ত্র ভগ্নভর পড়ে হুড়ো ওরা নেমেসন। ওরা ভাবে — মানুষের জন্মের সময়ই, তার শরীরে একপ্রকার কাকনিক ধর্মপরিচয়ের মহলা ছিটিয়ে দেওয়া হয়। আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ঐ মহলাকে মনের গভীরে স্পর্শ করে সেওয়ার অগচ্ছিন্ন চলতে থাকে। এতে সন্নিবি হয় পরিবার — পরিজন — সমাজ — সংসার — এমনকি সেল রাষ্ট্র অবধি। সে যে একজন মানুষ — এই পরিচয় তুলিয়ে দেওয়া হয়। ডাকে ঘিরে তৈরি হতে থাকে জাতপাত — বর্ণ — সম্প্রদায় — ক্রেশী — সংরক্ষণ ন্যায়ের সব আবর্তনের স্থপ। পাশাপাশি গড়ে ওঠে শোক — নিশীড়ন — যক্ষনা — ঘোঁষাবাচ্চি — ভোলাভেদ — কলাই — বাসা — বুনাখুনি ইত্যাদির পাহাড়। বিবেক আর মৈদুল, জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই, একটু একটু করে এসব কুড়তে শিখেছে। পরিণত ব্যসে তাই দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে যে — মানুষের মাঝে প্রকৃত বিশ্বাসের দৃষ্টি অন্যতম প্রতিভার হল প্রতিষ্ঠানিক ধর্মনীতি, আর প্রচলিত রাজনীতি। তাই ওরা এসব এড়িয়ে, প্রকৃত মানুষ হওয়ার অভিপ্রায়ে, নিয়ন্ত্রণের এসব মহলা আবর্তন থেকে মুক্ত রাখতে চায়। সেই ছাত্রজীবন থেকে ওরা দেখে আসছে — প্রায় সকলেই প্রবাকে — প্রচলনকে যেনে নিতে বিগোবোধ করেনা, যদিও বা এর পিছনে কোনো যুক্তি-ব্যাখ্যা বুঝে পাননা। কখন যেন ওরা তাই — চলমান প্রবাহ থেকে পৃথক হয়ে যায়।

সেইদিনটা আজও বিবেকের কাছে মুহুরের মতো মনে হয়। মর্মাত্মিক সংঘাতটা সে ফুলে যাওয়ার পথেই পেয়েছিল — ‘মৈদুলের বাবা বুন হয়েছেন’। মনের গভীরে সে বড় ভয়াবহ সময়, সেললুড়ে চলছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। বন্ধ — হবতাল লেগেই থাকত,

প্রায়দিনই তাদের ফুলে ভ্রাস হত না। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস দলবাদের অবকাশের যুগ। দুর্নীতির সর্বোচ্চ শিখরে বসে এই দল মন্ত্রীদের লাভের কামের করেছিল, কাচার কারিগরীরা দলদলিগে সোপের মানুষ তখন সমুদ্র। মৈনুলের বাবা ছিলেন সি.পি.এম.-এর সেই উত্থানের যুগের এক সক্রিয় কর্মী। আর এটাই ছিল সে যুগের চরম অবস্থা। তাই কংগ্রেসী ঘাতকদের হাতে তাঁকে খুন হতে হয়েছিল। বিবেকের মনে হয়-এ যেন সেদিনের কথা। পোস্টমর্টম করা মৈনুলের বাবার ছিদ্রবিচ্ছিন্ন দেহটা সারা কাপড়ের ব্যাগেতে ঢেকে শেষ যাত্রা শুরু হল। মৈনুলের সখাই বুকঘটা করার ভেত্রে পলল, অতিবেশীনের ডোবে জল, বিবেকের কিশোর হৃদয় সেই দুর্ভেদ্য প্রার আত্মসংকল্পে কণাক্ত পাবেন — মৈনুলকে বাধার বন্ধনে আবদ্ধ করে সেও হাট-হাট করে ভেঙে উঠেছিল।

মৈনুলের বাবার সম্পর্কে মাঝে মাঝে সে বলত — তাঁদের প্রতিবেশীরা (মুসলমান সমাজের) অবিক সংখ্যাই তাঁকে ভাঙা ডোবে সেপাতেন না। ওদের বিচারে তিনি ছিলেন — ‘শয়তান পাটির নেতা, যে পাটি ধর্মটির মালেক, ইসলামী দৃষ্টিতে ‘কফের’। সেদিনের শব্দব্যাক্রা দলের মধ্য থেকেই অসংকল্পন বৃদ্ধ প্রতিবেশীর কষ্ট থেকে চাপা ওঠান শোনা যায় — ‘কাফেরদের সঙ্গে মিলে অত্যাচার কোথায় মরাত হস’।

সেদিনের সেই কিশোর মন — অনাগত ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করতে অক্ষম ছিল। বিবেক-মৈনুলের ভাবতেও পাবেন — মৈনুলের বাবার মতো লাভ লাভ মানুষের হস্তের বিনিময়ে কলতার আবেশে অধিষ্ঠিত হয়ে সেই সি.পি.এম. পাটিও এতদিনের সব কিছু ভুলে, কংগ্রেসের মোসর হবে; হাজার হাজার খেটে খাওয়া মানুষের অসহ্য উৎসাহ ও সহযোগিতার হাত ধরে চলতে শুরু করে, ওরা ইহাত ফেটে পুঞ্জিগণিতের কালো হাতের সঙ্গে হাত মিসিয়ে সরল অসহায় মানুষগণের রক্ত নিয়ে খেলায় মেতে উঠবে; চরিত্র—বিবেক— সীতি—আদর্শ—সর্বকিছু তলাঙলি দিয়ে ঐ মল্লই যে এতদিন বুনাখুনি, সন্ত্রাস, প্রত্যাশা, মিথ্যাচারিতা, সংখ্যাগুরু ভোগ্য আর পুঞ্জিগণিতের পলসেহানের পথ কেছে নেবে—এসব ছিল দুঃস্থের মতোই অবাঞ্ছন্য। সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে, ধর্মের ভেতরকারী, মৈনুলের অধিকসংখ্যক প্রতিবেশী ‘রা-ও’ বলল করে, সুযোগ-সুবিধা আর স্বার্থের গন্ধ পেয়ে ‘সেই শয়তান পাটিরই’ ছত্রতলে আশ্রয় নেয়। বিবেক আর লাভ পাবেনা — কেমন যেন চাপা অসহ্যের বৃকটা টানটান কতে ওঠে।

• • • • •

বিবেকের মনে হয় — কী যেন একটা চরম সত্যকে সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে; যদিও সে জানে তার চিন্তাভাবনার সঙ্গে সহমত পোষণের মতো মানুষের সংখ্যা নগণ্য, তার মতো তুচ্ছ চিন্তাধারার মানুষকে, তার খুল লাইকের মরপণী মৈনুল ছাড়া কেউ হয়তো গ্রন্থাই করবেনা; তবুও সে অন্তরের ভাবিয়ে বিবর্তনী দিয়ে ভাবতে বসে। সে জানে এদেশে অল্প সাধারণ মানুষ রয়েছে যারা ন্যায় বিচারের আশায়, এক একটা মোকদ্দমার শিক্কে বন্ধনের পর বন্ধন ধরে অর্জবায় করে

যায়; উল্লিখাব্যবসের প্রণালী বিতে পিটে কতজন সর্বস্বান্ত হয়ে কাহ — কিন্তু কতজন কাক কিছুই হয়না। কলকাতায় আসলত জনত বিচার হয়ে ওঠে হাস্যকর — বেনদারক — প্রহসনরূপক; ট্রেন কম্পার্টমেন্টের কথা মনে পড়ে যায়। (স: কলকাতা কোর্টের আড়ালে) সত্যিই তো ওঁদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই লম্বার-নিয়ামদারী। তার কারণে দেখা যায় সেই আইনজীবী তত বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন — যিনি হত বেশি সংখ্যক প্রকৃত শোষণ, আইনের চাতুরি আর বিকৃত প্রমাণের ভলিগণিত্য পরিক্রমা করে — নির্ণয়ের প্রমাণ সম্ভব হয়। আইনজীবী মহলে ঐরাই হয়ে ওঠেন ফার্স্ট ক্লাস ল-ইয়ার — দুই বড় উল্লিখাব্য; কিসকত পু/একদর, পেশকর কালস, সমকালি সাক্ষী হিসাবে আসলতে গেছে। তার মনে হয় আসলতগুলোতে খণাখণ তরু হওয়া প্রয়োজন যে সেখানে সাক্ষীগুণে ফেরা করার পিছনে, আইনজীবীদের আচরণে সন্দর্ভনের প্রচণ্ড, প্রকৃত ঘটনাত তেজোকা না করে অংগ সন্দেরের প্রচণ্ড হা বিনা। ‘সাক্ষীকে ফেরা’ — নাকত তত, আইনজীবীদের হাতে ফুলে সেওয়ার দৃষ্টি হল — বিচারকের নিমিত্ত প্রকৃত ঘটনা পরিষ্কৃত করে তোলা, অথবা সাংঘর্ষি, নির্ণায় কাউকে ক্ষতি না সেওয়া। অথচ বাস্তবে দেখা যায় আইনজীবীদের অধিকসংখ্যকই ঐ তরুত অর্থোপার্জনের হস্তিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন; ফলে অংগ সময় অলপায় হয় একত্রিত — অপরদিকে প্রকৃত ঘটনা বিকৃত লগ্নাতরিত হওয়ায় অলগ্ন ন্যায়বিচার অসম্ভব হয়ে ওঠে। সবল সাধারণ মানুষ আসলতে বিচারে ব্রিত্ত অধে করেন, আসলতে যোতে কুচিত না হাতি হয়। পকাত্তরে অল্প দুঃস্থের মানুষ, একবিনী নানাভরত আইনবিচারীরা নিমিত্ত কাউকে, আসলতের প্রচলিত পরিকল্পকে সাংগে গ্রহণ করে থাকে; অনেকের আদায়মূল হয়ে ওঠে আসলত। সাধারণ মানুষ এসবের প্রতিবাদ করতে ভয় পায় — পায়ে আসলত অসম্মাননার পায়ে অতিমুদ্র হতে হতে। আইনজীবীদের অর্থোপার্জনের লালসাকে নগ্ন করে দেখিতে হা বিচারে সৈখক আসলতের পরিবেশে পরিকল্প করবার অতিপ্রায়ে কলম ধরেন; কিন্তু বাস্তবে এসবের প্রতিফলন ঘটে না। তাই বিবেক আত্ম নির্ভরন বসে ভাবছে সেলের রাষ্টনীতিবিলম্বসংঘে পিচ্চিত সম্প্রদায় ঐ সব প্রসঙ্গে নির্বাক থাকেন, তাঁদের বিবেকে বাধা না। এ তো শিকার চরম অবস্থাননা। বড় অসহায় লাগে বিবেকের।

• • • • •

সকালটা যখন এসে শৌছালে শোকে দুঃখে অতীতের মা মুখী গেছেন। (স: সভাকার অসত্যতা) অতীতের বাবা শিশুর মতো হাট হাট করে কেঁদে উঠলেন। প্রতিবেশীদের অনেকেরই কল্লার ভেত্রে পড়লেন — অসহায় গ্রামা মানুষগণের দুঃখ দুঃখ-বেননা-আর হতাশার সব আভ্যন্তর ছাড়া নেমে এসে।

অতীতী, গ্রামা চাচা-তুলা পরিব ঘরের এক বিশেষী। জোরের আলো ফেটার আগেই নিউদিনের মতো, প্রাকৃতিক কৃত্য সম্পাদনের জন্য সে ঘরের বিকে যাক্ষিল। তার নিভের গ্রামের, — জন্ম থেকে পরিচিত চেনা মাঠ — মাড়ভূমির রেখমালা নিলাপতা আর তলসেবাসার আঁচল বিছানো মাঠ। চলতে চলতে সে চমকে ওঠে —

‘কে হেন শিশু বিচ্ছেদ’ — নাকি তার শোনবার ভুল: সঙ্গে সঙ্গে আবার — আবার: অতীতের বুক মূলমূর করে ওঠে — সঙ্গে সঙ্গে আবারও সেই শব্দ: অতীতের বুকের রক্ত ছিঁয়ে হয়ে যায় — শিখন ফিরে সে বাড়ির বিকেল ছুটতে থাকে। কিন্তু না, সে পারলো না — কোণের আড়ালে থেকে একজন নবপিতা ছুটে এসে তাকে ধরাশায়ী করলো। সে প্রশংসে মুক্তি পেতে চেষ্টা করে, তার আত্মচিন্তাকারে ভেঙের বাড়ানি তৈরি করে ওঠে। ওদের কেউ ওর মুখটা চোখে ধরলো। অতীতের চোখের সামনে গাড়ি অঙ্ককার খনিরে আসে, পাওলো ঠকঠক করে কঁপতে থাকে — তারপর সাজো হাবিরে ফেলে সে। নবপিতাচওলো অতীতের দেহটাকে নিয়ে ভাবের নিরাপদ অরণ্যে চলে যায়। পার্থক্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পর তাকে আর বাঁচতে দেয় না ওরা। হৃদয়যন্ত্রণার চিকিৎসা শোপাট করতে শিশুচওলো উন্মত্ত হয়ে ওঠে। আতনের বৈধিকনির পিতার নিরাপদ থেকে উন্নত অবধি দেহটা অসারভাবে পলিগত করে — আততায়ী শিশুচওলো নিরাপদ অরণ্যে চলে যায়। মাসের পেড়া গন্ধ মেখে বাতাসও হেনে ঢুকতে সক্ষম ওঠে।

হটনটা ভাবতে গিয়ে বিবেক মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে। যে মেলে এমন ঘটনা অথ্যে ঘট — সেটা নাকি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এক অঙ্গরাজ্য। মেলে আইন আছে — আশ্রিত আছে, প্রশাসনের নানাকরন বিভাগ রয়েছে। আর এসবের পিছনে মঙ্গলো মতো খরচ হয় জনগণেরই অর্থ। জনগণ নাকি তাদের ইচ্ছায় ভোট প্রদার মাধ্যমে শাসক বদল করতে সক্ষম। অথচ বিবেক মেখেই ট্রান্স ‘পুঁথিগত থানা’ ছাড়া বাস্তবে আর কিছু নয়। শাসক বদলের প্রক্রিয়ায় সরল সাধারণ মানুষের রক্ত বহাতে থ্যা থ্যা হয়, মৈতুলের বাবার মতো কতজনের জীবনের আলো চিরতরে নিবিয়ে দেওয়া হয় — স্বা নির্যাতন, নিরীড়ন, বন্ধনায়ক সাক্ষী রেখে আসে শাসক পরিবর্তনের পালা। কিন্তু সেও তো এক কল্যাণী পরিবর্তন। এই তো সেদিনের কথা — চার্লসিক ল্যাঙ্গে লাল করে দিয়ে পল্লিমবসের বুক থেকে রাজকুমার, তাপসীনের মতো কত জায়া প্রশ। দুইবে কোঁড়ে অভিনামে হারানন আব্দা চিহ্ন অঙ্ককারে মুখ লুকাচ্ছেন। সাধারণের নিরাপত্তা দিনে দিনে কমছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে টিগি-বিশ্বাস-শাসিন্যের মতো পুঁথিপতনের নিরাপত্তাসহ অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। রাজনীতির নির্লক্ষ্য রূপ দেখে বিবেকের সমগ্রচিত্ত বিকোত মেটে পড়ে, প্রতিকারের ইচ্ছায় উন্মত্ত বোবা ব্যাঙ্গোলে দ্বিষ্ট হয়ে ওঠে; অস্থির হয়ে ওঠে সে।

* * * *

এলো ডডডর সেই দিন — ১৫ই মার্চ ২০০৭: ইতিহাসকে লজ্জা দেওয়ার মতো দিন। স্বাধীনতার পর, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রতে, পুলিশ বাহিনী ও শাসকবদলের সম্মিলিত আক্রমণে দেশের সাধারণ মানুষের কণ্ঠ নিয়ে পৈশাচিক মেসি বোলার নজিরবিদীন ডডডর সেই

দিন (৪: শাসক বদল সম্ভাবনক)। পুন: স্বর্ষণ আর ষটপাট — মানুষের হৃদয়কার আর কালাম ভাবে ওঠে নশীগ্রামের সেই গ্রামচওলো: কতজন চলে গেলে তার সঠিক হিসাবকেও সবকারিতাবে গণ্যচাপা দেওয়ার অশক্ততা চলে। সার্বভৌমের ওতপ্রেতসাম্প্রদায় শাশিপ্রিয় মানুষ, টিভির পরায় যে নৃশা বেছে চমকে ওঠে, কতজন চোখের জল মেলে, কেউ কেউ খাবার মুখে তুলতে পারে না: একদেখার রাজনীতিবিদরা সেই নৃশা দেখে উন্মত্ত হয়। বিমান-বৃদ্ধ বিনদেশে মল মনে মনে হয়তো বলে — ‘এইবার জাতিরা জ্বল হয়েছে’।

জী যেন ভেবে বিবেকের লগাট কুঁজিত হয়: ১৫ই মার্চের পেনায়ের পড়া ঘটনাক্রমের মহা গড় চক্রবেত্তিয়ার সূত্রত সম্ভব কথা মনে পড়ে যায়। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি চলে গেলেন। দেশে গেলেন হুদয়ান বয়সের এক শিশুসহানুভূতি। এ পিতৃ ভবিষ্যতে হুঁ হুঁ হয়ে, আতকের কাহিনী ওনে যদি কিন্তু হুঁ? সেদিন সে যদি এই রাষ্ট্রকঠামো আর বন্ধপড়া সনাতনের বুক পড়িয়ে কৈফিয়ত দাবি করে? যদি সে প্রতিকারের চেষ্টায় হাতে অস্ত্র তুলে নিতে চায়? আতকের হুদয় হারানো মানুষওলো যদি এই হীনচারিত রাজনীতিবিদদের রাষ্ট্রকঠামোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে? যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে? ... তাই যদি করে — এই রাষ্ট্র কঠামোই তখনই গায়ে উত্তপ্তকী, মাওবাদী বা এই জাতীয় কোনো স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে সেবে।

মহাশক্তা দেবীর হাজার চুখাশির মা’-এর কথা মনে পড়ে যায়। অনেকদিন আগে, — সেই কালেগ আইফে, বিবেক বইটা পড়ছিল। তৃতীর জন্যে সমবেদনায় তার বুকটা ভরে উঠেছিল। লেখাওলো যেন আত্মও চোখের সামনে ভেসে আসে — ‘..... এদের বয়স হাই মোক: এদের শাশি হুঁড়া কারণ এরা শুধু স্রোগান লেখে না। স্রোগানে বিকাশ করে এরা সনাতনকে বদলে নিতে চায়’ বিবেকের মনে হয় আতকের এই আত্মমানুষওলোও হুঁহুতো একদিন ‘তৃতী’ হয়ে যাবে। মৈতুলের কথা মনে পড়ে যায়। কোনোরকমে হাজার সেকেন্ডারি পরীক্ষাটা দেওয়ার পর, বাবার অবর্তমানে তাকে বাৎসরিক পেশা ‘কৃষিকারে’ মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। দুজনের মধ্যে যোগাযোগ ক্রমশ কমতে থাকে। একসময় গ্রামের বাড়ি ছেড়ে, সিমলাগড়ে তার নবনির্মিত বাড়িতে বিবেক বসবাস শুরু করে।

হুদয়ান পর, সিন্ধুর নশীগ্রামের চাষীসর হাফাকারে, বিবেক, মৈতুলের কানে আকুল হয়ে ওঠে। মৈতুলও তো একজন কৃষক। তার জমিওলোও যদি কেউ কেড়ে নেয়! মৈতুলকেও যদি ওরা খুন করতে চায়; বিবেক অস্থির হয়ে ওঠে। রক্তাক্ত মানুষওলোর অসহায় মুখ তার স্মৃতিশটে ভেসে আসে। নশীগ্রামের বরীকার, গোবিন্দ, ইন্দ্রনাথ, সুব্রত, অঘটনবাদের মাঝে সে তার মৈতুলকে দেখতে পারে। রক্ত গভীর থেকে গভীরতর হয়, বিবেকের চোখে ঘুম নেই। অব্যক্ত বক্তব্য সে হুঁহুতে করতে থাকে।

আসুন বাংলায় ফিরি

আশীষ লাহিড়ী

পড়ম ক্রীম ও আপনার ভাষাসংস্কৃতি

‘উৎস মানুষ’-এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। নাক্তে নাক্তে অন্তর্ভুক্তিভিত্তিক জাতিগত থেকে তার প্রমাণ পাই। শেষে সব সময় যে পূর্ণকল্পিত হই তা অবশ্য নয়। কখনো কখনো দেখি, কুল বাড়তি নৌছে পেয়ে। যা বলতে চোখেছি, ঠিক তার বিপরীত তিনিশতা মুহুরেই পঠক। তখন লেখক হিসেবে বেশ লজ্জা করে।

সেরকমই একটা ঘটনা ঘটল সেদিন। ‘উৎস মানুষ’-এর সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা ছোটো আলোচনাসভায় একটি অত্যন্ত সুশিক্ষিত, বুদ্ধমনা, অবাঙালি যুবক (যিনি বাংলায় আমার-আপনার মতোই বুদ্ধম) হঠাৎ আমাকে বললেন, ‘আপনিও শেষে এই বাঙালি সংস্কৃতিতে পতিনিজ্জমের স্বল্পে পড়লেন।’ আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। যুবকটি বললেন, ‘উৎস মানুষের গত কয়েক সংখ্যাতোই দেখছি আপনি হা-হুগল করছেন, বাঙালি ভক্তলোকদের সংস্কৃতির আর কিছুই রইল না। আপনার কি মনে হয় না, বিশ্ব জুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভয়াকং আরম্ভের পরিকল্পিত এই সব সংস্কৃতি-টংকুতির ওছড়া নিয়ে মাঝা মাঝেনোটা এক ধরনের তুচ্ছ কিলসিতা? তাছাড়া, বাংলা সংস্কৃতি কত উচ্চতরে, এই কথাটা বার বার বলে আপনি কি অন্যান্য ভাষার সংস্কৃতিকে ছোটো করছেন না? এটাকে আমি উগ্র বাঙালি বাদেবিক্রান্তা বলে মনে করি।’

সত্যি কথা বলতে, এরকম আচমকা গেরিলা আ্যুপ্রে আমি একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। তার পর এক এক করে আমার কতকগুলো পুঁথি করলাম। ক্রমশঃ, এটা তো ঠিকই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদে দুনিয়া জুড়ে যে দাপাদাপি করছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করাটা এখন বুঝি বড়ো কাজ। পারলে কবুত হাতেই সে-সড়াই করা উচিত। কিন্তু সেখানেও সমস্যা আছে। একে তো কার নেতৃত্বে সে-লড়াই করব, জানি না। কবুত কাঁধে কোথায় নেতা, কোথায় ওরে নেতা? বলে বুঝে বড়োনেতা খুব কাজের কথা তো নয়। তার ওপর, আমি সত্যিই খুব নিরীহ গোছের লোক, কবুত-টংকুতির সামনে বা পেছনে খুব অল্পই বোধ করি। কাজেই চাইলেও সে-সড়াই করা আমার সাহসে সুলোনে না।

ঐতিহ্যত, আমার কেন জানি না এরকম মনে হয় যে, মার্কিন হাসিকমের নেতৃত্বে সাব দুনিয়া জুড়ে বিশ্বায়নের থে-প্রক্রিয়া চলছে, তাতে মার্কিন শাসকশ্রেণীর ভাষা (যার নমুনা আমরা বুধবাবুর কাছ থেকে হাংশেই পেয়ে থাকি) হাজা আর কোনো ভাষাকেই টিকতে দেওয়া হবে না (এমনকি এতদিন যেটুকু আমরা ইংরেজি ভাষা বলে ছেলে ও খিলে এসেছি, সেটুকুও না)। শুধার্কিত ‘হুদীয়’ ভাষা আর সংস্কৃতিতে (আমার তো ধারণা, সব ডাকই হুদীয়) নষ্ট করে দেওয়াটা

ইটারনেট-এর ভাষাকার মার্কিন ভাষার একটা ‘মস্ত বড়ো ভরলেন। তাই নিজের ভাষা আর সংস্কৃতির দার্ব দক্য তকটা হ্রাতি সাম্রাজ্যবাদ-বিশোধী মানুষের একটা প্রাথমিক কাজ। মানুষটি হিন্দিভাষী হলে তাঁর কাজ হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতিতে বর্ধন। আমার তো মনে হয়, নিজের আশপাশে সবারে সচেতন হওয়াটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রাথমিক পর্ল।

হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য সবারে বুঝই সংলেনলীল এক ভক্তলোকের কাছ থেকে জানলাম, হেমচন্দ্র-নিরাসা-চলীধরনাথের হাতে-পড়া বলিষ্ঠ হিন্দি সংস্কৃতির ওপর সবচেয়ে বড়ো আঘাত হানলে বলিউডি-মার্কিন [-Bolly-মার্কিন] ফিল্ম-সংস্কৃতি। বলিউডি হিন্দি শেষ করে দিলে সত্যিকারের হিন্দিতে। বাংলাতেও সে ঘটনটা ঘটছে। কাজেই আমার বাংলা-জানা অবাঙালি বন্ধুর অভিযোগ আমি মানতে পারলাম না। একজন বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতির বড়ো সম্বন্ধ সচেতন থাকটাকে আমি কোনে-মতোই উগ্র বাঙালিমানা বলে মনেতে পারি না।

অপচর্কের ব্যাপার, নিজের ভাষা আর নিজের সংস্কৃতিতে দুল দেওয়াটা যে খুব ভুলকি, সেকথাটা নিগ্রহীণা না বুহলেও বহুজাতিক ব্যবসায়েরা কিছু ঠিকই বুহছেন। তাঁরা তো আরব খুয়ে তল শাম না, তাঁরা কেবল ডলার-সেন্ট কোরেন। সুতরাং তাঁরা হঠাৎ এ ব্যাপারটতে মনোযোগী হলেন শেষে খট্টা লাগল : ‘আহলে কি ভাষা আর সংস্কৃতিরও ব্যাভার-নর বাড়ল? ব্যাপারটা খুলে বলি।

টিতিতে সেই বিজ্ঞাপনটা ভলনেতেই দেখেছেন। বিশ্বসর্কারী প্রতিযোগিতার শেষ পর্ব। শ্রেষ্ঠাচারের পালা শুরু হোলো। ভারত থেকে যে-কালিকটি ফাইনালে উঠেছে (তার পোশাক-আশাক এবং অভিবাক্তি অত্যন্ত শালীন ও নর) সে হঠাৎই সবাইকে চমকে দিবে ইংরেজির বললে সুভদ্র হিন্দি ভাষায় বলে উঠল : ‘আপনি আপনাকে ভাষা ও সংস্কৃতিতে সম্মান করল, শেষেরে সারা পৃথিবী আপনাকে সম্মান করছে।’ এক মুহুর্তে নীরবতার পর গোটা হল হাততালিতে চেটে পড়ল। কালিকটি প্রতিযোগিতায় জিতে প্রেইতের মুহুর্ত পরল।

বিজ্ঞাপনটা কীসের, মনে পড়ছে কি? পড়ম নামক ককাতিক প্রসঙনী-ব্রাডের। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বহুজাতিক সংস্কৃতিগির মধ্যে একটি হল ইউনিস্কোভার। তাইই ভারতীয় উপ-সংস্কৃতি হিমুতান দিটার এই ব্রাডের মালিক। তাক্কব ব্যাপারঃ একটি বহুজাতিক সংস্কৃতি প্রচার করছে যে আপনি আপনায় নিজের দেশের ভাষা ও সংস্কৃতিতে দুল দিন, তাহলে সারা পৃথিবী আপনাকে খাতির করবে। ভাষ সম্প্রদায় করলে অকণু বোকা যায়, এর আসল কক্কব (যাকে বিপণনের ভাষায় বলে ইউনিক সেলস প্রোশেজিশন), অর্থাৎ যে ব্যাটী আপনায় মরছে

প্রকাশ করে আপনাকে পণটি কিনতে উসকে দেবে) হল, পণ্ডস
 প্রাপনার মতো সংকুচিত-সঞ্চিতন সভা মানুষের মন থেকে, সে জানে,
 আপনি আপনাকে তাহা ও সংকুচিত কতখানি মূল্য দেবে, তাই পণ্ডস
 ক্রমে আপনি আপনাকে সংকুচিত বিবেককে ভুলি রাখতে পারবেন,
 সেই সঙ্গে একটি বিশ্বস্ততা জিনিসও পাবেন। ভেতরকার বিপদ-
 মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এই যে, একেবারে উকিবিধ মহলের রূপসীরা যার
 চান্স-আমেরিকা থেকেই প্রসঙ্গী করেন, তারা এইসব হেঁচো বিজ্ঞাপন
 দেখে ভোসবার পাঠী নয়। কিন্তু বামের ট্যাকের অত জোর নেই, অথচ
 এ মুহূর্তে, অকথকে, উকিবিধ মহলে খুবখুব করার সাথে সহজ যোগে
 জানা, তারা তো আর প্যারিস কিংবা সিউ ইয়র্ক থেকে প্রসঙ্গী আনাতে
 পারবেন না। ফলে তাদের মনে অশ্রবের হিসে জাগবে: 'ইস, থাকলানই
 বা কসবাব বা কেলগাছিয়া, আমাদের বুদ্ধি বিশ্বসুখী হতে সাধ জাগে
 না।' সেই হিসেবেও বিপদময় মূলধন করতে চায় এ কোম্পানি।
 কলতে চায়, আমাদের ব্র্যাডের ক্রীম মাফো, দেখবে কসবা কিংবা
 বেগমগাছির ফ্রাট্ট বয়েই তুমি বিজ্ঞাপনের ঐ বলিবাটার মতোই
 বিশ্বাসের সুখী হয়ে উঠবে। এটা বানানো কথা নয়। আমাদের বাড়িতে
 এসেই দেখে কত করত। সে টিভি বিজ্ঞাপন দেখে সাং বিনে ঘরী
 দুবাব মোহে তার স্ব স্বকর্জিত টাকা দিয়ে 'ফেয়ার অ্যান্ড লাল্টী' কিনে
 কিনে মুখে মাখত, কারো বাহন ওনতা না। ঐ বিজ্ঞাপনের ইউনিক
 সেলুম প্রোগ্রামপিন যিনি বা যারা রচনা করেছিলেন, তাঁরা শতকরা
 দুশো ভাগ সফল, এটা মানতেই হবে। সেই সময়তার মূল্য বেসে পরের
 বাড়িতে সোমন থেকে কোনোরকমে বেঁচে-যাকা গরিব ক্রমা বলিকাজ।

তবে আসলো ক্ষেত্রে পাঁচটা পদ্ধতির। লক্ষ্য করবেন,
 বিজ্ঞাপনে যে-মূল্যবোধের কথা বলা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আপনাদৃষ্টিতে
 বলবার কিছু নেই। আমরা, অর্থাৎ এই উৎস মানুষ পরিহাসের
 লেখক-পাঠকরা তো সেই মূল্যবোধেই বিশ্বাস করি। আমরা তা সত্যিই
 মনে গ্রহণ চাই, প্রতিটি দেশের, প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ তার নিজের
 সংকুচিত, নিজের ভাবার মধ্যে শক্ত করে ভিত গাঁথুক। আমরা তো
 সত্যিই বিশ্বাস করি, নিজের ভাষা, নিজের সংকুচিতই আমার
 সত্যিকারের স্বাক্ষরিত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জানি, আমসময় চলার
 পথে সমস্তের বড় বাধা ঐ মূলপ্রত্যয়ের সংকুচিত। বিশ্বসুখী,
 ব্রহ্মাওমুখী ইত্যাদি ভগবৎবিত্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে বাহালি
 (তথা ভারতীয়) মেহেরের মনে তারা এই মূল্যবোধ চুম্বিয়ে দিয়েছে যে
 ফ্যান-বডেল হওয়াটাই হল স্বীকৃতির প্রসঙ্গ। আজ নেহাত মধ্যবিত্ত
 বাড়ির মেয়েকেও তার মা কুক-খোলা জামা গুলে নিতেন পুলিশের
 'গ্যাম্পের' ওপর দিয়ে ফেঁদাল-চলন খোঁচানোর সংকুচিত। বিশ্বসুখী,
 ব্রহ্মাওমুখী লাত করেন। পুলিশের নিয়ন্ত্রণের মার্কিনিয়ানরা খোলা ফল
 পদে পদে আমাদের নিজস্ব জীবনধারাকে কলুষিত করে চলেছে। অথচ
 হজরত গেন্ডু, ব্যাং এর জন্য সবচেয়ে বেশি দামী, (যার প্রধান উদ্যোক্তা
 গ্যাম্পের নাক আরেকটি বহুজাতিক প্রাচ্য) তাইই কালো, আপনাকে
 নিজের ভাষা ও সংকুচিতের সমাধি করুন। ভয় হয়, এই টেকনোজিও
 কি তাইই নেবে নাকি এখন থেকে।

এ এক অস্বস্তিজনক। প্রথম ওয়া আপনাকে সর্বনাশ করবে।
 তারপর ওয়াই বলবে, আশা কী সর্বনাশ হয়ে গেলো যে। আপনাকে হুত
 প্রতিযোগিতাও ওয়াই করে দেবে।

তার একটা অর্থ অর্থনা এই যে প্রতিযোগিতাও একটা ব্যাকার
 তৈরি হয়েছে। বেশ কিছু মানুষ নিশ্চয়ই এরকম ভাবছেন যে ধার-একটা
 শিকড়ইনি সংকুচিত দিয়ে খুব বেশি দূর এগোনো যায় না। তাই একটা
 কল্যাণিক সংস্থা টিভির পর্দায় কলিমের বিক্রি বাড়ানোর জন্য এরকম
 একটা থিম বেছে নিতে সাহস পাচ্ছে। তারা তো বিপদ-গবেষণা ছাড়া
 এক পাও এগায় না। তাদের বিপদ-গবেষণা কি তাহলে এ কথা হলো
 যে শেফের ওপর সমস্ত একপ্রকার মধ্যবিত্তের মধ্যে দিল্লের সংকুচিত
 প্রতি কিছুটা সম্মানবোধ নতুন করে জাগবে? সেই নব-বাহারটাই কি
 ধবতে চাইছে তারা? হুহুসাতী কী?

কল্যাণিক প্রসাধন-কোম্পানিগুলির মূল খসম-বিত্তি হল
 উচ্চ-মধ্যবিত্ত ভারতীয় সম্প্রদায়। তাই তাদের পক্ষে হাজারিক ছিল
 Bolly-মার্কিন মূল্যবোধকে 'প্রোমোট' করা। বস্তুত, এই ধরনের
 অধিকাংশ বিজ্ঞাপনে ঐ-কী করা হয়। সেখানে পাশাপাশি যে ধরনের
 পোশাক পরে, যে ধরনের প্রসাধন করে, যে ধরনের ভাবভঙ্গি করে,
 যেভাবে হাসে, যেভাবে কাঁদে, সর্বাংশই যে ভাবায় কথা বলে, সেটা
 জানার-আপনার বাড়ির সঙ্গে মেলে না, অন্তত কিছুকাল আগেও মিলত
 না। 'উ' না বলে 'আউচ' বলা, 'ইস', 'বাকলো' বা 'খ্যাংকেরিক' না বলে
 'নিউ' বলা, 'সিউ' হুলা সাহেবে কিলার ড্রাগ, বাংলা কামালাস ক-বর্ণে তাপ
 একটা এক-অক্ষরের প্রতিশব্দ আছে, সেটা ভদ্রতার খতিয়ে আর
 ছাপলান না), এগুলো তার সবচেয়ে নিরীহ উদাহরণ। সব ক্ষেত্রেই
 স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে বয়ে নেওয়া হয় ঐ Bolly-মার্কিন মো-অিশলা
 ভাষাভাষিক। প্রায়শই দেখবেন, মূল Bolly-মার্কিন কথাগুলো যে-
 কালো ভাব কানো হয় সেগুলো অবজালি গলায় আজেবাজে বলে
 উচ্চারণ হয়। যেমন, 'মাগি, বোজো খিসে সেগেচে'। খিসে এখন আর
 'পায়' না, 'লায়ে'। 'কল্ল এখন 'বোজো'। উচ্চারণকারী গলায় টাই থাধা
 থাকে, তাই সাতখুন মাপ। টিভিতে বোলো যে কোনো চ্যানেলে মাত্র দশ
 মিনিট সময় ব্যয় করলে আপনি এরকম অল্প মিনিমুতা সময় করতে
 পারবেন। কিন্তু এই বিশেষ পণ্ডস-বিজ্ঞাপনটি দেখে মনে হচ্ছে,
 কল্যাণিকরা মেন লাইন থেকে বেঁচে একটা 'কর্ড লাইন' ধরতে চাইছে।
 Bolly-মার্কিন মূল্যবোধকে প্রোমোট করে যে-মূল্যবা মোটবার, সেটা
 তো পুটেছেই, তার বইরে অন্য যে-বাজার রয়েছে, সেটাকেও দখল
 করতে চাইছে তারা। তারা গার্হস্থ্যও থাকে, ওলারও কুড়োচ্ছে-অথবা
 কুড়োচ্ছে।

কিন্তু প্রতিপক্ষ কেন এত ব্যাপণ, কেন তাদের গায়ে এত জোর,
 ঘণ্টা এত বুদ্ধি আর পকেটে এত টাকা, এ নিয়ে কাঁদুন পাওঘাটা কোনো
 কাছের কথা নয়। প্রক্টা হচ্ছে, আমরা যারা 'স্টাটাবে' ঐ জিনিসটাকে
 প্রতিহত করতে চাইছি, তারা কী করছি? কোন কোন জিনিস ব্যাপণ,
 তার তিরিখি বানানো খুব সহজ। কিন্তু তার পাশা কোন কোন জিনিস
 কালো, যত ছোটো আকারেই হোক, তার নিষ্পন্ন তুলে ধরা বড়ো
 কঠিন। কিন্তু সেটাই করা সবার আগে দরকার। কথায় বলে, নিরানকই
 দশ লক্ষাওড়া কর্মসূচির চেয়ে এক দফা ছোটো বাস্তব পদক্ষেপের দৃঢ়
 অনেক বেশি।

আমার মাটি খামি বনি আপলো না রাখি, তাহলে বাসের হাতে
 বন্দুক আছে তারা তো দখল নেবেই।

ধর্ম মানুষকে হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান আরও কত কী বানায়,

কেবল 'মানুষ' বানায় না

গিয়াসুদ্দিন

ধর্ম → ধর্মীয় মৌলবাদ → ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি — এটাই সঠিক সমীকরণ। কিন্তু এই সমীকরণটি ভুল বলে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার করা হয় অথবা এই সমীকরণটি গোপন করার অপচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম ভাল আর ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদীরা মন্দ কিংবা ধর্ম শান্তি, সম্মতি ও অহিংসের কথা বলে, ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদীরা অশান্তি, হিংসা ও বিতর্কের কথা বলে — এই তত্ত্বটা একদম ভুল, একেবারে অহিংসাত্মক ও অবাঞ্ছনীয়। ফারা এই তত্ত্ব প্রচার করেন তাঁদের একটি অভিনয় দ্বারা অংশ হয়ত সত্যই শান্তি ও সম্মতি চায়, কিন্তু বৃহৎ অংশটা সাক্ষরিতভাবে মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য এই মিথ্যাটা নানা অপযুক্তির জাল বুনে প্রচার করে। ধর্মীয় মৌলবাদের অন্যই ধর্মের পার্শ্ব এবং বীরা ধর্মীয় মৌলবাদের প্রচার ও প্রচারণা করে তাঁরাই ধর্মীয় মৌলবাদী। ধর্ম থেকে ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদীদের পৃথকীকরণ কিংবা ধর্ম বুঝে ভাসে কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদীরা ভয়ঙ্কর — মন্দ — এই রকম বজার তুলে মিথ্যা আর হয় না।

অনেক ধর্মীয় ধর্মের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তার্ল মার্কসের মন্তব্য সুবিধিত। ব্রাউন রাসেল বলেছেন, সব ধর্মই কৃত্রিম ও অসত্য। কবি স্যুপ্রিনাথ বলেছেন, অলংকার নির্বোধের প্রাক্তন পুংখন। বিখ্যাত ব্যক্তির ধর্ম সম্পর্কে এই উক্তিগুলি নিশ্চয়ই সত্য। ও যথার্থ, তবু যেন ঠিক মনে ডারে না, যেন খুব নিরীহ গোয়েন্দা মনে হয়। বরং বাস্তবায়নের কবি রত্ন মহাশয়ের উক্তিটি অধিক যথার্থ মনে হয়। তিনি বলেছেন, ধর্ম হল হেমলক বিশ্ব। হ্যাঁ চার্লসিক তাকালো, খুব ভালভাবে নির্বাক করলো মনে হয়, ধর্মের চেয়ে ডারডার নেলা, ধর্মের চেয়ে ডারডার কৃত্রিম, ধর্মের চেয়ে মিথ্যা আর কিছু নেই। ধর্ম তো হেমলক বিশ্বই, তার চেয়েও মায়াক্কত কোনো বিশ্ব থাকলে ধর্ম হল তাইই। ধর্ম কেবল মিথ্যাই নয়, প্রভাবশালী আর এল নয় ধর্ম। ধর্ম কী অনায়াসে, কত অকলীসায় মানুষকে বোকা দেয়, রকায়, বোকা বানায়। ধর্ম মানুষকে হিন্দু বানায়, খৃষ্টান বানায়, ইহুদী বানায়, মুসলমান বানায়, আরও কত কী বানায়, শুধু 'মানুষ' বানায় না। ধর্ম আবার মানুষকে শুধু ভাগ, ভাগের ভাগই করে না, মানুষকে স্বার্থপর করে, গোষ্ঠী করে, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক করে, সাক্ষী করে, শীত করে, শীন করে, বিবেচী করে, হিসে করে, জমী করে, খুব করে, নিষ্ঠুর করে, অমানবিক করে, ক্ষমদায়ী করে, বিবেকহীন করে, মুক্তিহীন করে। নির্বোধ করে, অন্ধ করে। উগ্র করে, গোঁড়া করে, ধর্ম কত অনায়াসে মানুষকে ঘাতকও

করে। আরও বুধনিত যা কিছু আছে ধর্ম মানুষকে সে সবই করে। ধর্ম কেবল মানুষকে সত্যিকারের 'মানুষ' করে না। ধর্ম জেনে এত কৃত্রিমতা তা বুঝতে হলে তার উৎসে যেতে হবে।

মানুষের একটা সমাজ ছিল — অগ্নি সাম্রাজ্য সমাজ। শুধু মানুষের মধ্যে প্রেমী ছিল না, শোষণ ছিল না, রাষ্ট্রও ছিল না; না কোনো ধর্মও ছিল না। হাজার হাজার বছর মানুষ ধর্ম কাঁচা ইশ্বর খুঁজতে খুঁজতে ইশ্বরের প্রয়োজনীয় পড়েনি। মানুষ সমাজ যখন বিচ্ছিন্ন হলো দুটা প্রেমীতে — একবিতে দাম, আর একবিতে দাম-অলিভ — ঠিক তখন হল আবির্ভাব রাষ্ট্রের, তাই সাথে সাথে ধর্মের। শুক হল যেমনই মানুষের ওপর মানুষের শোষণ, তেমন শুক হল শোষণ প্রেমীকে প্রেম-নীড়নের জন্য রাষ্ট্রের শাসন এবং শোষণকে শিষ্ট ও মুক্তিগ্রাহ্য করে তোলায় জন্য ধর্ম তথা ইশ্বরের নামে মিথ্যা প্রচার ও প্রতারণা — তোমরা দাম হয়ে ভাঙবে, কই ভোগ করবে, এসব তোমাদের ইশ্বরের বিধিগণি, তোমাদের পূর্বজন্মের পাপের ফল। যারা দাম-মন্ডিক তারা তাদের পূর্বজন্মের সুকর্মের সুফল ভোগ করবে, ওদের প্রতি ক্ষেত্র করো না, হিংসা করোনা। ইশ্বরের বিধান মেনে পান্ডা থাকো, ইশ্বরকে হরণ করো, মরণের পরে স্বর্গ পাবে এবং পরজন্মে সুখ পাবে। এইসব বাক্য প্রমাণ করে, ধর্ম এসেছে মানুষ কল্যাণের জন্য নয়, এসেছে শোষণ প্রেমীর স্বার্থ রক্ষা করতে। আসলে ধর্ম ইশ্বরের প্রেরিত কোনো আশ্বাসের বর্ণন নয়, শোষণ কেন্দ্রী ও শাসকশ্রেণী ইশ্বরের হস্তা এবং তথাকথিত অমরণ্যের থেকে ওকই ইশ্বরকে মর্মে (মানব সমাজে) ওদের আপন স্বার্থ পূরণ স্থাপন করছে। শোষণের চোখে খুসো দিতে তাইতো বলে ইশ্বর নিরাকার ও অশুভ।

ইশ্বর এবং ইশ্বরের ধর্ম যে শোষণ প্রেমীর সৃষ্টি তা আরও পাঁচ বোকা যায় যখন দেখা যায় সমাজ ব্যবস্থার বিকর্তন ও রূপান্তরের সাথে সাথে কী সুখচারে ও কত সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ইশ্বরের কলী ও বিধানগুলো পাশ্টে পাশ্টে যায়। দাম সমাজে ইশ্বরের বিধান ছিল, মানুষকে (দাম) পতন হঠকো কেনা, বেচা ও হস্তা করাও দেখা নেই, পাশ নেই। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ইশ্বর বিধান মিল, হস্তা করা হস্তাশাল জো বটেই, মানুষকে দাম করে রাখাই পাশ। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ইশ্বর আবার অন্য বিধান মিল। মিল, মানুষকে শুধু ক্রীতদাসও থেকে নয়, ক্রীতদাসও থেকেও মুক্ত করতে হবে। এইভাবে যেমন যেমন শোষণ প্রেমীর যা ও রূপ পাশ্টায়, তেমনই ইশ্বরের বিধানওতো কী

চমৎকার ভাবে পায়ে-পায়ে যায়। এতলেই প্রথম করে পৃথিবীতে দ্যত ধর্ম আছে এবং ধর্মগ্রন্থ আছে সবই অনুভব। ধর্মের জন্ম মিথ্যার পক্ষে, ধর্মের জন্ম মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য, ধর্মের জন্ম স্বার্থের প্রকাশের ও নরকের ভয় দেখিয়ে মানুষকে সোজা, কাপুরুষ ও পুতুল বানানোর জন্য, জাইতো ধর্মের চোখে যথু কিছু আর হয় না। ধর্ম কোনো কালে, কোনো যুগে উৎপাদিকা পদ্ধতির বিকাশের ও সমাজ বিকাশের পক্ষে সহায়তা প্রদান করেনি, বরং প্রতি পক্ষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। মানব সমাজের বিকাশের জন্য তাই ধর্মের স্বরূপ উন্মোচন করা, ধর্ম ব্যাধিক সেভাবেই ধর্মকে মানব সমাজে উপস্থাপন করা একান্তই আবশ্যিক। ধর্মীয় মৌলবাদের বিজড় ধর্মের পক্ষেই, ধর্ম থেকে ধর্মীয় মৌলবাদের পৃথক করে ধর্মীয় মৌলবাদের বিজড় লড়াই বা সমালোচনা শুধু অর্থহীনই নয়, বরং হতভাগ্যও। যারা ধর্মের বন্দনা করেন অথচ ধর্মীয় মৌলবাদের সমালোচনা করেন তাঁরা ভণ্ড ও প্রতারণা প্রেমীভূত জীব। এই প্রেমীভূত মুবেশধারী বুদ্ধিজীবীগণ ধর্মীয় মৌলবাদের হাতেই শক্তিশালী করেন। তাই ধর্ম, ধর্মীয় মৌলবাত এবং তথাকথিত এই বুদ্ধিজীবীদের বিজড়ে সংগ্রাম ব্যতীত মানব সমাজের কল্যাণ ও বিকাশ সম্ভব। অর্জন করা অসম্ভব।

ধর্ম ও ধর্মীয় মৌলবাত তথা ধর্মজ্ঞতা বা ধর্মীয় গোড়ামির ধারণা ও ব্যাকরণই হলো যাকব সম্প্রদায়। ধর্মজ্ঞতার বিজড়ে সংগ্রামের অর্থ তাই যাকবতন্ত্রের বিজড়ে সংগ্রাম। ইসলামী যাকবতন্ত্র তথা মোম্বাতন্ত্রই

সবচেয়ে শক্তিশালী। এটা শুধু এসেছে নয়, সমগ্র বিশ্বেই। সেজন্যই মুসলিম সমাজই সবচেয়ে পক্ষপাশ। এই পক্ষপাশ পক্ষা দুব করতে এই সমাজেই তাই মোম্বাতন্ত্রের বিজড়ে সংগ্রামটা অধিক বেশি জটিল। বলা যাকনা, এই সংগ্রামটা সবচেয়ে কঠিনও। ইসলাম ও ইসলামের প্রকর্তক মহম্মদের সামান্যতম সমালোচনা সহ্য করার মত মানসিক নানুত্তম সমন্বীলতা আজও সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজ অর্জন করতে পারেনি। সামান্য সমালোচনাতেই তেঁদের মুসলিম সমাজ চঞ্চল ও অস্থির, এমনকি হিংস হয়ে ওঠে তার তুলন। কেবল মুসলিম সমাজই এবং এটা মানব সমাজের পক্ষে তীব্রিকর, ততটাই লজ্জাকরও। কোরানের সেই পুনঃপুনঃ শাস্তির হুমকি, সীমা লঙ্ঘনকারীদের আশ্রয় করা করে না এবং তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি এই কথাটা মোম্বাতা ব্যবহার উত্তার করেন, কথার কথার স্বরণ করিয়ে দেন। এর ফলে মুসলিম সমাজের মানুষ হতেও যীরা বলেন শরিয়ত আইনওতো অঙ্কভাবে অনুসরণ নয়, যুক্তি ও ব্যক্তিত্বের নিরিখে মূল্যায়ন করে যেওলা অস্বাভাবিক ও হানিকর সেওলা বর্জন করে ব্যক্তিবসম্মত বিজ্ঞ আইনের নির্দেশ ও অনুশীলন করতে হবে, তাদের সীমালঙ্ঘনকারী বিজ্ঞান করে তাঁদের প্রতি মোম্বাতন্ত্র হিংস হয়ে ওঠে এবং তাঁদের হত্যাশেষের ফতোয়া দেয়। এই ফতোয়া কার্যকর করতে মুসলিম

সমাজের একাংশ কীভাবে উদ্বৃত ও হিংস হয়ে ওঠে তা সর্বজন পৃথিবীতে। এই মোম্বাত সমাজের হাতেই মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব আজও কুণ্ডিত। ফলে মোম্বাত বহুবেশ পুরাণের ও ভ্রান্তচীর্ণ সেই শরিয়ত আইন-কানুন, শরিয়ত মূল্যবোধ ও আদর্শ এবং শরিয়ত শিক্ষা-সংস্কৃতিতেই বিহীন মুসলিম সমাজ আবর্তিত হচ্ছে এবং ক্রমশই পক্ষাশালী হচ্ছে। মুসলিম সমাজের উন্নতির তাই এখন শর্তই হলো শরিয়তের খাঁস থেকে এই সমাজকে মুক্ত করে আধুনিক মানবতাকে গড়ে তোলা। যে সব মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতি শরিয়তের প্রকাশ করেন তারা শরিয়ত প্রকাশের খাঁস থেকে মুসলিম সমাজের উন্নতির কথা বলেন তাঁরা ভণ্ড ও প্রতারণা। এটা মোম্বাতন্ত্রের বিজড়ে সংগ্রামটা আরও জটিল ও কঠিন করে তোলেন।

এই সংগ্রামটা হতেই জটিল ও কঠিন হোক, আমাদের কিন্তু লড়াইতেই হবে, কারণ এর কোনো সহজ, সরল ও অসূখ বিজ্ঞ নেই। শুধু জটিল ও কঠিনই নয়, এটা একটি সীমাহীন সংগ্রামও বটে। সংগ্রাম করতে হবে তাই যেহেতু এই সমাজের মোম্বাতন্ত্রের ফতোয়ার বিজড়ে,

ধর্মীয় গোড়ামি ও ধর্মজ্ঞতার বিজড়ে, সংগ্রাম চালিয়ে হবে মোম্বাতন্ত্রের উৎসমুখতা বন্ধ করার লক্ষ্যেও। মাদ্রাসা (খারিজি) ও মতবগলি হলো মোম্বাতন্ত্রের প্রধান উৎসমুখ। মাদ্রাসাওগলি মোম্বাতন্ত্রকে মৌলানা ও মুফতি সরবরাহ করে। মাদ্রাসা সম্পর্কে ধীরে ধীরে মোহমুক্তি ঘটাবে তিকই, কিন্তু এমনও অসংখ্য মাদ্রাসা চলছে এবং তা চলছে মুক্ত মুসলিম সমাজের

অর্থে। সৌদি আরব থেকেও প্রচুর অর্থ পাশ মাদ্রাসা গুলি। মাদ্রাসা সম্পর্কে মোহমুক্তির মূহুরতিতে আমাদের কর্তব্য হলো ক্রম গতি প্রদান করা এবং মুসলিম সমাজকে মাদ্রাসা ব্যাধি থেকে মুক্ত করা। মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য তাই আধুনিক শিক্ষা, যত শীঘ্র শিক্ষার্থীর অভাবে মাদ্রাসাওগলি বন্ধ হবে, ততশীঘ্র মোম্বাতন্ত্র দুর্বল হবে এবং মুসলিম সমাজের বিকাশের বন্ধ মুখ খুলে যাবে। তাই শুধু আধুনিক শিক্ষার আশঙ্কাতার পক্ষেই বললে হবে না, এর পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা বর্জন করার কথাও স্পষ্ট করে বলায় সাহস অর্জন করতে হবে।

আধুনিক শিক্ষানিকেতনওগলির আভিনায়ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিজড়ে তথা মোম্বাতন্ত্রের বিজড়ে সংগ্রাম পরিচালনার সুযোগ তৈরি করা সম্ভব এবং করা আমাদের কর্তব্য। কারণ আমাদের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীগণ বাতে ধর্মীয় মৌলবাত ও ধর্মজ্ঞতার শিক্ষার না হয় সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকে ও যত্নবান হওয়া আবশ্যিক। বিজ্ঞ আমাদের সরকার ও শিক্ষাবিদগণ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্বিকার। বরং এমনই শিক্ষাক্রম রচনা করা হয় কিংবা রচনা করানো হয় যার ওপর থাকে ধর্মের ব্যাপক প্রভাব। ফলে পৃথিবীতে শিক্ষার শেষে দেখা যায় অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত মানুষজনই বিশ্বাস করেন তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলি — কোরান, পুরাণ, বেদ, বাইবেল ইত্যাদি — ঐশী প্রস্থ এবং

মহা পবিত্র। এদের বশটি আত্মলুপ্ত কলরকম পাবনযুক্ত আট। কোমল-বক্ষঃ-প্লাবিত আনন্দি যা ভক্তি এবং কল্পিত বিপদভাবিকা লগ্ন ভাগ্য সেশা যায়। এরা নিত্য নিজ কর্মীর উপাসনালয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত ও পরিবার-পরিচরনের সুখ-সমৃদ্ধি কামনার স্বার্থপরবল মত আত্ম-তপসাবলি পনতঃ মাথা নত করে। সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে এদের মধ্যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি এদের একাধিক কর্মিঃ মৌলবঙ্গী রূপেও আত্মপ্রকাশ করেন। তাই শুধু গভীরগতিক ও পুণিগত শিক্ষানবী নয়, আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীদের এমনভাবে পঠনান করা উচিত যাতে তাদের মানসিক গঠন এত সংকীর্ণ, এত অনুরাগ, এত আত্মোত্তেজিত করে এত সমাত্রবিশুদ্ধ না হয়। বরং তারা যাকে সকল কর্মীর সংস্কার ও কৃসংস্কারমুক্ত এবং যুক্তিবাদী ও উদার চিন্তের প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠে।

এরূপ পাঠদান সমস্ত নিশ্চয় নয়। কিশোরদের অভ্যস্তের পরিবেশ, বাইরের পরিবেশ এবং সমগ্র পরিবেশই এরূপ পাঠদানের প্রতিফল। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকও এরূপ ঘাট দানের অনুকূল ও সহায়ক নয়। সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং সমাজের মানসিক গঠন এমনই যে এরূপ শিক্ষাকে উপনীত সত্ত্বই হবে,

এরূপ পাঠদান কেবল সুকঠিনই নয়, কৃত্রিমও। কিন্তু এটাও ঠিক যে, এ কাজ অসম্ভবও নয়। সমস্ত প্রতিফলতা এবং শিক্ষারন ও পাঠ্যসূচির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এরূপ পাঠদান সম্ভব। শিক্ষাক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পাঠ্যসূচিও পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে এরূপ পাঠদানের সংযোগ ঘটানো সম্ভব। এরূপ ব্যস্তবধর্মী পাঠদানে শিক্ষার্থীদের কর্মীর মোহমুক্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে সাক্ষ্য অর্জন সম্ভব তা হলক করে বলা যায়।

বাড়ির পরিবেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্ম শুধা ইশ্বর এবং তাদের কর্মকর্তা ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি অকণ্ঠ্যবাস, অকলঙ্ক ও অন্ধ আনুগত্য নিয়েই বিলাসয়ে যায়। কিন্তু অল্প বয়স হেতু তাদের যন্ত্রিত্বের জড়বিশ্বাস, অজ্ঞানত্বা ও অন্ধ আনুগত্য থাকে বলেই হালকা ও পলকা। একই বিজ্ঞান, ব্যতবতা ও যুক্তির আদ্যত মিলেই সেগুলো ভেঙে পড়ে বান বান হয়ে, গায়ের পোশাকে যেমন ফুলের আভরণ প্রথম পর্যায়ে কীধল খালগাভাবে লেটে থাকে, শিক্ষার্থীদের যন্ত্রিত্বও ঠিক তেমনই ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ আনুগত্যি আলগাভাবেই অবস্থান করে। এদের যন্ত্রিত্ব থেকেও সেগুলো পোশাকের ওপর থেকে একই টোকা মেঝে ঘুরে মেঝে ফেলার মতো করিয়ে দেওয়া সম্ভব। তারজন্য প্রয়োজন পঠে; বিশ্বাসের পাঠের সঙ্গে ব্যক্তব জীবনের ঘটনা ও প্রতিজ্ঞাতাও তো তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা এবং সেই বিষয়ে ধর্মগ্রন্থ ওলোতে কী কলা হয়েছে ইচ্ছাযের মতো সেগুলোও তাদের নিকট প্রকাশনা করা। তাহলে ধীরে ধীরে তারা ক্রমেই পারবে এতদিন তারা যা জেনে এসেছে তা ভুলে ছাড়।

একজন সম্ভাবন শিক্ষক হিসাবে আমার যা উপলব্ধি কেবল সেটাই অকণ্ঠ্য ব্যক্ত করার চেষ্টা করছি এই সম্ভাবন এবং এটা কেবল উপলব্ধিই নয়, এটা আমার পরীক্ষালব্ধ ও অভিজ্ঞতালব্ধ একজনর জ্ঞানও। আমার এই জ্ঞান আমার জীবনের অন্যতম এক সেশা প্রভিনও।

আমি যা বিবাস করি তা অতপট্টেই লিখি, যেটুকু লিখি তা মুসলমানদের কল্যাণেই লিখি, আর সেজন্যই পরিবর্তের সমালোচনাও নির্ভীক চিন্তে করি এবং পরিবর্তে স্বর্জন করার আশুদ্য করি। এইসব লিখেই মোহোত্তরের রোহানলে পড়েছি। ধর্ম মানুষকে উন্ন করে, উন্নত করে, হিত করে, আরও কতকগুলে তদন্তব করে তা বিশ্বাসের প্রধানত্ব বলেছি। যা বলেছি তা বসন্তে ফেলেছি ও প্রত্যাক করেছি সেই

লিনওপোতে বসন আমাকে মোহোত্তর যোগ্যতা করা হয় এবং আমার দুঃস্বপ্নজনকীয় নষ্ট লক্ষ টাকার পুণ্ডরার দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। আমি সেখানে কীভাবে ও কতটা মোহোত্তর সমাজ ও কর্মীকে মানুষের হল স্বর্জন হয়ে ওঠে, হিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাইই পাশাপাশি এও লেখছি যে, ওদের সঙ্গে আমার কোনো প্রাক্তন বা বর্তমান ছাত্র যোগ নেই। এমনকি তারা অত উগ্র হইনি, কিন্তু আমার প্রতি ঘটেই বিলাপ

হুমের এবং আমার সমালোচনায় বদল হয়েছে, আমি লেখছি, তাদের মধ্যেও আমার কোনো ছাত্র নেই। বরং আমার প্রাক্তন কে ছাত্রই আমার লেখা সমর্থন করে তা পাশেই আমাকে জনমানের তৈরী করেছে। সেই কভের দিনগুলিতে, আমি মুসলমানদের এত মখর শ্রুত— এই শ্রোত্বকে আকাশ-বাতাস মুখরিত ও তীব্র আবেশলিত করেন, সেই দিনগুলিতে বিলাসনের শ্রৌতিককে কোনো মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর চোখে-মুখে বিশ্বাস্য অপ্রচ্ছন্ন ছাপ লেখি। লেখছি বরং মোহোত্তর জগতদান আমার জন্য তাদের মুখমণ্ডলে উপস্থানের চিহ্ন। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করেছি, কীসে, তোরা কোন শ্রুত? ওরা সংশ্লিষ্ট একযোগে উচ্চকণ্ঠে বলেছে, স্যার, আমরা আপনাব শ্রুত। যে ছাত্রটি বুদ্ধবদ্রায়ে আমার আলোচনা ওয়ে দুইই মীড়িত বোধ করত ধর্মভীকতার কারণে, সেই ছাত্রটিও মীরব থাকেনি, সেও সকলের সঙ্গে তই মিলিয়েছে। এ যে কত বড় দ্রাবি এবং এই দ্রাবির মহানমে যে কত দুঃব তা লেখছি যে সেগা আমার নেই।

মোহোত্তরের প্রধান রিক্রুটিং সেন্টার হলো খারিজি মাদ্রাসাগুলো। মোহোত্তরের ধর্মনিষ্ঠ কভের সহবসায় হয় এই মাদ্রাসাগুলি থেকে। আমরা কারা সমাজের সংস্কার চাই, সমাজের সেই থেকে যাকতীয় মধ্যযুগীয় যুগধরা ও মরতে পড়া বান-গরগ দুঃ করে আধুনিক সমাজের নির্মাণ চাই, সেই আমরাও তো আমাদের সংস্কারের রিক্রুটিং সেন্টার করে গড়ে জোয়ার প্রবাস নিজে গারি আশ্রয়ের শিক প্রভিভানওগিকে।

হোটেলের পাতা

শিকাগোতে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, দুশ্লবোধ ইত্যাদি নিয়ে হোটেল বর্তমান প্রজন্মের এক, কী ভাববো, কী ধারণা বস্তুবোধকে দুশ্ল নিচ্ছে — আমরা যতটা চিকিত্সক সেমস্ব ভাবি না। হয়তো একা বা কখনো চলে যা অকলমেই বসন্তে মৃত্যোগ পায়ে না, চাওয়া পায়ে না। উৎস মনুষ্য সে কল্যাণে কলম দিয়ে চাইছে প্রতি সংস্কার: একেবারে প্রসঙ্গ:

‘দুশ্ল-কলমে কিম্বা শিকার পর বিশেষ খাওয়াতেই জীবনের সার্থকতা।’ এ ব্যাপারে তোমার কী মত?

উত্তর পাওয়া গেছে এরকম:

সম্পর্ক উপেক্ষা করে নয়

মানুষ আত্ম নিজেব ভেতরটাকেও চিনতে সমর্থ পড়ে না। ক্রমে ধূমি কীবা ফোটার মত শুধু সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে মানুষ নিজের ইচ্ছাভা: ও হৃদয়কে জলাঞ্জলি দিয়ে: সাথে সাথে হঠাৎ বাক্সে মনুষ্যের ব্যক্তি: — তাঁরই প্রথমেই বোঝা উচিত আমার কী চাই ও আমি কী পাবার যোগ্য। সহ ও সাধারণ মনুষ্য অত্যাধিক মোহিতের সপন পড়ি দেওয়া একটা তাৎকালিক সমাধান হয়ে পাবে মন্ত জীবনের সফল হওয়া অনেক বড় ব্যাপার। সেখানে অনেক ছোট ছাপের বিশেষ থেকে অর্থ ও খ্যাতি সংগ্রহ। শেষের জন্য, ভাবনার জন্য নিজের ও দেশের উন্নতির জন্য বিশেষ হওয়া যেতেই পারে; কিন্তু তাই বলে তিল তিল করে গড়ে ওঠা সম্পর্কগুলোকে উপেক্ষা করে নয়। সম্পর্কের জন্য হার্ব ড্যাগবি আমাদের দেশের ব্যতস্ত। তাই প্রথমে নিজের প্রকৃত চাহিদা সম্বন্ধে কোন নিজের ব্যক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাইই নিজের বিস্তার ঘটান উচিত। মৃত্যুর টাক: ভাবনার জন্য বিশেষ খাওয়া ও দেশে ঘিরে চালিয়াতি করা নেহাতই অস্ত্র-সোয়াদ্বন্দ্যতা।

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

হাউস স্টাফ

এস. এস. কে. এম. হার্পিস

কলকাতা

আমরা বড় অলস, বারোহ ...

একটি কথা অবশ্যই ঠিক যে, ভারতের খেতে বিশেষে শিকা যথেষ্ট ও তার উপর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ সরাসরি চাকরি করে নিজের পায়ে পাঁড়ানোর সুবিধা আছে; কিন্তু আমাদের ভারতের শিকারব্যবস্থার ক্রমে ক্রমে অবনতি হচ্ছে, এখানকার রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা তাদের নিজেদের স্থান বলে রাখার জন্য বিভিন্ন রকম ভাবে এই

দুশ্লের প্রেক্ষাপটের মানববন্ধন হয় (যদিও) কলকাতা শাসন, কিন্তু কত দ্রুত শেখাই হাঙ্গল দিকে কেউ দিচ্ছে ও তাৎপর্যম্।

অন্যভাবে ভাবলেও বেশ কয়েক বছর যে, বিশ্বের বসীভূত: হাঙ্গল, ১৮৮৬-৯৭ বিলাসাবধি হ্রদ: পতিততা এই দেশের খ্যাতিতে জগৎয়েন, এমনিভাবে প্রকৃতির মতো শিল্প বড় হয়েছে এবং ইংল অত: আমদানি মনে হঠাৎই হয়ে আসেন। বরং তখনকার যুগে আমদানি মতো। বিদ্যুতের অংশ, পাখা ইত্যাদি ছিল না। আমাদের সবচেয়ে বড়: অনুবিগটি হল আমাদের অর্থাৎ আমদানিকার যুগের ছেলেমেয়েরা বড় অলস। বর্তমান যুগে, তত আমদানির আগের চেয়ে বড়: বড়: এবং এই আমদানির চাকরির জন্য আমরা ওঠা সমস্ত অভ্যাসে লেগেছি: আমাদের ঘনি ইচ্ছা থাকত তাহলে আমরাও সমস্ত পাখা বিপত্তি দূর করে এখনই বড় হয়ে উঠতে পারতাম। তাহলে আমাদের বিশেষ খাওয়ার কোনো প্রয়োজন হতো কি?

তৃত্বিতা মন্তব্যকার

বসন্তকুমারী মল্লিকা বিদ্যালী

চটবড় (নদীয়া)

দেশ আমাদের মা

‘‘হেলে আমার মন্ত মানুষ, মন্ত অতিসার’’ — নটিকেরা এই গানের লাইনটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রত্যেক বাবা মায়েরই হয় থাকে আমার হেলে বা মেয়ে বড় জায়গার চাকরি করবে, অনেক টাকা রোজগার করবে। কিন্তু তারা কতদূর তাঁদের স্বপ্ন সার্থক করতে পারে? দুশ্ল কলমেই শিকাগোতে করার পর অভিজাত ঘরের ছেলেমা পাড়ি দেবে বিশেষ অর্থ লাভের লালসায়। বিশেষের ছেলেমা কিন্তু সেভাবে আমাদের দেশে আসে না। যে সমস্ত অভ্যাস মেধাসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা বিশেষে যেতে পারে না, তারা কি তাদের নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না? ঠিক পারে। তারা অল্পত অনের দামত করে বেওয়া না, বরং নিজের মাতৃভূমিকে সম্মান করতে জানে। মাঘের গ্রেহ উপলব্ধি করতে জানে। আর এরই হয় প্রকৃত মানুষ।

মেবলীনা দালগু

লাউব কালকাতা

গার্লস কলেজ (১ম বর্ষ)

বিদেশেই সাক্ষ্য

সেই বছর হল আমি শহর ছেড়েছি এবং উচ্চতর বিদ্যালয়ে জন্য বিশদী বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে ফাওয়ার ইচ্ছে রাখি, অবশ্যই জীবনে সফল হওয়ার জন্য।

আমার শিক্ষার একটি কাজ এই দেশে, এই শহর কলকাতাতেই করা সম্ভব। বিশেষ করে যখন আমি এমন একটি শহরের কথা বলছি যেখানে আন্তর্জাতিক মানের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান আছে।

তবু যে-মানবের কাজ এসব স্থানে হয়, যাতে গোনা কিছু ক্ষেত্রে ছাড়া, পাশ্চাত্যে কল্যাণের পরিমাণের আকার করে আশ্রয়িত হয়।

বিশেষে, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বের শেষদিকের বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা আদান, তাঁরা যে তাদের সুযোগগুলি সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছেন, অত্যন্ত চেষ্টা করছেন, তার আভাস আন্তর্জাতিক মানের পরিকল্পনায় তাদের publication এর তালিকা দেখানই পাওয়া যায়। খসে একই কাজ করতে গেলে, সুযোগ থাকলেও, আমরা কিছু পড়াশুনা করতে হতে পারে যা আমি করতে পারি নই। একই পরিধানে, বিশেষে সাফল্যটাই একই বেশি সহজলভ্য ভেবেই আমরা এ নিশ্চিন্ত।

অকস্মিক নিঃস্বাস
মাতাকান্তের ছায়
আই, আই, টি বোঝে (দুখাই)

দেশের জন্যই বিশেষ সাওয়া

অতীত ছেলেমেয়েই চায় বিশেষ গিফট ভাগ্যে করে পড়াশুনা লিখবে। তাই তাদের বাবা মায়েরাও এই বিষয়ে তাদের বধ্যসাধনা সাহায্য করছেন। বিশেষে পড়াশুনা করার জন্য নানা কৃষির সুযোগ রয়েছে। তবে অনেক কৃতি ছাত্রছাত্রী বিশেষে পড়াশুনা লিখতে যেতে চায় যাদের মনে সুপ্ত থাকে ভবিষ্যতে নিজেকে বিশেষে সুরক্ষিত করার ইচ্ছা। সুখ বাসনা ও বিলাসী জীবন যাপন করার জন্যও অনেক, বিশেষে যেতে আগ্রহী তাদের কথা জালাল।

আমাদের দেশ ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা প্রাচীনকালে থাকলেও আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা চর্চায় সুযোগ ততটা সেই বা বিশেষে আছে। এদেশে এখন কিছু মহৎ প্রশ্ন চিকিৎসক থাকেন যারা বিশেষে গিয়ে পড়াশুনা শেষে এসেছেন এবং এদেশের মানুষের জটিল রোগের চিকিৎসা করছেন। সব কৃতি ছেলেমেয়ে আমাদের দেশকে নিতে গিয়েছেন বিশ্বের দরবারে। এনে দিয়েছেন সম্মান-পরিচিতি-খ্যাতি। এছাড়া ঈশ্বর দেশে নিজস্বের অর্জিত জ্ঞানের কাজে লাগিয়ে আমাদের মত মনিষ মেলে আনছেন অর্থ। তাই বিশেষে পড়াশুনা করতে যাওয়াটা আস্ত আর শুধু শখ বা ঘোহ নয় — একরকম প্রয়োজন। সেজন্যই যারা দেশকে ভালোবাসে, দেশ অর্থাৎ দেশের মানুষের জন্য সত্যিকারের ভালো কিছু করতে চায় — সুযোগ পেলে তাদের জ্ঞান পড়াশুনা করতে যাওয়াটা অক্ষয় প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়।

সংস্কৃতি উন্নয়ন

অষ্টম শ্রেণি
বসন্ত কুমারী বালিকা বিদ্যালয়
চাকরাই (নবীয়া)

অপরকে দেখে ...

যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী কৃতি বলে প্রমাণিত, তারা নিজের মাফুদুদি এবং পরিবারের কথা না ভেবে বিশেষে পাঠি দেয় কেরিয়ার বা নিজের জীবনের গুরুত্বের জন্য। তারপর তারা সারাজীবন নিজের কেরিয়ার

নিজেই ব্যস্ত থাকে, নিজস্ব রোগের দিকে ফিরেও তাকায় না। যে দেশ এত বরফ করে তাকে গড়ে তুলেছে, সেই দেশকে সে ভুলে যায়।

অথবা দেশের ভাবসম্পদের দেশ থেকে গেছে, এমন মেহরাবী চাইও আছে। তাদের সাখা বুঝি কম। দেশের কৃতি ছাত্রছাত্রী একটা দিকটাই বেশ বিশেষে চলে যাওয়ায় ব্যাপারের আদ্যমের দেশেও কিছু বেশ চলে আসে।

প্রথমত : উন্নত ব্যবসায়িক এবং যন্ত্রপাতির অভাবে ছাত্রদের বিশেষে যেতে হয়।

দ্বিতীয়ত : যখন কোনো কৃতি ছাত্র দেশে যে, তখন মেধাসম্পন্ন মানুষ বিশেষে গিয়ে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে বা ব্যবসা করে পড়তে উপার্জন করতে তখন ছাত্রটির মনে হতেই পারে আমি কেন বিশেষে যাচ্ছিলাম, আমি বিশেষে যেলে তার থেকে বেশি টাকা উপার্জন করার। আমাদের দেশ আর্থিকভাবে বিপন্ন। আমাদের দেশের পাতে এই সমস্ত ছাত্রদের বিশেষের সমান সুস্থান বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষে সুযোগ কিছু বেশ আমাদের দেশের সরকারের নেওয়া উচিত, যাতে কৃতি ছাত্রদের আর্থিক অনটন না হয়।

চিন্তা সর্বস্ব

সপ্তম শ্রেণি

বসন্ত কুমারী বালিকা বিদ্যালয়
চাকরাই (নবীয়া)

এই কি জীবনের সার্থকতা?

আমাদের প্রজন্মের প্রকণা হল মূল ভুল ভুল করেই বিশেষে পাঠি দেওয়া। সে উচ্চশিক্ষার জন্যই হোক অথবা মেট্রা টাওয়ার চাকরির জন্য হোক, তাদের বেশির ভাগই দেশের কথা ভুলে বিশেষে থেকে যায়। তাহলে এই কি জীবনের সার্থকতা? না, তা একেবারেই নয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য একজন মানুষকে নবিত্ববান, সম্মত মস্তিষ্ক, মনির্ভর ও বিশ্ববুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত করা, যে তার ভ্রম ও জ্ঞান সমাজ এবং মানবকল্যাণে লাগাতে পারে। এখানেই একজনের সামগ্রিক জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু শিক্ষালাভ করে বিশেষে যাওয়াটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের জীবন এই সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হয় কারণ :

প্রথমত : তারা তাদের নিজের স্বপ্ন বাবা চিত্তের গতিব ভিতরেই আবদ্ধ থাকে। তারা পড়াশুনা করতে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটিকে গুরুত্ব দেয় না।

দ্বিতীয়ত : প্রত্যেকটি দেশবাসী বাধ্য, বাসস্থান, সুযোগ সমস্ত কিছুই চানই দেশের সমাজ, সরকার ও বহু বিভাগ মন্ত্রণালয়ের কাছে গুলী। নাগরিকবান নাগরিক হিসাবে তার উচিত সেই ভবনের দায়ভার বহন করা ও সেইমতো নিজের প্রম দিয়ে তা পোহ করা। কিন্তু শিক্ষালাভের পর এই প্রয়োজনের কথা ভুলে, নাগরিক এড়িয়ে বিশেষে যাওয়াটা তাদের বৃহৎ

অগ্ন ও জীবন থেকে বিদ্যুৎ করে রাখে, তাদের অসম্পূর্ণ
আর কৃত্ত স্বাধীনতার দিকেই ইশিত করে।

প্রবন্ধা বাসনী

প্রথম বর্ষ (বি.এস.সি.)
বিধাননগর কলেজ

বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত এক ছাত্র

যে বিষয় নিয়ে পড়ব বলে মনস্থির করেছি, সে বিষয় যদি
দেশের বাইরে অন্য কোথাও ভাল পড়ানো হয়, চর্চা হয়, তাহলে
সেখানে বেড়ে আশ্রিত কোথায়? আর বিশেষ মানে তো শব্দ পুঞ্জিবাদী
আমেরিকা বা ইংল্যান্ড নয়, দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে যে
কোনো দেশ। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খবেকথার সুযোগ থাকে।

সুতরাং, উচ্চশিক্ষা লাভ করে তাকে মানুষের সেবার কাজে
লাগানোই যদি বৃন্দতর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তো সারা বিশ্বে
হুড়িয়ে আছে মানুষ। হলেই বা আমাদের হিকানা বিশ্বের যে কোন
জায়গায়। শিক্ষাকে ঐতিহ্যের নামে কেন্দ্রীয় বর্ডার লাইনের ভিতর
আটকে রাখা বিশ্বায়নের যুগে সত্যিই কঠিনকর।

সুতরাং, উচ্চশিক্ষার শেষ কথা বিশেষকরত নয়। বরং বলা
চাল বিশেষত্বা উচ্চশিক্ষার প্রস্তুত এক ছাত্র।

উপায়ন পাত্র

একদল স্রেণি
লব্ধ প্রব বিদ্যাপীঠ

বৈদ্যবের হাতছানিতে বিশেষত্বা নয়

প্রাচীন যুগে আমাদের নান্দনা, তাকশীলার সূন্যে যেমন দুর্-
দ্রাঘ থেকে শিক্ষার্থী এসে শিক্ষাগ্রহণ করতেন — তেমনই এ যুগে
আমরা যদি অন্তর্ভুক্ত বা হার্ডোর্ডে শিক্ষাগ্রহণ করতে চাই মনে হয়না
আমরা কোনো অপরাধ করব? অবশ্য আমাদের ভারতবর্ষে
ব্যাসলোব, দুর্ঘাট, প্রমুখ শহর তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে
হাফেট উন্নতি করেছে। তাই শিক্ষার্থী বিশেষ ভ্রমণ আবশ্যিক না হলেও
একটা পথ মাত্র। বিশেষে বৈদ্যবের হাতছানিতে, ধর্মের মোহে পড়ে
অপ্রয়োজনীয় বিশেষত্বা সেই ছাত্রের অদূর ভবিষ্যৎ-এর অনুচ্ছল
অবস্থাকেই সূচিত করে।

স্বাধীন মুখাধী

এর, কয় (প্রথম বর্ষ)
বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের দেশ কিছু শিখিয়ে নেই

উচ্চশিক্ষা শেষ করতে যারা বিশেষ ছোট্টন টীকা 'বিশেষত্বা',

মাত্রত্বন-কে ভুলে যানেন, এমন কিছু চরম অবশ্য ও প্রান্ত ধারণা নিয়ে
আমি বিশ্বচর্চাকে বিচার করতে চাই না। কারণ সেক্ষেত্রে ব্যাপনটো
হিপোক্রিসি হয়ে। শিক্ষার্থী কোথায় তার উচ্চশিক্ষা শেষ করবে তা
নির্ভর করে পাঠ্য বিজ্ঞানের উপর : শিক্ষার্থীর পছন্দ, তার যোগ্যতা,
মাত্রার্থী, শিক্ষাক্ষেত্রের পরিবেশ ও পরিপক্বতায়ো। এই পাঠ্য শর্ত
ওধ্যতায় বিশেষের বিশ্ববিদ্যালয়েই পূর্ণ হবে এমন কোনও মানে নেই।
বরং আমাদের ভারত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আরোই শিখিয়ে নেই (দুশত
প্রাথমিক শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে রিসার্চ ওয়ার্কফোর্সের ক্ষেত্রে আমাদের
হাটতি)। তাই ওধ্যতায় নামের শিখনে (সার্ব অমুক অ্যাক্সারসন ক্যাম্প
অফ হাইমার স্টাডিস অফ ওমুক টাউন, ওঃ কিন্তুই বিরাট কিছু হলে)।
ছোট্টার আগে এটাই ভাবা উচিত। চাকরির ক্ষেত্রেও একই কথা
প্রযোজ্য। বিশেষে যদি ভালো ('ভালো' কথটা আপেক্ষিক এবং
ওধ্যত্বপূর্ণ) চাকরির সুযোগ থাকে তা কখনও ছাড়া উচিত নয়। তাই
উচ্চশিক্ষার শেষ বিশেষ যাত্রার মধ্য দিয়ে একথা মনেতে লাগলো না।
বরং বলা যায় উচ্চশিক্ষার প্রকৃত সমাপ্তি ভালো প্রতিষ্ঠানের ভালো
ভিত্তি লাভের মধ্য দিয়ে।

নামক মুখাধ্যায়

একদল স্রেণি
লব্ধপ্রব বিদ্যাপীঠ

কৃষা বিশেষ শিক্ষা

শিক্ষার জন্য বিশেষ ভ্রমণ কোন নতুন ব্যাপার নয়। প্রাচীনকাল
থেকেই এই রীতি চালু আসছে। এখনো ভারতের বিভিন্ন
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ ছাত্রছাত্রীরা পড়াওতো করার জন্য ভিড়
জমায়। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন বিশেষে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ না করলে
জীবনটাই কৃষা। এমন ধারণা যাত্রা পোষণ করেন তাঁদের সম্পর্কে
সমিহাস হয়ে উঠতে হয়। মনে হয়, তাঁরা নিজেদের বৌদ্ধিক বিকাশের
জন্য নয়, নিজেদের শব্দ পুঞ্জ আর সমাজের উচ্চ কোটিতে স্থান
পাওয়ার জন্যই বিশেষ ভ্রমণ করতে চান।

ওমু তাই নয়, বেশিভাগ এ-দেশীয় ছাত্রছাত্রী বিশেষে
পড়াওতো করে, বিশেষেই নিজেদের ডব্বিবাং গড়ে ফেলে; আর
লাকালাকি ভাবেই সেখানে থেকে যায়। অর্থাৎ তাদের বিশেষ
শিক্ষাগ্রহণ এখানকার মানুষের কোন কাজে লাগে না। এমন বিশেষ
শিক্ষাকে কৃষা বলে কি গণ্য করা যায় না?

প্রমিত ভট্টাচার্য

বি.এ. (দ্বিতীয় বর্ষ)

বসা, দাঁড়ানো, শোওয়া, চলাফেরা

ডঃ জ্যোতিষ আগরওয়াল

সারানুবাদ : দুলালকান্তি রায়

আপনি যেভাবে বসেন, দাঁড়ান, চলাফেরা করেন, ভেঙে কাজ করেন, ভিনিসপত্র ধরে নিয়ে যান, পছন্দমত ভুলো যাচ্ছেন, বেড়ান, ধুমন, নিজের গুজনটাকে সামলান এবং এভাবে যে শক্তি আপনার বায় হয়, আপনার শিঠের উপর তার একটা দাপ্তর প্রভাব পড়ে। আপনি যদি আপনার শিঠের পেশীর, হাড়ের এবং গ্রহিণী ক্রান্তি কমাতে চান তাহলে নিজের দেহভঙ্গি ঠিকমতো রাখার অভ্যাসটা করুন। এটা আপনার শরীরের ভাবনাময় রাখতে ও সাহায্য করবে।

ঠিকমতো বসুন



আমরা যখন বসে থাকি তখন আমাদের শিঠের নিচের দিকে বেশ বকল পড়ে। এসময় শিঠের নিচের দিকের ঝড়নও যে চাপ পড়ে তা ঠিকিয়ে থাকার সময়ের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি। আপনার

প্রতিদিনকার ক্রটিবাদের কথা ভাবুন—আপনি পড়ছেন, ডেডে কাজ করছেন, টেলিভিশন দেখছেন, বেড়াচ্ছেন বা খাচ্ছেন, যাইই করুন না কেন আপনি দেখবেন দিনের বেশির ভাগ সময়টা আপনি কসেই কটাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও আমরা খুব কম লোকই কিভাবে যদি তার বর্ধেই ওরুখ স্নি না। প্রাথমিক ব্যাপারটা খুবই সরল। নির্ভুলভাবে বসা বলতে খুব সহজভাবে বোঝায় :—

- আপনার পা মেঝের উপর থাকবে।
- আপনার হাঁটু দুটি ৯০ ডিগ্রি কোণ করে থাকবে।
- আপনার কোমর হাঁটুর সমান বা তার চেয়ে একটু বেশি উচ্চতায় থাকবে।
- শিঠটা বেশ ভালমতো ট্রেস সেওয়া থাকবে—বিশেষ করে বাক্যনো খাঁজে হলে আরও ভাল হয়।
- আপনার শিঠের বেশ পিছন দিক করে বসুন।
- আপনার মাথা, কাঁধ ও কোমর এক লাইনে থাকবে।

অবসরে বাড়িতে

সারাদিনের খাটা-খাটুনির পর মানুষ যখন বাড়িতে যশে বিশ্রাম নেয় তখন সে কবার ভঙ্গির কথা একেবারেই মাথার সাথে না।

কবার ক্রটির জন্য যে শিঠ-বাখাগুলো হয় তার ওক কিছু হয় মানুষ যখন বসে তখন থেকেই। কখনো কখনো কৌচ-চেতাবের পোশেও সমস্যা হয়।

আসবাবপত্র ঘাঁবা তৈরি করেন মানুষের শিঠের পক্ষে সবকিধি বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁদের প্রাথমিক ধারণা থাকা সবকর। মেডলগের বাক এমনই যে সেজন্য শিঠের নিচের দিকে একটা অবলম্বন বা ট্রেকা দরকার। বাড়ির বেশ কিছু আসবাবপত্রে এসব থাকে না। সেওয়া এবং ইচ্ছা চেয়ারে শিঠের সমস্যা হতে পারে যদি সেগুলো খুব নরম হয়, এবং সিট খুব নিচু, গভীর হয় বা পিছনের ট্রেকা খুব ছোট হয়। সিট খুব গভীর হলে আপনি মেঝেতে পা রেখে সামনে বসতে বাধ্য হবেন। তাতে আপনি আবার সামনে ঝুঁকে পড়তে পারেন, নয়তো মোথ থেকে পা তুলে পিছনে হেলে কোমরটাকে ট্রেকা দিতে চাইবেন। এ দুটোই যে কোনোটাতেই পরে শিঠের বেদনা ওক হতে পারে। সিট খুব নরম বা খুব নিচু হলে আপনি অসুবিধের পড়তে পারেন। একেবারে আপনি যেভাবেই বসুন আপনার মেকনও অত্যধিক চাপ পড়বেই।

শিঠ ভালভাবে রাখা যাবে এমন একটা ইচ্ছা চেয়ারে বসলে আপনার শিঠের নিচের শিঠটা ভালভাবে লেগে থাকবে এবং আপনার দুটো পা-ই ওটোলোভাবে মেকের উপর থাকবে। ইচ্ছা চেয়ারে শিঠ রাখার মত ছায়গাটার এমন আকার হওয়া উচিত যাতে সেটা কোমরের কিছুটা বাড়তি ট্রেকা দিতে পারে। যদি সেরকম না হয় তাহলে শিঠের কাছে একটা, কি দুটো কুশন রাখুন। সিটটা খুব নিচু হলে মিলিতকে বিয়ে পা দুটো উপরে রাখার ব্যবস্থা করবেন।

আপনার ভঙ্গির দিকে আপনি নজর রাখুন

আপনি যদি আপনার ভঙ্গির দিকে নজর না রাখেন তাহলে সোকা ও অর্ধচেয়ার যত নির্ভুতভাবেই তৈরি হোক না কেন আপনার শিঠ তাতে বকা পাবে না। আপনি খাড়া হয়ে বসুন। আপনার শিঠের নিচের অংশে যেন একটা সাপোর্ট থাকে এবং আপনার পা দুটো মেঝেতে রাখুন। পা এলিয়ে আরাম করার অবস্থায় বসবেন না। অনেকই এটা করেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। চেয়ারে পা এলিয়ে বসলে শিঠ অত্যধিক বেক হয় এবং তাতে শিঠের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে।

যখন টিভি দেখবেন বা বই পড়বেন

যখন টিভি দেখবেন তখন সবচেয়ে ভাল হল সবাসরি পর্দার

সামনে চেয়ার এনে বসে যাতে আপনার বকের মত গণা বাড়িয়ে ছবি দেখতে না হয়।

অনেকে বিছানায় ওয়ে বা সোফার হাতলে মাথা রেখে একটু কাত হয়ে পড়তে, টি.ভি. দেখতে বা একটু ডক্সা ঘেঁষে ভালবাসেন। খুব ভাল হয় যদি এই অভ্যাসটা একেবারেই ছাড়েন, হাতলের যে কোণটা থাকে তার নকন ঘাড়ের বেশ চাপ পড়ে এবং পরে ঘাড়ের ব্যথা হয়। নেহাত যদি ঈর্ষাভেদী থাকেন তাহলে একটু উঠে বসে ঘাড়টাকে এমনভাবে রাখুন যাতে তাকে এমিক-ওনিক করতে ঘুরিয়ে ছবি দেখতে বা পড়তে না হয়। ঘাড়ের পিছনে কুলন রাখবেন এবং ঘাড়ের উপর চাপ কমাতে আধঘণ্টা অন্তর ঘাড়টাকে নড়াবেন।

টি.ভি. কীভাবে রাখবেন সেটা অবশ্য খুব জরুরি। আপনার চোখের সোজসে (উচ্চতায়) এটা রাখাই একটা আদর্শ ব্যবস্থা। এতে আপনারা ছবি দেখার সময় ঘাড় এমিক-ওনিক করতে হবে না। টি.ভি. খুব উঁচুতে বা খুব নিচুতে রাখলে ঘাড়ের চাপ পড়ে।

একটু বিরাম দিন

আপনি যা-ই করুন না কেন মাঝে মাঝে অবশ্যই বিরাম নেন। নিষ্ক্রেম অবস্থান বদলাবেন। দাঁড়াবেন, এমিক-ওনিক ঘুরবেন। পিঠটাকে টান-টান করবেন। এতে আপনার পিঠ বেশ ভালো অবস্থায় থাকবে।

ঠিকমতো দাঁড়ান ও হাঁটুন

দাঁড়ানোই বলুন আর হাঁটাই বলুন তা ঠিকভাবে করে আপনার মেরুদণ্ডটাকে স্বাভাবিক রাখতেই হবে। চেষ্টা করবেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে ও হাঁটতে।



পেটকে ভিতরের দিকে রেখে পিঠ সোজা করবেন, কাঁধ ঘেঁষে না ঝুঁকে বায় দেখাবেন। আবার বাড়াবাড়িও করবেন না। সিঁপাইরা গ্যারেজ করার সময় পরীরের উপর অংশটাকে যেভাবে খাড়া করে রাখে সেটাই সে চেষ্টা করবেন না—তাতে পেশীতে টান পড়ে এবং ব্যথাও হয়।

অনেককণ কোথাও দাঁড়িয়ে থাকতে হলে একটা পা মাটির উপর মজবুত করে রেখে অন্য পা হট-পাথর বা রেলিং-য়ের উপর রাখবেন। পা রাখার টুল খুবই দরকারি। নেওয়াসে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ান। হাতল ব্যবহার করুন। কয়েক মিনিট অন্তর পা বদলাবেন।

কর্মক্ষেত্রে কসরীয়

অমিমে বা অন্য কোনো কর্মক্ষেত্রে যদি ভাবেন আপনি বসে বসে কুঁকড়ে হয়ে যাচ্ছেন তাহলে পাবেন তো নিচের কথাগুলো মেনে চলুন :

এমন একটা চেয়ার ব্যবহার করুন যা আপনার পিঠের নিচের ঠিককত ঢেঁকা শিমে রাখতে পারবে। তা না হলে একটা ডোমাসে ডাঁড় করে বা একটা বালিশ পিঠের নিচের অংশের পিছনে রাখুন — দেখতে হবে চেয়ারের সিটের জনা মেনে আপনার উক বা হাঁটুর উপর কোনো চাপ না পড়ে। পাবলে এজন্য একটা নতুন চেয়ার যোগাড় করে ফেলুন।

এক নাগাড়ে এক অবস্থায় বসে থাকবেন না। উইন, একটু চলাফেরা করুন। যেমন, কারও সঙ্গে যোগে কথা হলে দাঁড়িয়ে সেটা করুন। সবসময় ঘাড় ঝাঁকিয়ে কাজ করবেন না। কাগজপত্র পড়তে হলে সেগুলো চোখের উচ্চতায় ধরুন। অনেককণ ঘাড় ঘুরিয়ে বা ঝাঁকিয়ে, বা পিঠের উপর বকল দিয়ে কাজ করলে একসময়ে কষ্ট হবেই।

কম্পিউটারে যখন কাজ করেন



কম্পিউটার এখন গ্রাম সব কারোই ব্যবহার হচ্ছে। যদি অনেককণ এই নিয়ে কাজ করছে হয় তাহলে নিচের কথাগুলি অবশ্যই মেনে চলুন :

কম্পিউটার মনিটর ও কী-বোর্ডকে

ঠিকমতো উচ্চতায় রাখুন যাতে কম্পিউটার স্ক্রিন সোজা আপনার সামনে থাকে এবং আপনার থেকে একহাত দূরে থাকে। আপনার কান্নের টেক্সটি এবং কী-বোর্ডটিও কনুই-এর উচ্চতায় রাখা দরকার।

- আর চাই শরীণ্ড আলো। স্ক্রিন আলোর ফোকাসে থাকা উচিত।
- বেশ সোজা হয়ে আয়াম করে বসুন। কোনক্রমেই ঝুঁকে বসাবেন না।
- কাগজপত্র রাখার জন্য একটা স্ট্যান্ড রাখলে ভাল হয়। সেটা স্ক্রিনের উচ্চতায় রাখতে হবে যাতে সেখান থেকে কিছু নেওয়ার জন্য উপর-নিচে বার বার তাকাতে না হয়।
- গ্রাম সময়ই আমাদের অনেককে অনেককণ কম্পিউটারের সমানে বসে কাজ করতে হয়। তখন আমরা বসার ধরন, বসার ভঙ্গি নিয়ে একবারও ভাবি না, ওরফন্দও সিঁই না। এর ফলে পিঠের কষ্ট সেরা দেয়। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ৩০ সেকেন্ডের বিরতি নেওয়া উচিত। এসময়ে ঘাড়টাকে এপাশ-ওপাশ এবং শিঠকেও ঝাঁকি থেকে ডানদিকে কয়েকবার ঘোরানো দরকার। এতে আপনার ঘাড় ও পিঠ অনেক দকল থেকে ঝাঁকবে।

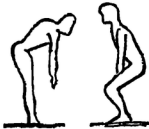
- অনেককে অনেক সময় কাঁধে ফোন রেখে মোদে কথা বললে, সেইসঙ্গে টেবিলে কাজ করেন, টাইপও করেন। এটা একেবারে করছেন না। ফোনে অনেককণ ধরে কথা বলার ব্যাপার থাকলে হেডফোন ব্যবহার করুন।

কাজের টেবিল

- টেবিল এমনই একটা উচ্চতায় হওয়া দরকার যাতে কাজ করতে গিয়ে পিঠে টান না পড়ে। যদি সেটা খুব নিচু হয় তাহলে তার উপর ঝুঁকে কাজ করতে হয়—যা একেবারেই ঠিক নয়।
- ডেস্ত একটু হেলানো হলে পড়া ও লেখা দুয়েকই সুবিধে হয়।
- টেবিলের নিচে পা রাখার ভাল জায়গা থাকা দরকার যাতে অযথা ঘাড়, পিঠ সামনে ঝুঁকিয়ে কাজ করতে না হয়।

জিনিস তোলা এবং বসে নিয়ে যাওয়া

আমাদের পিঠের তিনটি স্বাভাবিক বক্র আছে—ঘাড়ের বক্র



ভিতরের নিকে, কাঁধের বক্র বাইরের নিকে এবং পিঠের নিচের নিকটার বক্র ভিতরের নিকে। ভারী জিনিস তোলা ও বসে নিয়ে যাওয়ার সময় সেভাবে হবে এই বক্রগুলো যেন ঠিক থাকে। তাহলে পিঠের ব্যথার সম্ভাবনা কমবে।

ভারী জিনিসটার যতটা কাছে সম্ভব ধাঁড়াতে হবে। দুটো পায়ের মাঝে একটু ফাঁক রেখে একটা পা কে আর একটা পায়ের কিছু সামনে রাখতে হবে।

কখনও কুঁকো মাটি থেকে জিনিস তুলবেন না। তার বশে ইটু দুটো একটু ভাঁজ করে দুটো পায়ের উপর ভর করে জিনিসটা তুলুন। তোলার সময় সেভাবে হবে যাতে পিঠটা যতটা সম্ভব সোজা থাকে। এ সময় এদিক-ওদিক ঘাড় না ঘুরিয়ে জিনিসটাকে যতটা সম্ভব শরীরের কাছে এনে বসে নিয়ে গেলেনই ভাল। এতে পিঠের নিচের অংশে চাপটা কম পড়ে।

বিদ্যনা নিয়ে

মানুষ জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় বিদ্যনাতে কাটার, অথচ বিদ্যনাটা তার শরীর-বাস্তবের পক্ষে কতটা ভাল তা নিয়ে অত ভাববে না। বিদ্যানার উঠলে বিদ্যনা যদি নেমে যায়, বিদ্যনা যদি উঠে-নিচু হয়

তাহলে সেটা বার দিয়ে নতুন বিদ্যানার কথা ভাবাই ভাল। নইলে মেরুদণ্ড ও পিঠে পলে কষ্ট হবে।

আদর্শ বিদ্যনা তাকেই বলব যা আবহমানকাল এবং পরীদের পিছনে ভালোবাসার সঙ্গীত দেবে। কাঠের তক্তাব উপর ৫ থেকে ৮ সেন্টিমি পুরু কোষক বা গনি যা নরম হবে কিন্তু এমন নরম হবে না যে বসলে সেবে যাবে এমন বিদ্যনাই হবে আদর্শ বিদ্যনা।

কীভাবে ঘুমাবেন

পিঠের নিচের নিকের কথা ভাবলে পাশ ফিরে শোওয়াই সবচেয়ে ভাল। পা দুটোকে সামান্য নুকেব নিকে এনে একটা বর্ধিত দুটো পায়ের মাঝখানে রাখতে হবে। এতে আপনার মেরুদণ্ডে কোনো টান পড়বে না।

চিং হয়ে শোওয়া খারাপ কিছু নয়। এতে যদি কিছু অস্বস্তি হয় তাহলে ইটুর নিচে একটা বালিশ রাখতে পারেন। এতে কোমর ও গ্রানটিং-এ টান পড়বে না।

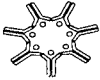
উপুড় হয়ে শোওয়াটা একেবারেই ঠিক নয়। কিন্তু এভাবে ওঠেই যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে পেটের নিচে একটা বালিশ রাখবেন। এতে পিঠে অতিরিক্ত ঝাঁক হবে না। উপুড় হয়ে ওঠে ঘাড়টাকে পাশে ঘুরিয়ে রাখতে হয়। এতে ঘাড়ের উপর চাপ পড়ে। যদি উপুড় হয়ে শোওয়াই আপনাকে পছন্দ করেন তাহলে একটু ঘুরে এমনভাবে আশোওয়া অবস্থায় থাকুন যাতে পেটের নিচে বালিশ বেয়ে শরীরের উপরের অংশটা পাশ ফিরে থাকে।

বালিশ কেমন হবে

মাথার বালিশ যেন খুব উঁচু বা খুব নিচু না হয়। এমন উচ্চতায় হওয়া উচিত যাতে সেই বালিশে মাথা রাখলে মাথাকে ঝাঁকিয়ে সামনে বা পিছনে না আনতে হয়। সেখানে হবে ওঁচু ঘাড় ও মাথা যেন বালিশের উপর থাকে, কাঁধ কেনোফ্রমেই বালিশের উপর রাখা চলবে না, আর বালিশটা একটু নরম হলেই আপনার ঘাড়ের পক্ষে ভাল হবে।

সূত্র : Dream 2047 : Vigyan Prasara, New Delhi.
August 2006

সংগঠন সংবাদ



১৯৮১ ৮৩৬১৫

- গত ১৪ই জানুয়ারি নদীয়া জেলার পাকড়াডাঙ্গার উকিলনাড়া গ্রামে 'চান্দন' বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা' একটি পঞ্চসভার আয়োজন করে। বিষয় — 'সিসুর থেকে হরিপুর — উন্নয়ন ও পরিবেশ'।
- 'বিকল্প বিদ্যুৎ কি পারমাণবিক বিদ্যুৎ হতে পারে?' — এই বিষয় নিয়ে চন্দনই রায়শাল একাডেমিতে গত ২৪.২.২০০৭ বিকেল তিনটোর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিকিৎসক, সাক্ষরিতিক কর্মী, বিজ্ঞানকর্মী, কৃষক, প্রমিষ, ছাত্র বিভিন্ন স্থানের হল ভর্তি মানুষের সামনে প্রথমে পান পরিবেশন করেন মৃতপা বাঘোপাধ্যায়। প্রথম বক্তা ছিলেন

অমিত সরকার (অকলিত)। উনি মানবশরীরের রেডিয়েশনের প্রভাব ও তার শেষ পরিণতি সীতা নিয়ে আলোচনা করেন। শেষ বক্তা ছিলেন প্রণীপ ঘোষ। পরমাণু চুল্লির বিজ্ঞানের নিকটই হরিপুর ঘুরে আসার প্রত্যাক অভিজ্ঞতা ও আশেপাশের চরিত্র মানুষের কাছে তুলে ধরেন। ডাক ছিল প্রাক্কল বা দুকতে সাধারণ মানুষের কোনোই অসুবিধা হয়নি।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন চান্দনই বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। আলোচনা সভার শেষ পর্বে বহুজন প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চলে।

□ ১৬ এপ্রিল '০৭ ক্যানিং মুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার ১০ জনের দল দু'ডাঙা ভাগ হয়ে ২০ দিনব্যাপী সারা পশ্চিমবঙ্গে সাইকেল পরিভ্রমণ শুরু করে। 'সাগের কামড়ে আর দুতা-মুখ নয়' — এই প্রতিজ্ঞা বালোর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার স্বত্ব নিয়ে এই পরিভ্রমণ। সুন্দরবন এলাকার এই স্বল্প-সরাসির সংস্থা ভ্রমণের কর্মসূচি চালিতে যাচ্ছে জীবন। সাইকেল-কর্মীদের একটি দল উ. ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুর, ভুলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কুচবিহারে চেলা ঘুরছে। অন্য দল হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, ধনসি, ন. ২৪ পরগনা মোট ১৮টি জেলা পরিভ্রমণ করে দুই দলই ক্যানিং শহরে ফিরেছে ৫ মে ২০০৭।

সি. ওই স্মরণে

বই-চিত্র

১৫, বঙ্গিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট (কমি হাউসের তিনতলা), কলকাতা ৭০

দূরত্ব: ২২৪১ ৬৮৪৫, ৩২১০ ৭৮৩৭

কলকাতা স্ট্রিট কমি হাউসের তিনতলায় বই-চিত্র — কোনো সাধারণ বই বা ছবির বিপণনকেন্দ্র নয়, বই-চিত্র-র পোছন আছে একশো বছরের ইতিহাসের বিদ্যুতি, আছে সমসাময়িক জীবনধারণের টানাপোড়েনের বোঝা - আত্ম ও তাই সি, ছয় মূর্তিওর ফটোগ্রাফিক মূল্য বহুপাতি, কীটের নেগেটিভ, পুরনো আসবাব, তার সুখপত্র, আপনাকে ধাঁড় করিয়ে দেবে অতীত বর্তমানের সঙ্গিলয়।

গত এক বছরে অতীত বর্তমানের এই অনায়াস কাভার্ড আমরা নিশ্চিত করেছি অল্প গ্যালারি আলোকচিত্র প্রকাশিত, বৈকুণ্ঠ সুকুলের স্মৃতিসভার, অল্প নাগের ফটোগ্রাফির বিবর্তন নিয়ে বক্তৃতার এবং চার ওই পরিচয় গ্রন্থ প্রকাশে। এখন আমরা চেষ্টা করে চলেছি আলোকচিত্রের একটি সংগ্রহশালা তৈরি করতে।

এর পালাপাশি আমাদের পুরনো কার্ড চলতেই থাকছে — সুনির্বাচিত বাংলা, ইংরেজি বইয়ের সংগ্রহ আমাদের প্রতিদিনই নতুন করে, জড়ো হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিনগুলি।

আপনার সবরকম পরামর্শ নিয়ে আসুন বই-চিত্র; আমরা বেলা ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

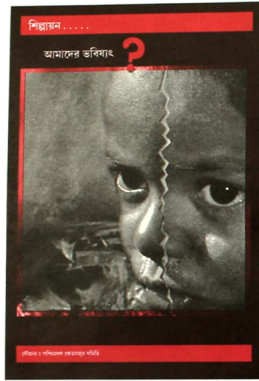
সবু গৃহ - জীবন ও আলোকচিত্র

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

সংকলন ও গ্রন্থনা : সৌমেন ওই

সম্পাদনা : বই-চিত্র

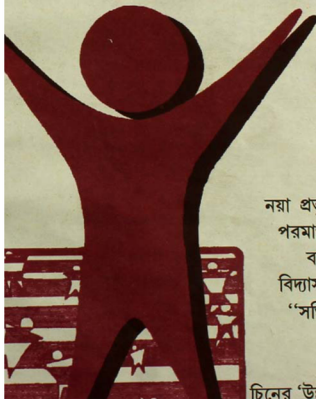
দাম : ৭৫ টাকা



ভারত সরকারের সি এ জি (Comptroller & Auditor General) রিপোর্ট, মার্চ ২০০৬, অনুসারে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মাথায় রাজ্যের ঋণের বোঝার পরিমাণ ১ লক্ষ ৪ হাজার ২০২ কোটি টাকা; গোটা রাজ্যের সমস্ত কৃষিজমি বেচেও এ ঋণ শোধ হওয়ার নয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে জমা দেওয়া এন সি ই আর টি রিপোর্ট অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে শহর-গ্রাম মিলিয়ে স্কুল পড়ুয়াসের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ স্কুলছুট (drop-out)।

কেন্দ্রীয় সরকারে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা 'Perceived Adequacy of Food Consumption in Indian Household ২০০৪-২০০৫' অনুসারে অনাহারে-অর্ধাহারে ভোগা গ্রামবাসীর সংখ্যার অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গ সবার ওপরে। সারাবছরের কয়েকমাস এ রাজ্যের ১০.৬ শতাংশ গ্রামবাসী ন্যূনতম খাবার পায় না। তার পরেই রয়েছে ওড়িশা, ৪.৮ শতাংশ। খাদ্যভাবের জ্বালা সবচেয়ে কম রাজস্থান ও হরিয়ানায়। আর পুরো সারাবছর ধরে অগ্রতুল খাদ্য জোগানে শীর্ষে রয়েছে আসাম (৩.৬ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার), তার পরেই পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা (১.৩ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার)। এর পরে বিহার।



Cur
AR
18/09/07



নয়া প্রভু, নয়া দাস, নয়া বুদ্ধিজীবী
পরমাণু বিদ্যুৎ - ভালো না মন্দ
বার্ড ফু আর জলাভূমি
বিদ্যাসাগর 'ঘর জ্বালানে' ?
“সত্যি বললে পস্তাতে হয়”

বিশিষ্ট প্রোগ্রাম
চিনের 'উন্নয়ন' কি আমাদের 'উন্নয়ন' ?

সূচিপত্র

অনাহারের পপতন্ত্র ও দিসুর	শর্মিষ্ঠা রায়	২
প্রতিবাসী নটক এবং তথ্যচিত্র	শাহু রায়	৩
একটি আত্মকথন	হুমায়র চক্রবর্তী	৬
তত্ত্ব বিজ্ঞানকে মনে রেখে ...	কল্যাণ রায়	৯
"হর-জ্বালানে পর-ভালানে" কিশোরগঞ্জ	আশীষ লাহিড়ী	১২
ক্রান্তর এবং শিক্ষক	বিদ্রব মুখোপাধ্যায়	১৫
কর্ণশ্রোত মেজাজ	ভবেন্দ্র দাস	১৭
অসুস্থির হাত ধরে	অমিত চৌধুরী	১৮
পরমাণু বিদ্যুৎ : তাত্ত্বিক-দর্শন বিবরণ	মানস প্রভিন্দ দাস	২১
বার্ড হু আর ফলাফুলি	অসীম চট্টোপাধ্যায়	২৭
ছোটদের পাতা		২৮
পুস্তক পর্যালোচনা - ১	বরুণ চট্টোপাধ্যায়	৩০
পুস্তক পর্যালোচনা - ২	মৃণালকান্তি রায়	৩১
সংগঠন সংবাদ		৩১
ক্রেডেন্স : চিনের পুঞ্জিবাসী ফ্যাসিবাদ	সেবিত্রত পণ্ডা	৩২

সম্পাদনা □ অশোক কল্যাণাধ্যায়

উৎস মানুষ

ISSN 0971 - 5800

বি ডি ৪৯৪, স-৩ লেক, কলকাতা ৬৪

BD 494, Salt Lake, Kolkata 64

অধ্যাপক কার্যালয় — প্রবাসী, এস ৬/২, স-৩ লেক, কলকাতা ১০৬

ফোন : ২৩৫৮ ৬৩১১, ২৩৫৪ ০৯০৪

কি হুতি!

কি হুতি ওদের!

সেই ছোট দু'বক, যারা গত ১৫ জুলাই শাবকিত্ত বাসের মধ্যে সমবেত 'পারিত্রিক' নাগরিকদের প্রার্থনার সামনে এক অসহায় তরুণীকে হুংরিষ্টভাবে সজ্জিত করল, বাসের এতমাত্র প্রতিবাদী দু'বক জগজ্ঞাথকে নৃপনে মানে রক্তাক্ত করল, তাদের কি হুতি হলো তো — পুলিশ তাদের চিকিৎসাও হুঁতে আসেনি, কর্তৃকাকিত্তা বলে বিরোধে পড়বে ইচ্ছা চিহ্নিত কোনো সংকট তৈরি করবে না, হুংং মুখামস্তী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে। এস ১ কর্টেব সেই বাসের সরকারি কন্ডাক্টর ড্রাইভারেরও কি হুতি! ওরা বাসের ভেতর চূড়ান্ত নন্দভগনা মেধেও কেনোরকম বাধা সেওয়ার বলে আক্রান্ত দু'বককেই ধাক্কা দিয়ে বাস থেকে নামিয়ে দিয়েছে; কিন্তু সরতাবে আক্রান্ত তাদের নাকি চিকিৎসাও করতে পারেনি। মুখামস্তী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে।

১৬ জুলাই হাফতার জোড়া দু'নে অতিমুক্ত কৃষ্ণাত্ত তিংগা প্রণাত 'বুটিন' বেসমুর ছাড়া পেয়ে গেল ব্যারাসত অনাবাসত। অপরাধ অমান্য বার্থ প্রকাশন। অসংখ্য দু'বক, বু'ন, ধর্ষণ, জোলাবাতি, দালাগিরির নাহক উত্তর ২৪-পরগনার তাপস দাস ওরয়ে বুটিন পাসক দলের অভ্যন্ত নির্ভরযোগ্য কাছের লোক বলে সবাই জ্ঞানে। কি হুতি ওর! মুখামস্তী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে।

প্রশ্ন হাঁস আর বেয়াইনি ভর্তির জালচক্র ধরা পড়ল, ধরা হল না জ্বালের গোড়ার সরকারি আদিকরিক, শিক্ষাকি, সাতনৈতিক নাটের ওরনের। কি হুতি! মুখামস্তী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে।

কি বছর মালাবা, মুর্শিবাবাদ, মেদিনীপুরে কন্যাজালে কোটি কোটি টালন স্বাত হচ্ছে, ওবা মরনুমে চূর্ণ করে থেকে ভরা বর্ষার বয়েছে কোন্ডার ফেলা হচ্ছে, আর প্রতিবার গ্রাম ভূবহে, ঘর ভাঙছে, মা-বোনেরা হিসের ছালায় শিত বেচছে শরীর বেচছে। আমলা ইঞ্জিনিয়ার টিকিয়ার নেভাসের কি হুতি! মুখামস্তী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে আছে।

গত ১৪ মার্চ নবীগ্রামে কোন পুলিশ আর পুলিশের উল্লিখিত চরল পায়ে ০১২ বোরের বন্ধু হায়ে, স্বাধীন দিগন্ত-শাল্যনকর গ্রামবাসীদের সরাসরি তুলি করে মারল, স্বাধীন দিগন্ত-শাল্যনকর

বর্ণন নির্ভরত করল, শিশু হত্যা করল। কারা এখনও গ্রাম প্রতিদিন
কোমা ওলি নিয়ে বাইরে থেকে অন্ধকার চালিয়ে যাচ্ছে অবশেষ?
একজনকে প্রকৃত্যায় হয় নি, একজনকেও লাগি হলনি। মুখামুখী বলেছেন
সব নিরত্বপণ আছে।

১৭ মার্চ বেঙ্গুরির জননী ইউটাসায় ললভন দানী মুমুতি সি বি
আই-এব হাতে কামল বরা পড়ল, বম্বুত, ওলির বাস, পাটরি ভ্রাণাণ,
লাল রাসা, পুলিশের উর্ধ্বি হেলমেটে, সবকিছু সহ। তবু হন্যহাসে
খালাস। কান্না, পুলিশ সদস্য চ্যাকলিটে নিতে পারল না। তি মুক্তি ওসের।
মুখামুখী বলেছেন সব নিরত্বপণ আছে।

বামপ্রান্তের ময়দাহীন উচ্চতা আর শত্রু সরকারের অমানবিক
আচরণ আর নিরাচার। সন্তোষ সীমা ছাড়াতে অনেক বিবেকসম্পন্ন
সেবক বুদ্ধিজীবী, ন্যায়ালয়ী, সমাজকর্মী পথে নামলেন। প্রতিবাসীরা
সরকারি অনুষ্ঠান বহুতল করলেন, নতী এতৎসিবি থেকে পলভ্যাণ
কালেন। কিন্তু ক্রমে সময়েই প্রাপ্তে উঠাণ স্থিতিত হল। মুখবাবু
শিনির মতো মার্কসীয়েব সঙ্গে সহযোগে মিলিত হলেন, কিন্তুসের ফিরে
আসতে বদলেন সরকারি সংস্কৃতির নিরাপন অসময়ে। তি মুক্তি
মুদোপকর্ষনী বুদ্ধিজীবীসের। একসংসিবি তাঁতা চেয়ারে চালু নেওতা
আছে, সরকারি অনুগ্রহের দায়িত্ব আবারো টুকে পড়া যাবে, কারণ
মুখামুখী বলেছেন সব নিরত্বপণ আছে।

১৯ জুলাই পুলকারের বেপরোয়া খুলপাড়ির গাভার ছেটি
কৌতুকের বিকৃত সত্যক সেহ ধর ধর করে কৈশে ছির হয়ে গেল।
প্রকৃত্যায় হল ছাঁড়াইবা। মিডিয়ায় টু টে। অনিয়ম দুইটি নেবাকের
ছবি আরেকবার প্রকাশ্য এল। সরকারি বৈঠকে ২৫ জুলাই সিদ্ধান্ত হল
নিয়ম মেনে পুলকার চলতে পারে আগের মতই। তি মুক্তি পুলকার
মালিক আর আর-টি-এ (আঞ্চলিক বেটিরদান মন্তুর) কর্তাসের। আরে,
মুখামুখী বলেছেন সব নিরত্বপণ আছে।

২৯ জুলাই অল্প প্রকাশের খান্দানে ভমির দাবিতে
অসম্পন্নকর্তী বারসংগঠিত কৃষকদের ওলি করে মারল অল্প-পুলিশ,
মৃত অটি আহত বহ। বিরত রাজশেখর রেজিডর কংগ্রেস সরকার
ওতিখতি ভটনার তলত আর কতিপূরসের কথা ঘোষণা করল। অল্প
নবীগ্রামে ভটনারকার আন্দোলনকর্ত কৃষকদের ওপর পলিমবস-
পুলিশের নৃপল ওলিডালনার পাঁচ মাস পরেও বৃদ্ধ ভট্টাচারের বাম
সরকারের কোনো অনুপাত নেই, তবুও বা কতিপূরশ নিয়ে কোনো
উচ্চব্যতা নেই। বাম নেতারা গলা কাড়িয়ে বলছেন খান্দান আর
নবীগ্রাম এক নয়; নেতা-শিরোমণি জোতি কবু বলছেন — খান্দানে
কৃষকরা পলভাত্তিক আন্দোলন চাল্যাছিল, আর নবীগ্রামের কৃষক
আন্দোলন ছিল অলপতান্ত্রিক, সেখানে আক্রান্ত পুলিশ ওলি চালাতে
বাস হত্বেছিল। তি মুক্তি! আর তাহলে চিন্তা কী? ওমিকে মুখামুখী তো
কলসিইমেন সব নিরত্বপণ আছে।

অতএব, চলণও পলসি ...।

প্রতিবেদন

অনাহারের গণতন্ত্র ও সিঙ্গুর

উত্তরবঙ্গ কতদূর? চা বাগানওলি বহু হয়ে যাওবার পর কত মানুষ
জরা গেছেন অনাহারে? কেউ জানত না, খবর রাখত না হয়তো, যদি
না একটি বাংলা সংবাদপত্র হঠাৎই তাদের ইস্যু করে ভুলত, যদি না
তারপর একে একে কালাপাল, কলকাতার দু'একটি মেম্বেরতী সংগঠন
সেখানে কীপিয়ে না পড়তেন, বা উত্তরবঙ্গের ওয়েলফেয়ার
অর্গানাইজেশনগুলো ত্রাণ ও চিকিৎসা দিয়ে স্বকরেব শিরোনামে না
আসতেন। ঐ সব সংগঠনের কাজকর্মের সিগেট বেখে মানবধিকার
কমিশনের ওঠারময়ান স্বতঃপ্রসঙ্গিত হয়ে সারা সরকারি বিভিন্ন
মন্তুরতে তলব করে পাঠান। তারপর কয়েকদিন সৌভাগ্যসিদ্ধি,
হুটহুটনি, তারপর এসি ঘরের ঠাণ্ডা মেসিনে নিশ্চিত আশ্রয়। কী সুসংহ
অতিমান উত্তরবঙ্গের মানুষজনদের — আমলাপোলে একটি অনাহার
মৃত্যু সংকলনগ্রন্থের শিরোনাম হয় — আর উত্তরবঙ্গে হাজারে হাজারে
মানুষ, শিশু প্রতিদিন মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে সেক না খেরে। দলে দলে
হেয়ে প্রতিদিন হাবিয়ে যাচ্ছে দালালের হাত ধরে — পল্লিত
মানবসভ্যতা, ৫০ বছরের 'কমিউনিস্ট' দাসন তাদের কাঁচাতে
পারনি। আর আত্ম, এমন দুর্ধিনে তাদের পাশে পড়িয়েছে ওটিতর
বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বহুর বছর ভোট নিতে আসা সরকারের কোনো
হেলাসোল আছে বলে তো মনে হত না। তবে মানবাধিকার কমিশনের
চিঠি চেয়ে সরকারি কর্তব্যকর্তিরা এখন কিংবদন্তি সৌভাগ্যসিদ্ধি শুরু
করছেন।

সম্পাদকদের চাহিয়া ছিল সিঙ্গুর এখন কেমন আছে তার
প্রতিবেদন লেখার। আসলে কাকে বাস দিয়ে কতেই বা বলি: সর্বত্রই
তো এক চিত্র। উন্নয়নের বাধের চাকার বলি সাধারণ মানুষ। তার
অকণ্ঠস্বাধী ফল পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহার ও মৃত্যু।

আসুন একবার সিঙ্গুরের ঘোবদী গ্রামে। টাটার ঘেরা পাঁচলির
ঘরে এই ছায়াপল্লিকি গ্রাম। বাইরে থেকে বোঝার উপার নেই চাষের
জমি চলে যাওয়ায় এই গ্রামগুলির উপর দিয়ে কী কয় গেছে। গ্রামে
চুপুতে পথে পড়ে জুলুকিয়া নদী। যে নদীর গতিপথে মাটি ফেল খুঁিয়ে
ওেওয়া হয়েছে তার অভিক্ষুণ। টাটার খর্খর্। ভিত্তিসির জল আসত।
সেদের কাল হত। সে তো কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। ওই কালে আসত জুর
মাছ। ঘোবদীর মানুষই সে মাছ চরতেন। বিক্রি করতেন বাজারে।
নিজেরা খেতেন। ... জমি অধিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সবই গেছে।

ঘোবদীর মানুষজন খেতনদুরের কাজ করতেন। অধিকাংশেরই
চাষের জমি ছিল না। পথের জমিতে জন খেতে আয় তো ছিলই, ভাতভা
ধান ও আলু ওঠার সময় ক্ষেতের ধান ও আলু কুড়িয়ে এনে বাড়ির
পাকারের বহু ভালাতেন। ফসলের মাছে মাংসে ক্ষেতে ভলত জুর
পাকসবডি। সারা বছর বাড়ার খেতে হত না কাউকেই।

আর আত্ম! সেই ঘোবদীতে গীতা কোটলের ঘরে বৌক দিন,
ওয়া কেমন আছে? সখী ও তিন জেলেরদের সংসাধের হাস ধবেছেন
গীতা, আণে সারা বছর কাজ পাকত টাটা অধিগৃহীত জমিতে। প্রতিদিন

যোরাবির চত্বরে খাট ছিল সেখান থেকে দুই কেরি। এখন এক কেরিতে কোনওরকমে ঢালাতে হয়। স্বামী তান ঢালাচ্ছেন এখন, হজাশায়, কষ্ট মম খাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছেন।

একর উপার্জনই সমস্যা চলে সুখী বাগানের। বাড়িতে মা, শাওড়ি, দুটো বেগুন, তিন খেলে। স্বামী মায়া পেয়েছে। অন্য গ্রামে জন খেতে ২০ টাকা বোকেও লাভ করতে হয়েছে। মাছ তবুই লাভ করলে ৪০/৫০ টাকা। তাতে এতচলো পেট। শাদুক-ওলি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিছু বিক্রি, কিছু খাওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া। এরপর কবে কতদূর যাবেন? উন্নয়নের সুফল এত শীঘ্র এমন হাতে হাতে মিলবে কে ভেবেছিল?

চাঁদী-বেতমল্লুর পরিবারগুলির কর্মঠ ছেলেমেয়েরা সকালবেলা একপেট পাতা খেয়ে কাজে বেরোত। দুপুরে মাঠে দুটা মুড়ি রাতে আবার পেট ভরে ভাত। সঙ্গে সবজি বা মাছ-মাংস। গ্রামি চলে যাবার পর থেকে সবজি মাছ আর বাড়িতে ঢোকেইনি। এনালি সঙ্ঘের ভাতটুকুও আর হয় না। বাচ্চাওলোকে যদিও বা কিছু নেওয়া যায়, স্বভাবের ধারাবাহিক অনেক। গেরা সোবাণি গ্রামের এটাই চিত্র।

ঘেলে-সোমা, নাতি-মাতনি পরিবৃত্ত ভরা সংসার ফেলে বিদায় নিলেন বিনালা বামর। চলে গেলেন শবর নাস, কীভাবে অনেকগুলো বছর পার করে এসেছেন, কোনো সন্দেহও এমন অভিশাপ দেয় না কেউ। গেরার ছ'ঘন্টার ওপর ভাণ্ডার জোনে বড় ছোটো পেট-শিরে এক হয়ে গেছে। একটা সময় তো ভালো খাওয়াওলা ছিল। তার জোরেই এখনও চলে থিরে বেড়াই। মা হয়ে এও বেশোতে হয়েছিল বিমলাবতী।

শবর দাস। অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল বাড়ির বাচ্চাদের মুখে কোনওরকমে দুটো তুলে নিয়ে নিজেরা না খেয়ে থাকা। কিন্তু এভাবে কতদিন? মেয়েটার বিয়ের কথা চলছিল। জড়ুক শরীর আর নেইনি। রাস্তা ময়িছ ছুটি চেরেছিল। চিরছুটি। গত এক বছর ধরে অনেক লাড়িয়েছে, কিন্তু না, কিছু লাভ হয়নি। বড় একা লাগত। বড় নিমস পরাজিত। সবার পরিজন সকলকে ফেলে পরজন্মের গ্রামি মাঝায় করেই চলে গেলেন।

হারাধন বাগ। শেষ রক্তবিশ্ব নিয়ে লড়াইয়ে চেরেছিলেন। ২৭ সেপ্টেম্বরের লটিচারের দিন থেকেই সপরিবারে লড়াইয়ের সাময়িক সাহিত্যে। আড়াই বছরের মাতনি শাবলও সহযোগী। কিন্তু পরেরনি ভিটেমাটি ঝাঁড়তে। অসহ্যেতে মত খেয়েছেন সাবা কীভাবে ছিল ছিল সন্ধ্যা, সৃষ্টি, স্বপ্ন, বিশ্বাস — সব কিছুকে ওলা তাকতি করে নিয়ে গেল। সামনে শুধুই অন্ধকার। অনুধু স্ত্রী, ভরা সংসার ফেলে চিরকালের মত চলে গেলেন হারাধন।

সিন্ধুর ওপ হায়েছে দুড়াস মিছিল, বহু হয়ে গেছে কা ছেলেমেয়ের পড়াওনা। বই কিনতে পারেনি তারা। একরা সম্পন্ন সিন্ধুর সোবাণির মানুষ ইলা প্রতিদিন আদ্যন্তর পাতে বাসা ভুণিয়েছেন তারাই আশ্রিতিকের থালা হাতে অমায়িকই সামনে।

সোবাণির মাটিতে ঝাঁড়তে ব্যবহার ফিরে আসিছ উত্তরকলে। চোখ ভাঙছে চোখাঝাড়ি চা বাগানের সেই ছোট্ট মেয়েটি সুকুমারি গড়িয়ার মুখ। তিন বছরের ছোট্ট মেয়েটি কানের অভাবে হারিয়েছে দুটিশক্তি, শারীরিক সমস্ত ব্যক্তি। মিনি টারনি হারিয়ে গেছে অন্ধকারের জগতে আঁড়কাঠির হাত ধরে। ফুলে ফোঁপ উঠছে নারী মাংসের বাবলা। উন্নয়নের বাইরেভাড়াই। এই মিছিলে একে একে পা মেলাচ্ছে কত নতুন মুখ। এবার কার পালা, সিন্ধুর?

এখানে ঘোঁরে বিনিএল কর্তে অয়ে তাঁরা পাচ্ছেন না গ্রাণা চাল গম। গ্রাণের চেরে কন পরিমানে কেহুলা হচ্ছে বা বিল না নিরা বেশি লাম নেওয়া হচ্ছে। ওঁরা পাচ্ছেন না একশো দিনের কর্মকরকরব সুবিধাও। তবু, বস্ত্রপায়ে হেঁটে চলেছে সিন্ধুর — চারপাশে লনভ্যাত ওয়া বীজ — শেষ ভাণা, যদি দু'একটা বীজ ভিজে ওঠে।

সমিষ্ঠা রায়

প্রাসঙ্গিক পাঠ

সিন্ধুর : যে কতের পূর্ণ নেই।

বিশেষ সন্ধ্যা, আগস্ট ২০০৭, মহান প্রকাশন

চন্দ্রা একপেট

প্রতিবাদী নাটক এবং তথ্যচিত্র

পাছুর রায়

এক অন্য সময়ের ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা। ৩০ বছর একটানা আমছুরের শাসনের রেকর্ডকে আকস্মিক অর্থে বুড়ো আঁচলে সেবিত সিন্ধুর এবং নন্দীগ্রাম নামক দুটি ছোট্ট এলাকায় গরিব চাষির ভিটে মাটি উচ্ছেদের ডাঙাবই বিশপনের মুখে পড়িয়ে যে প্রতিরোধের পটিল পাড়ে তুলেছেন তা অবিশ্বাস্য বললে খুব কমই কল হবে। বিশেষ অর্থনৈতিক অজল গড়ার বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামের মানুষের লড়াই ভাববহুবর্ষের দূরেক এক মাইল ফলক। পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে সারা ভারতকে পথ দেখাল — এই গর্বিড উদ্যোগে আমরা স্বেচ্ছা অনুব্রব করতাই পরি বন্ধকালি হিসেবে। ৩০ বছরের একটানা সেন্দীপী ব্যপটি পাসন নয়, নন্দীগ্রাম সিন্ধুরের এই লড়াই চিনিযে থেয় বাংলায়

আবহমান সব্বাকো। আমাদের সংক্টিব মানুষদের একাংশ তবু যে নন্দীগ্রাম সিন্ধুরের পক্ষ নিয়েছেন তাই নয়, তাঁরা তথ্যচিত্র নির্মাণ ক'রেছেন, তাঁরা নাটক রচনা ক'রেছেন, তাঁরা গান বেঁধেছেন, তাঁরা কবিতা লিখেছেন। আমরা এই পরিসরে এই বিষয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র ও নাট্যপ্রযোজনা নিয়ে কিছু কথা বলব।

টোকোলশ কিংবা রাস্তির পদ্য

নাট্য জগতের মানুষজনদের কেউ কেউ ৩০ বছরের হুইবারনেশন কাটিয়ে অবশেষে সত্যের মুকোমুখি পাঁজায়েন নন্দীগ্রাম গলাহত্যা ঘটনার পর। 'অশোকনগর নাট্যমুখ'—এর অবস্থান কিন্তু এ

ব্যাপারে ছিল একেবারে বক্তৃত। এই লড়াই প্রেক্ষিতে আমদা তাঁদের পথনটিক 'বিদ্যারাত্রির পলা'কে দেখতে চাই। ২০০৬ এর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে নটকটি যখন প্রথম দেখি, তখন নন্দীগ্রাম এক্সেডার আসে, নিম্নে 'কেল্যাণ' ছাতি অবিগ্রহের পিছনে গায়ক কলন, শিল্পী তিত্ত। বিভিন্ন সভায় তখন আমদা যাকিনি মডেলের 'উন্নয়ন'-এর বিশ্ব সম্পর্কে, দেশের মধ্যে বিদেশী উপনিবেশ ৫২ সম্পর্কে, মানুষকে সচেতন করার কথা বলছি। কিন্তু সেখানে শুধু কেনা মুখের ছোট ছোট ভিডিও। বক্তৃত 'বুদ্ধিজীবী' কলন, 'নট্যজীবী' কলন, গায়ক কলন, শিল্পী কলন — কখনোই তখন পাড়া ছিল না। খুঁচকোনা বাস নিয়ে সবকিছুই তখন কম বেশি বুদ্ধ বা 'বৌদ্ধ দর্শন'-এর বর্ণনায় মগ্ন। তবুও নন্দীগ্রাম এশিয়াডেজের পর তাঁদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে যখন প্রতিধ্বনিতবোধী তরঙ্গ উদ্ভবিত হ'ল, তখন তাকে বাণত জানিয়েছি, অভিনয়কর্ম জানিয়েছি আমদা সত্যকে। Better late than never জাতীয় তির্যক মন্তব্যে ফেন্সে বাহুরে দেখতে চাই না, শুধু এইটুকু করতে চাই, নিম্নের পর যদি তারা এইভাবে ইংলিশ পরতেন তবে ১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম ঘটত কিনা এই প্রশ্ন অব্যক্ত নয় একেবারে। তবুও 'বুদ্ধিজীবী'বের একোশে ফোনে কলনবির (আপাতত) পরিত্যাগ করেছেন তা প্রায় অবিশ্যয় এবং হুঁয়ত তুলে অভিনয়যোগ্য।

এক এখানেই 'অশোকনগর নট্যমুখ' নামকতা প্রতিবাদী চরিত্রের থেকে বক্তৃত অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। তখন পরিচালক অতি চমকপ্রবণ এবং 'অশোকনগর নট্যমুখ' এর তরুণা অধ্যয়িত কুশীলবরা সে সময়ে 'কেল্যাণ ছাতি পান' হার্ড সিপিএন রচিত নটকের বিরুদ্ধে 'বিদ্যারাত্রির পলা' মতই ক'বেইলেনে বুদ্ধদেবের উল্টো রবীন্দ্রসদন চত্বরে। পোস্টমাল শুক হওয়ার পর তারা নটকটি তুলে নেন নি বা তার অভিনয় স্থল করেন নি। ২০০৬ এর অক্টোবর পর ২০০৭ এর মে মাসে নটকটি আবার পেশলাম 'বিভাবন' এর ম্যাট্রোসেবে। সেখান পর অভিনয় সেলাম 'অশোকনগর নট্যমুখ'তে। এই সাহস এই যুগের 'অশোকনগর নট্যমুখ' এবং 'টোটাং থিয়েটার' এর মতন ছোট হল সেখানে পরোকে এটা অবশ্যই অভিনয়শীল। তার মানে এই নয়, ওঁরাই একমাত্র প্রতিবাদী নটক করছেন যা সিপিএম বাসিত এই সরকারের বিরোধী কথা বলছেন। এখন আদ্যার থিয়েটার ক্রমে ক্রমে পঞ্চদশ-বৎসর সরকারকে পাল ভাটিয়ে বিশ্ববী বুলি কলনদের মদণ পথ পালটে, সরাসরি এই সরকার এবং তার পাওকে সরাসরোচনা করছে ('পঞ্চম বৈশিক' এর 'টোকোলাপ' যেন পঞ্চদশবৎসর শাসক কান্য পবিত্র মানুষের লড়াইয়ের পর, 'তৃতীয় স্তর' প্রযোজনা 'আনন্দমুখোতে' সিন্ধুর এসেছে। 'নন্দীগ্রাম' প্রযোজনা 'হু' তে নন্দীগ্রামের ৫২-এর কথা আছে, 'রংলণ' এর প্রযোজনা 'মুখোশ নৃত্য' তে সিপিএম এর বিচারিতার কথা তুলে ধরা হয়েছে, পল্লুকি প্রযোজনা 'অনা সনয়ের কাব্য'তে সিপিএম বিরোধের সরব নিয়ে নটক করতে গিয়ে উন্নয়নকারী আমদের এই সময় এই দেশকে দেখান হয়েছে, সর্বত্রের 'পদুর' নটকে সিপিএম হার্ড কনভার্স একটা যন্ত্রাণকারে রূপ তুলে ধরা হয়েছে ইত্যাদি।) কিন্তু জমি অবিগ্রহের প্রশ্ন বা নন্দীগ্রামের পুণ্ডর্যার প্রশ্ন বা সিপিএম যে আসে ক'মিউনিস্ট পার্টি নয় সেই প্রশ্ন সরাসরি উঠে আসছে 'অশোকনগর নট্যমুখ'এর 'বিদ্যারাত্রির পলা' এবং 'টোটাং থিয়েটার'এর 'রক্তন সেন' নটকে। এর মধ্যে অতি চমকপ্রবণ পরিচালিত

নটকটি বোধ হয় আমাদের থিয়েটারের জমি অবিগ্রহ প্রশ্ন প্রথম প্রতিবাদী উচ্চারণ। 'অশোকনগর নট্যমুখ' শুধু যে শ্রাহী তাই নয়, তারা ৭-১৩ নন্দীগ্রাম পরাধীন নয় এবং তাঁরা প্রযোজনার শৈল্পিক উৎসর্গ সাধনেও ব্যর্থ হত্বশুন। সেই কারণে 'বিদ্যারাত্রির পলা' একটি চিরকালীন সৃষ্টি হিসেবে পণ্য হওয়ার দাবিদার। সরকারি উল্টোনে নাচ না দেখিয়ে পথনটিক এক ব্যর্থ ইতিবাচক পথের দিশারী হচ্ছে এটি। এই সময়ে আমাদের থিয়েটারের প্রবল উদ্ভাসের কথা। পথনটিকের আলোচনায় 'আদ্যনা' প্রযোজিত '১৮০ বর্ষমহিল' নটকের কথা আসবে। এই নটকে এমন একটি 'উন্নত' এলাকার ছবি আঁকা হয়েছে যেখানে প্রতিটি নাগরিককে অধিকার পদমা দিয়ে কিনতে হয়, যেখানে নাগরিকরা অনেক কাজ করার জন্য মতিভ, হালদা, পাখরুলী, বুদ্ধ বার বিয়ে এমন জীবন চালায় যাতে শওকো গাওরা গাওরা পেশ্যে চিন্তা ভাবনা করার মতন 'বাক্যে কাজে' সময় নষ্ট না হয়।

এই আলোচনায় বলিত উচ্চারণে উঠে আসে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'টোটাং থিয়েটার'এর 'রক্তন সেন' নটকটি। এটি সেই অর্থে কোনো পথনটিক নয়। অন্য পরিসরে নটক করার ভাবনায় নিম্নোক্তপ্রাণ 'টোটাং থিয়েটার' সরলা মেসারিরালা হলে নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে, যে পরিসরটি অসঙ্গত পৃথিতে কোনো নট্যশালা হওয়ার উপযুক্ত নয় আলো। 'রক্তন সেন' নটকে নন্দীগ্রামের পন্থাতার কথা সেভাবে থাকে কোনোরকম অব্যক্ত ছুড়ি। 'রক্তন সেন' নটকে সিপিএমের বিচারিতার কথা পরিভার উচ্চারণ পোনা যায়। কোনো ভাবনাতা ছাড়াই। শুধু তাই নয়, এই সিপিএমের 'কমিউনিস্ট' নাম বহন করার যে কোনো হক সেই আলো, তা ব্যর্থীম ভাবায় কথা হয় এই নটকে। মাকে কৃষকরমণীকে লবণ কবর পুণ্ডিত ও সিপিএম বাহিনী। উাকে হত্যা করা হয়। রমণীর শবদাহরকার ছেটে যায় পর্ণকধের মাকখন বিয়ে, সামনে কোলে দ্রাক্ষাকর্ষ : 'মুণ্ডিত, শিলায়র চলাছে'। বিরক্তিকর বিকৃত সুরে 'কমরেড সেলিনের আহ্বান — চলে মুক্তি সেনাদল' গানটি গাইতে থাকে যখন সিপিএম বাহিনী, তখন এক দীর্ঘমেসী কুশীলব মাকে দাণিয়ে এসে লাথি মেরে ড্রামটা উটেটি দিয়ে বলে, ওরোয়ারে বাজা ডোলের কোনো হক সেই এই গান করায়। এই কথা বলে উপাধ কঠে সে ধরে গান — 'কমরেড সেলিনের আহ্বান — চলে মুক্তি সেনাদল' — 'আলোড়িত হয় সমগ্র ফেলপশু। এই নটকে ব্যক্তান্ত হয়েছে 'রক্তকরবী'র সেলাপ (কল্পত 'রক্তন' নামটি 'রক্তকরবী' থেকেই নেওয়া), এসেছে 'অভিগোণে' (লোকাত কৃষক রমণী উচিত 'অভিগোণের'র আদ্যে)। 'রক্তন — সর্গার — ফ্রেন — অভিগোণে' — এরা টোটাং থিয়েটারের নটকে লড়াইয়ের আদ্য — 'শিল্প সিপিএম টোটাং বাহিনী — সব নাটের শুক মুখামস্ত্রীক — গুলির মুখে বুক ভিড়িয়ে লড়াইনে কৃষক রমণী — এইভাবেই সম্ভূতা বর্ধিত তুল অক্ষ ব্যর্থ পথের নিয়ে এরা ছাউন শান্তনুর টোটাং থিয়েটারের এই নটকে। এদের ইতিপূর্বের নটকটি ছিল বর আলোড়িত বর প্রশসিত 'বাস'। কিন্তু আমার মনে হ'ল, 'রক্তন সেন' অভিনয় করছে 'কাস'এর পদী। নটক সম্পর্কিত এই আলোচনায় ইতি টানার আগে অবশ্যই অতি সাম্প্রতিক 'পঞ্চম বৈশিক' প্রযোজনা 'টোকোলাপ'এর কথা বলতেই হবে এবং বলতে গিয়ে উল্লিখিত না হ'লে আমাদের উপায় নেই।

'টোকালস' উপন্যাসটি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের এক ইহুদি সেনাধ্যক্ষ সেগালের লেখা। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির কারণে সেগালের সেনাধ্যক্ষি হতে হয়। এই উপন্যাস থেকে অসাধারণ সুশিখারায় আর্নিস্ট ঘোষ 'টোকালস' নাটকটি লিখেছেন। পরিচালনা করেছেন এবং সুইজা নামের এক ওজস্বপূর্ণ চরিত্রে চমৎকার অভিনয় করেছেন (এই আর্নিস্টই ছিলেন 'পদযাত্রা' এর নটিকার ও পরিচালক)। নাটকটি দেখতে দেখতে আপনায় মনে হবে আপনি এই সময়ের পশ্চিমবঙ্গের এক কাদিনী সেনায়েন, যে কাদিনী নবীগ্রামের সিন্ধুরের সাক্ষরহাটের হালদার ও আদামী মিনে উন্নয়নকার্যে এই রাষ্ট্রের শিকার হবে এমন অগণিত গরিব মানুষের এবং নিষ্ঠুর সার্ট ও তার দাখিক প্রদানের কাদিনী। ৪০ জন কুশীলব মঞ্চে অভিনয় করে এই নাটক। এক পুরুষ চিত্রগোষ্ঠী, চমৎকার ব্যক্তিগত অভিনয়, নিপুণ পরিচালনা, সহজিত মঞ্চ ব্যবস্থাপনা, বালক সাহসের আলোর পবিত্র ঘাণিত উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবহার (এমন দীর্ঘস্থায়ী সৃষ্টি বাংলা থিয়েটারে ইতিপূর্বে দেখেছি বসে মনে তো পড়ে না), উজ্জ্বল ভট্টাচার্যের পরিমিত আবহ এবং পঞ্চানন ঘের মুক্তকণী রূপসজ্জা 'শব্দম বৈচিত্র্য' এর এই প্রয়োজনকে এক অন্য উচ্চতায় উপনীত করেছে। এই নাটকটি উলস মানুষের পাঠকরা শেখুন—এই আবেগে আমি আত্মকৃত।

গণহত্যার ধারাবাহিকতা

এবার ওখাচির নিয়ে দু'একটি কথা: 'নিউজিা সলিডারিটি' নামক একটি সংগঠন প্রথমে ম্যাকমুলার ভবনে, পরে লোর্ডি সর্বনে Development and discontent শিরোনামে দু'খানা সেশি দিয়েছিল বেশ কিছু ছবি দেখায় 'উগ্রদান' করায় নান্দী সর্বনাশ গরিব শেগালীর কোরে ঘটাত্মে আঘাতের মেশ এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অন্যান্য কিছু রাষ্ট্র মূলত সাম্রাজ্যবাদের পন্থেদনে করার জন্য। 'অন্য ছবি' নামে অপর একটি সংগঠন বেশ কিছু ছবি এই মর্মে দেখিয়েছে। 'অন্য ছবি' প্রযোজিত চিত্রাঙ্ক পাশ পেরিচালিত 'নই শৈশব' সিন্ধুরের রাষ্ট্রচালিত ভয়াবহ ভাওব জীভাবে নিওমনের পরিকাঠামো নই করে নিয়েছে ভারী বারাদাখ। অতীনের কামেমার কাঞ্চও ভাগ। নবীগ্রামের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সন্তান, নবীগ্রামে ১৪ মার্চ পনহত্যার ওখাচির, সিন্ধুর টটার গাড়ি ভেঁড়ির কারখানার জন্য ১৯৭৭ একর জমি মঞ্চলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কলকাতার বেলেঘাটার খালপাড় থেকে উচ্ছেদ, ঢাকুরিয়া রেল কলোনিতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই ইত্যাদি বিষয়ে ওখাচির এরা দেখান। 'অন্য ছবি' তাদের অনুষ্ঠান ক'রেছিল 'বিওসি/কাল সোসাইটি' ও 'সিউডেস হল'। 'ন ফলো' প্রযোজিত 'বুকেড উপেন' শীর্ষক ১৪ মার্চ নবীগ্রামে গণহত্যার ঘট্টোজ বা ওখাচির ইয়েলের মাধ্যমে দেখানায়। এছাড়া 'মহান' পত্রিকার উদ্যোগে নির্মিত 'ওসমানিয়া চক থেকে কলি' নামে নবীগ্রামের উপর একটি তথ্যচিত্রও দেখার সুযোগ ঘটতেছে যদি হাউসের দিনতলায় 'রাখিকাল 'বুকেড উপেন' দের ঘরে। ছবি নির্মাণে অনেক সময় আবেগটিই প্রধান হ'তে পাঁড়ার, ছবিটা আদৌ ছবি হ'ল কিনা সে খবর নির্ভাভা রাখেন না। যেনে সাক্ষতে হবে, সার্ট্রিট এ সাক্ষরটি আপনায় cup of tea নয় একথা যেনে আপনায় প্রতিপাক রাষ্ট্রনৈতিক পক্ষি উচ্চারণে বিরক্ত থাকতে বাধ্য হয়। বিশেষ

ক'রে এই সব বিতর্কিত সংবেদনশীল বিষয়ে দক্ষতা ও তথ্যগাঠিত নিশ্চয়তা না থাকলে কান্না না করাই ভাল। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

সিন্ধুরের উপর অমান্য তথ্যচিত্রটি নির্মাণ ক'রোয়েন লাতসি মুখোপাধ্যায়। ছবির নাম Whose land is it anyway, প্রযোজক — গ্রিয়ার্ড প্রোডাকশন। ৪০ মিনিটের এই তথ্যচিত্রটির মতন ইতিবৃত্ত এবং নির্বোধের নিগ্রিমে উৎসর্গ ছবি সিন্ধুর নিয়ে এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি বলেই আমরা ধরনা। এই ছবিতে (script & concept : রবিশঙ্কর ফল এবং লাতসি মুখোপাধ্যায়) একতিকে যেমন তথ্যসমৃদ্ধ বিবর্তিতার বাধ্য হয়েছি, তেমনি সিন্ধুরের মানুষের শাস্ত্রায়ের কথাও বিস্তারিত তকুনমেটেছি। সেইসঙ্গে আছে লড়াই নারীত্বের সাক্ষাৎকার, আছে মেধা পটিকর, অনুজ্ঞা ভদ্রোচাৰ, শীওলি মিহি, নারাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সাক্ষাৎকার। এই ছবির সম্পদ যেমন বৃহত্তর প্রোগ্রেসিভিটি (লাতসি মুখোপাধ্যায়), চমৎকার সম্পদনা (ইউজিৎ মাস), তেমনি সহ পরিচালক অনন্যা কিশোরের প্রতীতি ওঠতে দারাবিহীন। এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ যে, লাতসি কিছু ক্রিপিস দিয়েছেন 'ভার্য বাংলা'র কাছ থেকে। লাতসির নবীগ্রাম নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্রটি আমরা দেখা হ'তে নি।

নবীগ্রাম নিয়ে প্রমোদ গুপ্ত পরিচালিত ও প্রযোজিত তথ্যচিত্র Development at gun point একটি সুস্পন্দ চমকিত। ততপটী বীকার করতে আমি বাধ্য যে, এই ধরনের ডকুমেন্টারি নির্মাণ প্রদেশের লক্ষ্যতা প্রমাণিত। ওঁর বেলেঘাটা খালপাড় ও বেল কলোনিব উপর তোলা ওখাচির আগে দেখেছি। খালপাড় উচ্ছেদ নিয়ে ওঁর ছবি। Images of development দেখে মুগ্ধ হয়েছি। ই বিষয় নিয়ে যিহেদে সোচ্চকন সংকুচিত মানুষেরদের কথা কান শিন, সুরকালবিহীনই রাষ্ট্রনৈতিক ললওলোকেই বখন তেমন ক'রে আসবে দেখা যাবে নি, তখন কলসে উঠেছিল ফ্রান্স গুপ্তর কামেমার। যেনে কথা হলেছিল, প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। Images of city তে রেল কলোনিব বাসিন্দাদের প্রতিবাদেয় যে শরীর প্রমোদের ছবিতে উঠে এসেছিল তা এক কথায় অসাধারণ। প্রমোদের Images of development ছবিতে স্থপতি উচ্ছেদে নির্মিপ্রম—এর পুষ্টিপের ভূমিকা দেখে মনে হবে যেন আমরা কোনো সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশে বসবাস করছি। মানবের মতন পুষ্টিগি হামারায় মূষ পড়িয়ে প্রমোদ এবং প্রমোদের সহযোগীরা (মির্জা, পার্শ্ব প্রমুখ) যেভাবে ছবি তুলেছেন সেই সাহসিকতার সেই সন্তোষনপ্রায় কলসে না করে থাকা যায় না। নবীগ্রাম নিয়ে প্রমোদের ডকুমেন্টেশন Development at gun point—ও 'কলকাতা চিড়ির ক্রিপিস' ব্যবহার করা হলও সম্পাদনার ওগে তা হ'য়ে ওঠে অসামান্য শিল্পসমৃদ্ধ এক ডকুমেন্টেশন, যা দেখে আমাদের পুষ্টি, শরীর শিথিলত হ'য়ে ওঠে। ঘটনার পর পরই বেসব সাক্ষাৎকার নেওতা হ'য়েছে এবং সেখান হ'য়েছে এই ছবিতে, ডকুমেন্টেশন হিসাবেও তা দৃশ্যমান ও ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে। আজ মনে হ'চ্ছে, মরিকচাঁপিতে বখন ৩০ জন উচ্চাভ্যন্ত ওলি করে হেরেছিল জ্যোতি বসুর সাজা, অভিশপ্ত সেই ২১ কলাই ঘেরেছিল ১৩ জন ভৃগমূল সমর্থককে তখন প্রমোদের মতন একজন সংবেদনশীল মানুষ যদি কামেমার শিরোনাম থাকতেন, তবে সেই ডকুমেন্টেশন থেকে আজকের প্রকল্প বৃহত্তে পারতো নবীগ্রামের পনহতা সিপিএম শাসনে কোনো ব্যক্তিগতী ঘটনা না।

নন্দীগ্রামের পর

একটি আত্মকথন

স্বপ্নময় চন্দ্রমণ্ডল

আমি যে ট্রাটে গতি, সেটা কোনো এক গ্রামটিরই কথা থেকে বিনেহিলাম। শিক্ত প্রকৃতির, তিমির ইচ্ছাশক্তি: পাল। তার বাবা মিট নেতা। ট্রাট হস্তাক্ষরের পর তার পাজ পাওয়া গেল না। ট্রাট মিট্রেশন করতে গিয়ে দেখা গেল কাগজপত্র গুণগোলা আছে, মিট্রেশন করতে গিয়ে হস্তাক্ষরকে ভেঙে কাগজপত্র ঠিক করতে হবে।

গ্রামটিরই বড়ির একতলায় আমি গিয়ে বসিনি এক কাল মার্চস-এই হবি আছে। অনেকেরই পাওয়া গেল না। সে কখনো দুর্গাপুরে, কখনো খতাপুরে বাসে। গ্রামটিরই বাসকে এ বিধে কলা হলে উনি কলসেন এ বাপারের আমি কিছুই জানিনি, তবে আপনাদের উচিত ছিল কাগজপত্র দেখে নেওয়া: একতম অবস্থায় আমাদের মিট্রিশপালিটির মিট্রিশপন বিভাগের এক কর্মচারী কলসেন — সবই হয়ে গিয়ে, একটা ভিন্ন এ আসেন।

ভিন্ন হল: মিটি হল আমাদের ট্রাটে। একটা বড় অংকের টানা দিতে হবে। মিট্রেশন হয়ে গিয়ে। রিক হ'ল ট্রাটের সবাই নিলে সে তুলে ঐ ভিন্ন মনি দিয়ে দেবে। যে ছেলটি ভিন্ন করতে এসেছিল, সে ভিন্নমিশপালিটির কর্মচারী: একই সঙ্গে ভিন্ন, ওইই এফ নেতা। ওর সঙ্গে আর একটা ছেল ছিল, সে স্থানীয় প্রায় কর্মচারী।

বুইই হস্তিক পরিবেশে চান্দুরো নিমিত্ত খেতে খেতে ঐ ভিন্ন সম্পন্ন হল। সবারিও হ'ল। কিছু টানা করতে কলা হলে ছেলটি কলস — "এর কমে হবেন। আমাদেরই অনেককেই দিতে হবে। আমরা ভিন্নশ্রিত ওয়ে হে কত করি"।

আমাদের ট্রাট বাসিন্দাদের মধ্যে একজন সন্তোষের ভ্রাতারই ছিলেন। উনি কলসেন, তাই তুমি যে পাটি কর, আমিও সেই পাটিই করতাম: উনমনি সাল পর্বত দেখার ছিলাম। তুমি যা করলে তাতে আমার বুঝ না ধারণ হয় গেল। ছেলটি কলস — দাদা, আপনারা টুকেছিলেন পাটির বুটসে, আর আমরা এসেছি সুমিলে। সমস্তটির সম্ভাবনারটা করে নিছি, যা হা। কথটা আমার সামনেই হয়েছিল। সম্ভাবনার শক্তি সঠিক বিশ্লেষণে পাড়ায় সহ + ব্যবহার। সহ শব্দটা গম্ভীরতার মত মাথা নিচু করে চূপচাপ হয়ে আছে।

সবার মতই আমিও ঘুরেই টানা মিটেছিলাম। এখানে মাঝার ওর সঙ্গে দেখা হলে আমি ধীরে ফেরা।

হস্তিনা কলসিলাম আমার এক স্বপ্নে। এক সঙ্গে এস. এফ. আই করতাম। এখন ফোলাঘরের নেতা। ও কলস, এতো সামান্য কাশার। বাস সে। অন্যতম কলা।

আমি কলসাম — বাড়ির সামনের পুকুরটা একই একই করে বুটসে দেখা হচ্ছে। পাড়ার কেউ ভয়ে কিছু কলসেনা, কালো এক পুকুর কোথাবার গরিব দিয়েছে নিতাই ... — অন্য কথা হল।

আমাদের গলির ঘুরে বোজ লাইন করে ছটা বাস থাকে। বায়ে বাসের ড্রাইভার বাসিন্দার মতই বাথ, খিদি করে। রাত্তায় প্রাতঃকৃত্য করে। তারপর ডোর খেঙে স্টেট সে, ইচ্ছিন টেট করে, বিচ্ছির শব্দ, বিচ্ছিরি খোঁকা ... নিবেদ কলসিলাম। ওহা কলস, মালিককে কলস। মালিক স্থানীয় কলসের মনোভাব সমস্ত হয়ে ছাটেরই 'এস. এফ. আই' দেখা লাগে গেছি আর এক পায়েট করে শেটি-মিটি টিভিন স্পন্দন করেছিলেন।

ফলে গলির মধ্যে গ্যারেজ করার কনঠা পেয়ে গেছেন। আমি বলি অমিল সারা (নামটা পায়েট দিলাম। তবে)। গলিটাকে গ্যারেজ বানিয়ে দিয়েছে।

আমার বন্ধুটা কলস — সেই রংগির সুবিধাবানিতায় আঁকে বয়েছিল। এসব বুঝেই কলসেন ছাড়া অন্য কথা নেই। তোর স্পেডেলিসিসের বাখাটা কয়েক?

আমি বলি, বাখার কথা বলতেই তো এসেছিলাম।
বন্ধুটি বলে, বাখা কি আমারও নেই? ওসব ছাড়া। অন্য কথা...

মুশকিস হচ্ছে কোথায় জানাব নাগিল? আমার পুরনো কমেডও নাগিল ওমতে চায়না। কাশা এসব কোনো নতুন নাগিল নয়, নতুন তথ্য নয়। ও সব জানে। ছেলটি সহ। অব্যাহিত। অতি সাধারণ জীবন বাসন করে। কিন্তু ও কিছু করতে পারেনা। বন্ধুটিও বোধহয় ঠিক মত জানে না নাগিল জানাবে কোথায়?

গ্রামে বুধচাখিরা এখন সি. পি. এম.। মধ্যচাখিরা বাজ হয়ে সি পি এম। ভাগচাখি কৃষি প্রমিকরও সি পি এম। বাস মালিক সি পি এম, বাস প্রমিক সি পি এম। কারখানা মালিক সি পি এম, কারখানার প্রমিক সি পি এম। চোর সি পি এম, পুলিশও সি পি এম। ভাড়াটে সি পি এম। বাড়িওলাও সি পি এম। কোনো স্থানীয় সমস্যার পাড়ার সি পি এম দাদা। সমাধান করেন। পাড়ার নিজস্ব সবিস্থান আছে। কোনো মেয়েকে বেশপাড়ার ছেলে মিট্রিক বিলে বাগবাঝার যে বিচার হবে, বাগিগেই সে বিচার হবে না। বর্ষমানে যে সাজা, বাঁকড়ার তা নয়। যে জাতে নিয়ে হলে কোথাও যাইন দিতে হবে, কোথাও হবে না। মুগি হলে কোথাও ওকা ভেঙে কেঁটিয়ে ভুত ভাড়াতে কলা হয়, কোথাও হয়তো তা নয়। এলাকা ভেদে একটা মাইক্রো সেভেলে সমান্তরাল প্রশাসন চলছে। সমান্তরাল বুডিসিয়ায় চলছে। এখানে ঠিক মত দাদা ধরার ব্যাপার আছে। ঠিক মত দাদা বরতে হয়। দাদা ধরা একটা আর্ট-এ ধাঁড়িয়ে গেছে। দাদাদের এলাকা একে বিবরের ভাগ্যচাক্ষুণ্ডেও জেনে নিতে হয়। যে দাদার গ্রামেটিরই ওপর আশ্রিত, সেই দাদার হয়তো পুষ্টিদের ওপর স্ববরাদির করার ক্ষমতা নেই। যে পুষ্টিরা 'গেথে', সে হয়তো ফুল-কলসভালা 'সেথেনা'।

ফুলগোলা এখনই, সেখানে এ. বি. টি. এ. করতেই হবে, একা না করলে চিহ্নিত হয়ে খেতে হবে। ব্যারাসত নিকটকর্তী একটা ফুলের

কথা জানি, সেখানে কুল চালায় এক গ্রুপ ডি স্টাফ। সে কটন করে, কপে কুল ছুটি হয়ে ঠিক করে, বহিঃত ভরতীতে সাংস্কৃতিক সম্মেলিতি রক্ষার বক্তৃতা দেয়, ক্লাসও নেয়। তার কারণ উনি এলাতার বাপুটি সি এম। সমস্ত টিচাররা তাকে বানা করতে বাধ্য। একবার ইন্সপেক্টর এসেছিলেন কুল। কোনো অভিযোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কোনো টিচার কোনো অভিযোগ জানাতে সাহস করেনি।

একম জনেক উদাহরণ সবার কাছেই আছে: উদাহরণ দিলে এই সারা পৃষ্ঠাতেই ক্যাকারসিস হয়ে যায় কিছুটা, তাই এইসব উদাহরণ দেয়া। গীরা এটা পড়ছেন, তাঁদের সবার মনেকাক্টের মধ্যে কিছু করতে না পারার ব্যাকরণ কেবলমাত্র। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

সামস্ত প্রকৃতা নেই। নতুন প্রকৃতা নেই। তৈরি হয়েছে। গত ত্রিবিধ বছরে এই নতুন নতুন আদর্শের অর্থন। এইসব নতুন নতুন সোভারুতি চোখ স্নায়ু না। হাতে কোনো চাকুর থাকেনা, শরীরাচার্য্য ততটা হামবড়াই থাকে না। অতুত পোষ্য প্রকৃতা।

আর একটা নতুন দাস শেই। তৈরি হয়েছে গত ত্রিবিধ বছরে। এসব হাতেই শুধুর অর্থন। আর সেই শুধুর অর্থন মাথা। এই নতুন দাস রয়েছে বুদ্ধিভীষ্মের মধ্যে বেশি করে, ব্যবসায়ীসের মধ্যে, প্রমোটারসের মধ্যে। চাকিসের মধ্যে, ভবিকসের মধ্যে। বুদ্ধিভীষ্মের জন্যে রয়েছে নানা পুরস্কারের হাতছানি, নানাবিধ একাডেমি, তার নানাবিধ পদ, সেমিনার ওয়ার্কশপ, স্তুতি ও কন্মতা। কবিসের জন্যে কন্মসরাসসহ স্পনসরারসহ কবিতা পাঠের ব্যবস্থা। গদ্য লেখকসের জন্যে কথা সাহিত্য উৎসব, সীতের শিষ্যের জন্যে সীতের মেলা, নট্য শিষ্যের জন্যে নট্যমেলা, পিতৃবেলা, বইমেলা, বিজ্ঞান মেলা, সিলে ম্যাগাজিন মেলা — আরও

কৃত সী। সিলে ম্যাগাজিন পুরস্কার; কবিতার জন্যে, কথাসাহিত্যের জন্যে কতরকম পুরস্কার; ফিশ ফেস্টিভ্যাল, অঁতডামির কত নুন খেয়ে চলেছি। কি করে বিরক্ত কথা কলব। আপ কা নিমক খাদ্য সরকার ...।

তার মানে এই নয় যে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সরকারের মনো খুব খারাপ। সরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নাট্যাংশবে সরকার-বিরাগী নটক হতে আইনত বাধ্য নেই। জন্যে বাধ্য থাকতে পারে। অনেক সিলে ম্যাগাজিনে সরকারি নিতি-বিরাগী লেখা ছাপা হতে পারে। কিন্তু এতদিন ধরে খুব একটা হয়নি।

একটা প্রকল্প শুধু থেকে গেছে। সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যে নতুন প্রকল্পশ্রী তৈরি হয়েছে, তারা লক্ষ্য রাখবে যাকতীয় নিমক খরামি। টেডাই মেডাই দেখলে নিঃশব্দ উচ্চারণ কলবে কব গে-লি বা। এ ওলি স্বম্বলুক মায় ওলি। বোকা যাবনা। একটা নটকেষ মল্লের তিতবে ওলি ঢুকে পেল, কিছুদিন পর মলটা ডেঙে গেল। কিছা একরকম কোনো একটা পত্রিকা তাকিসের বাড়িওলা কল আপনাদের উঠে যেতে হয়ে।

এ সব নিশ্চই ক্যাসিবাগী কাম্যদ নয়। এটা গীরা বলেন ঠিক করেন না। শুধু কিছু লোক হুংক করে এসব খল ফেস্টিভিলেন ১৪ই মার্চের ঘটনার পর। নশীগ্রামে ওলি চমার পর বেশ কিছু নিমক খাওয়া মানুহজন একমুখে নিমকখরামি করলেন। রাজ্যের নামলেন, প্রতিবাদে

খালিল হাসেন, মিছিল করলেন। চিত্রশিল্পী, নট্যাংশরী, চলচ্চিত্র পরিচালক, গায়ক, কিছু লেখক, লক্ষ যোগ সহ কিছু তরি — যে লক্ষ যোগকে একমুখে এই দুখানশী অভিহিত করেছি লেন 'আদামের বিবেক' অভিহায়।

খাবরি ভাঙলে যা ওজরাটের দল্লা হলে ইরাকের মার্সিন হামলা হলে যে সব বুদ্ধিভীষ্মী প্রতিবাদ করেন সি সি এম-এর সঙ্গে গলা মিলিয়ে, উত্তরশ্রী অনেকে সি সি এম-এর নিম্ম করতে নামলেন। এরা হল মায় — গত ত্রিবিধ বছরে এই প্রথম পর।

আমলে এই বহিঃপ্রকাশ বা ফৌস কল এটা ওজরাট নশীগ্রামের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদশ্রী নয়, কলসিনের ওজর মল পায়ল। এটা মন খারাপে শরীকৃত মায়সন্তর হলে এটা।

আবঃওয়া মদুর কলেকের সূত্রলে মেম নিতে কলতে বছর নাতুততায় কেবেই উত্পন্ন বহুপত্র মেমের তাম হয। কলেকশনিয়াস একটা মেমের নাম। কলেক শরীকৃত কলসিনের হওয়া ঐ মেমে নিম্ম গ্রন্থ মেম। নশীগ্রামের গলহত্যায় মলসল পর তুরি হয়েছিল। সিলে পদ সিলে বেশে গেছি মার্সি তালি, বিতমসেতু, ভিকারি শালেশাল, ছোট আভরিয়া, টামসিল চা খাণান, সর্গোপরি ছোটোই মানসিগি কৌশল। সরকারি হাসপাতালবে বিলিম্বির অবস্থা, সরকারি দুর্নীতি, এসব নিয়ে বকব কলেকের ফেস্টিভিল হযেছে। লাকত লল মিজেসের সাফাইয়ের জন্যে ব্যবহার বিলিম্বির সঙ্গে তুলনা করে মালেন, কিছু বুদ্ধিভীষ্মী ময়তবকতাব্দে প্রতিবাদ করেন সি। এই প্রথম:

আলিও মিছিলে গেলাম। লেখকসের ভাড়া করে প্রতিবাদে তৈরি করলাম। নানা সংশোধন করে একটা মলমেও তৈরি হল।

লেখকসের মলমেও কেউ কেউ বলল — এই ঘটনাটা একবার অনুক বাহুতে দেবিয়ে আনা উচিত। কেবেই মায়শ্রী অনুকবাহু কোনো এক বুদ্ধিভীষ্মী যিনি সরকারি কন্মতায় আছেন, এক কন্মতাবান।

তা অলপ শেষ পর্যন্ত কল হামি। কিন্তু বিবুতি ছাপা হবার পর

অনি করেকটি ফোন পেতে থাকি এলাকা খেতে হামি নয়, নশীগ্রামে বিবুতে সভায় আসার অনুমোদন। একটা সভায় গেলাম। পুসিপি ওলিচালনার নিম্ম, মডুরের পরিবাসের জন্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন ইত্যাদি সবই ছিল, ছিল না পুসিপের পোষাকে যারা জেলেছিল তারা কল। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন। সিলে দলম ও প্রতুতকমিতার কোনো মলমেওলা এ যিটিং-এ অংশগ্রহণ করেছিলাম তাই কাতায় সহি করেছিলাম। প্রত্যাব সর্বসম্মতিতে বৃথীত হল, কিন্তু আমার সম্মতি ছিল না।

তখন ব্রোঞ্জই যিটিং হুতু, নানা জায়গায়। তুলনুল নেভাতা বসে আছেন মলকে। কোনো কোনো 'একম নকশাল'ও আছেন। কখনো কলীর সুমন, জয় গোয়ারী কা মহাশেতা শেখীও। মলতা কন্ম্যাপাখায় যা কলমে ডাল লাগছেননা, মেনে নিতে পারছিলা, সবাই যখন ডালি মিছে, আমার হাত মলকেন। কিন্তু কলসিন পর একটা প্রতিবাদ মুখবুতি দেখতে পাছি, মেনে বোকার কথা গুলিয়ে হুতু, মেনে অদানশ্রীর মেনে বৃতি মেমেছে, মেনে কীছা গল গুলিয়ে হুতু, মেনে ওজরাটা ডালে পাতা গজালে। একটা বৃক সিমেটম পকেট পুরে রেখেছিল, মনে হ'ল পকেট

থেকে লাফিয়ে পড়ছিলাম। আমি জানি। হঠাৎ আমি আমার চেতনার স্তম্ভভংগে ঘুম ঘোহর ভাঙলো।

এরপরেই অবাক কাণ্ড! নন্দীগ্রামের ঘটনাটা যে খুব অন্যায় কিছু নয়, এটা অবিরাল ছিল এবং রাষ্ট্রা চালাতে গেলে এসব হতেই পারে এই লাইনে বৃত্তি সাজিয়ে কিছু বুদ্ধিজীবী বাজারে নেমে গেলেন। বিলম্বের পরে হ'ল, কনভেনশন হ'ল। কিছু পরপরিকল্পিত বিশেষ সংখ্যা বের করল, এবং সেখানে "সাধারণ ভাষণ" রে ভুই ভাল ভোর আমা ভালো নয়" ধরনের গান পাওয়া হ'ল। যুদ্ধের উচিত্যতা ভালো, সি পি এমও ভালোই, পুলিশ তত ভালো নয় আর নন্দীগ্রামের হানিটা পাটি কিছুটা হঠকারী, কিন্তু এই ঘটনার জন্য দায়ী জ্বিরিকা কঠিন তথা কুশাল।

এসময়ের কথা-সাহিত্যিকরা যে বোধ বিবৃতিতে সই করেছিলেন, তাদের অনেকেই ঐসব বিবৃতিতে সই করেন। কেউ শোকে এতটাই লিখে ফেলেন। কোনো কথা হ'ল ঐসব করার সঙ্গে।

উত্তরদেলে এরকম —

- ১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরি করি, কম কাজের মনুর পেয়েছি, লিখতে চিঠিতে পারি, ওদের চটালে কোচের কলি করে দেবে ট্রিক নেই, আমার প্রতিবার লেখার বেলা দিয়েই করব। দেখাটোখা ওরা পড়ে না। ওরা বিবৃতি পড়ে।
- ২) কে অর্ডিনেশন কমিটির মেম্বর আমিও। এটা না করলে ট্রিকের পারতাম না।
- ৩) আমার উদ্ভাস কালোনির ভবিষ্যৎ। এখনো পট্টা পাইনি। একটা গল্পগুলো অটোতে আছে। কমিটির পাওয়ার জানিয়ে দিতে হ'ল আমি ডোমালেরই লোক।
- ৪) আমি তো পাট টাইম শিক্ষক। ওদের মনুর ওপর আছি। ইচ্ছে হলেও উপায় নেই। কখনো তি চিত হতে পারবে?
- ৫) একটা পত্রিকা করি। পত্রিকাই আমার জীবন। আর বীজ যা আছে আমার জীবনে। কিছু বিজ্ঞান পাই। ওটাও যদি বন্ধ হয়ে যায় ...।
- ৬) ভালো বাস করে কুনিয়ের সঙ্গে ...।
- ৭) ...

উদাহরণ বাড়ানোর প্রকার নেই।
হতপ্রকারের বাহিনীরা অকণ্ঠে আমাদের আছে। কিন্তু কখনো হত প্রকল করতে পারিনি। কেউ আমাদের ছুরির কলার কিংবা কলুরের মন সামনে তৈরির কাগ নেয় না, কখনো কখনো বাধা দেয়না, কিন্তু কখনো কখনো বাধা দেয়।
ঐ এক বৈশিষ্ট্য বীজ। অতি কিছু ফেনে শেষে লাগলার এরকম —

- ১) আপনি নাকি মনটা বাধ্যপাধ্যায়ের মতোই এ-মিরে ...
- ২) কবীর সুবন বন্ধন কলসিহিলে বকলা নিতে হলে তখন আপনি নাকি হাততালি ...
- ৩) আপনি কি চান আমার সেই বাহ্যিকের মনওতো তিরে আসুক?
- ৪) শিয়ারের প্রত্যেকজনীক নিয়ে একটা কনভেনশন ডেকেছি, আপনাকে আসতেই হবে। যদি বিশেষ কিছু বলার থাকে, কখনো ... ইচ্ছা।

এ সব কনভেনশনের বাহিনী। যুদ্ধাঙ্গীর কুণপুণ্ডলিকা

পেড়ানোর মতোও তাইনি। সমস্ত বাধ্যপাধ্যায়ের অনশন হতেও তাইনি। সরকারি খেতাব ও পুস্তকার প্রত্যাখ্যান করতেও তাইনি।

ফোন বা এস. এম. এস. পাইনি। কেউ লিখছেন। ই বড়ি পুস্তকার প্রত্যাখ্যান করুন একটুনি। কেউ বলছেন আপনি একজন ডব। আসলে সি. পি. এম. এর দলদল।

বিরাটিতে বই মেলা হয়। আমার সেখানে একটা দিন কোনো আলোচনার অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। আমি তৃণমূলের দলদল বলে আমার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা হ'ল। আমার আমার অতি প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপেরও ভাবলেন আমি বিক্ষিপ্ত গিয়েছি। সমীচীন জল্পনার সহ কয়েকজন বসিও বন্ধু, যাদের পরিকার বীজবিন লিখেছি, তারা জানালেন আমি সি. পি. এম. এর দলদল।

আমার আনন্দবাজার নেই, আমার রানকুক মিশন নেই, আমার কো-অর্ডিনেশন কমিটি নেই, আমার সি. পি. এম. নেই, তৃণমূলও নেই, জীবন এটা হয়ে গেলাম।

কিন্তু উৎসবের মত কথাসাহিত্য উৎসবও হত সরকারি উপাযোগে। মার্চ মাসের শেষ দিকে হবার কথা ছিল। আমবা জানিয়েছিলাম এই উৎসব করত করছি আমরা। এপ্রিল দিন বার হ'ল। বললাম যাকনা। ছুন মাসে হবার ডেডলাইন হ'ল।

আমার সহকারী লেখকরা, যারা বড় কাগজে লিখতেনের বইয়ে নি, বীরা মনুদের কথা লিখতেন, বীরা হেট কাগজে লিখতেন লেখার ভাগ লেখা, বীরা আমার দুঃসময়ের বন্ধু, তারা বললেন কথাসাহিত্য উৎসব-কে কেন্দ্র করে আমাদের খোঁজপোনা হয়, মনুসময়ের লেখকরাও আসেন (সরকারি বসতে) ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে। আসলে ঐরাই তো আমাদের আত্মীয়স্বজন। চলে আসুন।

বাংলা একাডেমির কর্মকর্তারাও ফোন করলেন, যেন আমি কতটা বাহিনী, কতটা গুরুত্বপূর্ণ গলাব হব ও বরপ্রেরণের করবার।

আমি তাকলাব কেন আর মিছে অভিমান। অভিমান ছিইয়ে রাখতে হলে তো নখনে মিনেমা সেবেতে বাওতা বারনা, জীবনানন্দ সভাপতি নয়, গিরীশ মজুমদার মজুমদার ইত্যাদিতেও নয়। তা হলে সরকারি উপাযোগে চালিত বই মেলাতে? সরকারি বাসে? এইসব গড়াপটো হুজুর যাতেই লাগলার নিজস্ব ক্ষতিহে। পরাজিত বিদ্রোহী, শিখরে বীধা আমার হতে, আমি রাখাঝি ঢুকছি, কে যেন বলে লিগ আমার অশুণ বন্ধন, আমি জোড় হতে করলাম, হুচে হালাতাব আনলাম, বাংলার ব্যকে বলে দাঁত কালালাম। বললাম, ভালো হয়েছে। (স্বাভাবিক সাক্ষাৎ)

নন্দীগ্রামের ঘটনার কলর পাতি হয়নি। লক্ষ্য শেঠ হুগলিটা পৌরসভায় লিখে আবার ছিইয়ে। কোনো পুলিশের কলি হয়নি, কেউ কলিপুরে পাননি, পুলিশের সঙ্গে চাট পরা মনুসময়ের কারা ঢুকছিল জানা যায়নি। যে খবর কলসিহিলে লাইক হেল করে দেবে, তার কোনো হেলসেই নেই।

শিখ ও কিশোর একাডেমি তৈরি হয়েছে। আগামী ফিল্ম ডেসিভাডায় হুগি বাহ্যিকের কাগ চলবে। এবং ...

'পাশলাদাত'তে রাজার শেষ মনুদের ডায়লগ ছিল 'এ রাজ্যতে নাহি হবে হিন্দো অত্যাচার, নাহি হবে পারিষদ যাকনা, ... বাও সবো নিজ নিজ কাজে —

পদত্যাগী নটাকর্মীদের অনেকেই কিংবে গেলেন ফের।



(১৯৮১-১৯৯০-২২ ৫.২০০৭)

“সে চলে গেলেও হঠাৎ পিউনি

ফুলের গন্ধে হারিয়ে সকাল

শ্রবণের চোনে সামান্য এত

নুহুই হবে অনন্তকাল।”

কবীর স্মরণ

বন্ধু বিজনে মনে রেখে ...

কল্যাণ ক্রম

এই পৃথিবী ছেড়ে সবাই যায়। তবু যাওয়ার একটা সময় থাকে। বীরা কাজ করেন তাঁদের সেই কাজ শেষ করার দায় থাকে। সেই দায় পরিবার, আত্মীয় বন্ধু বা সমাজের প্রতি। কেউ স্বপ্ন দেখেন এমন এক সমাজের যেখানে সবাই স্বাধীন, সুখী, ভুগু। আবার আমাদের মতো অনেকেই পা বাঁচিয়ে নিরাপদ জীবন যাপন করতে ভালোবাসেন। ‘সমাজ যদি কোনোদিন বদলায়, আমিও তার সুফল পাবো; সুতরাং অত বামেলায় যাওয়ার দরকার নেই’ — এই হ’ল মধ্যমিত সুবিধাবাদী মানসিকতা।

কিন্তু বিজনে জানতো সমাজ নিয়ে খেঁচে বদলায় না, তাকে বদলাতে হয়, আর সেজন্য চাই দীর্ঘ সংগ্রাম; ও শাসকগোষ্ঠীর উদ্ভাতা আধিপত্য অর্থমিককে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ওমু তাত্ত্বিক লড়াই নয় বিজনে লড়াই করত বিপ্লব মানুষের পাশে ঈড়িয়ে। বিনপুয়ের পাথর খানেনের বিপ্লব আধিবাসীদের জন্য কিংবা সিলিকোসিসে অস্বস্ত্য প্রতিক্রমের জন্য লড়াইতে বিজনে ছিল অনবদীয় — আপনি সে লড়াইতে ওর পাশে না থাকলেও ও ছিল অকুতোভয়। আইনি লড়াই, প্রতিরোধ-আন্দোলন এবং তাঁর বড় অবলম্বন ‘টপ কোয়ার্ট’ পত্রিকার মাধ্যমে জনমত গঠন, এই ত্রিমুখী লড়াইতে বিজনে ছিল অক্লান্ত।

সাবীকবীর অভাব, পত্রিকা চালানোর সমস্যার চাপ, সহযোগিতার অভাবজনিত আক্ষেপ — এসব নিয়েই চলতে হত তাকে, কিন্তু গত এক দেড় বছর ধরে বিজনে যেন ক্রমশ একা হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুরা নানা কারণে সবসময় তার পাশে থাকতে পারে নি। একান্ত আপন পত্রিকা ‘টপ কোয়ার্ট’ বেরোচ্ছিল না। এরই ওপর, ছাত্রদের সমাজ-তত্ত্বমহীনাও এক আশ্চর্যজনক সাফল্যের জন্য ইস্যুর খোঁজ বিজনেকে অত্যন্ত নীড়া দিত। শিক্ষক হিসেবে এক ব্যর্থতার স্রাশি ওকে গ্রাস করেছিল। সোনা যাচ্ছে পথেঘাটে অনেক তাকে বিক্রম করত — অসত্য ‘পরিকল্পনা বাবা’ বলে অসম্মান করত।

২০০৪ সালে বিজনে ওর এক ভিসিতে জমি বিক্রি করে একটি নতুন ট্রাট কেনে এবং বসবাস শুরু করে। কিন্তু ওই ট্রাট-কালচারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ওর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। বিজনে ট্রাটই ওর স্ট্রীকে বলত — জমিটা বিক্রি করে ভুল করেছি। ওরা ট্রাটটা বিক্রি করে আবার ভাড়া বাড়িতে ঘিরে যাওয়ার কথা ভাবছিল। ... এইসব মিলিয়ে বিজনে ক্রমেই মনসিকভাবে নিঃসহ হয়ে গিয়েছিল; যাতে যাতে

বলত, ‘আমার আর বাঁচতে ভালো লাগে না।’ যে সমাজকে বিজনে বদলাতে চেয়েছিল সেই সমাজই বিজনের সব আত্মবিশ্বাস কেড়ে নিল, ওকে বৃত্তার বিকে ট্রেসে নিল।

কৃষিজমিতে শিল্পায়ন নিয়ে এখন রাজ্য ভালোপাড়: ২০০৩ সালে রাজ্যের নতুন কৃষিমন্ত্রী গৃহীত ইওবার পর বিজনে ‘টপ কোয়ার্ট’র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল: তাব শিবোনাম ছিল ‘পশ্চিমবঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ’: এমন মানে হচ্ছে বিজনে বোঝিয়ে চিন্তায় ও মননে তার সময়কাল থেকে তারেক্টা এগিয়ে ছিল। ভৌম জলনির্ভর সেচব্যবস্থা, এক ফসলী ইঁদুর, পরিবেশে রাসায়নিক সাব ও কীটনাশকের প্রতিক্রিয়া — এসব নানা বিষয়ে ওর উদ্বেগ ছিল গভীর। ও চাইত উন্নয়ন হোক পরিবেশের সঙ্গে সমন্বিতপূর্ণ: মানে পড়ছে ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চীন এক বক্তৃতায় বলেছিলেন: We have over a century been dragged by the prosperous West behind the chariot, choked by the dust, deafened by the noise, humble by our helplessness and overwhelmed by the speed. We agreed to acknowledge that this chariot drive was progress and that progress was civilisation. If we ever ventured to ask “progress for what and progress for whom”, it was considered to be peculiarly and ridiculously oriental to entertain such doubts about the absoluteness of progress. Of late, a voice has come to us bidding us to take count of not only the scientific perfection of the chariot, but also of the depth of diiches lying across its path.

উন্নয়নের সেই গতিশীল রথ এখন চলছে সিঁদুর নশীগ্রাম শালবনী পুরুষোত্তমপুর ইত্যাদির ওপর দিয়ে। কিন্তু ধরিত্রীর বুকে সেই রথের চাকার গভীর কতে কে প্রবেশ সেবে। বিজনে তো চলে গেছে। এই ভোগবাণী দুনিয়া ধরিত্রীর কান্না শোনে না — সে বধির। উদ্ভাতের বর্ষ এসব কথা হৃদয়ে প্রবেশ করতে দেয় না। ‘আমরা ২৩৫ ওরা ৩০’ —এর অহংকার শাসকে বধির করে দেবে। আর সেই বধিরতা ভাঙতেই দরকার হয় বিজনের মতো হেলোমের।

বিজনে আর কোনোদিন ফিরবে না, কিন্তু সময়ের তাকে আরও অনেক বিজনে জন্ম দেবে — নশীগ্রামে বা সিঁদুরে। আমরা সেই জটিলগর্তের সন্ধানের অপেক্ষায় ...।

পুঁজির পৌষমাস গরীবের স্বপ্ননাশ

"তোমাদের মত কোম্পানিকে ব্যর্থকর্ষ করাও জন্য আমরা পাহাড় তেড়ে ওঠিয়ে দিয়েছি, জমলকে কেবলি কংস, সোভিয়েত নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়েছি, জনশ্রমের মানবজলকে ব্যস্ততা করেছি — এ সবই তোমাদের জন্য। উদ্দেশ্য একটাই, তোমাদের বানিজ্য করতে যেন সুবিধা হয় এবং তোমার আয়ের মাটিতেই যেন বানিজ্য কর" — "ফরহুদ" পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফিলিপাইন সরকার এ ডাবলিউ বন্থি ম্যানানাল (MNC) এবং ট্রান্স ম্যানানাল (TNC) কোম্পানিগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বিজ্ঞাপনটি বসবাসীর খুব একটা অর্থনা লাগার কথা নয়। কারণ সব কিছু বিক্রির জন্য থাকবে ধরতে পশ্চিমবঙ্গের ডিম এগ্রিকাল্টিভ অফিসার (CEO) বুড়ি, উন্নততর বামফ্রন্ট সরকারের কামগারী (!) মুখ্যমন্ত্রী বুড়বের ভট্টাচার্য গোয়েবলসীয় কার্যের বেশে-বিদেশে নিম্নপতি পরিবেষ্টিত হয়ে বাবাংবার একই ভঙ্গিতে প্রচার করে চলেছেন অর্পার্টেট হাউসগুলির সেনার কাঠিব মারাবী পরশে রাজ্যের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে; শিখারচেনের জোয়ারে নতুন নতুন কৃষকের মুখোশ সুটি হবে ফাগু বেকারি ঘুচবে, গরিবরা দুগ্ধীকরণ হবে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষিতে রাজ্য সরকার সেবা হবে। নোকা কথা রাজ্যে অর্থনীতির মরা গায়ে স্বাধীনতারি কান ডাকবে। বসেনি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির জোট এবং সাম্রাজ্যবাদী জাতি এজেন্সিগুলির (World Bank, International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), Department For International Development (DFID), Japan Bank for International Co-operation (JBIC) ইত্যাদি) 'পোস্টার বর' তিনি, তিনি আরও মারা বেশে মুখ্যমন্ত্রীর বোলা হতে। কারণ তাঁর নেতৃত্বে তাঁর সরকার ও দেশ LGP - Liberalisation (উদারীকরণ), Globalisation (গ্লোবালন) এবং Privatisation (বেসরকারীকরণ) কর্মসূচির দ্বারা ও সফল রূপায়ণের মধ্য দিয়ে সংস্কার কর্মসূচিকে (Reforms) অতি সম্ভাবনাময় ভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বৃহৎ পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলি তাঁর প্রশংসার লক্ষ্যমুখ। প্রশংসাকবীর কিছু নতুন নিষ্ঠা দেখা যাচ্ছে—

বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট James D Wolfensohn বলেছেন — "World Bank has praised the left parties for their 'broad-based Vision' on social Sector and infrastructure development and said the UPA government's Common Minimum Programme was in tune with the Bank's objectives 'It does not seem to be a red flag at all', he said referring to the left parties." (Times News Network, 23.11.04).

FICCI-র চেয়ারম্যান জেনারেল অমিত মিহ্র তাঁর আমেরিকা সফরকালে অর্পার্টেট হাউসগুলিকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন — "Please differentiate the noise and the sound of the left," he said "Noise is the cacophony, and sound is substance and that will be no different if there was any other party in its place ... (communists) have been on the fore front of the reform movement in India." (Internet, 15.06.04).

মার্কিন মুক্তবাস্তুর বাকসমিতি প্রতিনিবি প্রাক্তন কাউন্সিলর Geza Feketekuty এসের প্রতি গভীর আস্থা থেকে বলেন — "From what I have seen in Kolkata, I am convinced that there is no fear of India's reform process being derailed as the leftists are now playing an important role in Delhi ... A lot of what is being said by the left in Delhi is part of political bargaining and everyone understands that" (Times of India, 6.3.05).

এতসব প্রশংসাতে উত্তেজিত হুইটী মুক্তবাস্তু অকলীলার বলেন — "Go and tell the world that we are changing. We Marxists are not fools to cling to obsolete ideas. In West Bengal, the left is right. And this is the right place to invest" (Buddhabad Bhattacharjee at CII Summit. The Indian Express, 14.02.05).

পাশাপাশি বৃহত্তর জনতাকে বিভ্রান্ত করতে বুদ্ধ উবাচ — "... we also understand that the process of economic reforms is irreversible. All we want is that the reforms should have a human face ..." (Times News Network, 10.06.04).

দেশীয় ও সাম্রাজ্যবাদী অর্পার্টেট হাউসগুলির দমনবীর মুখ মানবিক হয়ে উঠবে এবং তাদের নির্ণয় মুনাবা প্রকণতার বদলে একটি রাজ্যের জনগণের উন্নয়নের প্রতি তাদেরকে দায়বদ্ধ করে তোলা যাবে — এই সেনার পাণ্ডুরবাটির কথা তেঁবে নিশ্চিত হতে পারে চূড়ান্ত নির্বোধ অথবা অর্পার্টেটের উদ্বিগ্নভোজনে চরী সর্বস্বরা।

কর্ণাটো হাউসগুলি নির্মেলার তাদের বসিষ্ঠা শীলারক্ৰেতগুলিকে তি চোখে দেখে এবং গোটা বিশ্বকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তি চোখে পরলোতে চায় তার সমস্তের প্রতিমিথি বুলক ব্যাধ্যা দিয়েছেন আমেরিকার প্রাচীন অর্থগতির চর্চা বেশ সেই ১৯৬৭ সালেই — “জাতিরাষ্ট্রগুলির সাম্প্রতিক সীমানার সীমিততা আধুনিক বাণিজ্যের যন্ত্রণতির প্রতিবন্ধক। কর্ণাটো সংস্থাগুলির আদ্য এমন এক বিশেষ প্রয়োজন দেখানো ওয়ু উৎপাদিত সাহসীই নয় বরং উৎপাদন প্রতিষ্ঠার ব্যবহারী উপাদানগুলিকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতার সঙ্গে ইচ্ছাকৃত এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করা যাবে।” অর্থাৎ কর্ণাটো সংস্থাগুলি বিশ্বব্যাপী জল-জমি-জল-খনিজ সহ তারই দাব্যবৃত্তিক সম্পদ, উৎপাদিত সামগ্রী এবং প্রাণ সম্পদের উপর একতরফা আধিপত্য কায়েম করতে চায় এবং সর্বোচ্চ দুর্বলতায় সেগুলি ব্যবহার করতে চায় কিংবা অবাঞ্ছিত রেখে দিতেও পারে, কারণ কোনও জাতিবাষ্ট্র বা স্থানীয় এলাকার মানুষের প্রতি তাদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। কর্ণাটো রাজত্বের সরকারের সাম্প্রতিক ক্রমিকা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক না হয়ে গেলেও তার একমাত্র কাজ হবে পুঁজির যতই প্রবীণ, অনিবার্যভাবেই জনগণের বিবেক সঙ্গীন উচিত।

কর্ণাটো পুঁজিতে আমেরা নিজেদের পরে জনগণের হাফে ব্যবহার করছি এবং সংস্কারের মানবিক মূল অনুশাসনের কবিত্ব এবং এ ছাড়া গভীরতর সেই — বুদ্ধবাবু, তার দল এবং উলিউলোকাই একতরফার বুদ্ধিভাষীর একমাত্রিক ও অবিরত প্রচার আসলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে সমাজব্যবস্থা অনুশব্দেবকে আড়াল করে চলেছে। পরিবেশা উন্নয়ন, প্রভাওয়া প্রায় পর্বত পিচ রাহুর ডাল ছড়িয়ে দেওয়া, জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষা কেন্দ্রে বিশেষি অনুদান বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজগুলিকেই বুদ্ধবাবু ‘সংস্কারের মানবিক মূল’ বলে চালাচ্ছেন। এই ‘মানবিক মূল’ কে আরও মানবিক করে তুলতে সাম্প্রতিক ভোজন্যর সওয়াল চলছে গ্রামীণ জমিতে শিখত্বপূর্ণ কৃষির চেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে— এই উদ্যোগের সপক্ষে।

শিক্ষায়ন-পরিবেশা উন্নয়ন-পরিচালনা উন্নয়ন প্রকৃতি কর্মসূচিগুলি একটিকে অন্যটির থেকে এমন বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে যাতে সবার কাছে থেকেই এক রকম সহানুভূতি সূচক অনুশাসনের আদায় করে ফেলা যায় যে, সরকার জনগণের স্বাধীনতার মানেপ্রদান করতে পুঁজি আদায়ী — ওয়ু অর্থিক সামর্থ্য কম বলেই জন-স্বাস্থ্যর করতে কথা হচ্ছে। এক গভীর সাম্প্রতিক বহুস্তর সহকারে আড়াল করা হচ্ছে এই সত্যটিকে যে, এই সার্বস্বত্বের প্রতিটিই সমাজব্যবস্থার দীল নকশা অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যর প্রতিটি প্রয়োজনের কেন্দ্রে অবস্থার পন্যায়নের লক্ষ্যে বিশেষি জনের বাধ্যতামূলক শর্ত মেনে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। বুদ্ধবাবু সমাজব্যবস্থার নির্লক্ষ্য চিকিৎসার করছেন মাত্র — গরীব জনগণের সামগ্রিক কিছু কাজের সুযোগ বা সামান্য বাড়তি মজুরি পাওয়া এই সব কার্যক্রমের অত্যন্ত নগণ্য পার্যফল মাত্র — জনগণকে এ কথটা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।

বুদ্ধবাবু লালিত উন্নয়নের উড়ালপুল থেকে শিক্ষায়ন-উপনগরী-স্বাস্থ্যনগরী স্থাপিত হলে নির্মেলার কল্যাণক্রমেই আনন্দমূল্যপূর্ণ হারান এবং একান্ত নিজস্ব কৌমল্যবনের সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত কৃষক, ক্ষেতমজুর ও তাদের পরিবারবর্গ সম্মিলিত ভাবে থেকে মনুষ্য উৎপত্তি হয়ে থাকলেও স্ট্যাটাবডির পরোয়ান-আলী-নিউটম্যান-সুন্ডি ভেনডার-কাজের তি প্রকৃতি ক্রীতসমসন করে নিদ্রুত করেন। এবং নয়া উপনগরীর নামহীন - মুখহীন-পরিচয়হীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পর্ববসিত হওয়া এদের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ: আর ইচ্ছাকৃত কৃপিত্রি উচ্চতর অভিযানের মাধ্যমে এসবকে এক ভাসমান জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা যাবে যে কোনও সময়। সামান্য বেশি কাছনমুন্সোর আশ্বাস দিয়ে এই ফলাফলার ভবিষ্যৎকে আড়াল করে নাগরিক জৌলুসের প্রতি গরীব মানুষগুলোকে মোহায়াত করা গেলে কোলা কতে। তাহলেই ওলা ভুলে যাবে ওদের এক পূর্বসূরীর নাম ছিল স্পার্টাকাস এবং ভুলে যাবে ‘গরীব মানুষ’ এই স্লোগান নেমতি থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার শব্দত হয়। আর এই ‘স্বপ্ন অপরূপের মাধ্যমে লাল কাপড়ের নানাবলী গায়ে বুদ্ধবাবু এতদ কো হুডাড প্রতিক্রিয়াদীল দক্ষিণপহার বিবেকে প্রমিত ও মেহেনদী মানুষদের সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে রাখার এক কৃপা ঐতিহাসিক অশ্রাধ করে চালাচ্ছেন। আর তির এই কার্যেই সমাজব্যবস্থাী ভাতিং এজেন্সি তথা সমাজব্যবস্থার তাক্রিমের এত পুণ্যবৃত্তি বুদ্ধবাবু মাধ্যম। অথচ এইই সময়ে ভিউ-কেনেব্রুয়েল-মেক্সিকো-বলিভিয়া জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগকে অহু করে চালাচ্ছে যুঁতে সেওয়ার সাহসে মোহাচ্ছে কর্ণাটো পুঁজি তথা সমাজব্যবস্থাী অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং বুদ্ধবাবু, এমনি সময়ে সমাজব্যবস্থার ঘড়িগিরি করে আশ্রিত সদলবলে ইতিহাসের অহেজনাহ পদপত হওয়ার পথে এক পুঁজিগড়ম্বর ব্যয়ায় নিজেদের সামিল করে চালাচ্ছেন। কৃষকে ভাঙ্গিল (কোথায় গেলে)?

“ঘর-জ্বালানে পর-ভালানে” বিদ্যাসাগর

আশীষ লাহিড়ী

বিদ্যাসাগরের দুইটীরা কন্যা বিদ্যাদিমিতী (১৮৩০-১৯১৮) বিয়ে হয় ১৮৭৫ সালে সূর্যকুমার অধিকারীর (১৮৫৫-১৯২৬) সঙ্গে। বিদ্যাদিমিতী আর সূর্যকুমারের বিতীরা কন্যা সরস্বতী (১৮৮০-১৯৪৫) মাত্র একশ-আইশ বছর বয়সে বিধবা হন। ভাবনপর পরলোক, ইশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা, স্বয়ং ইত্যাদি নানাবকম আধৈলম্বিক খেলা নিয়ে বেড়ে থাকেন। ১৮৪৫ সালে সরস্বতীসার মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর লেখা একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। সেই পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় দামদামাই বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অন্তরের সমস্ত বিষ উগরে দিয়েছেন সরস্বতী। সম্ভ্রান্ত সাহিত্যে পরিব্যস্ত পত্রিকার ডিসেম্বর ২০০৫ সংখ্যায় প্রমিষ্টকুমার সমস্তর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে।

দেখা যাক সন্দানশইয়ের কিছুই নাটনির এতটী ভোত, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তা কতটুকু কান হেঁচোতে পারল।

সূর্যকুমারের বিয়ে

অতি উচ্চ-বর্ণীত কিছু ঘরির ব্রাহ্মণ ঘরের মেলে সূর্যকুমার অধিকারী বি এ পাশ করে ১৮৭৫ সালে হোয়ার স্কুল শিক্ষকের চাকরি পান। এক ওড়ানুধাতী তাঁকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে জ্ঞানপ করিয়ে দেন। বিদ্যাসাগরের তাঁকে দেখে খুব পছন্দ হয়। কিছুদিন পর তিনি নিজের মেয়ের সঙ্গে সূর্যকুমারের বিয়ের প্রস্তাব দেন। সূর্যকুমার বলেন, বিদ্যাসাগরের মেয়েকে বিয়ে করলে সেই ‘অপরাধে’ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সূর্যকুমারের পরিবারকে একঘরে হতে হবে। আত্মব হওয়ার কিছু নেই যে বিদ্যাসাগর মহাশয় নীরবে এসকল কথা ওদিয়ে বিষড়ভাব প্রকাশ করেননি। বিদ্যাসাগরের মহত্ববাহী অর্থপূর্ণ

আত্মকাল (১৯৭৫) সম্বন্ধেও পূর্বন অনেকটা শিখিল ইয়াজে। এখনকার সমাজপতিরা তিথিঃ তিথিঃ অর্থ পাইলেই নিরস্ত হইকেন। ... যতক, তুর্কীন এবং সমাজপতিরা কিছু কিছু বিদ্যায় এবং একটি ভোত পাইলেই সমস্ত হইবেন। পাক-স্পর্শ বিদ্যার একটি অঙ্গ। পাক-স্পর্শ উপলক্ষে এই কার্য সহজেই সমাধা করা হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাই সূর্যকুমারের পিতাকে খয়ং চিঠি লিখতে রাজি হনেন। তখন সূর্যকুমার কলসেন, চিরিতে কোনো ফল হবে না, বরং সূর্যকুমার নিজে গিয়ে তাঁর মাকে সব ব্যক্তিগত বলবেন।

আমার মাতা এক অতি প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের কন্যা। ... যে বিয়ের আমার মত হয় মাতা ভাড়াতে অমত করেন না; পিতাও কখনো আমার বিরুদ্ধাচারী হন না। আমাদের সৎসরের ব্যবসায়ী ভারী মদ্যের উপগ্রে; পিতা কেবল পুত্রা ব্যক্তিগত লইয়া থাকেন।

হির হল, সূর্যকুমার তাঁর মাকে সাজি করাবার জন্য অক্লান্তকর্ম পরে নেয়ার ব্যক্তিগত করেন। এরই মধ্যে বিদ্যাসাগর পায়-পায়ীর ‘শেষতাবার’ ব্যবস্থা করলেন। পূর্বাঙ্গের কথাব্যক্তির পরের বিবাহের তিনি সূর্যকুমারকে নিষেধ করলেন। বিদ্যাসাগরের ৩১ বছর আত্মহাট্ট স্ট্রীটের বাড়ির উপরে বারান্দায় গিয়ে দেখা করেন :

একখানি গালিচা আসনের সামনে অম্বাশ্রম প্রস্তুত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছিতে [সূর্যকুমার] আহাব করিতে বসিলেন এবং আহারান্তে আচমন করিয়া নিতটঃ একটি বড়ো আম কাঠের সিঁদুরের উপর বসিলেন। তথায় বসিবারান্তে একটি ছাত্তবর্ষী [আমদে পনেরো বছরের — লেখক] বালিকা ডিরা লইয়া আসিল এবং সলচ্ছভাবে একটি পায় তাঁহার দিকে চাইল এবং ডিরাটি তথায় রাখিয়াই চলিয়া গেল। ... এ ঘটনা মুটে বাবা বৃষ্টিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় কৌশল করিয়া বরতনের পরস্পর দেখানোয়া করাইলেন, এবং পরিজনবর্গকেও বর দেখাইলেন।

এই ঘটনার দিন থেকে পর বিবাহ সম্পর্কে পাণ্ডপের সব আগুপি মুতে গেল। অনুমান করা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ‘কিছু বিদ্যায় এবং ভোত-‘ঘর-জ্বালাই কটুর সমাজপতিদের জ্বালান করেছিল।

‘ঘর জ্বালানে পর ভালানে’ বিদ্যাসাগর

পিতার বিবাহবৃত্তান্ত এইভাবে বর্ণনা করবার পর সরস্বতী তাঁর দামদামাই ইশ্বরব্রহ্ম সম্বন্ধে লিখছেন :

গতর্ঘমেটের প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ মধ্যে তাঁহার বিশেষ ব্যক্তির ও প্রতিপত্তি থাকায় তিনি তখন তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব অথচ নিজের কৃতবিদ্যাদিগকে গতর্ঘমেটের চাকরীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিজনবর্গের বিশেষ কৃষ্ণজাত্যভ্যাজনও ইয়াইছিলেন।

একথা অবশ্যই সত্যি। অক্ষয়কুমার মদ্যের উদাহরণ তো চোখের সামনেই রয়েছে। মতাদর্শগত কারণে অক্ষয় মত যখন মেহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধিীন সম্পাদক পদ ছেড়ে দিলেন, তখন বিদ্যাসাগরই এগিয়ে এসে তাঁকে সম্য-প্রতিষ্ঠিত সরকারি শিক্ষক-শিক্ষক স্কুলের অধ্যাপক করেন। এখানেই শেষ নয়, অক্ষয়কুমার কারনে অক্ষয় মত যখন সে-চাকরি ছেড়ে নিজে বাবা হলেন, তখন বিদ্যাসাগর মদ্যেরই প্রভাবে তত্ত্বাবধিীন থেকে তাঁকে কিছু টাক্স পেনশন সেভারের ব্যবস্থা করা হয়। এটাই বিদ্যাসাগরের স্বভাব ছিল। এখানে লক্ষণীয়, বিদ্যাসাগর শুধু বন্ধুবান্ধব কলিই মানুষের উপকার করতেন তা নয়, উপকৃত মানুষটির চরিত্রকেও বিশ্লেষণ করে তাঁর কাছে প্রধান বিষয় ছিল। যেমন অক্ষয় মত সম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগকে তিনি লিখেছিলেন, এই মানুষটি খুব ভালো ইংরেজি ভাষা জানেনই, উপলব্ধি নানা বিষয়ে এর চেয়ে জ্ঞানী লোক এখন আর কেউ নেই।

এই পরেই সরস্বতীরা যে-কথাটি বলেন তা আমাদের হস্তব্যাক করে দেয় :

কিন্তু তাঁহার নিকট কুটুম্ব বা আত্মীয়স্বজনের যে এমন কোনো উপকার করিয়াছেন তাহার একটি দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু অনেকের যে বিশেষ অনিষ্টসাধন করিয়া লিখছেন তাহার দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে। এমনকি তাহার

মাতারহী (অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের স্ত্রী) তাঁহাকে 'পর ভ্রাতার' 'পর ভ্রাতার' এরূপ অশুভ আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন।

বংশোদ্ভূতের মতো এই লাইসেন্সের অভিযান্ত্রিক এতই উন্নত যে কিছুকাল শত্রু থেকে মুক্ত নিতে হয় এবং প্রকৃত অর্থে কী। প্রথমতঃ বৃত্তান্তে ছাত্র, 'পর ভ্রাতার' 'পর ভ্রাতার' মানে হল যে-সকাল ঘরের সর্বজন করে পরের ভাষায় করে বেড়াই। দ্বিতীয়তঃ, সবসময়ের প্রতিক্ষেপে অনুভবীয় বিদ্যাসাগরের স্ত্রী যতঃ বিদ্যাসাগরকে ঘর-ভ্রাতার পর-ভ্রাতার বলতেন, কেনন বিদ্যাসাগর বহিঃস্থের গোপন উপকার করে যেতেন, অতঃ 'আত্মীয়কৃত্ব'র 'অনিষ্টাধার' করতেন। বিদ্যাসাগর যে পরিবারকে জীবনে কত নিঃসঙ্গ ছিলেন তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

সরস্বতীর অভিযোগের তালিকা দ্বিতীয় :

... তিনি অনেক সময়ে গরিব, নিমিত্ত, দুগ্ধিত কর্তৃক করিয়া নিম্নাচ্ছেন। তাহাতে তাঁহার কর্তব্যকর্ম অগাধ জন। তাঁহার মহাশয় ইয়াহাৎ এবং তাঁহার প্রচলিত জন। (তাঁহাকে) শব্দে অতঃপর দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও এবং যাহার জন। তাঁহার পার্থিব জীবিত সমুদ্র অতঃপর পরিণত ইয়া বর্তমানে বিনাশের পথে অবিসার্য পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মণের প্রতিসম্পাদ্য অংশকাও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ এবং অসংলগ্ন একটি নিরীহ নরপণ্ডিত জীবিত্যের সন্তোষ উচ্চৈশ্বর্য সাধন অতি ওলুহর পাণ, মহাপাণ। এ পাণের প্রচলিত আছে বলিয়া সারমাণের বিশ্বাস নাই।

[বাঁকা হরক লেখক কৃত]

সামান্যভাবে দামামাই সম্বন্ধে নানাবীর মূল্যায়ন এই :

তিনি দরিদ্রদের ক্ষমগ্রহণ করিলেও বুদ্ধি, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানবান বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হন। একজন তাঁহার একটি বিশেষ অহঙ্কার ও আত্মভিমান আছে। তিনি নিম্নোক্ত ক্ষমতা পূরণ মনে করিতেন এবং কখনও তাহারও সহিত মিলেমিলে ঐক্যমতে কাজ করিতে পারিতেন না। তাঁহারে ব্রাহ্মণসুলভ সংবেদ, ভিত্তিলা ও ক্রমা লক্ষিত হইত না। তিনি সত্যকথ্য পালন করেন নাই এবং প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি প্রোঞ্চীয় বৃত্তিবিপ্লব প্রকণ তড়নে অনেক সময় অনেক অসংলগ্ন কাজ করিয়া ফেলিতেন। এবং যাহার উপর যখন একবার চটিতেন তাহারকে একেবারে ছাড়বার না করিয়া ছাড়িতেন না। ইহাতে তাঁহার জ্ঞানপনর ভঙ্গ ঘটিত না। এবং কখনো এরূপ অকার্য্যের পরিণাম কভিভেদে না। প্রোঞ্চবত্তে কোনও অকার্য্য করিয়া ফেলিলেও ক্রোড়ের উপশমে নিজের ভ্রম বুঝিতো সে ভ্রমের সংশোধন করিতে পারিতেন না। অসং কার্য্যে যেমন কালক্লেষ হইত না, আবার স্বাক্ষণের পৃথিবী হইতে বর্ণ পূর্ণ সিদ্ধি সম্পাদনে এতই কল বিলাস হইত যে উহা আর জীবৎকালে সম্পাদ্য হইত না। আমরা মুক্ত করে বলিতে পারি এবং সরমণ করিতে প্রস্তুত আছি যে, তিনি বৈদ্যকল নগর্য্য ব্যক্তির সাহায্যে ও সহায়তায় তাঁহার সাময়িক জীবিত স্থাপন করিয়াছেন তাহারের অনেককে একেবারে বিনাশ করিয়া গিয়াছেন। বংশাধিনা এবং নিম্নোক্তর তাঁহার আর একটি চরিত্রগত বিশেষ ভ্রম ছিল। [বাঁকা হরক লেখককৃত]

এখানে সেন্সর অভিযোগে তেজা হইতে সেততো সত্যই কলঙ্কিত। সব বাৎসর্য্য সেততোতে এইভাবে সাজানো হয়। ১) তাঁর বৃত্তিগত ও মনোবৃত্তি। ২) কখন নিজে কখন না-নিজে তিনি সেন্সর তরতেন। ৩) তিনি কখনোই প্রকৃত, এটা কত পুরোনা কথা; কিন্তু বৃত্তিবিপ্লব আসে কোনো কোনো বিশৃঙ্খল বংশেও তিনি আর্জ হইতেন, এই ইতিহাসটি নতুন। ৪) বাস ওপর চটতেন, তাঁর সর্বজন করে ছাড়তেন। তাহে সবথেকে বড়ো অভিযোগ এই যে সেততো তাঁর জ্ঞানপনর ভেদ থাকত না। আত্ম-প্রদানীয় নিম্নোক্তই তিনি কত নিতেন। ৫) নিজের ভুল স্বভাবও তিনি তার সংশোধন করতেন না। ৬) অসং কাজ করত তাঁর একটিও সময় লাগত না, কিন্তু বড়ো বড়ো পরিকল্পনা কখনো শেষই করতেন পাওতেন না। ৭) যাহার সাহায্যে তিনি তাঁর সাংসারিক জীবিত স্থাপন করেছিলেন, তাহারই সর্বজন করে গিয়েছিলেন। ৮) তাঁর জীবিতের সেতও নিম্নোক্ত ছিল।

আন্তর্য্য : যে-সূর্য্যবাসীর অভিযোগের সঙ্গে চিত্রিত মেয়ে বিদ্যে সেবার জন বিদ্যাসাগর এত উৎসাহী ছিলেন, যার জন্য তিনি কিছুটা নত হইতেও বাধ্য ছিলেন, তাঁরই কন্যা মুখে এই বিদ্যাসাগর : তাহে এই বিদ্যাসাগরের সত্যকথ্যে নির্মম ও নিষ্ঠুর চাপেপাটের কথা এখনো বহিলি। এবার সে-প্রসঙ্গে আসি।

কুটুম্ব-প্রাণী ছিলেন

বিদ্যাসাগর বানাকুল-কুলপনর কুলীন পণ্ডিতবংশের সন্তান ছিলেন। তাঁর 'নিষ্ঠা কুটুম্ব ও জীবিত্যজ্ঞান'র কোনো উপকার করেন তিনি করেননি, এই হল অভিযোগ। কুটুম্বের প্রতি তিনি যে-ভয়ানক অন্যায়ে করেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে তুলে ধরেছেন নাটকীয় সবস্বাক্ষর। —

কুলীন ও ভঙ্গকুলীনদের মধ্যে তাঁহার অনেক কুটুম্ব ছিল। "কবিরাজ নিবারণ" ও "বিদ্যাবিকার প্রভঙ্গ" সংকল হইতে তাঁহাকে নিষ্ঠুর করিবার অভিপ্রায়ে এক সময়ে তাহাদের অনেককে মিলিত ইয়া তাঁহারে নিষ্ঠা আদিয়া বহিনয়ে আবেদন করেন, বিদ্যাসাগর : তুমি বিবিধ শাস্ত্রদুশীলন করিয়াছ সত্য বটে, কিন্তু তাহার ফল কী হইল? এই হইল যে তুমি সনাতন হিন্দু ধর্মের বাক ও হিন্দুসন্যাসের বাক্যে ছুরিকাঘাত করিতেছ। নিষ্ঠুর হও, স্নেহহারা হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা কবইও না। ইহাতে অর্থক হইবে। ...

ব্রাহ্মণের সন্তোষে বসিলেন, 'তুমি কি সমাজের ভয় রহিত? সমাজ তোমাকে পণ্ডিত করিবে; তোমার সহিত কন্যা আসন ক্রমণ করিবে না, আহার বিহার করিবে না, এবং চাটখি মেতে নিয়ে ঘর কর, তাহাঙ্গিলকে কি চিত্তকুসারী রাহিবে, না যখন সম্ভবান করিবে?'

... বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের প্রতি ঈর্ষ্য কটাক্ত কথিয়া বলিলেন, 'মেয়েদের চিত্তকুসারী রাহিবে কেন? যদি এমনই ঈর্ষার যে জ্ঞানবানের ঘর ভিন্ন আর মেয়েদের পাথ না ছুটে তবে বহনই কন্যা সম্ভবান কবি কারণ জ্ঞানবানরা ত নরক যকন : নরক যকন অংশেকা আসল বহনই ডাল। আর বিদ্যাবিকার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে সমাজের চিত্তের একবার বিশেষ রূপে প্রতিষ্ঠা ইয়া দেখুন, এই সনাতন হিন্দুসমাজে বিদ্যাবিকার প্রচলিত না থাকায় কত

অন্যায় কত কল্যাণের ঘটিতেছে, কত ভ্রমহতা বাল পাণ্ডিত্যে সমাজমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণেরা সন্তোষ পৈতা দ্বিভাষা অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া গেলেন; বলিলেন - 'তুমি নিপাত যাও, তোমার বংশ নিপাত হাজক; অভিসম্পাতের ফল কালে চলিবেই চলিবে'।

[বীরা হরত লেখকতৃত]

এই কবিদ্বির মধ্যে নিয়ে বিদ্যাসাগরের এবং সমাজপতিদের সুপরিচিত রূপই দেখতে পাই আমরা, সুতরাং আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু আশ্চর্য্য হই যখন সেই বিদ্যাসাগরের নাতনি এই ঘটনাটিকে বিদ্যাসাগরের চলিতের দ্বিতীয় কালে প্রকাশ করিতে চান। কুলীন ব্রাহ্মণদের মুখেও ওপর এমন উত্তরাভ্যে কথা বলটা নাকি বিদ্যাসাগরের অন্যায় হয়েছিল। অথচ ঐভাবে অভিলাপ বেওয়াটা কুলীন ব্রাহ্মণদের নাকি অন্যায় হয়নি। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণদের বেওয়া সেই 'অভিসম্পাত' নাকি সত্যিই লেগেছিল বিদ্যাসাগরের কাছে। কখনো তেঁা না, বিদ্যাসাগরকেই নাকি! তিনি নিজে কুড়ি-একশ বছর বয়সে বিধবা হন। ইতিহাসের কী অদ্ভুত পরিহাস!

'নিরীহ শরণাগত জীবাবস্থার সমুদ্রে উচ্ছেদ'

কিন্তু কবিদ্বি এখনই শেষ হলে না। তেনে মানবদশিয়ারে ওপর তাঁর এমন ভাষ্যক্রম, তা আরো সবিস্তার কল্যাণ করায়ন সরস্বতী। তিনি লিখেছেন, 'অতএব একটি নিরীহ শরণাগত জীবাবস্থার সমুদ্রে উচ্ছেদ সাধন অতি গুরুতর পাপ, মহাপাপ।' সেবা বাক, ব্যাপারটা কী।

আমরা যেখনি, সূর্য্যভাসার অভিকারকে বিদ্যাসাগরের পূর্ব পক্ষ হয়েছিল। শুধু সুপীকিত বসেই নয়, সংও পরিচরিত করলেও তাই জানাই করার পাশাপাশি তিনি সূর্য্যভাসারের দ্বারা যুলের শিক্ষকতার কাজ ঘটিতে প্রথমে মেট্রোপলিটান যুলের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। সূর্য্যভাসার তাঁর এওই বিশ্বাসভাষন হয়ে ওঠেন যে অবশেষে ১৮৮২ সালে তাঁকে মেট্রোপলিটান কলেজ ও কুলচলির সেক্রেটারি করে দেন।

এরূপে সূর্য্যভাসারের ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিসাবের দ্বারা দু'তিন হাজার টাকা পরিশোধ দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করেন বিদ্যাসাগর। এই হল সরস্বতী কবিতা সেই 'অতএব একটি নিরীহ শরণাগত জীবাবস্থার সমুদ্রে উচ্ছেদ সাধন।' মেট্রোপলিটান থেকে বরখাস্ত করার পরও কিন্তু সূর্য্যভাসারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্কচ্ছেদ হয়নি। বস্তুত্বাণানের বাড়িতে যাওয়াও বন্ধ হয়নি। অসুস্থ বিদ্যাসাগরকে অনেক সেবাবৃত্তও তিনি করেন। সম্পর্কচ্ছেদ হয় বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর (১৮৯০) পর। তখন সূর্য্যভাসার সপরিবারে মুর্শিাবাদের বাসভূমিতে পৈতৃক বাড়িতে ছিলেন। সেখানে জমিদার শ্রীধর সিংহের সেক্রেটারি মাঝাকা এক চাকরি দেন। ১৯২৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেট্রোপলিটান স্কুলের সেক্রেটারির মতো অত বড়ো কাজ ছিল যাওয়ার দুশে হ'লবতই তিনি তুলতে পারেননি। নিশ্চয়ই তাঁর পরিবারের মধ্যেও এই ঘটনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সেই প্রতিক্রিয়াই তাঁকে আশঙ্কিত করে হাজক তাঁর মেরে সরস্বতীকে এই লেখার মধ্যে। সেই তির্য্যতা এতদূর গিয়েছিল যে বিদ্যাসাগরের

বিশ্বখ্যাতী কৃপণ নারায়ণের কৃকর্মওলোর দ্বারাও সরস্বতী বিদ্যাসাগরের ওপর চাপিয়েছেন। উইলসন নারায়ণ কহাটুপি করে এই নারায়ণজিই বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি হারিতে নেয়, যুক্তি দেন বিদ্যাসাগরের মেয়েরা। এই ঘটনা বিবৃত করে সরস্বতী লিখেছেন : 'যে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে শিশুকর্মের নারায়ণবাসুর প্রবেশবিকার পর্য্যন্ত ছিল না, এবং কল্যাণী যে বাড়িতে সন্তোষকল্যাণী ছিলেন, সেই বাড়িতে শিশুকর্মী কল্যাণীর [অর্থাৎ সরস্বতীর মার] প্রসবকালেও তাঁহার অবস্থিতিব হুইন হইল না। মঙ্গলারের বিচিত্র গতি। ইহাতে ইংরাজীতে Irony of fate বলা হইয়া থাকে।'

এব পরের অংশটুকু বড়োই কেননাগত। স্নোহ, হুতাশার অল্প সরস্বতী দ্বিবিদে আমন সেইসব কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের কথা, যাঁরা 'অভিসম্পাত' দিয়েছিলেন যে বিদ্যাসাগর নির্বংশ হবেন।

একশে অভিসম্পাতের ফল কালে কিনা তাহার বিচার আমরা কবিততে চাই না। তবে এটি ভ্রম সত্য যে ব্যক্তিবিশেষের কার্য বা বাক্য দ্বারা যদি ব্যক্তিবিশেষের হ্রাসে বিশেষ আঘাত দেওয়া যায় ... তাহার ফল সন্দেহের ফলিবেই ফলিবে। এখন আমার মাতামহের [বিদ্যাসাগরের] বংশাবলী পরিণাম দুটো পক্ষই বুঝা কইতেছে যে এই কণ অভিলাপ। উপযুক্ত প্রাচলিত ব্যতীত এ বংশের পরিচয় নাই।

উপসাহায্য

আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম একটা আশঙ্কার কথা বলে : বিদ্যাসাগর সমাজে তাঁর নাতনির দ্বিবারমুখ লেখা থেকে কি প্রমাণিত হবে যে আরো অনেক মহাপুরুষের মতো তিনিও ভ্রমসে দুটো আশা করা ভ্রম আশন করলেন, যার এক মহলে আশ্রয় আর মূল্যবোধের কথা, অন্যদিকে শুধুই ব্যক্তিগত আশের গোছানো? কিন্তু কার্যত আমরা যা দেখলাম তা ঠিক এর বিপরীত। একজন মানুষ তাঁর নিজের একমাত্র ছেলেকে লিখিতভাবে ত্যাগপত্র বলে ঘোষণা করেছেন। সে অর্থ, মাতাল, দুশ্চরিত্র ও কল্যাণী বলে। তার বলে একটা সং, সুপীকিত বৃকমকে তার সম্মতি নিয়ে, সমাজপতিদের সঙ্গে লড়াই করে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিয়ে নিজের ছেলের মতোই তার ওপর নির্ভর করতে থাকেন। বড়বড়ো মেট্রোপলিটান সংহা চালাবার ভার তুলে দেন সেই পুত্রকুল্য আমরদের হাতে। কিন্তু তারপর যখন একজন জানা বলে সেই লোকটি অর্থ, টাকাপত্রসা ভ্রমকণের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, তখনই তাকে বরখাস্ত করলেন। তখন তাঁর শেষ বয়স, পতীর ও মন অত্যন্ত অকস্ম। তবু যেটা উচিত মনে করেছেন সেটা করতে পিচ্-না হননি। এমনকি নিজের মেয়ের অসুখিবে হতে পারে ভেবেও শিথিয়ে আসেননি।

অর্থাৎ ক্ষুদ্র বার্ধ নয়, সং খালার মূল্যবোধই তাঁকে শেষ দিন পর্য্যন্ত চালিত করেছে। পাত্রিবিক্রি নানারকম ঘোড়াঘেঁড়ি, হাজার লোকের নানারকম ন্যাশ-অন্যাশ দাবি, চরম নিঃসমতা, অসুখতা এসব কিছুই তাঁকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাই আমাদের আশা অমূলক। নতুন-জানা শুধু বিদ্যাসাগরের গায়ে কাঁসা হুঁড়তে তো পারিইনি, উপরন্তু আরো মহান করে তুলেছে তাঁর ডায়েরি।

ক্লাশরুম এবং শিক্ষক

বিদ্যম মুখোপাধ্যায়

স্বাক্ষর উচ্চশিক্ষার প্রাধান্য — শিক্ষকরা ক্লাসরুমে গিয়ে যান, নিয়মিত ক্লাস নিন। ... সাধু, সাধু! এমনটাই তো চাই! তরুণের অবস্থা নাকি সৃষ্টি হয়েছে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন না, চুটিয়ে হাইডেট টিউশন করছেন। লোকে ছা ছা করছে। এই অবস্থা আর বেশে নেওড়া যায় না। কাজরি সংস্কার এবং বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগুলি উঠে পড়ে লেগেছে সারা উচ্চশিক্ষা দফতরের ডাবং বেঞ্চা কেলেঙ্কারি ঠাঁস করবে বলে। সুতরাং নড়ে চড়ে বসা।

সম্প্রতি স্বাক্ষর উচ্চশিক্ষা সংসদ উচ্চশিক্ষারক্ষী সংসদ এক মিটিংয়ে বসেছিলেন। সেখানে যুক্তিসঙ্গতভাবে আলোচিত হয় যে এরাছোর কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ক্লাসের সংখ্যা দিন দিন কমছে। ক্লাসের বাইরে সমান্তরাল 'ক্লাসের' ব্যবস্থা শিক্ষার মূল স্রোতকে ক্রমশ কীর্ণ করছে। বিভিন্ন সময়ে সরকারি দ্বাবে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে নানা ব্যবস্থার কথা কলা হলো কার্যত জায়ে পরিণতির তেমন হেরফের হয়নি। তাই এখন থেকে কোন শিক্ষকের কটা ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল এবং কটা ট্রিনি নিয়রেনে, প্রতি মাসে তার হিসেব কুসিয়ে নেওয়া হবে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিস বোর্ডে। ছাত্র-অভিভাবক যা কাইয়ের যে কেউ তা দেখতে পাবেন। মাননীয় মন্ত্রী আশা যে এর ফলে 'ক্লাস না করা' শিক্ষকের ওপর 'চাপ পড়বে' তাঁরা বিধেয়ের জড়নায় কষ্ট পাবেন। ফলে তাঁরা ক্লাস নিতে বাধ্য হবেন। নোটিস বোর্ডে যে পরিসংখ্যান কোশানো হবে তাতে কলেজের অধ্যক্ষ বা ডায়রেক্টর অধ্যক্ষ স্বাক্ষর করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে করবেন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান। এই পরিসংখ্যানের প্রতিমূলি উচ্চ শিক্ষা সংসদকেও পাঠ্যতে হবে। বিধানসভায়ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী এমন কথাই জানিয়েছেন।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ক্রৌরিক শিক্ষক যে নিয়মিত ক্লাস নেন না, এই সত্যকে অস্বীকার করে যে কোন আশঙ্ক? একথাও সত্যি যে মূলত এগারশেই হাইডেট টিউশনের এমন রমরমা বাজার। বহু শিক্ষকেই হাইডেট টিউশনের ব্যাপারে যতটা আগ্রহী তার সিকিভাগও ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে নয়। যে সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থার কথা কলা হচ্ছে তা সর্বাংশে সত্যি। যদিও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াই পড়িয়ে পড়িয়ে বদার ছাড়পত্র পাওয়ার একটি সংস্থা আছে। ক্লাসরুম বন্ধনি আসেই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে। এই চিত্র কিন্তু একদিনে সৃষ্টি হয়নি। কেন এমনটা ঘটল তা কিছুটা আলোচনা অপেক্ষা রাখে।

ব্যবস্ট সরকার কর্মতার আসার পর যে কটি দফতরের ওপর পরিবেশ ওচ্চ আক্রোশ করেছিল, শিক্ষা দফতর সম্ভবত সেই

ডালকার শীর্ষে। এর কারণও ছিল। শিক্ষকদের চান পরিচিতি আছে, ছাত্র-ছাত্রী মহলে প্রভাব এবং সমাজিক গ্রুপনেতৃত্ব অংশিতভাবে হলো আছে। চোটের বাজমীতিতে এগুলি প্রভাব প্রচলিত। বিশেষত গুণাকলে একজন প্রাথমিক শিক্ষকও ফরটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন অতীত ৫০ বছর আগে। চোটের বাজমীতিতে তখন তেমন সর্বস্বত্বের শিক্ষকদের ব্যবহার করার এক সুপ্রতিকল্পনা বর্জিত হল এবং তা যাপন যাপন অতীত সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগের কাজও শুরু হয়ে গেল। প্রাথমিক পরে ব্যাপারটা চলছিল গোপনে, আড়ালে, কিন্তু বামস্ত্রের শাসন যতই দীর্ঘায়িত হয়েছে ততই ব্যাপারটি প্রকাশ্য এবং উদ্ভূত হয়েছে। একধরনের বৈশিষ্ট্যবাহক; আমাদেশ কে কী করবে?' তাই উপাচার্য থেকে ক্যান্সার নিয়োগ পর্যন্ত সবকিছুই হা পাটির অনুসরণে। ছাত্র-সংসদ নির্বাচন স্থায়ী পণ্ডি-অফিসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠনগুলিতে বাজমীতিকভাবে কৃতিত্ব করে বলভাত্রের একবিপদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমগ্র স্তরে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন মোতাবেক শুমর সূত্রমতাবে সুবিদায়। তাই এটাইও বিশ্বদ্বারা নেই, অশান্তি নেই। বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা, যথা কর্মিটি কিংবা কমিশনের সদস্যপদ, প্রতিমিহি, বিশেষ ভ্রমণ, পঞ্চায়েত কিংবা পুরস্কার প্রদীপন ইত্যাদি ইত্যাদির মাধ্যমে সমগ্র সিস্টেমটিকে নিবৃত্ত করে তোলা সম্ভব হয়েছে। এই সামগ্রিক বাজমীতিকরণের প্রকাশ মণ্ডে মাতে উদ্ভট রূপে প্রকাশিত হয়। তাই ওজবাস্ট যোগদার দাবার বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রতিবাদ জানিয়ে শিক্ষকরা রাতপথে সুবিদায় মিছিল করেন, পথ সভা, জনসভা করেন, বৃগ্ণতদের জন্য অর্থসংগ্রহ করা হয়, বিস্তার জানিয়ে নিশা প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু বেশপূর, মোটো আচারিয়া, সূতপূর ইত্যাদি ইস্যুতে তাঁরা আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। তিথারি পাসোয়ান কিংবা মনীষা মুখোপাধ্যায়ের অন্তর্ধান বিবাহে টাইমের মুখ থেকে একটি ব্যাকও উজারিত হয় না। আমাদেশগোল কোনও ওচ্চদুই পাঠ না। যামবপূর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনবত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশের নির্মম লাঠিচালনার প্রতিবাদ তো মূলের কথা, নিশা করার মত নানতর মানবিকবোধও অনুপ্রস্থিত।

অকল্প একথা থাকলে ভুল হবে যে এরাছোর সমগ্র শিক্ষকই মনে রাখে প্রকৃত আর্থিকতার সঙ্গে এই পাঠ্যক্রমের সমর্থন করেন, সবাই এক পথেই পথিক। বহু শিক্ষকেই আহ্বান ঘাঁরা এই অগুণ দলভাত্রের, এই বৈরভাত্রিক ক্রিয়াকলাপের সমর্থক নয়। কিন্তু টাইমের অবস্থা শোচনীয়। ঘাঁরা শষ্টভাত্রের একবিকল্প প্রতিবাদ করেন টাইমের বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়, তেজ বিশেষ

লাফা, এমনকী দার্শনিক নিগ্রের মত ঘটনাও ঘটে যায়, কর্মক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরেও। একটি সিস্টেমের বিস্তারিত প্রতিবাদ কিংবা বিরোধিতা কর্তৃত্ব সফল হতে পারে যদি হয়; সরকার এই সিস্টেমের সমর্থক হয়। অন্যদিকে ধার্মা ভ্রষ্টতা সরকার নয়, তাঁরা সবকিছু সেক্ষেত্রেও শীতল থাকতেই চেষ্টা বলেই মনে করেন। এ এক ধরনের যোঝা-কালা হয়ে থাকে। সিস্টেম এভাবেই আরও পল্লিশাণী হয়ে উঠেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই দার্শনিক দলভ্রমের ফলশ্রুতি কমনাত্রিক। নিম্নবর্ণিতভাবে সেগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে :

ক) বাস্তবজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত শিক্ষকরা অর্থাৎ বাস্তবজীবিত হার্মে যেসব শিক্ষককে ব্যবহার করা হচ্ছে তাঁরা পূর্ণমাত্রায় সুযোগ নিতে শুরু করেছেন। বাস্তবজীবিত হার্ম পূরণ করাই তাঁদের এক আর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। সমস্তভাবেই উপেক্ষিত হলে ক্লাসরুম। অর্থাৎ পঠন-পাঠন এবং এর সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি বোণ হয়ে উঠেছে।

খ) সুযোগ-সুবিধার সোডে দাসত্ব শব্দের শিবিরে ভিত্তি বাড়তে লাগল, ক্লাসরুম আরও উপেক্ষিত হতে লাগল।

গ) ক্লাসরুম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল। যে কটি ক্লাস হয়, তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার ক্রমশই কমেই হতে শুরু করল।

ঘ) সমাজবাস ক্লাসের ব্যবস্থা অর্থাৎ গ্রাইডেট টিউশনির ব্যবস্থা ক্রমশই বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত রূপ নিল। ক্লাসরুম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না এক্ষেত্রে গ্রাইডেট টিউশনি তাদের একমাত্র ভরসা।

ঙ) দারিদ্রবৃত্তি নিষ্ঠাবান শিক্ষকরাও ক্রমশই হতাশ হয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়তে লাগলেন। এর পান্যপানি কীভাবে শিক্ষকদের ব্যয় বিস্তারিত নিরন্তর সহ্য করতে করতে তাঁরাও একসময় নির্লিপ্ত এবং উদাসীন হয়ে পড়লেন। ক্লাসরুম আরও উপেক্ষিত হল। ছাত্র-শিক্ষক দূরত্ব আরও বাড়তে লাগল।

এভাবেই ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মমানে ধার্ম্য এক অচলপ্রকৃতি। উচ্চশিক্ষা সনদের যে উল্লোখ গ্রহণ করতে চলেছেন তার দ্বারা পরিস্থিতির যে বিপুলতার উদ্ভবিত হবে না, তা হালকা করে বলে দেওয়া যায়। কারণ —

১) এর ফলে ‘যাত্রা কলমে’ ক্লাস হলোও বাড়তে হবে না, অর্থাৎ রেজিস্ট্রারে প্রমাণ থাকবে শিক্ষক ক্লাস নিয়েছেন, যদিও বাস্তবে যাটো ক্লাস হয়নি। অন্যভাবে ‘দু নখরী’ তীব্রভাবে বাড়বে। কাগজপত্রে সবকিছুই ঠিকঠাক থাকবে কিন্তু বাস্তব হবে ভিন্ন।

২) এই দূনখরীর বিস্তারিত কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়াও কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক দুজনেই তো পাঠের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। দুজনেই জানে সাক্ষ্য ঘটে পাঠি প্রতিদেব বাবাশায়। কে নেবে কার বিস্তারিত ব্যবস্থা? সম্ভবত এই কারণেই ক্লাস না নেওয়া শিক্ষকদের বিস্তারিত ‘উপদ্রুত ব্যবস্থা’ নেওয়ার কথা একমাত্রের জন্যও সরকার মুখে আনেনি।

৩) এই দূনখরীর বিস্তারিত ছাত্র-ছাত্রীরা সোচ্চার হবে এমনটা আশা করাও বাস্তবতা নয়। কারণ ছাত্র-ছাত্রীরাও জানে যে এইসব ক্লাস না নেওয়া বেশগোরা শিক্ষকরা যথেষ্ট প্রভাবশালী হওয়ার সুযোগ তাঁদের হাত কতদূর পক্ষ। প্রতি করার যথেষ্ট ক্ষমতা তাঁরা রাখেন, এবং প্রয়োজনে করবেও থাকেন। তাছাড়া অন্যদের বিস্তারিত প্রতিবাদ করতে গেলে যে সাহসী লড়াই মনোভাব থাকা প্রয়োজন একশালের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তা অনুপস্থিত। অবশ্য এর কারণও আছে বিগত ৩০ বছরেও একটানা কর্তৃত্বের সুযোগ শাসক গোষ্ঠী একাত্তার সিংহভাগ মানুষদের মেরুপন্থীনে পরিণত করেছে, ছাত্রছাত্রীরাও এর ব্যতিক্রম নয়।

রাজ্য সরকারের তরফে এই উল্লোখকে তাই হাস্যকর করার বোধিত কিছু বলা হয় না। ইতিপূর্বে বহু দূনখরিতম্ভ এবং পতিশীল প্রদানের হার্মে বাস্তবসরকার অনেক ইতিবাচক করেছে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কাজের কাজ কিছু হয়নি, অবস্থার কথামাত্র পরিবর্তন হয়নি। সরকারি কর্মীদের কর্মসম্প্রতি ফেরানোর লক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর প্রোগন, ‘এখনই কর্মস’। কর্মসম্প্রতির আসৌ উদ্ভবিত হয়েছে এমন কথা কোনো সুস্থ বুদ্ধির লোকই বলবে না। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের গ্রাইডেট প্রাকটিস বন্ধ করা নিয়ে অনেক নাটক হল, ফল লভ্যতা। ফুল, ফলসে, শিক্ষকদের গ্রাইডেট টিউশন বন্ধ করার রত ঘমতি। নিট ফল কাঁচকলা। এবার শিক্ষকদের বিবেকের কাছে আবেদন, যে সমস্ত শিক্ষক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে না এসেও ‘উপস্থিত’ থাকেন, কটন মোতাবেক নির্ধারিত ক্লাসের সময় বাড়িতে বা কোটিং সেটরে গ্রাইডেট পড়ান, কিংবা পাঠের কাজে ব্যস্ত থাকেন, বিবেক বলে তাঁদের কোনো কিছু কি অবশিষ্ট আছে? এদের বিবেক জাগ্রত করে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আর পাথরে পথকূল ফোটানোর দায়না কী সমর্থনরত্বক হয়?

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে শিক্ষা সৌক্য এখনও টিকে আছে তা এক শ্রেণীর দারিদ্রজন-সম্পন্ন সং শিক্ষকদের জন্যই আছে। এরা সংখ্যার লম্বু, সমর্থন নেই। কিন্তু এরা চিরকালই ছিলেন, আছেন, দল, সরকার, পতাকার হাং কোনো কিছুই সঙ্গেই এদের শিক্ষকতার সংযোগ নেই। কিন্তু এদেরও কি আজকাল ভালো থাকতে দেওয়া হয়? স্বাধীনভাবে শিক্ষাব্যবস্থার দারিদ্রপালনে সম্ভাব্য সুযোগ সেওয়া হয়?

কর্ণাটো মেজাজ

তপেন দাস

কিষায়নের বাজারে এ এক বিশ্ববকস কিষ : কর্ণাটো কিষ। কর্ণাটো সাংকৃতিই এখন যেন কর্ণকৃতির সেবা চিহ্ন। অফিসে চুকলেই দুকণ্ড কেতা। ঠাটকাট অটোপাট পাটপাট পরিচয়। ঘরের ছেলে ডালভাত খেয়ে বুপি নয়। চান্টে ফুড অর জাক ফুডে মহাতৃতির সন্ধান করে চেয়ে। এই প্রজন্মের এখন ভবসা হল কর্ণাটো সংকৃতি। মেয়েদের পোশাকে হালফাশান, হালকা মেকআপ, তবু বিউটি টিপস-এর জন্য প্যানন থালা চাই। হালফাশান করতে মহাতৃতিময় ইঁকে দেওয়া জীবনের স্বাধীনতা যেন উছলে ওঠে। ছেলেদের পোশাকে কখনো জোলাজোলা টোলমটোলা, আবার কখনো টাটকা টাইট ম্যাট টিউনিশের কটকা। বাড়ি আবার পাবিকিশুর, কিন্তু অফিসে চুকলে কাসিডর্মিজ। ঘরের ভেতর নিশই হাতে পাঠি, কিন্তু অফিসে এলেই করককে কিষ।

ওষু অফিস কেন, এখন কর্ণাটোের মায়া সর্বত্রই ওটিওটি ছাড়া বিস্তার করেছে। আশেপাশে ডোবা-নর্মা-কল্লারের পাহাড় কিছুটা কাকতাই পারে — কিন্তু একটা কর্ণাটো অফিসের পাশেই ফাস্ট ফুডের রেস্তোরাঁ, সাইবার ক্যাফে, একটু দূরেই মন্টিগের, ডেনবিকে গেলেই আফোজাফান — জলতরঙ্গ যম্মা সেলেক্স কাগজার। অর্থাৎ শহরের মধ্যে সী-কিন কলচার। সবকিছুই সাজানো থাকছে। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলেন ‘কর্ণাটো চেন’। একহাতে ঢাকা রোজগার করে, আর এক হাতে ঢালে। মন্টিগেই কেটে বাক মিন। লাইফ ইচ্ছ এ ফান। জাক বলছি কর্ণাটো চেন, ডাকে কেউ বলেন কর্ণাটো ফাঁস। পারলগিক বণিভা আর ভাংকলিক মুনাকার একটা ছাব গড়ে জোলা হচ্ছে যেন। এখনও পর্যন্ত আমরা ফুডপার্ক, ফুডকোর্ট, আর ওমিকে হেল্পে সিটির মধ্যেই আছি। কদিন পরেই পুরো শহরটাই হয়ে যাবে কান সিটি। থুক থুক পানের শিক ফেলা তেবানিকুলের বাজার আরে আরে ছুটিয়ে যাবে।

এই কর্ণাটো সংকৃতির কণ্ঠা বিশেষ করে মনে হওয়ার একটা কারণ আছে। কলকাতায় মুক্তি পাওয়া একটা বাংলা ছবি বোকার জন্য নাকি কিছুদিন আগে দর্শকদের ভিড় উপভা পড়েছিল। যারা ছবি বোকার জন্য ভিড় করেছিল, তার বেশির ভাগই নাকি কর্ণাটো সংস্থার কর্মী। স্টলফোর্ড স্ট্রোর ফাইভের বিভিন্ন শাহ্‌র তরল তরুনীরে ভিড়ই ছিল বেশি। এতে নাকি অনেক কর্ণাটো সংস্থার মালিকও বুপি। তাদের মনে যত্নেই ছেলেমেয়েরা ঠিক লাইনেই আছে। কোনো কোনো সংস্থা নাকি ওই ছবির একগুচ্ছ ট্রিকি ক্রিনে কবিসের উইচ্ছ এন্ড শিফট বোকার কথাও ভেবেছে।

কেন, এই ভিড় কেন? বলিউডের ছবিতে ফেডারিট স্টারের কাসিট ছলে ভিড় থাকেই আমরা জানি। কিন্তু হঠাৎ কলকাতার ছবির এন্ড কম্মা? — প্যানশেনে পানসে ন্যাকান্যাকা হাকগেরু ছবি নাকি এটা নয়। কিন্তু কর্ণাটো প্রজন্মকে মাত করছে কী করে? ছবিতে নাকি ইউনিক সেলিং পয়েন্ট, অর্থাৎ ইউ এস পি প্রধানত দুটো। কী সেই দুটো?

ছবির চরিত্ররা শহুরে উচ্চ-মধ্যবিত্ত। তাদের খুজানো অনাকারী ভারতীয়ের মেজাজ। কর্ণাটো সংস্থায় চুকলেই আবেগভাণে পানপোট টেরি করে রাখতে হয়। কলন কোথায় ছুটিতে হবে কিছু লো ময়না। আর পাক্ষরমেজ রেকর্ড যে একজনকে কোথায় তুলে দেবে, সে নিশ্চয়ও জানেনা। একমুখে চাকরিতে চুকলে স্যাটারি হাইকে দানা সকলর ডোব টাটকায়ে। একেই বলে কম্পিউটার ট্রাইবল। কাসিট ফর ইওগারসকে। অথচিয়ার ইউ ডেলিভার, অর ইউ শো। হা বুনি শাও, নব বুনি মাও। এইসব কাও বুঝ ছাব আবেগে ঠাস ঠাস হয়ে বিকটিতে। ছবির চরিত্ররা কর্ণাটো কাঙালির মতো একেবা: যত্নে বিদেশি পানাপান করছে। আবার সেলে ফিরে আসার সময় কিছুটা ইমোশনাল টায়ও থাকছে। বন্ধু আছে, বন্ধু বই আছে, নিজেরও সুইট হাট বই আছে। পরীতে বন্ধু পতীর সঙ্গে নাচ আছে। সন্তানের জন্য অলংকরা আর — শিশুমেলেব কেনাকটাং আর কবি শিল্পীরের রচনা থেকে উত্থান উচ্ছৃতির মাঝে সেই অলংকরা উবে যাওয়াও আছে। ছবিতে বিনেপি বাজার সঙ্গে কলকাতার রাস্তা আর ফুটপাডকে মেলাতেই হবে — তাই ক্যামেরা মেহো বোত, ছিটাই থগপি সেতু, ছাইওভারের বইলে যেতে পারেনা। ছিটাইত, আবে ইংরেজি আবে বাংলায় ছবির সংশ্লিষ্ট রাস। আরও আছে বন্ধুর কটকে নিয়ে অফিসিয়াল ট্রায়ে বেততে গিয়েও হঠাৎই বন্ধুটির হাতাবিক মুক্তা হয় — তারপর এই গোপন প্রেমের স্বপনপূর ঘনিষ হীরে খোলস ছাড়তে থাকে — তখন মেসে ব্রঙ্গ মাফনে আসে — তা ফুংকারে উড়িয়ে ওষু যাওয়া আসা আর মোতে ভান্ডার হাতেই জীবন নয়, জীবন মোতাই হয়ে ওঠে মুখ। জীবনকে কোনো ব্রঙ্গ কোরো না, ওষু ভেসে যাও। মজে কাও। মন্টিগেই যিটি। জীবন নিয়ে উত্তরণ উৎকণ্ঠা যতই থাক, প্রমথি আবেগ আর মনিকৃতা কর্ণাটো কর্তব্যকে যে ব্রিটি মেহ। কারণ কর্ণাটো সংস্থায় কর্মীর মেহা, প্রমথীনতা আর উৎপাদনশীলতাই মালিকের মুনাকার কড় প্যারটি।

ছবিতে মন মজানোর দুটি কারণের মধ্যে একটি হলই দিচ্ছি, চরিত্ররা শহুরে উচ্চ মধ্যবিত্ত। সহজেই মোকা যায়, ছবিটা শহুরেবে বেশি মন্টিগেছে। কর্ণাটো সংস্থায় ঘাঁরা কাঙ্ক্ষন, ঠাণ্ডা পল্লর চিকি, কিন্তু সকাই কি উচ্চ মধ্যবিত্ত? আউটমোনিং, কনট্রোট বাইটিং, টেলিফোনে অবিরত ড্রায়েস্টের সঙ্গে কথা বলা — এই কাজের বিনিময়ে প্রান্তিকোণে কণ্ঠটা। পাঁচ থেকে সাত/আট হাজার টাকা। হাতকাড়া শাটনি, শায় বিকটিহীন পরিধান, গড়ে করো ঘণ্টা। আট ঘণ্টা কাজের দায়। মে বিবল — সবই যেন ভাংপার্থ হারানো। তার ওপর আই টি হাবে ট্রেন্ড ইউনিয়ন আশোলনের সেই স্বয়মরা আর মেহা যায়না। আউটস্ট, প্রডাকশন, শ্রুটি, আগ্রেসিভ মার্কেটিং — এই সব শব্দের মধ্যেই কর্ণাটোের বিস্তার।

নয়া যুবক যুবতী পড়াতোনা শেষ করতে না করতেই কিছু একটাতে পাহাছে। এই টাকটাই বা শেষ কে? কিন্তু কম্পিউটারের সামনে টানা বসার পর ঘণ্টা, টেলিফোনে ঘাড় সোজা করে অথবা

কাঁধে ট্রেসিংয়ে ঢেপে, হাউসে বা ইন্টার্নে হাত ঢপলে থাকা অবস্থায় বিবাহবন্ধনে বাঁধের পরিপাতি ঐ! এই ট্রেসিংর ফলে এক-দু-করাইই নানা অসুখ বেধা গিয়েছে। আর কত ছেঁটে গিয়ে! কর্পোরেট হাসপাতলের কোনো কতি নই। ওমিক্রি আর এক পল নহা তরল তরুণীর লগিন পড়ে ফাটে। ফলে কর্পোরেট হাসপাতলের কখনোই কোনো দায়ভার নিতে হচ্ছে না। কিন্তু এই বিশেষ ছবি দেখার জন্য কর্পোরেট মেডিকেল কুশলতার দান দিয়ে

খাঁর খালটিয়েছে জড়ি করছেন — তাঁরা তো তাৎকালিক ... যম্বে বিভোব। কিন্তু শহুরের এই সীমাপ্রস্তুত ছাড়িয়ে যে লাক লাক কোটি কোটি বেকার — তাঁরা তো এই কর্পোরেট সংস্কৃতির ধরা ছোঁয়ার নথিবে। তদু দাবিত্রা আর নিবন্ধনতার সংসারে এর ডেউ কি লাগে না? এইসব মানুষের ক্ষেত্রে বক্তব্য থেকে অনেক দূরে দাবিয়ে যেড়াচ্ছে কর্পোরেট মেডিকেল বিভাজন বেধা কখনোই দীর্ঘ হচ্ছে!

প্রযুক্তির হাত ধরে—এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায়

অমিত চৌধুরী

“ভাষা”: সাধারণ লেখালেখি থেকে চম্পাখানার বণ্ডা—কম্পিউটারের কারিগর অনেক বছর ধরেই চলে। নতুন কথা হলো ভারতীয় ভাষার বৈচিত্র্যময় ভগ্নতে কম্পিউটারের পর্বতী অনুপ্রবেশ। আর, এই প্রযুক্তির হাতে ধরে এত ভাষা থেকে অন্যভাষায় চটভঙ্গি অনুবাদের নানান প্রচেষ্টা! বিশ্বদ্রুতে ব্যবহারিক বিবৃতি পুঁজিতে তৎপ-প্রযুক্তির এক নতুন উদ্দেশ্যের নাম “লোকালাইজেশন” (“Localisation”)। লোকালাইজেশনকে মফল কবতে জোর দেওয়া হচ্ছে ভাষা-প্রযুক্তির ব্যবহারিক-গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে যন্ত্র তৈরিক অনুবাহ বা যন্ত্রের সাহায্যে অনুবাদের প্রযুক্তি-চর্চাতে সহচরতার সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে এই লেখায়।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ভাষা-নির্ভে বিশ্লেষণ বা চর্চায় ভারতীয় ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। পালিনির ব্যাকরণ খ্রিস্টপূর্ব ২২০-৪০০-এ সংকৃত ভাষা নিয়ে যে চর্চার পরিচয় দেবে—তাকে কলা যথ “লিসুয়িস্টিক” বা “ভাষা-তত্ত্বের” প্রাথমিক সুসংগঠিত রূপ, সারা পৃথিবীতেই। মনে করা হয় যে, এর বেশ কয়েকশ বছর আগে থেকেই ভারতে ব্যাকরণ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছিল। তালিল ভাষার ব্যাকরণ চর্চার প্রথম কৃত্তিত খ্রিস্টপূর্ব তিনশ শতকে টোলেক্সিকারের। এই ব্যাকরণ অজ্ঞতও মেনে চলা হয়। গ্রীক দার্শনিকরা ভাষার চরিত্র ও উৎসে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেন। এই বিতর্কের পরিচয় পাওয়া যায় স্ট্রোটার রচনায়। গ্রীক ঐতিহ্যের গুরুত্ব রোমান দার্শনিকরা গড়ে তোলেন ল্যাটিনের ব্যাকরণ। অ্যট্টোরো-উলিল শতকে ইউরোপীয় ভাববিভঙ্গা আধুনিক ভাষা-চর্চার সুপাতত ঘটান। ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হয়। উইলহেল্ম ফন হুমবোল্ট ১৮২০ সালে পর্যবেক্ষণ করে বলেন ভাষা হচ্ছে একটি “নিয়মশাসিত ব্যবস্থা” যা বুদ্ধিভিত্তিক ভাষাচর্চার আধুনিক ধারা সৃষ্টি করে। বিপত্ত দেবদ-মূল বছরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধারায় আধুনিক ভাষাচর্চা ধাপে ধাপে সন্মুখ হতে উঠছে।

ভাষার অঙ্ক, ভাষার গণনা

গণকল্প বা কম্পিউটারের সাহায্যে ভাষাচর্চা করতে হচ্ছে

প্রয়োজন ভাষার আধিকরণ বা গাণিতিক গঠন। পিথিত ভাষা তো আসলে বিশেষ পর্যায়ক্রমে সাজানো অক্ষরের ধারা, বিশেষ বিশেষ সংকেত বা চিহ্নের সংযোগে। “ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ থিয়ারি” নামে অঙ্কের একটি শাখা এখন এই ধরনের চিহ্ন সমষ্টির নানান বিন্যাস, বিশ্লেষণ করে ভাষা চর্চাকে গাণিতিক মাত্রার উন্নত করছে। সম্ভব হচ্ছে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক ধাপ বা “আলগরিথম” তৈরি করে, সফটওয়্যার রচনা করে, ভাষার গভীরে ঢুকে বিশ্লেষণ। ব্যবহৃত ভীদন থেকে নেওয়া হাজার-হাজার শব্দ বা বাক্যের ভাণ্ডার কম্পিউটারে ভরে, করপাস (Corpus) গঠন করে প্রয়োগ করা হচ্ছে বিশ্লেষণী সফটওয়্যার। উদ্ভোচিত হচ্ছে বিভিন্ন ভাষার নানান ব্যবহারিক চরিত্র। এই সব ভাষার গণনা বা কম্পিউটার তৈরিক ভাষা চর্চার একটি বিশেষ লক্ষ্য হলো—যন্ত্রের সাহায্যে অনুবাহ (Machine Aided Translation) বা যন্ত্রভিত্তিক অনুবাদের (Machine Translation) জন্য বিভিন্ন ব্যবহারিক সফটওয়্যার তৈরি করতে সাহায্য করা।

চাই, কৃত্রিম বুদ্ধি!

১৯৫০ সালে আমেরিকায় মূলত রুশিয়ান ভাষার প্রকাশিত গবেষণাপত্র সমূহকে ভাড়াভাড়ি বোকার ডাগিলেই যন্ত্রের সাহায্যে অনুবাদের প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। সেসেবে, দুই ভাড়াভাড়ি অর্থ করতে, হিসেব করতে কম্পিউটারের সাহায্য এখন প্রমাণিত, তাবা হয়েছিল, এক ভাষার শব্দ বসলে অন্য ভাষার শব্দ কিসে “যান্ত্রিক অনুবাহ” সহজেই সাফল্যের খুব সেবেই কম্পিউটারের-ই হাত ধরে। পরে, কাজে নেমে বোকা গেল যাপারটা অত সহজ নয়। এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার যান্ত্রিক অঙ্কর, শব্দ, বাক্য-গঠনে পেরিয়ে শুধু ব্যাকরণ বা অর্থ নিয়ে নয়, ব্যাকর আরো অনেক ভাবে। সম্ভ্রমে কড় জটিলতা হলো এক একটি ভাষার অজান্তত্বীয় ধরন-ধারণ ও গঠন-বৈচিত্র্যে। এছাড়া, অনেক ভাষাই বেশ সজীব এবং পরিবর্তনশীল। বিশ্লেষণের বা গবেষণারের স্বাধীন সফটওয়্যার রচনা করা ভাই অনেক পটীত চর্চা ও গাণিতিক পদ্ধতি দাবি করে। শেষ অধি কম্পিউটার বিভাজনের বিকাশমান বিশেষ একটি শাখা, “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (Artificial Intel-

ligence) সাহায্যে ভাষা-প্রযুক্তি ধীরে ধীরে কিছুটা ব্যবহারিক সফলতায় পড়ে যাচ্ছে।

কম্পিউটারকে মানুষের মতো বুদ্ধিমান করে তুলতে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও ভাবিতিক চর্চা বিভিন্ন কায়ার এগিয়েছে। কোনো গাছকে বলা হয় 'নিউরাল নেটওয়ার্ক', কাউকে বলা হয় 'ফলি সিস্টেম'। কোথাও ব্যবহার হয় 'কেস সেসড বিজমিন', কোথাও 'জেনেটিক প্রোগ্রামিং'। এভাবে মানব-মস্তিষ্কের ভাষা-কার্যের অনুকরণে বা অনুসরণে কিছু পদ্ধতি গড়ে তুলে, সফটওয়্যারে তা প্রতিস্থাপিত করে, তৈরি হয় 'কৃত্রিম বুদ্ধি'। এই বুদ্ধিই গড়ে তোলে কম্পিউটারের এক জাতীয় ব্যতিক্রম দক্ষতা। এই 'ব্যতিক্রম দক্ষতা' অনেক গবেষণা করে, কঠোর পড়িয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে—কিন্তু জুড়ে মানুষের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ব্যবহারিক আদান-প্রদানকে আরো কিছুটা সহজ ও সুবিধাজনক করে তোলার জন্য। তবে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে এই কৃত্রিম বুদ্ধিভিত্তিক দক্ষতা মানুষের নিজস্ব ভাষাগত দক্ষতার থেকে এতদূরে অন্যভাষার একটা ব্যাপার। কম্পিউটার যুগ বা ইন্টারনেট / ওয়েব যুগের অনেক ডায়ালগ সফটওয়্যারে ব্যবহৃত করতে—মানুষের তথ্য জানার, জ্ঞানচর্চার পরিধিকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিতে সফটওয়্যারভিত্তিক অনুবাদের মাধ্যমে প্রয়োগ সাধারণ পিসি ছাড়াও মোবাইল ফোন হাত-কম্পিউটার (Handheld Computer), ল্যাপ-কম্পিউটার (Laptop Computer) ইত্যাদি যারফত অধুর ভবিষ্যতে ছড়িয়ে পড়বে আমাদের চারপাশে। মস্তিষ্কারের বুদ্ধিমান মানুষ এই 'কৃত্রিম বুদ্ধি'র সফটওয়্যার যুক্ত যন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করে তখন আরো বুদ্ধিমান, কর্মদক্ষতায় হয়ে উঠবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বা প্রযুক্তি-গবেষণার অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও স্বভাষার শৈল ভাষাতে ভাষা-প্রযুক্তির প্রাথমিক চর্চা কিছু কিছুটা এগিয়েছে।

ভাষা-প্রযুক্তির চর্চার তারত

ভারত সরকারের 'বৈপ্লবিত্ব দপ্তর' (বা পরবর্তীকালে তথ্য-প্রযুক্তি দপ্তর নামে পরিচিত হয়েছে) প্রায় পনেরো বছর ধরে ভাষা-প্রযুক্তির গবেষণাকে বিশেষ মনো দিচ্ছে।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলা বাংলা সারা পৃথিবীতে অনেক ভাষাবই মূল্য দটবে। মোট ভাষার সংখ্যা ১৯০০ সালের অনুমানিক ১০,০০০ থেকে ২০০০ সালে ঠিকিয়েছে মোটামুটি ৬,৭০০। এর মধ্যে মাত্র অর্ধেক ভাষা পরবর্তী প্রজন্মকে শেখানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা কেউ কেউ অনুমান করছেন আজকের কথাভাষার নব্বই শতাংশই ২০১৯ সালে আর থাকবে না। ভাষার মৃত্যুর সাথে সাথে হারিয়ে যাচ্ছে যুগযুগান্তর ধরে গড়ে ওঠা কত সাংস্কৃতিক সম্পদ বা জ্ঞানচর্চার উত্তরাধিকার। উন্নত জীবনধারার পরিচর্যা, শিখোয়াত শেখতলির কিছু ভাষা বিশেষভাবে পরিচুত হচ্ছে। দুর্বল হচ্ছে হাতে, ওজব হাভাবে হারাতে—শেব হয়ে যাচ্ছে দুর্বল শেখের, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর হাজার-হাজার ভাষা। ২০০০ সালের হিসেব মতো—পৃথিবীতে মোট অনুবাদ হওয়াইয়ের

৮০ শতাংশ হচ্ছে চারটি ইউরোপীয় ভাষায়—ইংরেজি, ফরাসী, স্পেনীয় এবং জার্মান ভাষা। ইংরেজির পাশে উত্তারের বাড়িয়ে করে একটি তথ্য এইরকম। সত্যতায় বেশি যে সেখানকার বই প্রকাশিত হয় তা নিয়ে সমীক্ষা করে দেখা গেছে। ১৯৮০ সালে একতম প্রতি ১৪০ জনের মধ্যে ৬৪ জনের দেখান ভাষা ছিল ইংরেজি। ১৯৯৪ সালে একতম ১৪০ জনের মধ্যে ৯০ জনের ভাষা হয়েছে ইংরেজি। এই পরিবর্তিতার কারণের অবস্থা হল—১০৫ কোটির এই দেশে মাত্র ৫ শতাংশ লোক ইংরেজি ভাষায় কাজ চলাতে পারেন।

কম্পিউটার-ইন্টারনেট কাজে লাগিয়ে ই-পাঠ্যস, ই-লিঙ্গা, ই-খাড়া ইত্যাদি সারা দেশে চালু করে কোনো মূল্য শেতে ফলে—এতদূর কম্পিউটারে চাই আঞ্চলিক ভাষায় তথ্য আদান-প্রদানের ব্যাপক ব্যবস্থা। ভাষা-বৈচিত্র্যের এই দেশে সবধরনের স্বীকৃত ১৮টি প্রধান ভাষা যেমন আছে, তেমনই আছে ১০ ধরনের লিপি যা লিখনবর্তিত।

তথ্য সারণি : ভারতের ভাষা-বৈচিত্র্য

ক্রমিক সংখ্যা	ভাষার নাম	লিপি	ব্যবহারকারী
১।	হিন্দি	দেবনাগরী	৫৫.৭২ কোটি
ক্রমিক সংখ্যা	ভাষার নাম	লিপি	ব্যবহারকারী
২।	বাংলা	বাংলা	৯.৪৫ ..
৩।	মরাঠী	দেবনাগরী	৬.২৫
৪।	তামিল	তামিল	৫.৬০
৫।	তেলেগু	তেলেগু	৬.৬০
৬।	মালয়ালম	মলয়ালম	৫.০৫
৭।	কানাড়া	কানাড়া	৩.২৭
৮।	উর্দু	উর্দু	৪.৫৪
৯।	ভোজ্জনি	দেবনাগরী	২.০
১০।	মেণালি	দেবনাগরী	২.৫
১১।	ওড়িয়া	ওড়িয়া	২.৮১
১২।	অসমীয়া	অসমীয়া	১.৫১ ..
১৩।	সংস্কৃত	দেবনাগরী	০.০০৬ ..
১৪।	সিঙি	দেবনাগরী/উর্দু	০.৬ ..
১৫।	কাস্মীরি	দেবনাগরী/উর্দু	০.৪ ..
১৬।	পাঞ্জাবী	গুরুমুখী	২.৯০ ..
১৭।	মণিপূরী	মণিপূরী	১.৫ ..
১৮।	ওজরাটি	ওজরাটি	৫.১০ ..

(১৯৯১ দেশ্যাস তথ্য)

এছাড়া, ভারতীয়রা প্রায় ১৩৫০ রকম উপভাষার (dialect) কথা বলেন। একশ পনরেক এসে বিশ্ববাসী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টাটে থাকতে অথবা দেশবাসী সমাজ-সংস্কৃতির

আদান-প্রদান এগিয়ে নিয়ে যেতে—এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার বিনিময়কে প্রযুক্তির হাত ধরে সম্ভবসাধ্য করে তোলায় গুরুত্ব তাই অপরিসীম। ভাষা-প্রযুক্তির গবেষণা আজ তাই ভারতীয় ভাষার কম্পিউটার ডিজিটিক অনুবান-বস্তু অনুবাদমহাশয়ক যন্ত্র, জ্ঞান-ভাণ্ডার, পর্দা-প্রদর্শন (Screen Interface) ব্যবস্থা, অক্ষর চেনার ব্যবস্থা (Optical Character Recognition বা OCR System), অক্ষর থেকে বাচন ইত্যাদি তৈরি করতে বিশেষ উদ্যোগী বা তৎপর। ১৯৯১ থেকে ২০০১ অধি ভারত সরকার এই কাজে প্রায় ৩০ লক্ষ আমেরিকান ডলার ব্যয় করেছে। সরকারি এই বিশাল কর্মসংকল্পের বর্তমান ঘোষণামন্ত্র বা ডিপন স্টেটমেন্ট হলো “ডিজিটাল ইন্ডা-এক সবার জ্ঞান জ্ঞান।”

(Text to Speech)

অনুবাদ-প্রযুক্তির সম্ভাবন

ধর্মপ্রচার, জনসচর্চা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে এক ভাষার লোক অন্যভাষা বৃত্ততে চেষ্টায়ে জাতীয়কাল থেকেই। আধুনিককালে অনুবাদের প্রয়োজন অনেকতরপ বেড়ে গেছে—যোগাযোগ বা যাতায়াত ব্যবহার উন্নতিতে, শৈল্পিক নিষ্ঠা থেকে ওয়েবব্যবহার বিদ্যুতিতে বা প্রদর্শন, উচ্চ-শিক্ষা ও জন-শিক্ষার উন্নয়নে। অনুবাদ-প্রযুক্তির গবেষণায় যে ভারতীয় প্রকল্পগুলি গত পনেরো বছর ধরে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে লালন মাল্যায় সমল হয়েছে তা হলো, ‘আঙ্গলাভারত’ (Angla bharat) ‘অনুসারক’, ‘মাত্রা’ (Maira), ‘মন্ত্র’ (Mantra) ইত্যাদি। আঙ্গলাভারতের লক্ষ্য ইংরেজি থেকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যন্ত্রের সাহায্যে অনুবাদ (Machine aided translation); অধ্যাপক আর. এম. কে সিনহায় নেতৃত্বে এই প্রকল্প ১৯৯১ সালে কালপুর আইআইটিতে শুরু হয়। পরে, এই কাজে ইয়ারডিসি (ERA&DC) ও সিড্যাকের (CDAC) কিছু কিছু কেন্দ্রে বিশেষ বিশেষ সহযোগী তৃণিকায় যুক্ত হয়। প্রাথমিক পরে ইংরেজি থেকে হিন্দিতে—জনস্বাস্থ্য (Public health) বিষয়ক বিশেষ কেন্দ্রে ধরে অনুবাদক সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। কলকাতার যামবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিভাগে ইউজি.সি.এ (UGC) সহায়তায় জ্ঞান-চালিত (knowledge orient) উদাহরণভিত্তিক (Example based) পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অনুবাদ করা হচ্ছে—অনেক গবেষণার পর। এখানে তৈরি সফটওয়্যার যেটি যেটি প্যারাগ্রাফের ‘খবর’ (News) জাতীয় লেখা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা যাচ্ছে। দুমাইয়ের আই.আই.টিতে, ডাঙ্কিনানভুর আমা বিশ্ববিদ্যালয়ে, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ হচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকা-জাপানের চেয়ে এই জাতীয় অনুবাদ-প্রযুক্তির গবেষণায় ভারত অনেকটা পিছরে থাকলেও—কেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে চলছে এটাই আশার কথা! অনুবাদ-প্রযুক্তির কাজে যথার্থ সাফল্যের জন্য চাই NLP (Nature Language Processing) বা প্রাকৃতিক ভাষার প্রক্রিয়াকরণের বিজ্ঞানের সঙ্গে এই কাজের সঠিক সমন্বয়। আর চাই যন্ত্র করে তৈরি

করা বিভিন্ন ভাষার শব্দ বা ব্যাকরণ তথ্য-ভাণ্ডার, সমৃদ্ধ অভিধান ইত্যাদি গবেষণার মূল উপাদানসমূহ। প্রযুক্তিমূলক চর্চার পর্যায় পেরিয়ে—ভারতে অনুবাদ-প্রযুক্তির গবেষণা এখন একটু একটু করে শক্ত ভিতের ওপর সংগঠিত হচ্ছে। এইসব ভারতীয় গবেষণার ফলাফল কভিয়েন, বা কভদুর ব্যবহারে প্যাকেজ হিসেবে এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে আসবে তা অবশ্য এখনই বলা যাচ্ছে না। যথার্থ ব্যবসায়িক উদ্যোগের ওপর বা বেসরকারি প্রযুক্তি-শিল্পপতিদের সঠিক চেতনার ওপর যথেষ্ট আশাভরতা তা বেশ কিছুটা নির্ভরশীল। সরকারি গবেষণাগারের ভাষা-প্রযুক্তির সাফল্য সম্পর্কে কর্পোরেট জগতের বিশেষ আগ্রহ বা ঈর্ষাভুল আছে। শোনা যায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে বেশ কিছু এই ধরনের ভাষা-প্রযুক্তিগত নকলা বা আবিষ্কৃত তত্ত্ব কর্পোরেট জগতের বাজারমুখী প্রযুক্তি উদ্যোগে ইতিমধ্যেই অস্বীকৃত হয়ে গেছে।

শেষকথা

তথা-প্রযুক্তির সামাজিক ব্যবহার দৃঢ় বাড়বে ততই বেড়ে চলেবে ভাষা-প্রযুক্তির গুরুত্ব। অপরিশ্রুত যন্ত্রস্বরের অনেক ‘যন্ত্রণা’ কলসায় উন্নত প্রযুক্তিকে আগতভাবে করেছে মানুষের ‘শব্দ’। আবার আরো উন্নত যন্ত্র তৈরি করে, বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরি করে এগিয়েছে সমাজ। যন্ত্রের যথার্থ ব্যবহার ছাড়া ভবিষ্যতের মানবসমাজের পৃথিবীযাত্রী সভ্যতার সৃষ্টি বিকাশ ভাবাই যায়না। ভাষা-প্রযুক্তি চেষ্টা করছে যন্ত্রকে আরো মানবমুখী, আরো কাজের করে তুলতে; মানুষের সাংস্কৃতিক-সামাজিক জীবনে সংকল্পিত অনুবাদের সহজ যন্ত্র বা ব্যবস্থাগুলি উন্নয়নমুখী বাংলাদেশ সৃষ্টি করবে অনুবদ্যবিষয়ে—এ আশা আজ করা যায়। প্রসঙ্গত, প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে একটি মন্তব্যকে শব্দ করা যায় নিবন্ধটির শেষে।

“মানুষ হলো যন্ত্র, ব্যবহারকারী জন্ত। যন্ত্র ছাড়া সে কিছুই না, যন্ত্রসহ সে-সবকিছু।”

“Man is a tool-using animal. Without tools he is nothing, with tools he is all!”

Tomas Carlyle

সহায়ক লেখা/বইপত্র/তথ্যসূত্র :

- (১) কেন, কৃষ্ণ এবং কম্পিউটার—সেয়েমকাল বাল্যাকম্বার, আমন পাবলিশার (১৯৯০)
- (২) ইনডোন ইন্ডিক্স : টেকনিক ওর মেনি ইনডোন—জাভা ইন্ডিক্স শিল্পায়-অরুণাল (১৯৯৯)
- (৩) ইডিএলএস ওয়েবসাইট—www.idl.net.gov.in
- (৪) সিড্যাক ওয়েবসাইট—www.cdac.in
- (৫) সোলাইজেশন কোলস জার্নাল, মুন ২০০৯ সংখ্যা
- (৬) মেনি ইনডোন ইন ইন্ডিয়া : এ গ্রিড সার্ভে, দুর্গেশ হাও, এ. সি. এ. টি. দুয়াই

পরমাণু বিদ্যুৎ : ভালো-মন্দ বিসংবাদ

মানস প্রতিম দাস

[পাড়ার চায়ের দোকান। কেমন-তেমন নয়। নাম — 'বিশাল কাফে'।

ভেতরে জায়গার পরিমাণ অবশ্য কিংবা নয়, তবে গোটা চার-পাঁচ ঘণ্টা টেকি রাখা হয়েছে। সঙ্গে বেঞ্চি। আর রোববারের সকাল। খড়ির কীটা সবে দশটা ঘড়ি হয়েছে। চা এবং আক্যাপিলাসুদের আসার সময় এখনও হয়নি। তবে একজন ইতিমধ্যেই হাজির। সব সিটায়ার করা বসন্তবাবু। ব্যাঙার হুট হয়ে গেছে, সকালের জলখাবার হয়ে গেছে, এরপর বাড়ি থাকটা আর সমীচীন মনে করেন না তিনি। আদ্য ইত্তর কাগজখানা উটে-পাটে পড়ছেন। আর মুখস্থ হয়ে এসে বলে। শেষে সেনাকপোর দরে চোখ ফুলাচ্ছেন, এমন সময় সঞ্জয় ঢুকল। এলাকার ফুলমাস্টারকে এত সকালে বোধহয় আলা করেননি তিনি। তাই স্বাক হারে তাকালেন। মুখটা একটু ওকনো-ওকনো লাগছে সঞ্জয়ের।

বসন্ত — কি হে মাস্টার, এককম মিইয়ে পড়া চেহারা হল কেন?

সঞ্জয় — আর কলবেন না দাদা, সারা রাত্তির ঘুমই হল না।

বসন্ত — কেন কেন? ঘুমের আবার কী হল?

সঞ্জয় — না, ঘুমের কী হবে। সারা রাত্তির আঘাতের ওমিকে কয়েট ছিল না।

বসন্ত — ওঃ তাই বোলা। বিদ্যুৎ বিস্রাট।

সঞ্জয় — আর এই বিস্রাট যে কতদিন চলবে কে জানে। হায়েই লোডশেডিং।

বসন্ত — (কাগজে ঘুঁষ ডুবিয়ে রেখে) এই তো সবে শুরু। দিনে দিনে আরও বাড়বে।

সঞ্জয় — (হেসে) কাগজে সেরকম লিখেছে নাকি?

বসন্ত — না। কাগজ আর লিখবে কী! ব্যবস্থা তো তোমরাই করছ।

সঞ্জয় — যাঃ বাবা। এর মধ্যে আবার আমরাত কোথেকে এলাম। কী বলছেন একটু খোঁসসা করুন তো। স্বপন, দুটো লিটার রে।

বসন্ত — (কাগজ ভাঁজ করে রেখে) তোমরাই তো নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে দেখে না বলছ। কিছুটা তোবে আসবে কোথেকে কলতে পারো?

সঞ্জয় — আচ্ছ, এই কথা? ওই পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের কথা কলবে। ওটা তো আটকোতেই হবে।

বসন্ত — কাস! তাহলে থাকো বিভিন্ন রকমী নিয়ে।

সঞ্জয় — বসন্তদর, এই আপনাদের মত কিছু মানুষ বুঝতেই চান না বিপদটা। জানেন, সারা পৃথিবী থেকে আর পরমাণু চুলি বিদ্যার করে সেওয়া হচ্ছে। সেই বিপজ্জনক জিনিস আপনারা সেবে ঘরে তুলছেন।

বসন্ত — এসব তোমাদের কে দেখার বল তো?

সঞ্জয় — কেন এওতো কি মিথো কথা?

বসন্ত — তা নয় তো কী? প্রোকাল ওয়ার্লি আর পলি যোগেনের সমস্যা, এই দুইয়ের মাজিচ চাপে আর অনুর কায়গার পরমাণু চুলিকে তেঁকে অনাতে হচ্ছে, জানো।

সঞ্জয় — কী যে বলেন! কোথার হেতে জানছ তুমি।

বসন্ত — ইউরোপের কথাই বলি প্রথমে। তোমরা তো প্রচার করে যাচ্ছ যে সেখানে পরমাণু চুলিদের দিন অবসান হচ্ছে ধীরে ধীরে। ওসিক ফিলম্যান্ড এক বড়সড় চুলির অর্ডার বিজনে।

সঞ্জয় — ফিলম্যান্ড?

বসন্ত — আরো। ফিলোটা। প্রোটোবলে সেই কথায় সে দেশেরও তো পরিবেশ রক্ষার একটা শাখাভেতা আছে। সেটা জানতেই হলে পরমাণু চুলি বসাতে হচ্ছে। কান বলব?

সঞ্জয় — চলিয়ে যান।

বসন্ত — প্রতিবেশী চীন। ২০২৫ সাল নাগাদ সেখানে গ্রায় ছাউকিটা পরমাণু চুলি বসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য।

সঞ্জয় — চীন তো পরিবেশের ডাকনা ভাবছেই না। না হলে ভেউ এডারকেটে চড়ার রাস্তা বনায় ওভারে?

বসন্ত — এটাই সম্ভাব্য। পরিবেশের ভাবনা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করছে চীনের পরমাণু চুলি স্থাপনকে। সেখানে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আর অন্যান্য কারণে বোঁদালা এত বেড়ে গেছে যে এখন নির্মল শক্তি যোগানোর বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে।

সঞ্জয় — হ্যাঁ, নির্মল শক্তি। পরমাণু বিদ্যুৎ হল নির্মল। এর থেকে বড় উপগ্রাস কী হতে পারে। যে বিদ্যুতের ঠাণ্ডায়ে দু'চারটে প্রজন্ম পশু হতে ছেড়ে পারে সেটা নাকি নির্মল শক্তি।

(স্বপন চা দিয়ে যায়। দু'জনেই লম্বা একটা চুমুক সেব নিচ্ছেদের চায়ের রাসে।)

বসন্ত — বুঝলে ভায়া। বিপদ সব কিছুতেই। নতুন কিছু করতে গেলেই বিপদ। তবু বুদ্ধিমান লোকেরা পরিকল্পনা করে। বলি, কয়লার আদ্য তো আর বড়লোর সেঁড়ন বছর। এর পরে তো তা হলো তোমার বিভিন্ন রকমীই ডবকা।

সঞ্জয় — কেন, সূর্যের আলো, হাওয়া এসব কী কোষে পড়ে না নাকি আপনাদের? জানেন, আমাদের লে হাওয়া থেকে

পক্ষি উৎপাদনে কত এগিয়ে? তারপর জলবিদ্যুৎ রয়েছে। ছোট ছোট হাইডেল প্রাট থেকে কত বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। কিন্তুই তো হয়নি।

বসন্ত — আশো, হাওধা সবই আছে। তবে এখনও সাতবাটী পতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন এদেশে হয় কমা থেকে। আর কলার থেকে বিদ্যুৎ মানে যে কী হয় তা তো জানেই। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফেয়ার কথা না হয় জানি মিলান। কিন্তু ছাই? ছাইই আশ? কোলাঘাটের চাহ-করাধ পুরো শেষ করে গিয়েছে। লোকজন নিঃশেষ নিজে পাখে না ঠিকমত। একরের পর একর ঢেকে যাচ্ছে কলো ছাইয়ের সূক্ষ্ম কণা। পরমাণু বিদ্যুতের বিন্যাসের কথা কী কহা? ইতিহাসের হিসেব যদি মেলাও না তাহলে দেশে পরমাণু বিদ্যুতের তুলনায় অনেক অ-নেক বেশি লোক মারা গেছে কলার বিদ্যুৎ আর জলবিদ্যুতের কারণে।

সঞ্জয় — সে তো পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা সামান্য বলে। কিন্তু জলবিদ্যুতের সম্ভাবনার কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

বসন্ত — এভাবে কেন? কথা হল একটাই যে ওটা নিয়ে আমাদের সব প্রয়োজন মিটে যে না। তাছাড়া সমস্যাও কম না। ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে গেলেও ভূমি অধিগ্রহণের সমস্যা আছে। তাছাড়া বর্ষা বিদ্যুৎ হলে মানে বরা-উরা হলেই জলের স্রোত নিচু-নিচু। কোথায় থাকবে তখন তোমার জলবিদ্যুৎ?

সঞ্জয় — ধুম! আপনি তো সবকিছুকেই অবহেলা করার মনোভাব নিয়ে আসছেন। প্রাকৃতিক সম্পদকে কি এভাবে হোলাফেলা করা যায়? প্রকৃতি এগোচ্ছে। সৌরবিদ্যুতের দামও তো কত কমছে।

বসন্ত — হোলাফেলা নয় রে ভাতা। এ হল সুদূর প্রসারী ভাবনা। সেটা ভেবেছিল বলেই ফ্রান্স দেশটা আজ সাততর পতাংশ বিদ্যুৎ বানায় পরমাণু চুল্লি থেকে।

সঞ্জয় — ওঃ সেই ফ্রান্সের উদাহরণ। দেশটা তো পরমাণু বিদ্যুৎ বানাতে গিয়ে কণা জড়কিত হয়ে পেল।

বসন্ত — রাখে তোমার নেভায়েব দেখানো ওসব হেঁসো কথা। জানো কোন অবস্থা থেকে পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ফ্রান্স? এ হল সেই সত্তর লোকের প্রথম নিককার কথা। তখন তেল সম্পদে ধনী ওলক গোষ্ঠীর বেশগুলো ভেদের দাম চার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ওদিকে ফ্রান্সের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বেশিরভাগই চলে তেলে। নিজের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল বা কয়লা ছাড়া নিশেষ। তখন কী করে দেশটা? পরের পরেরো কলার ছায়াটা নিউক্লিয়ার রিঅাক্টর মানে পরমাণু চুল্লি বসাল সে দেশ। নিজেরের প্রয়োজন তো মিটলই পাশাপাশি বিদ্যুৎ রপ্তানি করতেও শুরু করল। তুমি কি

বলতে চাও এসব না করে গেরা দেশে মোমবাতি জ্বালিয়ে বাস থাকলেই দেশটা ভাল করত?

সঞ্জয় — কিন্তু এও তো ঠিক যে সেখানে ইউনিট শিল্প বিদ্যুতের দাম পাশাপাশি দেশগুলোর থেকে অনেক বেশি। সে সব দেশে পরমাণু বিদ্যুতের কাজেটা নেই।

বসন্ত — সেই দেশগুলো যখন ফ্রান্সের থেকে বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য হয় তখন? সেখা, সোফা কথা, তুমি নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারো নি বলেই বিদ্যুৎ কিনছ। আর অন্যান্য উৎসের কথা বলছিলে না? ফ্রান্স নিকে কিন্তু জলবিদ্যুৎ ব্যাপারটা ব্যাটল করে দেয় নি। সে দেশের বাবো পতাংশ বিদ্যুৎ হল জলবিদ্যুৎ।

(ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন ছাত্রই ইচ্ছে চায়ের সেকানে। অর্থাৎ সফা ছাড়া স্নোতার উপস্থিতিও রয়েছে এখন। হোতাসের মাথা থেকে 'চেরনোবিল' 'চেরনোবিল' উচ্চারিত হল অশুভটীকারে। সঞ্জয়ও লুফে নিল শব্দটা।)

সঞ্জয় — আজ্য বসন্তদা, এত কথা যে বলছেন, আপনি কি চেরনোবিলের কথাটা কোমলুয় ভুলে গেলেন? নাকি ওটা বললে আপনার খুঁটির জাল ছিড়ে যাবে।

বসন্ত — আঃ চেরনোবিল! ওই এক ভূত সেবিচে তোমরা লোককে ভরে সিরিয়ে মারছ।

সঞ্জয় — সেটা কি ভিত্তিহীন নাকি? এত বড় একটা দুর্ঘটনার কথা মানুষকে বলব না? শুধু কি ইউক্রেইন, কত দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল তেজস্ক্রিয়তা। এত লোক মরল, এত ক্ষতি হল অর্থনীতির — সে কি ভুল করার মত ভিদিন?

বসন্ত — সংখ্যার বা অস্ত্রের ভরকৈ গিয়ে লাভ নেই, সেটা তোমাদের মত মানুষের বিশেষ বা এদেশে সবসময়ই বেশি দেখাচ্ছে। আমি এটুকু বলব যে চেরনোবিলের দুর্ঘটনা হল পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সবচেয়ে ব্যাাপ দুর্ঘটনা।

সঞ্জয় — তবে? কিলাস সেভিয়েত উদ্যোগ ছিল বলেই মানুষগুলোকে দুর্ঘটনার কাছাকাছি অজল থেকে সরানো গিয়েছিল। এদেশে ওরকম হলে আর দেখতে হবে না।

বসন্ত — ভালই বলেছ। সঙ্গে তোমাকে এটাও জানতে হবে যে চেরনোবিলের পরমাণু চুল্লি ছিল খুবই ব্যাপার ধরনের, একদম অস্বাভাবিক। সে রকম চুল্লি আজকের দিনে আর কেউ বনায় না। দুর্ঘটনার ধাক্কা ওটার ঢাকনা পর্যন্ত নিন্মিক হয়ে গিয়েছিল। সরাসরি হাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল চুল্লিটার বেশ কয়েক দিন। আগুন ছলছিল, তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানি। এরকম একটা চুল্লি যে সেভিয়েত চালিয়ে যাচ্ছিল, সে অপরাধীও দেখতে হবে। কই, ওই চেরনোবিলের মত আর একটা দুর্ঘটনা তো কোথাও হয় নি।

সম্ভব — কেন আমেরিকার প্রি মাইল আইল্যান্ডে ?

বসন্ত — এই তো, এখান নিম্নের ঝাঁপে নিজে পড়লে তথ্য। প্রি মাইল আইল্যান্ডে দুখটানা ঘটছিল তিনটি কিন্তু ১৯৭৯ সালের সেই দুখটানার কারণে কেউ প্রশ্ন হয়নি।

সম্ভব — ইস্ এখানে কেনই সরাসরি মিথ্যাচার শুরু করলেন।

বসন্ত — সে তোমার মনে হচ্ছে। কিন্তু সেও কলকতর উপর মাথো চলার পর পেনসিলভানিয়ার জেলা আদালতের দ্বক দিলভিত্যে ব্যাঘ্যে পরিষ্কার হয়ে মনে হয় মুক্তা তো বুঝে কথা, যাকি পক্ষ এটা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি যে প্রি মাইল আইল্যান্ডের চুটি থেকে বেরনো ডেজক্লিফতার কারণেই কারও শারীরিক ক্ষতি হয়েছে। বেদ্যাস রেখে মাসটার, আমেরিকা দেশটার আদালতকারীরাও কিন্তু অনেক উচ্চতর গোয়েন্দার। তাও তাঁরা কিছু প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

সম্ভব — প্রতিষ্ঠা তো আপনাই করে নিচ্ছেন। মনে হচ্ছে প্রি মাইল আইল্যান্ডে যেন শুধু একটা লরি আর্কাইভেট হয়েছিল। সত্যি পারেনও।

(একদফা হেসে নিল জোহান্স দল। বসন্তবাবুও দুদু হাসলেন।)

বসন্ত — বেশে, খাঁটি তথ্য তানে যদি রেখে ছাও তাহলে কিছু করার নেই। কিছু হয়নি, এমন তো বলিনি আমি। অবশ্যই হয়েছে। চুটির ভেতরে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থায় একটা বড়সড় গণ্ডগোল অবশ্যই হয়েছিল। আর তাতেই কোর অজ্ঞানতা গলে গিয়েছিল। তবে সেটা হয়েছিল অপারেটরদের মাঝে। একটা ডাসল্ড বন্ধ না হওয়ার ঠাণ্ডা করার জল বেরিয়ে যাচ্ছিল। ফলে তাপ ডরজর জরগায় পৌঁছে যায়। সেই ব্যাপারটা ধরতেই পারেননি অপারেটররা। তখন তত ডাল নির্দেশক ব্যবস্থাও পড়ে ওঠে নি। কিন্তু দ্বন্দ্বিতা ভিত্তিকের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে সাহসে সেওয়া গিয়েছিল। কিছু ডেজক্লিফতা বেরিয়ে গেলেও অধিকাংশই কনট্রোলিংয়েট পিডিবিয়ার মধ্যে অবশেষে আটকা পড়ে যায়।

সম্ভব — এখন সত্যিই মনে হচ্ছে আপনি আমেরিকার পরমাণু চুটি শিল্পের খেঁজের কথা আওড়াচ্ছেন। একটু ভেবে দেখেন না যে এই ডেজক্লিফতা কত মারাত্মক। মানুষের ডি. এন.এ. সম্ভ্রান্তে পায়ে পড়ে গেলে চুটি থেকে বেরনো ডারি আইসোটোপের ডেজক্লিফতা। কাল্পার হতে পারে অনেকের। যে মানুষের জন্য এত উদ্বেগ তাহলে মেরে ডারপর কি শ্রমদেয় কিছুই বিলি হবে? ডেরনোবিলে বিপদ সাম্রাস্যতে যে লিকুইডেটরদের কাছে লাগানো হয়েছিল তাহলে জনেকে পড়ে শারীরিক বস্তুকি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিল।

বসন্ত — আগেই তো বলেছি, ডেরনোবিলের চুটি থেকে শুরু করে দুখটানা সাম্রাস্যতে, সবই বুঝ আসিবে পছন্দিত হলেই। ওটা একেবারেই অনুসরণ করার সত্ত্ব কোনও বিষয় নয়। তবে ওই বিল্ডিংয়ের প্রত্যেককে তোমারা সবসময়ই বড় করে দেখাও। জানাব, কতদূর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলে কম বিল্ডিং হয় না। এছাড়া সাধারণতঃই প্রকৃতিক দূষণ তো হয়েইছে।

সম্ভব — দুটো এক হল ?

বসন্ত — এক কেন হবে? প্রাকৃতিকভাবে তোমার আদার শরীরে যে বিল্ডিং এসে পড়ে তা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিল্ডিংয়ের ক্ষয়কণে তপ। ডিক্লিফতার জন্য যে এক-রেখা ছবি তোলাতে হয় তাতেও একই অবস্থা। তোমাকে একটা হিসেব বোঝাই। একটা সূচক আছে ফলত লস লস অফ লাইফ একশপেইলি বা এস.এল.ই। এখন পরমাণু বিদ্যুতের কারণে এই সূচক এক ফটা মাত্র। ইউনিয়ন অফ কনসার্নস সায়েন্টিফিস অবশ্য বলেছে যে সেটা সেউ মিন। ডুলনার তথ্যক পড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেটা তেরো দিন। তেল পড়িয়ে বিদ্যুতের ফোলা সাড়ে ছার দিন। এস.এল.ই. এক দিন মানেই যে প্রত্যেক মানুষ প্রজন্মের থেকে এক দিন আগে মারা যাবে, তা কিন্তু নয়। এটা পড় হিসেব। তো দেখান ডুলনটা দেখো।

সম্ভব — বসন্তর, একতম অপ্রভচার আমরা কিন্তু প্রথম ওনিই না।

বসন্ত — কোনটা যে অপ্রভচার কে বললে! হাই পাওয়ার ট্রান্সমিটারের কাছে কালার বসন্তায় বেড়ে গেছে, নাকমুখ ঘিরে রক্তক্ষরণ হয়েছে এ তো আচ্ছত্তবি নয়। আবার পাওয়ার লাইনের কাছে থাকার তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণে শরীরে কালার প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়, এও তো তথ্য। এওলোর কোনওটাই কিন্তু পরমাণু চুটির কারণে নয়। যেসে রাখো ডেজক্লিফ রায়ান তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও বোঝাও। সেটাও হিসেব রাখতে হবে।

সম্ভব — সেই জন্যই তো আমরা আরও বেশি করে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা বলছি।

বসন্ত — হলো না। সঙ্গে এটাও হলো যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও আবহাওয়া গরম করার মত গ্রীনহাউস গ্যাস বেরোয়।

সম্ভব — খাঁ।

বসন্ত — হ্যাঁ। আচ্ছত্তবি নয়। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র জল ধরে রাখতে গিয়ে যে অজ্ঞানতা ডারিয়ে দেয় সেখানকার গাছপালা, জৈব পদার্থ পচতে পচতে মিথেন গ্যাস ছাড়ে। সে গ্যাস যে স্রোবাল ওডারিই ঘটায় তা কি তোমাকে বোঝাতে হবে?

সম্ভব — না বোঝাতে হবে না। এটাও বোঝাতে হবে না যে আপনার শুরু মানে মার্কিন চুটি শিল্পপতিরা ডালোই

ব্রেনওয়ার্ড করেছে। তা সেখানেকার পরমাণু বিস্ফোতের
খ্যাতিপাত্র নিয়ে আপনার বক্তব্য কী? অবশ্যি তো
সেখানে নতুন পরমাণু তৈরি হচ্ছে না।

বসন্ত — বসবে ডায়াল বসবে। ২০১৪ সাল নাগাদ নতুন তৈরি বসে
যাবে। পরিকল্পনা জোর কন্ডয়ে এগিয়েছে। বড় কথা হল
আমেরিকা ফ্রান্সের ৭৭ শতাংশ পরমাণু বিস্ফোতের সম্মান
উৎপাদন করতে চাইছে। ইমিটরতা কে না চায় হলো।
আর খ্যাতিপাত্র কখনো চাইছে? এখন যে ১০টা তৈরি
সেখানে আছে সেখানে ক্ষমতা সম্বাহার যানে
করাগাটি ইউটিলাইজেশন অনেক বেশি। প্রি মাইলের
সময়কার ৬০ শতাংশ ব্যবহার এখন ইতিহাস। এখন ৯০
শতাংশ। আর নতুন প্রি গ্রাস জেনারেশনের যে তৈরিওতো
তৈরি হচ্ছে তারা যেমন নিরাপত্তা যেমন থাকবে সাধারণ
কবে যিচ্ছে।

সঞ্জয় — কীরকম সাধারণ? মজার কথা মনে হচ্ছে।

বসন্ত — মজারই বটে তবে তোমাদের কাছে অবস্থিতি। যেখানে কম
নিম্নসংযোগ আধুনিকতম কয়লা নির্ভর প্রায়শঃের খরচ
প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টার ১০০০ ডলার সেখানে এই প্রি
গ্রাস জেনারেশনের ক্ষেত্রে খরচ ১২০০ ডলার।

সঞ্জয় — তর্কের বাড়িবে না হয় ধরলাম যে প্রায় তৈরিকৃত বা
অপারেশনে আপনাতা খরচ বঁচানোয় কিন্তু পরমাণু
বিস্ফোতের প্রকল্পিত বর্জ্য সামগ্র্যতে যে বিপুল খরচ
হয়ে যাচ্ছে তা তো সম্বন্ধে জল ঢেলে দিচ্ছে। আবার খরচ
কবেও খুব একটা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। কী বলেন।

বসন্ত — হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা, যানে পরমাণু বর্জ্য যে এখন কেল
সমস্যার তা তো অসীমার করা যায় না। ঠিক তাই বর্জ্য
ফেলার আগে হাজার রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার
চেষ্টা করা হয়।

সঞ্জয় — সে তো মুখে কলছেন। কিন্তু তাতে কী বিপল কমে আসে?
ওই ভয়ঙ্কর জিনিস তো আর নিরাপত্তা হয়ে যায় না।

বসন্ত — সেটা বিজ্ঞানীরা জানেন বলেই শত শতকোটি টনে। প্রথমত
তৈরি থেকে বেরবো জিনিস থেকে মূল্যবান পারমাণবিক বের
করে নিয়ে তাই বাকিটা বর্জ্য হিসেবে ধরা হয়। এই
পরিমল কিন্তু বেশি নয়। একটা বড় নিউক্লিয়ার প্রায়ট
থেকে বছরে এক ট্রাক ভর্তি বর্জ্য বেরায়। কয়লা নির্ভর
কেন্দ্রে থেকে বা বর্জ্য বেরায় তার তুলনায় একটা একক
ফুড়ি লক্ষ ডায়ের এক ডাণ। আরওয়ে একটা কোর্ট
ভয়ঙ্কর এক ডাণ। পরমাণু বিস্ফোত বিক্রি করে বা পরমাণু
আসে তার এক শতাংশ খরচা করলেই বিস্তৃত নিরাপত্তা
দিচ্ছে এগুলোকে সরানো যায়।

সঞ্জয় — কোথায় আর সরানো? সেই তো মাটির নিচে রেখে
ভবিষ্যতের বিপদ বাড়ানো। যদি আর জল দুখল
খটবে।

বসন্ত — কিন্তু বিপদ হবে না। হ্যাঁ অসংখ্য আনন্দ তা থাকতেই
পারে। তবে মাটির ২০০০ ফিট নিচে থেকে তো তোমাদের
ঘরে বিকিরণ আসবে না। তারপর এই সব বর্জ্য রাখা হয়
কন্ডোবাই কন্ডোবাই। পাথুরে পরিবেশে এসব কবর
সেওয়া হয়। চারপাশে এটেল মাটির আবরণ থাকে সেটা
জল লাগলেই তুলে উঠে একটা প্রায় নিশ্চিত আবরণী
তৈরি করে। জল বিশেষ ঢুকতে পারে না যানে কন্ডোবাই
অবধি পৌছতে পারে না। ঢুকে গেলেও ওই মাটি
ফিশ্টলের কাজ করে, আইসোটোপগুলোতে যেভাবে
যে না। বড় কথা হল, ব্যাপারটা খুবই নিরাপত্তা। জলের
বৃষ্টি প্রায় অসম্ভব।

সঞ্জয় — যা: কত সহজে সমাধান করে দিলেন আপনি। এদিকে
আমেরিকায় এখনও বর্জ্য ফেলার সঠিক জায়গা পাওয়া
যাচ্ছে না। তিরিশটা জায়গায় বিপজ্জনক বর্জ্য জমা হয়ে
উঠছে। আপনার নিরাপত্তা জায়গা পাচ্ছেন কোথায়?

বসন্ত — কেন নেভাদার ইয়ুটা পর্যন্ত জায়গা তো নির্দিষ্ট। হ্যাঁ
আমলাতে ব্যাপারটা অটোমেটিক আছে বলেই সমস্যা। না
হলে ১৯৯৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি বর্জ্য ফেলা শুরু
হতে যেত। এর জন্য পরমাণু বিস্ফোত সম্প্রদায়
ইতিমধ্যেই ২৪০০ কোটি ডলার জমা করে দিচ্ছে
সরকারের কাছে।

সঞ্জয় — আমলাউই ডরসা। আমরাও সেখানেই যাব। আমেরিকার
নাগরিকরা সমস্যটা বোঝে বলেই না? আইল্যান্ডের
পরমাণু তৈরিকে আইনি কাগজ দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে সেই
১৯৯৪ থেকে।

বসন্ত — আইন, আমলাতন্ত্র তার নিজের পক্ষে চলবে সে তো জানা
কথাই। তোমরাও সেখানে নিশ্চই যাবে। আবার একই
সঙ্গে অন্ধকার গ্রামগুলোতে কেন বিস্ফোত পৌছায় না,
হাস্যপাতল কেন অন্ধকারে ঢুকে থাকে, অতি প্রয়োজনীয়
জিনিস তৈরির কারখানা কেন পাওয়ার কন্ট্রোল জন্য বন্ধ
হয়ে যায় — সে সব নিয়েও তোমরা আলোচনা করবে।
এই বিচারিতাও সহজে হচ্ছে মানুষকে।

সঞ্জয় — বলেছি তো ওসব জগজগারে কাজ হবে না। মানুষের
জানাই আমাদের আশাবাদ। হরিপুরে ওরকম সুন্দর
ফসল সেওয়া বস ফসলী জমিওতো কেড়ে নিচ্ছে পরমাণু
বিস্ফোতের। কত আলু, মিষ্টি কুমড়া দিয়ে তৈরি চাষের
জমি, সব ঘাসের বিস্ফোতের পরে। হলেবলে কালি
পরিষ চাটীর জমি হতভম্বের ধান।

বসন্ত — আসল কথাটা জেনেও সেটা বলছ না মাস্টার। বেশি
জমি লাগছে মানুষের নিরাপত্তার জন্যই। বিস্ফোতের
চারদিকে ১.৬ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে এলাকা তাই
জনদুখল করে রাখা হয়।

সঙ্ঘ — তারপরেও তো আছে।

বসন্ত — হ্যাঁ আছে। পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মহা দল
হাজারের বেশি মানুষ থাকবে না, দশ কিলোমিটারের
মধ্যে সর্বাধিক ছুটি হাজার আর তিরিশ কিলোমিটার
ব্যাসার্ধের মধ্যে একলাকের বেশি মানুষ নয়।

সঙ্ঘ — তবে?

বসন্ত — এ তো নিরাকপ্তার জন্যই। পরমাণু বিস্ফোজক্রে নিজে
ভাঙ-ভাঙনা আছে বলেই তো এত উদ্যোগ। তোমার
কল্যাণ বা তেল বিস্ফোজক্রে এর এক অংশও ভাঙে না।
(আলোচনা চলতে চলতে আর এক হাউস টা চলে এস।
টিক কর অ্যাকটাইটে বোমা গেল না। তবে স্রোতারা যে
চাইছে আলোচনা চলুক, তা পরিষ্কার। তাদেরই কেউ
চায়ের খরচটা বহন করছে।)

সঙ্ঘ — বসন্তা, আপনি একবার হরিপুর যান। মানুষ কতটা
উদ্বিগ্ন বুঝতে পারবেন। বিকিরণের ভয় তো আছেই,
তার সঙ্গে আপনাদের পরমাণু বিস্ফোজের ঝাড়া সমুদ্রের
মাছ যে কতটা গায়েব হয়ে যাবে, সেটাও জেলেনের
কাছে দুশ্চিন্তার।

বসন্ত — কই পরমাণু বিস্ফোজের জন্য সমুদ্রের মাছ বিমূহ হয়ে
এমন কথা তো ওনি নি। সমুদ্রের পাশে বিস্ফোজের
গড়তে হয় কেননা চুম্বির ভেতরটা ঠাণ্ডা করতে প্রচুর
জল লাগে। তাতে তো মাছের থাকার জন্য জল কম
যাচ্ছে না।

সঙ্ঘ — সেই গরম হয়ে যাওয়া জল আপনারা আবার সমুদ্রে
পাঠাচ্ছেন। বাহ তো আর হট বাথ নেওয়ার জন্য বসে
থাকবে না।

বসন্ত — তোমাদের হত্যারেরও বলিহারি। যেন গরম জল সোজা
চুম্বি থেকে সমুদ্রে ফেলেত যাচ্ছে। আস্তা বহু প্রাকৃতিক
কারণেও তো সমুদ্রে মাছের আকাল বেধা যায়। তখন
তো জেলেনের পাশে তোমাদের সেধা যায় না। শক্তিশালী
মেটেরেইটোসো কিশাল জাল দিয়ে সব মাছ সাবড় করে
দিয়ে। গরীব কোল ডিঙি নিয়ে ঝুঁকি নিয়ে অনেক ঘুরে
গিয়েও মাছ পায় না। তাদের কথা কেবলই তোমাদের
আবেলানের রঙিনে থাকে না, তাই না!

সঙ্ঘ — আমি ভাবছি, এসব বোঝায় পরমাণু চুম্বি বসানোর
অনেক আগে থেকেই শেখানো হয়, না? এমন
বিশজ্ঞান একটা প্রকৃষ্টকে এ রাজ্যে পাঁচ করতে হবে
তো!

বসন্ত — এ রাজ্য বা এ দেশের কথাই যখন তুললে তখন বলি,
তোমাদেরও কিছু জানার বা শেখার আছে। ভারতবর্ষের
পরমাণু শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে ট্যাক রেকর্ড খুবই

ভাল। নিরাকপ্তার বিকটা এখানে প্রচণ্ড ওস্তাদ পায়। যখন
তখন বিপদ ঘটি না এখানে। এমনকি সুদূরির সমরও
দক্ষিণ ভারতের কলকাতায় পরমাণু চুম্বি নিশ্চিন্তভাবে
নিজেকে বহু করে দিয়েছিল। তেমনও সমস্যা হয়নি।

সঙ্ঘ — বিপদ কী হয়েছে বা হয়নি সে তো জানার উপায়ই থাকে
না পরমাণু চুম্বির গোপনীয়তার কারণে। কতটুকু তথা
পায় সাধারণ মানুষ?

বসন্ত — তোমার মুক্তি হারিয়ে গেছে বলে এসব কথা বলছে।
সেরকম বিপদ হলে মানুষ এমনতেই সরব হত।
তোমাদের মহাযোযা তোড়াকা করত না।

সঙ্ঘ — আস্তা বিপদ না হয় বাতই মিলায়। আপনাদের ছালামি
আসবে কোথেকে, সেটা ভেবেছেন? অবশ্য আপনাদের
জনা তো আমেরিকা আছে। বিস্ফোজ বহির্ভর হতে গিয়ে
সেই তো পরবর্তীই হলেন।

বসন্ত — এটা পরবর্তীতার প্রশ্ন নয়। আজকে পরমাণু চুম্বির
ইউরেনিয়ামের জন্য আমেরিকার সঙ্গে আমাদের চুক্তি
করতে হচ্ছে তিক্তই। কিন্তু আমরা যতটুকু পাব তাই চরম
সম্মততার ভরতে পারব নতুন প্রযুক্তিতে। ফলে বেশি
বেশি সরবরাহের দরকার পড়বে না। তাছাড়া আমরা
শেষ হয়ে যাওয়া ছালামিটাকে রিসাইকল করছি। ফলে
সেখান থেকে অনেক আমাদের ফস্ট ক্রীডার
রিঅ্যাক্টরের জন্য পুটোনিয়াম পাব।

সঙ্ঘ — যে পুটোনিয়াম দিয়ে বোমা তৈরি হয়, তাই তো। বোমা
তৈরির মশলা পাওয়া হবে সহজে।

বসন্ত — পরমাণু বোমা আভরনের গিনে বাতব। কিন্তু তাই বলে
পুটোনিয়াম যে একটা উপযুক্ত ছালামি তা তো অস্বীকার
করা যায় না। আমরা কথটা শেষ করি নি। এছাড়াও
কামচা আমাদের দেশেই খোরিয়াম ব্যবহার করব
ফস্ট ক্রীডার রিঅ্যাক্টরে। সেখান থেকে তৈরি হবে
ইউরেনিয়ামের একটি আইসোটোপ যা পরবর্তী খাল
ক্রীডার রিঅ্যাক্টরে ছালামি হিসেবে ব্যবহার হবে।
ভবিষ্যৎ অতটা অন্ধকার নয় যে মস্টার।

সঙ্ঘ — অন্ধকার তো নিশ্চয়ই। ইউরোপের দেশগুলো থেকে শুরু
করে জাপান পর্যন্ত ক্রীডার রিঅ্যাক্টরের সমস্যায়
নাজেহাল। অবিকার্য জলপায় সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।
ঠাণ্ডা করার জন্য যে সোডিয়াম ব্যবহার হয় তাকে
সমালোচনা যাচ্ছে না। হয় গড়িয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে নয়
তো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পিছে ভেতরেই। এদিকে এসেছে
সেই চুম্বি নিয়ে এত আশা!

বসন্ত — আপনও বলেছি দুইটোনা যে কোনও বড় বিস্ফোজক্রে
ঘটতেই পারে। কিন্তু তুমি সে-দুই লোক আপনকার
হিসেবে নিচ্ছে। ভারত নিজে তার পরমাণু প্রতিষ্ঠান

সুরক্ষিত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উন্নত গবেষণা চলাচ্ছে এখন। মেথারী পূর্ববকরা তো যেন যেন আইনে পান না পরমাণু হস্তে।

— দুইটোনাই যদি বলেন তো সেটা আসলে ঘটাবে উগ্রপন্থীরা। একটা পরমাণু বিস্ফোরককে বোমা মারলে না ... হ্যাঁ, কয়েক হাজার বোমার কাজ হয়ে যাবে। যা তেজস্ক্রিয়তা ছাড়াও তাতে অত্যন্ত প্রচণ্ড ব্যাঘাত। আরও মজার কথা হল কখন যে আপনার রিঅ্যাক্টর থেকে মুটোনিয়াম সরিয়ে সেটা বিটেই বোমা বানাতে ভাবা সেটা ষোড়শ ঘণ্টে না।

— দুটিই অজবিশা ভয়ঙ্করী। রিঅ্যাক্টর থেকে যে মুটোনিয়াম পাওয়া যায় তাতে মুটোনিয়ামের বেশ কয়েক বকর আইসোটোপ বিশেষ আছে। বোমার জন্য সবক'র ওপু মুটোনিয়াম ২০২। আর কই হোক ওই আইসোটোপের বিশেষ নিয়ে কেউ পরমাণু বোমা বানাতে পারে না। আর উগ্রপন্থী? তারা যখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের আক্রমণ করেছিল তখন কী কম কতি হয়েছিল। সেখানে তো পরমাণু কেন্দ্র ছিল না। আক্রমণ অত সহজ হয় না। আবার, হলে যে কোনও জাগরণীয় ভয়ঙ্কর আকারে হতে পারে। বরং পরমাণু চুম্বির অন্য ভাষায় বিকটা ভাষা।

— সেরকম কিছু আছে নাকি?

— অবশ্যই। বাইশ ধরনের উচ্চ ফলনশীল বীজ তৈরি করা হয়েছে বিকিরণের মাধ্যমে মিউটেশন ঘটিয়ে, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে হ'লফেরও বেশি রোগীয়া রোগ নির্ধারক পলীকা করা হচ্ছে প্রতি বছর। পাশাপাশি পনেরো থেকে কুড়ি লক্ষ রোগীর জন্য রেডিয়েশন থেরাপির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আরও অনেক কাজে লাগছে। মাটির নিচে কোনও লীক নির্ণয়, বন্দরে পলি বা দূতর সরে যাওয়া, মাটির নিচে জলের স্তর পরীক্ষা করা — এসব কাজে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দাপট কাজে লাগছে। আরও নতুন সব প্রয়োগ হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশায়েছেন।

— ভাবার বিষয় বট। আপনারা কত ব্যক্তি সারাজেই আর কতগুলো ঘটাজেই তার তুলনায় করা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

— তুলনা তো আসলে তোমরাই করতে চাও না। তাকে বোধহয় তোমাদেরই অনুস্থিৎ।

— পরমাণু চুম্বি থেকে আড়াই-তিন শতাংশে বিস্ফোরিতকমত দেশকে বিধে পারেন না অঞ্চল তার জন্য কত বরফ আর

কত যে কুসৃষ্টি। সত্যি। ওখানতে পরিবহনের সময় যে বিস্ফোরণ নষ্ট হয়, মানে ট্রান্সমিশন লস, ঐতিহ্যেই আপনার এই বিস্ফোরণে ভিরিয়ে দেওয়া যেতে। তা না করে কয়েক মলক আগেকার অপলার্ব প্রমাণিত হওয়া এক শিল্পের হয়ে গলা ঘটায়জেন। আন্তর মানুষ বট আপনারা। স্টোন বিস্ফোরণ, বায়ু বিস্ফোরণ শিল্পের কোমর ভাঙাই মনে হচ্ছে আপনাদের গেরশন এজেন্ডা।

বসন্ত — আমাদের এজেন্ডাতে আর যাই থাকুক, মানে মানে দু'একটা শহরের রাস্তের ফোলা ঘটানোকে সব ব্যক্তি সত্যোনার কর্মসূচি নেই। ধবংহের কাণ্ডে যখন ওসব পড়ি তখন মনে হয় তোমাদের চমকনার যা হবে ওগুলো তার রিঅ্যাক্টর। তখন তো গোটা রাস্ত ব্যক্তি নিভিয়ে বকুতা পোনাটি হবে গোটা বিশ্বের এজেন্ডা।

সম্রাট — কোটেই তা নয়। বরং যেটুকু বিস্ফোরণ মানুষ উপভোগ করেছে তা কিনা ভয়ে, কিনা আশঙ্কায়।

বসন্ত — এ মনে সেই মজার কথাটিই মনে করিয়ে দিলে — ভয় নেই, ভয়লাও নেই। বরং ভাবভয়ের পরমাণু বিস্ফোরণ পরিকল্পনা ২০২০ সাল নাগাদ কুড়ি হাজার মেগাওয়াট বিস্ফোরণ সরবরাহের আশাস ভরসা আছে।

সম্রাট — ভরসা তো পরমাণু চুম্বিরই নেই। বিশ্বের বৃহত্তম পরমাণু বিস্ফোরকশ্রের রিঅ্যাক্টর তুর্নিকস্পের কণ্ট লাইনের উপর, পড়েছেন তো। গোটা জাপান মুড়ে সব পরমাণু বিস্ফোরকশ্র নিয়ে ভদন্ত হচ্ছে। নিরাপত্তা নিয়ে ভাল রকমের আশন করা হয়েছে ওখানে। কাকে কী ভরসা দিচ্ছেন?

বসন্ত — জাপান শেপটার নাম না নিলেই ভাল করতে ভাবা। বেশটা কখনই মুখ বুজে পড়ে না। মেকনিকটা তীষণ পতিশালী। সেখানে থাকে, ওই শেলি আবার ওটি ওখারে নিয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবে। অবশ্য পরমাণু চুম্বি সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা তোমারা বোধহয় কখনই নেবে না। (সম্রাটের চোখ পড়ে ঘড়ির দিকে। ক্ষতবী কেনও কাজ বোধহয় মনে পড়ে যায়।)

সম্রাট — উঠতে হবে। একটা কাজে এখন না গেলেই নয়। বসন্তদা বেরোবেন নাকি?

বসন্ত — না ভাই, এখন আমাদের পুরো অবসর। আরও ধানিকটা বসি। ভাষাভাষা বুককেই তো পান্না, আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে ...।

(হাসির রোল ওঠে, যবনিকা পড়ে রোষবার সত্যোনার দলপ এক বিতর্কে।)

বার্ড ফু আর জলাভূমি

অসীম চট্টোপাধ্যায়

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা কিছুই নয়। শীতের ওকতে পরিবারী পানিওতো এসে গেলেই তাদের থাকার জলাভূমিওতো হাতছাড়া হয়ে গেছে। মানুষেরা সেখানে জমি ভরতি করে বাস বাড়ি কানিয়ে থাকতে আরম্ভ করে দিয়েছে। শুধু কি থাকা? খোলাসা, পার্ক, সুইমিং পুল, পলিং মল — যাকে বলে একতরফ জমজমাট বসোবস্ত। হাজার ওহাট্টের নিয়মবতির আসলে জলাভূমির সেই ঘূর্ণি অন্ধকার কোথায় উঠাও। পানিওতো ভাষাভাষা করে যায়। বাপ ঠাকুরার আমল থেকে হাজার হাজার মাইল পানি দিয়ে প্রতিবছর তারা এখানে এসেছে। কাচঢাটকে তারা ভিনটেই পারছিল না। পানিওলোর চোখ কেটে ফল আসছিল।

তা হাই বল বাপু এটা কিন্তু পানিদের অন্যায় আচরণ। না হয় ওরা উদ্ধাঙ্গ হয়েছে — তাতে হলটা কি? এটা তাদের কেনা জমি নয়। ওদের থাকার বসে যা হয়েছে তা তাদের জন্যই হয়েছে। এতগুলো লোক একটু মাথা খোঁজার জায়গা পেয়েছে। এদের অনেক লোক কাজ পাবে। উন্নয়নের জন্য একটু আদর্শ ও রকম হয়েই থাকে।

পরিবারী পানিওতো তাদের মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে পাশের গ্রামওলোর পুকুর, মিঠি, ছাগল গরু চরাকার মাঠ ঘটিওলোতে থাকতে আরম্ভ করল। তাদের থাকা কটা মাস বইত নয়। বাজাওলোকে একটু বড় করে নিয়ে সীতটা কাটিয়ে নিয়ে গেলে যে ঘা বসে পানি সেওয়া। এদেশটা তাদের জমজমি হয়েও ওরা ত আদতে বিদেশী বই আর কিছু নয়। ওদের মজামতের কোনো দায় নেই।

ওধু কটা মাস এখানকার বসিন্দাদের সঙ্গে একটু বেশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হবে। হুড়ত এখানকার কলিন্দাদের সঙ্গে কবাবের দখল নিয়ে একটু আদর্শ খণ্ডা ঠগি, মারামরি, গলা ফাটিয়ে চিংকার চোঁচোবতি হবে। এত সব জায়গাভেই হয়ে থাকে। মানুষেরা কি করেন? সব কিছুই শেষে ঠিক হয়ে যায়। গরজ বড় ভালাই। পানিওতো থাকতে আরম্ভ করে গিল।

কয়েক বছর পর সজার টনক পড়ল। আপোপানের গ্রামের গৃহপালিত হাঁসমুরগিওতো দুখান ময়ে যেতে লাগল। কলিন পরে মড়ক ছড়িয়ে পড়ল পোলটিওলোতেও। ব্যবসারী গরির ওর্বোলের মাথায় হাত। পানি বামার গড়ে তারা দু পলসা রোজগারের দুখ দেখবে আশা করছিল। বিজানীরা তাদের সে প্রযুক্তিওলোও লিখিয়ে দিয়েছিল। কী রকম? না — প্রথমেই ডিম ফুটে হাঁস মুরগির বাক্সা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আলাদা করে ফেল। হরামেন আর অ্যান্টিবায়োটিক মেশানো পুষ্টিকর খাবার মাও। পাওলো একসময় বেঁধে মাও যাতে নড়াচড়া না করতে পারে। কেন? সোজা উত্তর — খাবারওতো যাতে সটান মাসে রূপান্তরিত হতে পারে। আড়াই কিলো পানির খাবার যাতে ছ পল্লবের মধ্যে এক কেজি অটিচো মুরগি হয়ে পল্লবের

বাক্সের বলিতে চুততে পাবে তার জন্য আরও কটা প্রযুক্তি ব্যবহারের দরকার। পানিওলোর ঠেঙোলাসে কেটে লাও যাতে একে অন্যলক চোকরাতে না পারে। পায়ের নখওতো কেটে লাও যাতে খিচাটতে না পারে।

ওধু গলা ফাটিয়ে কতকটা চিংকার করবে? ঘাবে না? দেখবে পেটের দ্বালায় ঠিক একসময় 'ভাড়া চৌটি' মেনে আসবে কবাবের ধসাতে। বাসু দেখতে হবেন। ডিম ফুটে বাক্সা কেমন থেকে মনে ছ পল্লবের অংশক। তারপরেই ইনভেস্টমেন্ট একলারে মূল্য মাসলে উতুল। পোলটির মুরগিদের মড়ক সেই দু পলসা রোজগারের অপায় বড় মড়ক মনেনে ছাই ঢেলে গিল।

বিশ্বের বৌদ্ধভূমির পর সেই বিজানীরাই বৃহৎ বণ কলজেন উন্নয়নের সেই অল্পা শব্দতে বার্ড ফু ভাইরাস/পোকাকি নাম এইটু কইত এন ওখান ইনফুয়েন্স। 'এ' বার্ড ফু। কোথেকে এলো? এহা এসেছে নাকি সেই হতজাড়া পরিবারী পানিওলোর কাছ থেকেই। ব্যব জলাভূমি হাত ছাড়া হয়ে যেতে উদ্বাঙ্গ হয়ে গৃহপালিত জীনচতুর সঙ্গে একসঙ্গে থাকছিল। এদের নাকি বিশেষ কিছু হয় না? দু ভাইবনস — কিন্তু

সক্রেমণ ছড়াচ্ছে এবাই। ভাইরাস এদের মনুয়ে ধরছে। সঙ্গে আর একটা হাড় কাঁপান সংবাদ। ঘি এই বার্ড ফু ভাইরাস ঘটতে একটা চেহারা অরলবল ঘটিয়ে (যা এহা হববশতই করে থাকে) একবার মনুযের নাকবানে ঢুকে পড়তে পাবে তা হলে আর দেখতে হবে না। পানির বদলে মনুযের মড়ক

লাগবে। এই সেই ফু ভাইরাস যা এক বছরে দু'কোটি লোক মেরে ফেলেছিল। নকই বছর অগ্ন্যেতার সেই বেকর্ড এখনও কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। সামনে একমাত্র অল্যা এইচ আই ডি ফি সেই বেকর্ড ভাঙতে পারবে।

ধন দাত, আগো প্রণীতা ত বাঁচাই। লক্ষ লক্ষ মুরগি মেরে ফেল হল। বক্তবীকর কাড় সব। এক কৌটা বক্তও যেন না বের হয় মারবার সমর্থ। হয় হাতে ল্লাহস পরে খাড়াটা মুচড়ে লাও কিছা পাস দিয়ে নহর। তারপর প্রাসিকের বস্তায় ভরে ফর্মালিন ঢেলে মাটি বুড়ে কর মাও। সাবধান, পেডাল কুকুরে যেন না যায়।

একটু ঝপ ফিরতে আবার বিজানীশিলের তলব করা হল। মুরগির মড়ক কী করে আটকানো যায়? জলাভূমি সংরক্ষণের কথা বাদ দিয়ে অন্য কী করা যায় তার হিন্স লাও।

পোলটির মুরগিওতো অত কাছাকাছি না রাখলেই হয়। সংক্রেমণ ছড়াবে না। উন্নয়নের ভগীন্দরখোরা নীতমুখ শিঁচিয়ে উঠলেন এই শোনার জন্য এত পলসা বরফ করে গবেষণা করা? গবেষণাচারওতো তুলে গিলেই হয়। হয় ঠিক ঠিক মতলব বাড়লোও নাহলে পত্রপাঠ সবাই

বিবেক হও। বিশ্বাসীরা নাওরা খাওয়া ভুলে গবেষণায় ভুলে গেলেন।
এটা তাঁদের স্বীকা মরার লড়াই। শেষেও বুদ্ধি বেফল।

সবজ্ঞাতব্য নমুনাগুলি খাড়াও। পৃথিবীর ঘেঁষানোই বার্তা হু
সেখা দেবে সেখানেই মুখশী নিধন কর।

আলিমের টিকা দিয়ে লাও।

টিকা তৈরি করবে কে?

ব্যক্তিগত ফার্মেসি কোম্পানির এক পায়ে খাড়া। আমরা
টিকা তৈরি করব।

নাম দেবে কে? নুন আমনে পাতা ফুরায় ওই হাতাতে গরিব
শেখতাই? হ্যাঁ, তাদেরই ভোঁতে দিতে হবে। তাদের খেলে মুখগির মজক
লাগবে তাদেরই খেলে গলক টন মুরগির মাংস রপ্তানি হচ্ছে
পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে অধিবেশন কম বামে। এই কাবার কাবার
যেতে তারা বিশেষী মুদ্রা মোক্তার করবে। বিশেষী মুদ্রা দিয়ে তারা
কিনবে ছদ্মানা তেল, ওষুধ পত্র, অস্ত্রশস্ত্র। গরজ বড় বালাই। নিজেদের
সেইই জনমারে লোক মারা গেলো ও দেশের কাবার অন্য দেশে সত্যায়
কেনা ছাড়া উপায় নেই — উন্নয়নের রথের চাকাকে সচল রাখতে

গেলে। রথের ওপরে অবশ্য কতিপয় লোকজনই বসে। তারাই দেশটা
চলানো। ছদ্মানা তেল দিয়ে তাদেরই গাড়িগুলো চলবে। লম্বা ওষুধপত্র
তাদের নিজেকেই ব্যবহারে লাগবে। অস্ত্রশস্ত্র কানে লাগবে যিহাদে অমন
করতে, বেচামণ প্রজা হাসন করবে, দেশে শাসনামলের শান্তি বজায়
রাখতে। দেশের বাড়ি লোকদের মধ্যে যে দুচারজন লোকপত্নী শিশু
অন্যদের বুঝে যোগাবে তাবও উপায় নেই। বেশি দাইনেব শোভ দেখিয়ে
অন্য দেশ টোনে নিয়ে যাবে। কীজন জো একটাই। ভালভাবে নিজের
বীচবার সুযোগ ছেড়ে নেওয়ারটা বোকামি।

তাই হুঁর টিকা আমদানি করে দেশের বস্তুনিষ্টটাকে বীচাতে
হবে। দেশের উন্নয়ন এই রপ্তানির সঙ্গে জড়িয়ে। হুঁ টিকার নাম
জোতারে রপ্তানি ছাড়াতে মজুরি কমাতে হবে। সময়মত বার পোশ
করতে থাকলে আসনের সঙ্গে নূর যোগ হবে। শেষে সুখ আসলে
ছাড়িয়ে যাবে। এই মুহুর্তেই বেশ কয়েকটি দেশের উৎপাদনের (যাতে
শিক্ষিত জনের জীবন ছিড়িশি) পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি বেঁচেয়ে যায়
সুখের টাকার ফলান নিতেই। তাই শেষে লম্ব টাকার প্রমতি উঠেই
পড়ে — চলাচলি সবকোনা না করটা তবে কি ভুল দিকার! বিশ্বজুড়ে
আজ বার্ড হুঁ মহামারী দেখা দিয়েছে-এর পর কাল কী হবে?

ছোটদের পাতা

ছোটরা, বর্তমান প্রজন্মের ওরা, কী ভাবছে, কী ধরনের মূল্যবোধকে মূল্য
দিয়ে তা অকণ্টে কলার সুযোগ রয়েছে 'উৎস মনু' -এর এই পাতায়।
একাত্তর প্রসঙ্গ ছিল —

'সদা সত্য কথা বলিবে' — এটা পুরনো মূল্য চলত।

আধুনিক কালে সবসময় সত্যি কথা কলা বোকামি। সল

হলে জীবনে পরাজিত হয়। তোমার কী মত?

এবারে ভালো উত্তর আমরা খুব বেশি পাইনি। অনেকগুলি প্রসঙ্গের
বইয়ে চলে গিয়েছে। মতামত পরিষ্কার হয় নি। তার মধ্যে নির্বাচিত
কয়েকটি উত্তর এরকম —

সত্যাসত্য বিভ্রম

সর্বদা সত্যি কথা কলার বিপক্ষে আমি মত দিতে ইচ্ছুক।
কোনো মরণাশ্রয় রোগীর পরীক্ষা করে তাকে ডখনই তার অঙ্গ
নিরস্তর কথা বলা উচিত নয়। এতে সে ভেঙে পড়তে পারে।
কিন্তু কোনো ক্রমে সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের ধারণা প্রচার করে কবী হন।
তিনি যদি ডখন তাৎক্ষণিকভাবে পাদ্রিসের কাছে নিজের সিদ্ধান্তকে
ভুল বলে মান্যনত তাহলে শ্রাণ সশরীর ও হতো না আবার পরকর্তীকালে
তিনি তার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেতেন। তাই বৃহত্তর ন্যায়ে
স্বার্থে মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা কলা অকণ্টই শেষের নয়। তবে মিথ্যা
কথা যদি নিজ স্বার্থকে সমর্থন করে, নিজ আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করে
তাহলে মিথ্যা সর্বদা। একটিকার ভাবুন তো 'সত্যি', 'মিথ্যা' কতজন
হুগে বইয়ের দুটি শব্দ হয়ে বাচ্ছে কিনা। আসলে এ দুটির উল্লে সেখা
দিয়েছে স্বার্থ বা পরস্বার্থ অপেক্ষা নিষ্কলার হিসাবে কল প্রচলিত।

সৌম্যদীপ দাস
লবন হ্রদ ক্যান্টন

এক ভয়ঙ্কর ধারণা

আমার মতে সবসময় সত্যি কললে অবশ্যই বিপদ আছে। বড়
উদাহরণ অসামান্য প্রতিভাধর বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। তিনি বিপদের কাছে
মাথা নোয়াতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আমরা কি সবসময় সত্যের
ময় দেখতে চাই? একটু আত্মসমীক্ষা করলেই যে উত্তরটা বেয়িয়ে
আসবে তা হ'ল — 'না'। আমরা আসলে আমাদের নিজস্বের ভয়
দেখতে চাই। আসলে লোক করে যদি সত্যিটা স্বীকার করে নেওয়া যায়
তাহলে প্রথমে বিপদ হলেও পরে কামেলা টুকে যায়, কিন্তু প্রথমে মিথ্যা
কললে পরে অনেক দুঃখতে হয়। যত দিন নাহলে মানুষের মনে ধারণা
টুকে যাচ্ছে যে, বেশি সত্যিকথা বলা মানেই কামেলায় পড়া। এই
ধারণাটিই আরও ভয়ঙ্কর, সত্যকত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

সোমক মুখোপাধ্যায়
ধামল শ্রেণি, লকন হ্রদ ক্যান্টন

মিথ্যা স্বপ্ন সৌরকেন্দ্র

সত্য মাতৃহত্যা শিশুটিকে যখন কলা হয় তার মা আকাশের তারা
হয়ে গেছে ডখন এই অসত্যটুকুও তার কাছে সন্দেহা যদি নিয়ে আসে।
স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কল কবী, বিপ্লবী বিশেষী শক্তিকে ভুল পথে
চলিত করতে পুলিশকে ভুল শুদ্ধা মিত। এই মিথ্যা সৌরকেন্দ্রিক।
সত্যকে গোপন করে বকন অন্যায়ের সঙ্গে আপস কলা হয় তখনই তা
পণ্ডিত অপরাধ।

উপায়ন পাত্র
ধামল শ্রেণি, লকন হ্রদ ক্যান্টন

অবস্থা বুঝে সত্য কথ্য

"সত্যকথা" এই শব্দটি ছোটবেলা থেকে আমাদের জড়ায় করে আসছে আমার মতে বর্তমান যুগে সত্যের গৌরব অনেকটাই হ্রাস হয়ে পড়েছে। আগে ছিল 'সত্য সত্য কথা বলবে', আর সেই বাক্যই এখন জগৎ বকলে 'অবস্থা বুঝে সত্য কথা বলবে' — অর্থাৎ, সত্য কথার থেকে সেই ব্যাক্যের প্রয়োগ ক্ষেত্র এবং ব্যক্তি ভ্রমেরোগের প্রভাব এখন বেশি চক্ৰস্পর্শ। নিজের এবং অপরের পক্ষে মঙ্গলজনক সত্যই আমাদের বলা উচিত। তা না হলে সত্য তার চক্ৰ ঘুরিয়ে ফেলবে।

স্বাধী মুখাঙ্গী

এম কাম (প্রথম বর্ষ), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সত্যি বলতে ভয়

আমরা ছোটবেলা থেকেই যেনে আসছি 'মিথ্যা বলা মহাপাপ', কিন্তু কঠমানে আমাদের সুসভ্য সমাজে এই প্রকারণটি অস্বীকার। কঠমানে সমাজ এমন এক জাতিগণ দ্বিষ্টিয়ে আছে — যেখানে সত্যকে সত্যি বলে কেউ মানে না, সাজানো কথা মনে করেন। এখন মানুষ সত্যকে জোর পলায় বীকার করতে ভয় পায়।

সেবলীনা দাসগুপ্ত

প্রথম বর্ষ, সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া গার্লস কলেজ

ছোটখাটো মিথ্যা অপরিহার্য

"সত্য সত্য কথা বলিবে" — এই উপদেশটা ছোটবেলা থেকেই ফুলের শিক্ষক, মা, বাবা, বাবু, ঠাকুরা জার সবার মুখেই ওনে এসেছি। কিন্তু একটু ডিম্বরে ভাবলেই বোঝা যায় কঠমানে সমাজে উপদেশটা অব্যাহত।

আধুনিক সমাজ — বিপুল জনসংখ্যা, প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন চরিত্র, নানা ঘটনা, অবিচার, জটিল পরিস্থিতি। মানুষকে পদে পদে এদের সাথে মোকাফিলা করে নিজের অভিন্ন টিকিয়ে রাখতে হয়। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ বা মনোভাবকে অনুকূল করতে, অবাঙ্কনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জটিলতাকে সরল করতে, ছোটখাটো মিথ্যা, বা অন্যান্য মানুষের অকল্যাণ থেকে আনে না, তার আশ্রয় নেওয়া যেতেই পারে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা বলা অপরিহার্যই বটে। উল্টে, এই পুরাতন উপদেশ এখনকার জটিল আধুনিক সমাজে অনুচিতভাবে বিপর্যয় থেকে আনতে পারে।

তাই উন্নত সংস্কৃতির কঠমানে সমাজে এক জঘন গোঁড়ামির পর্যবেক্ষণ পড়ে।

প্রকাশ বাসী

বিজ্ঞান বিভাগ, প্রথম বর্ষ, বিধাননগর কলেজ

কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়

এটা ঠিক যে আজকের দিনে সবসময় সত্যি কথা কপলে বেনেয়া হতে হয়; সত্যি কথা কপলে পক্ষে কেউ নীড়ানোর থাকেনা; সত্যি কথা কপলে নানান প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করতে হয় এবং অনেক সময়েই নিজের হতে হয় মিথ্যাচারিতার। এই সমস্ত কিছু হওয়ার পেছনে কতগুলো কারণ আছে।

আধুনিককালে বেড়ে চলেছে হিংস্রমীড় আর প্রতিযোগিতা। এইই হচ্ছে যে ক্ষিত্তবে কে হারবে, কে শৌর্যবে উঠবে, কে পড়বে বাসে;

এই নিয়ে চলে লড়াই। এই লড়াই মট করে বের মানুষের সত্যকে, পুষ্টিত করে মানুষের বিচারে আর মূল্যবোধকে। এই কারণেই খাতি, হুজুর্, ঈশ্বর অর্জনেব সেজে মানবিকতা, মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে, মানুষ এগিয়ে কঠমতা অর্জন করতে। এই কঠমতা অর্জন করতে যদি নিজের প্রয়োজন কনতে হয়, তা হলেও অনেকেরই শিখণ্ড হয়না। এবং অনেক সময়ে দেখা গেছে যে, কঠমতা অর্জন করা যায় না যদি কেউ সং পাথে চলে।

তবে একটু অন্যভাবে ভাবলে অন্য একটা চিত্র পাওয়া যায়। আধুনিক কালে সমসংসদ সত্যি বলা হতে বেকমি কিন্তু সত্যি কথা কপলে আমাদের কোনমিও নিজেকেই আত্মসম্মানেব কপে হেট হয়ে যেতে হবে না। জীবনের শেষ সময়টুকুতে আমাদের নিজের সত্যতার এই বলে বিচার জানাবে না যে, আমরা অসৎ ছিলাম। সত্যি কপলে হতে সেই অর্থ বিতপালী, কঠমতালসী হয়ে উঠব না, কিন্তু পরিহার থাকবে নিজের মর্দানার কপে। নিজেব চেষ্টানাব কপে, নিজের মননে কপে — নিজের কপে, এবং সেটাই বোধহয় যে কোনও বহুমানের চেয়ে অনেক বড় পাওনা — অনেক বড় মানসিক শান্তি।

পদ্মালী দাসগুপ্ত

অস্বীতি বিভাগ, প্রথম বর্ষ, বিধাননগর কলেজ

"সত্যতা" বর্জন করেই এগোচ্ছে সমাজ

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের জীবন হতে পড়েছে জটিল, সমস্যাসমুদ্র। এই ব্যতভারত জীবনের মাঝে মূল্যবোধের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। মানবসমাজের কেউ কঠর নিতে নৃষ্টিপাত না করে এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। আর এই গতিতে সবার সম্মত ভাল মিলিয়ে চলতে গেলে 'সত্যতা' শব্দটির গিরে না তাকিয়েই চলতে হবে, তারগ আজকের দিনে প্রত্যেক মানুষের জীবন হয়ে গেছে প্রতিযোগিতামূলক। মানুষ তার কেঁচ থাকার তালিয়ে এই প্রতিযোগিতায় নারতে বাধ্য হয়। কারণ সবাই চায় ভালোভাবে বেঁচে থাকতে, কিন্তু যারই সেই 'সত্যতা' শব্দটির মর্দানো নিতে যায়, তাকেই নিজেরের জীবন ত্যাগ করে তার মূল্য নিতে হয়। কিন্তু তাকে কেউ চায় না।

কঠমানে, দুনিয়ায়, তাই মানব সভ্যতাকে এগিয়ে চলতে হয় 'সত্যতা' শব্দটিকে ত্যাগ করে।

সেবলীনা দাসগুপ্ত

ছাত্র প্রোগ্রাম, বরানগর রাজকুমারী বালিকা বিদ্যালয়

সত্যের জায় হবেই হবে

সত্য সত্য কথা বলে জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার মতো মনোভাব বাসার থাকে তারাই আসলে সত্যক মানুষ। কঠমানে পৃথিবীতে এই মনোভাব বা এই ধরনের চেষ্টানাব দু' কাম মানুষের মধ্যেই থাকে, এখনকার যুগে মানুষ মিথ্যাকেই জীবনের অংশ হিসাবে বেছে নিয়েছে। যারই সত্য কথা বলে তাদেরকে খোঁসে কথা হয় বা কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সেই মানুষেরই উল্টে মিথ্যার জালে জড়িয়ে গিরে সমাজের এককোণে বড়কুটার মতো পড়ে থাকে। যদিও এখনকার সমাজে মিথ্যা ছাড়া সত্যের কোনো স্থান নেই মিথ্যাই এখনকার যুগের মূল লক্ষ্য তবুও পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থানে সত্যের জায় নিশ্চয়ই হবে।

রিমা জট্টাচার্য

ছাত্র প্রোগ্রাম, বরানগর রাজকুমারী বালিকা বিদ্যালয়



পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান আন্দোলনের পঁচিশ বছর (১৯৮২-২০০৬)

বসুন্ধরা, রুমত ভট্টাচার্যী বর্ষ সম্বোধনা
দুর্গাপুর শিল্পাঙ্গন সংগ্রহে এক কালচারাল ফোরাম
৫/৩ খ্যাত কলার পথ, টিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-১৬
প্রথম প্রকাশ : ১৯ জানুয়ারি, ২০০৭
পৃষ্ঠা : ৫০ টালা

সংকলনটির লেখকরা বিভিন্ন ভাবে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

অশোক বাখ্যাপাধ্যায় — তাঁর লেখায় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও তার সামগ্রিক কাণ্ডটিকে সহজ সুন্দর ভাষায় অত্যন্ত স্পষ্টতা সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন।

জমীন্দারদাস সাহু — আন্দোলনের কুসংস্কার বিরোধী ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক মনে করেন “আন্দোলনকে নিছক যান্ত্রিকভাবে কুসংস্কার বিরোধিতার মধ্যে আটকে না ধরে এবং ‘অসংকীর্ণ মত নিছক মাড়িত’ জাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ধর্মীয় ঐশ্বর্যবান ও সাম্প্রদায়িকতার মত নিকপলির সঙ্গেও তাকে সংশ্লিষ্টভাবে নেশানো প্রকায় — অবশ্য পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী” (পৃ. ১৬-১৭)।

শঙ্কর চক্রবর্তী — জানাচ্ছেন “ভারতবর্ষে জনবিজ্ঞান আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৭০-৭১ সালে দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। একটি কেরলের ‘সামলেট ভাঙ্গা’ প্রজেক্ট, অপরটি আজকের উত্তরাঞ্চল রাজ্যের গাড়োয়াল জেলার চিপকো আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।” (পৃ. ২১)। ওনার লেখার পাই ১৯৭৬ সালেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রায় আড়াইশ বিজ্ঞান ক্লাব নিয়ে গড়ে উঠেছিল পূর্বভারত বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠন (Eastern India Science Club Association) বা EISCA (পৃ. ২০ ও ২১)।

পরশু বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম লস্কর পরশু মুন্ডের বিপদ, পরশু-মুন্ডবিরোধী আন্দোলনে গণবিজ্ঞান কর্মীদের সামিল হওয়া, বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের ভূমিকা তুলে ধরেছেন।

সুজিত কুমার দাস সাক্ষাৎকারে গণস্বাস্থ্য আন্দোলনে গ্রাণ গ্রাকশন কোরাম যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা আমাদের মনে করিয়ে দেন। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে গ্রাণ গ্রাকশন ফোরাম কী ধরনের বই প্রকাশ করে তা বইয়ের নাকড়লি ওভারলি থেকে বোঝা যাবে “মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ”, “নিরীক ওষুধ” ইত্যাদি।

সব্যাসাঈ চট্টোপাধ্যায় — এর ভূলেছেন “পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলন মাত্র পঁচিশ বছর?” লেখক নিজেই এর উত্তর বোঝার চেষ্টা

করেছেন। দীর্ঘ আলোচনা সর্বসঙ্গীর্ণ। তথ্যসূত্রও বেশ লম্বা। লেখকের কাছে প্রত্যাশা নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করে যাচ্ছে আগামী দিনেও।

ব্রজ বাঘের ‘গণপর্জন’-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের মহাপ্রান্তের প্রধান আন্দোলনের পরিচূৎ বলা হয়েছে। লেখক পরিচিতিতে এমনটাই লেখা আছে। ব্রজবাবু কিছু তথ্য জানিয়েছেন —

১। ১৯৮৫ থেকে মহাপ্রান্তের তেহশিল আন্দোলনে গণপর্জন সক্রিয়।

১৯৮৭ সালে তদানীন্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী (শ. ব. সরকারের) অনুপ্রেরণা গণপর্জন একটি বসন্তা আইন তৈরি করে — অবশ্যই নামী চিহ্নসহ, সাংসদিক, আইনবিশেষের সহায়তায়। ভারত সরকার ১৯৮৮-এর জুলাই মাসে ‘দ্য ট্রান্সল্যান্ডেশন অব হিউম্যান অবগ্যান্য অ্যাক্ট’ আইনটি প্রণয়ন করেন।

২। চকুসানে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রা নৈরাশ্যজনক। সারা ভারতবর্ষে ট্রাফ সংগ্রহ ও কর্তৃতা প্রতিস্থাপনের যে মানচিত্র আছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের কোনো স্থান নেই।

ব্রজবাবু আসানসোলার এক পাঁচ বছরের শিশুও মৃতসহ চিহ্নিসং বিজ্ঞানের কাজে বান করাও ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে এক বোতল রক্তের অভাবে ঐ শিশু মারা যায়। পুরো ঘটনাটা আবার জানা। শিশুটি দুর্ভাগ্যেপূর্ণ ক্লাব ক্যান্সারে ভুগছিল এবং তাতেই মারা যায়। ব্রজবাবুর শেষ বরা তথ্য ঠিক নয়। ... উনি তো জানেন সেইখানে অসীকারকর্ষক বয়স্ক মৃতসহ নিতে পরিবারের সোচ্চক্ষণ অসীকার করেন। সমস্যাটা বেশ জটিল। ওনার লেখায় সে বিষয় উল্লেখ থাকলে ভালো হত।

অরুণেশু বাখ্যাপাধ্যায় — তাঁর লেখায় বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কুসংস্কার মনে চলার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুকূল ভৌমি সংগঠন ‘বিজ্ঞান মঞ্চ’ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে যে সক্রিয়তা দেখিয়েছে তারও উল্লেখ করেছেন। অথচ ঐ সংগঠন প্রতিষ্ঠার বয় আগে থেকেই আগে ছোট ছোট বিজ্ঞান ক্লাব ও সংগঠন বেশ ছোটসঙ্গে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে এসেছেন। শঙ্কর চক্রবর্তী ও অশোক বাখ্যাপাধ্যায়ের লেখাতে সেসবের উল্লেখ আছে।

ডায়াকসোহান দাস — অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বয় আলোচিত বিষয় ‘পরিবেশের অবনতির মূল কারণ ও প্রতিবিধান’ শিরোনামে লিখেছেন। যা পাঠ করলে বোকা যাবে সমস্যার গভীরতা। লেখাটি নিঃসংশয়ে মনেহোনা দাবি করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের সম্পর্কে লেখার সঙ্গে এ লেখা যায় কি?

ভগ্নন পুরকায়স্থ — দুর্গাপুর শিল্পাঙ্গন সংগ্রহে গ্রাণ কালচারাল কোরাম কী ধরনের কালকর্মে নিজেদের কাণ্ডত রাখে তা জানিয়েছেন, আর সংগঠনটির আন্দোলনের বার্তা জানানো হয়েছে।

সংকলনটি বিষয় নির্বাচনে যথেষ্ট পরিশ্রমের পরিচয় দেবেছে। লেখকরাও নিজেদের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন তাঁদের লেখায়। কিন্তু কেননা জন আন্দোলনের কাউকে সত্যকী কটিকে পবিত্র বলে অভিহিত করাও কি এক ধরনের কুসংস্কার নয়?

বরুণ ভট্টাচার্য

কেন পরমাণু চুট্টা চাই না

প্রকাশক : বিজ্ঞান প্রাচ্যবক

পল্টনী, খানা বীচপুর্, উঃ ২৪ নং পল্টনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭, মূল্য : ১২ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্বে যেদিনীশুকের হসিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন— অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন। রাজ্যের অনেক বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান সংগঠন, বিজ্ঞান কর্মী সরকারের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা নানান মিটিং মিছিলে, পত্র-পত্রিকায় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন, রাখছেন — এ নিয়ে কিছু বইপত্রও বেরিয়েছে। বিজ্ঞান অধেষকের 'কেন পরমাণু চুট্টা চাই না' — বইটি তারই একটি উদাহরণ। বইটি কয়েকজন লেখকের লেখার একটি সংকলন। প্রকাশকের শব্দ থেকে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষকে সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

এ ধরনের বইয়ে বা যা থাকে উচিত — যেমন, আমাদের দেশে (পশ্চিমবঙ্গ জো বইয়ে) বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবস্থা, তার খরচ-চাহিদা-ঘাটতি, সেই ঘাটতি পূরণে পরমাণু বিদ্যুৎ-এর প্রয়োজন আছে কিনা, পরমাণু বিদ্যুৎ কী, পরমাণু বিদ্যুৎ ব্যয় দিয়ে অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সেই ঘাটতি কতটা পূরণ করতে পারে, তার তুলনামূলক খরচ কী রকম, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ভয়ংকর পরিণতি, উন্নত দেশগুলি যখন এ ব্যাপারে এখন নিরুৎসাহ দেখাচ্ছে তখন ভারতের

নতুন করে এই সর্বনাশ ভেঙে আসার কারণ কী, তার যা কারণে হার্ব লেবা হচ্ছে — এ সব কিছুই এই বইয়ে আছে। বিজ্ঞানের কৌতুকলী পাঠক এতে সমৃদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্য লেখা সেই 'সাধারণ মানুষ' এতে ভতরখনি 'সচেতন' হতে পারবেন সেটা অবশ্যই একটা প্রশ্ন। লেখকগুলি থেকে তথ্য নিয়ে বিষয়গুলি যদি লেখা লেখান পবিত্রজিতভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হত তাহলে বচনগুলি লাল ধীপাত্য। তা না হয়ে লেখকগুলি কেমন রকম ভাড়া কন একটি সংকলন প্রকাশ করার বিষয়গুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বিভিন্ন বিষয়ে পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে ও একই বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের তেওঁরা ভাষণে মতোও গরমিল রয়েছে (যেমন, ২০০২ সালে ভারতে উৎপাদিত ন্যূনতমতর পরিমাণ নিয়ে তথ্য — প্রঃ পৃ. ৩৬ ও পৃ. ৩৭)। এতে পাঠকের বিশ্রাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, বিদ্বৎজ্ঞানের লেখা থাকলেও বলতে ছিলা নেই যে, ২-একটি লেখা ছাড়া বাকিগুলি কি সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছাবে নহ? তারপর, 'প্রবনী' চুট্টা', 'ডিম্বাটোটে ইউনিফর্ম'—এক নতুন পীতভাড়া শব্দ ব্যবহারের কি আসলি প্রয়োজন ছিল? লেখার শিরোনামে এরকম লম্বা থাকলে সাধারণ পাঠক কি আসলি আর পাতা উল্টাতে চাইবেন? বিষয়গুলি সহজ করে বুলিয়ে দেওয়াই তো (যদি বিষয়টি আসলি নেওয়ার দরকার থাকে) জনপ্রিয় বিজ্ঞানের প্রথম লক্ষ্য। 'ককবিজ্ঞানের মোড়কে' 'অন্যভাবে' শিরোনামে যে লেখটি দেওয়া হয়েছে তা কি আসলি বোধনবা? সাধারণের কাছে তা কেন ব্যর্থ নিয়ে আসে? মোড়ক কি তাঁরা আসলি খুঁজে পাবেন? এরকম নানা প্রশ্ন বইটি পড়ে মনে আসছে। এছাড়া আরে নানান অনসতর্কতা। প্রচ্ছদে 'চুট্টা' থাকলেও বইয়ের ডিভিরে 'চুট্টা' / 'চুট্টা'র ছড়াছড়ি।

যাই হোক, এটা তো ঠিক, বিজ্ঞান চেষ্টনা প্রসারে এখনকার কেন্দ্রীয় বইটুকু হচ্ছে বা বিজ্ঞান অধেষক—এর মতো সংগঠন, ছোট ছোট বিজ্ঞান ড্রাবই করছে। এজন্য অবশ্যই তাঁদের ধন্যবাদ। তবে আর একটি প্রশ্ন, নিষ্ঠা ও সচিব নিয়ে বইটি সম্পাদিত হলে ভালো হত।

সুদানকান্ত রায়



□ গত ১০ এপ্রিল খাউনিয়ার ডাঙ্গা, আসরুর্কণি সহ বিভিন্ন গ্রামে কোচবিহার বিজ্ঞান চেষ্টনা ফোরামের কর্মীরা 'অলৌকিক নগর বিজ্ঞান'

বিষয়ে আয়োজন প্রবর্তনীর আয়োজন করেন। সাধারণের কাছে 'অলৌকিক' হিসেবে পরিচিত এমন অনেক ঘটনার বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা তাঁরা দেন।

□ গত ৩১ মার্চ কোচবিহার সূর্যক সেবা কেন্দ্রে 'কেন পরমাণু চুট্টা চাইনা' শীর্ষক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। তপন দেন, হিরেশ দাস প্রমুখ বিজ্ঞান কর্মীরা আলোচনার অংশ নেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে কোচবিহার বিজ্ঞান চেষ্টনা ফোরাম ও বিজ্ঞান অধেষক পত্রিকা।

□ গত ১৫ জুন শরিকজি আমলাত ও কতোয়া নিবিছ করার দাবিতে কলকাতার মহাবোধি সোশাইটি হলে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজন করে মানববাহী মঞ্চ।

চিনের পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদ

সেবদ্রত পণ্ডা

বর্তমান বিশ্বের মোট দ্রব্য ও পরিষেবা উৎপাদনের ১৫ শতাংশ কৃষির চিনের প্রাপ্ত। গত পাঁচ বছরে এই দেশের মোট দেশীয় উৎপাদন কেড়েছে প্রতিবছর গড়ে ১০ শতাংশ হারে। উৎপাদন কৃষির প্রভাবে ১৯৮০-র দশকে চিনে মাষাশিল্প আর বেড়েছিল বছরে ৮.১ শতাংশ হারে। ১৯৯০-২০০০ এই সময়পরে ওই কৃষির হার আরো বেড়ে দাঁড়িয়েছে বছরে গড়ে ৮.৫ শতাংশ। পৃথিবীতে এর আগে কোনো বড় দেশে এই হারে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেনি। আচ্ছা বিশ্ব পুঁজি দ্ব্যবস্থায় চিনের অতিদ্রুত। ওখানে উৎপাদনের বরফ কম, সরকারের ভূমিকা লাহকরীদের দৃষ্টিতে সমর্থক। মূল্যস্ফূর্তনের এর চেয়ে ভাল জায়গা খুব বেশি নেই। এত ভাল'র পাশে কিছু ফ্যাসিপের অবস্থান কৃষি পাশ্চাত্য মতে অসম্ভব নয়, যদিও তা বোঝান। চিনের লাগান ছাড়া উন্নয়ন সেদেশে তৈরি করেছে আগের প্রকল বৈষম্য, ঢেকে এনেছে কোয়ার্টার, অর্থনৈতিক অসম্পদ্যতা, গণ-অসন্তোষ। দুর্নীতি সর্বত্রের পবিবাস্ত। শিক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবার বৈয়াল দশ। প্রমিত শ্রমীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের এটি পরিণাম। আমরা বোকার চেষ্টা করব চিনে সমাজতন্ত্রের পুঁজিবাদে উত্তরণের গতিপথটি।

কৃষি ও কৃষকের সর্বনাশ : মানবীর সম্ভাষ

চিনের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২০-র দশকের গোড়ার দিক থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত ভননগত বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছে বৈশ্বীয় সামন্ততন্ত্র, আনন্দাত্মিক পুঁজিবাদ আর বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের নির্মূল করার লক্ষ্য সামনে রেখে। এই লড়াইয়ে কৃষাধী-কর্মস্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থাকে বশে নিয়ে ভূমি সংস্কার কর্মসূচির রূপায়নের চেষ্টা হয়েছে বিপ্লবের কোড়ায় দিনগুলিতে। ১৯৩৭ সালে জাপানি-ব্রহ্মাণী লড়াই চলার সময় পার্টি গ্রামাঞ্চলে তেমন তেমন কৃষাধীনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেয়, যাঁরা জাপানি-ব্রহ্মাণী প্রতিবাদি যুদ্ধে বোণ দিতে ইস্কুত ছিল। ১৯৩৭-১৯৪৫ ওই পার্টিতে কৃষিসংস্কারের কাজ স্থগিত রাখা ছিল। ১৯৪৫ সালে জাপানিরা আত্মসমর্পণ করার পর ভূমি সংস্কার কর্মসূচির রূপায়ণ আবার কেন্দ্রীয় কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এই কর্মসূচি মূলত কৃষকদের সশস্ত্র অস্ত্রাধারের চেষ্টা নয়। এই সংগ্রামে প্রত্যেক গরিব চাষি আর ক্ষেতমজুর রাখা তুলে দাঁড়ায়, যদি কেউ নেয় কৃষাধীনের হাত থেকে, বাঁচোয়ার করা হয় সেই জমি বাঁচা নিজের দান দিয়ে চাষ করতে ইস্কুত তাদের মধ্যে। এইভাবে কৃষকেরা বান পোলের স্বাধীনপ্রাঙ্গ, কামসুত হয়ে উঠার প্রাণ ঢেলে ছবির যন্ত্র নিশেন, কৃষিতে উদ্ভূত উৎপাদন হল, বাজারে সে উদ্ভূত

বিক্রি করে জমিতে ফলন বাড়ানোর জন্যে কৃষকেরা পুনরায় বিনিয়োগ করলেন জমিতে, এতই স্নায় নিজেদের অন্যান্য প্রযোজন মেটানোর ভাগিগে আয়ের কিছু অংশ খরচ হল শিক্ষাজাত দ্রব্য কেনায়। এভাবে সমগ্র অর্থনীতিতে জোয়ার জাগল। ১৯৪৬-১৯৫৫ — কৃষিসংস্কারের এই পর্ব অতিক্রান্ত হবার পর প্রথম ত্রিবিধ বছর চিনা অর্থনীতিতে কৃষির হার ঠাঁড়াল বছরে ৭ থেকে ৮ শতাংশ। কৃষিসংস্কার না হলে এই মাফলা আসত না।

তার ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ যে অতৃত্তপূর্ব কন্যা এবং পরা দেশে সেয় সেসময় পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের চেতন বিনিয়োগ এমনভাবে প্রকিয়ে বসে যে পার্টি তখন দু'টুকরো হবার উপক্রম। ওই পরিস্থিতিতে কৃষিকের মোকাবিলা করতে পার্টি ব্যর্থ হয়। তবে সেই ব্যর্থতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কৃষিতে সমবায় আন্দোলনে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কমিউন গড়ে ওঠে, সমাজতন্ত্রের ত্রিত্ত বহুদূত করা হয়। প্রতিটি ব্যক্তি তার প্রদান অনুসারে ফলনের একটা ম্যাক্স। অংশ পাবার হুকমের হলেন। জমি ব্যবহার করার অধিকার কমিউনগুলির হাতে দেওয়া হয়। এই কমিউনগুলি ওণু কৃষিকার সংগঠিত করত এমন নয়। কৃষি থেকে উদ্ভূত সংগ্রহ করে লম্বু বা ছোট শিল্প ইউনিটে তারা তৈরি করেছিল, সেগুলির পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সেই গ্রাম সমবায়ের ওপর। উৎপাদনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও নতানপূর্ণত সংগ্রাম পরিচালনা করে সমবায়গুলি সমাজতন্ত্রের বিনিয়োগে সুদূত করল। এইভাবে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি একেবারে তৃণমূলস্তর থেকে স্বনাত্মিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক বিবেকীয়করণের প্রক্রিয়ায় সন্তোজনভাবে নেতৃত্ব দেয়। গ্রাম-বহুরের দৃষ্টি মেটেতে অনেকবান সাহায্য করে এই ব্যবস্থা। "দশটি মহান সম্পর্ক" (Ten Great Relationships)-এ মাও বলেছিলেন, যদি ভারি শিল্পের বিকাশ ঘটাতে চাও, তাহলে অবশ্যই কৃষি আর লম্বু শিল্পের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এটা বুলি স্বপচানো নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বুঝেছিলেন, ভারি শিল্পের জন্যে অপরিস্রাব্ হলো ক্রমতার কেন্দ্রীকরণ, কৃষি আর লম্বু শিল্পের ছাড়া ক্রমতার বিবেকীয়করণ করে তখনই এতানা যাবে কেন্দ্রীকরণের দিকে। নইলে আনন্দাত্মিক পুঁজিবাদ জনগণের ঘাড়ে চেপে কাষে, যেমনটা ঘটেছে ভারতের শিল্পবিকাশ।

এত কিছু করেও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় নি। ১৯৮০র দশকের গোড়ার দিকে তেঙ-এর 'সংস্কার' কর্ম শুরু হলো। তার প্রথম বলি হলো কৃষি সমবায়। সেগুলিকে চেঙে এক এক ফালি ভনি দেওয়া হলো কৃষক পরিবারদের। চৌধ চাষ চেঙে যাওয়ায় জমিতে উদ্ভূত

উৎপাদন হারিয়ে গেল। ভূমি আর উৎপাদনশীল হ্রীল না থাকের মত। প্রায় ১০ কোটি কৃষক চাষের মরমত শেষ হয়ে গেলে বেশিরভাগে পড়তে আরও কয়েক উপকূল শহরগুলিতে কৃষকসম সম্মানে। কেউ কাজ পায়, কেউ কাজ হারান হয়ে থেকে নিজেদের গ্রামের বাড়িতে যেখানে রয়েছে তাদের সম্ভাবনামূলক, বাবা-মা বা নিউজেন। পরিস্থিতি ক্রমশ এতই খারাপ হয়েছে যে কৃষক পরিবারের গৃহস্থলুপ্তও যেখানেই হয় আরের সম্মানে, কেউ বা কারখানার কাজ পায় নামমাত্র মজুরিতে যেখানে হাড়কাটা পরিগ্রহন করতে হয়, আর সে-কাজও যার ছোট্ট না, তাতে বাধ্য হতে হয় শ্রেণিবিক্রির স্বাক্ষর নাহতে।

চলিও সাধারণভাবে ডেড-অন্যায়ীরা ফ্রাং করতে থাকে কৃষি সমস্যাগুলির বিষয়ে, উইলিয়াম হিট্টন বলেন এই প্রকার উদ্বেগজনক। কেননা, ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে দেখা যায়, ২৪ কোটি কৃষকের অবস্থার খোঁজ উন্নতি ঘটছিল সমন্বয় কৃষির সীমিত। তার ফলেও এর বেশি সংখ্যক কৃষকের সমন্বয় ইউনিটগুলি সাফল্যের মুখ দেখেছিল। তাহলে সমন্বয় প্রচারা গ্রহণ করা বা গ্রামীণ উৎপাদনের সংগঠিত করার কাজের কোনো ভবিষ্যৎ বাসে কিছু নেই, এমন কথাও বাস্তব ভিত্তিই নেই।

‘সংস্কার’-এর আসল লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদনের সাফল্যকে বিনষ্ট করা। কেননা তাহলেই একমাত্র বলা যাবে কৃষিকারের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ভূখনি কথা আছে, দেশের অর্থনীতিতে কোয়ার জন্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা ডারি শিল্প গড়ার ভেতর দিয়ে, আর তার জন্যে বিশেষ লক্ষ্য না হলেই নয়। বিশেষ লক্ষ্যের পরামর্শের জায়গা হতে পারে চীন একমাত্র প্রম কোয়ার জন্যে যদি উঠির কাজে এক বিশাল বাহিনী। তার সমস্তেরা যদি ভবিষ্যতেও পলিত হই তবে গিয়ে তার মজুরিতে হাডকাটা রাইনি ঘটিতে তারা কথা থাকবে। সুমধ্য শিকারের এই অনুকূল পরিবেশ রচনার জন্য দরকার মার্কেসের পরিচালনা প্রোডাক্টিভিটির (মালিকানাধীন মজদুর শ্রমী) এক বিশাল সংরক্ষিত বাহিনী। কৃষির অগ্রগতিতে রুজু ক’রে ডেড-এর সংস্কার কর্মসূচি। কৃষককলকে বাধ্য করল মালিকানাধীন বিশাল মজদুর শ্রমীতে কোণ দিতে। শেষের বাজার উঠির করাই ওই সংস্কার-এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

উইলিয়াম হিট্টন দেখিয়েছেন, ১৯৪৯ থেকে ১৯৮৬ এই পর্বটিতে (১৯৪৯ থেকে ১৯৬১র কৃষিতে বিপর্যয় ধরলেও) খাদ্যশস্য উৎপাদন বছরে বেড়েছিল ৭.৪২ শতাংশ হারে। ওই সময়টিতে জনসংখ্যা বেড়েছে গড়ে বছরে ২.৪ শতাংশ হারে। খাদ্যশস্যের জনসংখ্যাভিত্তিক জনসংখ্যাভিত্তিক তুলনায় এর বেশিই ছিল। কিন্তু ডেড-এর ‘সংস্কার’ করের ফলে খাদ্যশস্যের ফলন কমেও শুরু করল। ১৯৯০ সালে ওই বৃদ্ধির হার পঁড়ায় ১.০৪ শতাংশ — জনসংখ্যাভিত্তিক হার তাকে বাড়িয়ে গেল, যদিও জনবৃদ্ধির বার্ষিক হার তখন কমে পড়িয়েছে ১.৫ শতাংশ (হিট্টনের প্রবন্ধ “দ্য রিস্ট্রাক্টিভন অফ চায়না” Monthly Review July/August 1998)।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার কমে এলেও চাষের জমির সোঁট আরও কমাতে অনেক বেশি বিশৃঙ্খলক গতিতে; ওই দেশের একাডেমিক পণ্ডিতেরা খত ভরেই কোনো কারণ নেই — এক কথা বলছেন। তাদের

যোগানেও কোনো চান পড়বে না বাঁসে টায়ের অনুমান। টায়ের খাবারীর হিসাব গড়িয়ে আরও দুটি প্রধান ধাক্কার ওপর ভিত্তি করে :

১. আধুনিক প্রযুক্তিতে ব্যবহার ক’রে দেশে বর্তমান পতিত বা চাষের শক্তি অনুপযুক্ত ভরিতক চাষ-ভরিতক পলিত করা যাবে;
২. নতুন নতুন উন্নত জাতের বীজ উদ্ভাবন ক’রে, আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের সহায়তায় এবং জলসম্পদের উন্নতি ঘটিয়ে কৃষিতে ফলন বাড়ানো যাবে।

টায়ের আলোচনায় যে বিকল্পগুলিকে ধরে নেওয়া হয়েছে, তার সবটাই বাস্তবে ঠিকঠাক না-ও থাকতে পারে। এখন অনুর্বর বা পতিত ভূমি নিয়েও যতটা ব্যবসা ভরিতক চলেছে। এখন শ্রমের সম্মান পরিবারগুলি অনেক জায়গায় পতিত ভূমি অংশভুক্ত কর্ম লম্বা ফিরে বসে আছে, ভবিষ্যতে লম্বা বাড়লেও বাড়লেও কামানোর অশেষ। শিল্পস্থান কিংবা আদ্যন্ত প্রকল্পের প্রসার ঘটলে এমনতে জলসংরক্ষিত বাড়তে ভবিষ্যতে। এখন অনেক ক’টি নদীর ভরাটেরা যেমন পতিত পৌছতে না। নদী গুলিয়ে আরও নদীর নিচে জলস্তর অংশভুক্ত করতে না। সুতরাং জলসম্পদের উন্নতি ঘটানোর হস্ত পুরে ইদং সমাধা কম। রাসায়নিক সার ব্যবহারের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বিশ্বব্যাপী নদী কৃষিপ্রযুক্তির ধীরেধীরে প্রবর্তন করে তুলেছে। এ অবস্থায় খাদ্যের ফলন বাড়ানোর আশাস নিছক বাস্তবিকতা হাঙ্গা হাঙ্গা তার কিছু নয়। মলিনাক্ষরকার প্রদর্শনগুলিতে সানান্দ্য আর তুলেই হস্ত যতই করে গেছে। এমনকি, উপকূল অঞ্চলের সমগ্র ভূখণ্ডে দান উৎপাদন পরপর হ্রাস পাচ্ছে। আর আবার যখন বিশেষ গবেষণার দাবি চিন্তন নবা ধর্মজন্মের মনোবলন করতে গল্ফ ফোরের মাই বানানোর হিড়িক লেগেছে, তখন কৃষি উৎপাদন চাঙ্গা করা বাস্তবে অসম্ভব কাণ্ডার।

২০০১ সালে বিশ্ব বাসিন্দা সংখ্যা সমগ্র হবার ৯৮ চিন এমনতে কৃষিপ্রচেষ্টার আমদানি বাড়িয়েছে। সরাসরিভাবে রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে দেশেরকারি মালিকানা আরও কোনো অঙ্গবিশেষ নেই। এখন কি, শ্রমের বাজারের আয়তন বাড়িয়ে চলার জন্যে পলিত ৬০ নেওয়া চলেছে। বিখ্যাত অর্থনীতির নিরম মোতাবেক বাজারের পিত্ত তাকিয়ে লরি কার প্রবন্ধ দেখা নেবার পরিণামে কৃষিকর্মি বাস্তু কেড়ে নিচ্ছে কৃষকদের হাত থেকে। রাষ্ট্রই যেহেতু ভূমির মালিক, সুতরাং লক্ষ্যমূল, সূচনারইওয়ে, ইম্প্যাক্ট কারবান, তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাকার বিভিন্ন কাজে ভূমি কেড়ে নেবার জন্যে নোটিশ জারি হচ্ছে যেখানে দেখানো। বিভিন্ন নগর প্রশাসন বা প্রকল্প তত্ত্বাবধি অনিচ্ছ কৃষকদের হাত থেকে বৈচিত্র বঙ্গ প্রচণ্ড করে ভূমি নিয়ে নিচ্ছে। গ্রাম থেকে কর্মপ্রবর্তীরা ভিত্তি জমাচ্ছে উপকূলবর্তী শহরগুলিতে যেখানে বিশেষ যোগাযোগিতা উৎপাদনে উদ্বৃত্ত কর্মচারের জন্যে এই ভবিষ্যতের নিয়োগ করছে তাদের কারখানায় — কাটা ডালো, তাদের কাঁচা পুরে নিচ্ছে।

চীনা সরকারের এক হিসাব অনুসারে, ১৯৭৯ থেকে ২০০০ এই সাত বছরে চীনে ৩৬,৬৭০ বর্গ কিলোমিটার চাষের ভূমি প্রকৃষিকাজে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। [সূত্র : Xia Yunfan, www.atimes.com/atimes/China/FG 17A do3.html, ৩১]

17.07.2004] তথ্যচিত্র মহলেব বারনা কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ আবার ক্ষমত্রে, যেহেতু এই বিসারের মধ্যে লাগামহীনতা বৈ-অইনি জমিগ্রাস তিব্বা কনাবনী জমির আয়তন বৃদ্ধিতে বঙ্গ হইনি। এক অর্থে এটা বুঝি চাকলাকার তথ্য, এই কারণে যে, ১০০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৮০ কোটি মানুষ কৃষক, অতঃ চাষের জমি কমে যাচ্ছে।

১৯২০-২০০৪ এই ৮৪ বছরে ৬ কোটি ৩০ লাখ চিনা কৃষক চাষের চাষের জমি হারিয়েছে। জমি গ্রাস নীতি সরকারি আমলাদের পক্ষেই তারি ক'রে চলেছে আর লাখ লাখ কৃষক বিবেচিত হচ্ছেন গৃহহীন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জমি-গ্রাসে দৃঢ় হয়েই স্থানীয় সরকারি পন্থা ব্যক্তিবা, পাটি আমলাতন্ত্র আর গ্রামের প্রধানের। তারা জমি কেড়ে নিচ্ছে সেনাবাহিনী, পুলিশ আর ভাড়াটে ওতা নিয়ে। একেবারে ভাঙ্গা আমলে ভারতে জমি গ্রাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে একইভাবে। তদন্তের মধ্যে চিনে বোহের একল্লীয়া শাসন, তাই জমিগ্রাসে বড়বাড়ি হলেও স্থানীয় সংকল মাধ্যমে তার প্রতিফলন থাকে না। এমন কি, চুড়ান্ত ভাবে মানবিকার লঙ্ঘনের ঘটনাতও কোনো কঠীন বিচার ব্যবস্থার ব্যবস্থা হবার সুযোগ কৃষক সাধারণের নেই। হাজার হাজার ঘন্টা ঘটে চলেছে এখনকার চিনে — ঘটছে কৃষকদের প্রতিবাদ, তাতে ঘটনায় বেড়েই হচ্ছে কুলটোর খাবাতো। জমির জন্যে কতিপয়বর টাকার প্রত্যয়ে ক'রে চলেছে সরকারি আমলা থেকে চিনা পাটির কৃষকলঙ্ঘনের অভিযোগকুল। কৃষকদের বঞ্চিত ক'রে তারা হারে উঠিয়ে দিচ্ছে ধনী ধনী।

১৯৮০-র দশকে 'ডেং-এর' 'সংস্কার'-এর মকল জমিতে আলা ফেরতকারি মালিকানা সৃষ্টি করা হয়েছিল। তদন্তকভাবে জমি বন্টন ক'রার সম্পত্তি, তবু ব্যবসে রাষ্ট্রের কান থেকে উদ্ধৃতিতে পাওয়া ওই জমিতে ভোগ দখলের অধিকারের স্বীকৃতি ছিল। কৃষক ওই জমি ব্যবহার করতে নিয়ে যাকনা পেতেন, কেউও পারতেন নে-জমি কিংবা উৎসের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনাদায়ী করার সুযোগও ছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার যে উত্তরন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সরকার, তার ফলে ক্রমশঃ কোটি কৃষক উচ্ছেদ হতে থাকেন বিবেচিত দেখতে। শিল্পায়নের ধ্রু দেখিয়ে কৃষকদের জমি কেড়ে নেওয়াতে যেভাবেই সমর্থন করা হোক না কেন, তাশি কোটি কৃষককে নিম্ন প্রমিতক পরিণত করার যে ক্ষেত্রে প্রত্যাস নিম্নক হাঙ্গর। তবু এ জমি-গ্রাস থামছে না কেন? তার কাল সম্পত্তি নিয়ে কোনো-কো ক'রে আছে কিছু পাটি নেতা রাষ্ট্রাধিকার মন্ত নত্ব কৃষকের হারে উঠেছে। জমির দখল পেরলর, কৃষিজমি সব লাগানো হচ্ছে অকৃষিকাজে। সম্পত্তির কারবারিয়া সেই সুযোগে জায়ে ধনী সাক্ষার সুযোগ পেয়েছে। এমন কি তাদের স্থানীয় সরকারের বাড়তি প্রোজেক্টের একটি মোকদ্দম রাখা হয়ে দাঁড়িয়েছে জমির কারবার। হালি সোখ কুচুর মতে বছরে ২ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি পরিণত হচ্ছে বিলাস বিলাস চওড়া রাজ্য, ইয়া বড় বড় কলকরখানা, শপিং মল আর আবাসন প্রকল্প। [১] ডেং = ১.৪৭১ একর [মুঃ Swati Lodi Khandu, www.sincos.com /sinacosChina — Business/19 Ch 01.html উত্তির 19 জুলাই, 2006]

চিনের কৃষক জনগণ রাষ্ট্র ও পাটি বাহিন্যদের সংগঠিত আক্রমণের সামনে ভয়ে ভুগু হারে আসছেন, ব'লে অনেকের ধারণা।

ব্যবসে হারিত। একেবারে জালানা। কৃষকদের মাথা জোত লাড়ছে, শ্রুতীকৃত অশান্তি আক্রমণের অবসরে ফেটে পড়ছে এখানে-ওখানে। অসহ্য সাহসে ডর ক'রে তারা প্রতিবাদে সাক্ষি হচ্ছেন, প্রতিবাদে গড়ও উঠছে। পরিহৃত এককম্বা অস্ত্রগর্ভ। তার বিবরণ পাওয়া যায় ইন্টারনেট টাটসে। কিছু পাকিস্তানদেশের পরশপত্রিকাতেও তার সন্ধান মেলে। মিত্তানতুন তথ্য জালাছে নিরপিত সংবাদমাধ্যমের মারফতে। চিনের নিজের প্রচার মাধ্যম এ বিষয়ে মুখে একেবারে কুলুপ এটা বাস আছে। সরকারি যন্তোয়া বিবিতভাবে না থাকলেও রক্তচক্ষুরে উপেক্ষা করার হিংস্র আছে কার?

গ্রামাঞ্চলে অসন্তোষ বাড়ছে, যতই তেঙ শিলাও শেঙ-এর তত মেলে চিন পৃথিবীকালে ব্যবহার ক'রে সমাজতন্ত্রকে মনুতুত কলাদ পাছে এওচ্ছে। বিশ্ববিশিষ্ট সংস্থার সদস্য হওয়ার পর এই অসন্তোষের মাত্রা বিশদ্বন্দ্বকহারে বাড়ছে, ব'লেও একেবারে হালফিল সরকার নিজেই বিরত, পাছে ২০০৮ সালের বিশ্ব অলিম্পিকের সময় এই গল অসন্তোষের বধর বিশ্বময় বেশি ছড়িয়ে যায়। কৃষকদের উপর অত্যাচারের ঘটনাওগি তমস্ত করা হয়ে বলে জানিয়েছে সরকার। চাষের জমি আর ঘরবাড়ি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে আপাতত জয়কটা মাস একেবারে সাবধান চলার কৌশল অবলম্বন করেছে চিন। এখন জমি হারিয়ে লালো লাগো কৃষক তাঁদু পেড়েছেন তাঁদের ঘরবাড়ি অংশে জমি যেখানে সেই সমস্ত জমির ওপর। পুলিশ-সেনাবাহিনী আর আধা-সামরিক বাহিনী দিয়ে ফিরে কৃষকদের বাড়ি-ঘর বৃশভোক্তার এনে ভেঙে ফেলা হয়েছে। যেখানে তদারকিত উগ্রামপ্রকল্পের জন্য কৃষকেরা যোগ্যে ঘরবাড়ি যেতে যায় নি, কিংবা ঠিক মত জতিপুল পাবার আশায়া তারা দর কবাকতি চালাচ্ছে।

নীতাবে জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তার একটি সংগঠিত বিবরণ নিলে দেখা যাবে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার দৃঢ় হয়ে যেসব দেশের সরকার তারা নিজের দেশের মানুষকে নিয়ে করে ছাড়ছে কত নৃশংস উপায়ে, অতঃ তারা স্বার্থকতা করছে কার? দেশবিশেষের বড় বড় পুঁজিপতিদের। দেশের মানুষ যেন উপনিবেশের প্রজা; সরকারি কর্তাব্যক্তির কথা না শুনে নিলাঞ্চার অত্যাচারের খড়ল নেমে আসছে তাঁদের উপর।

চিনের উত্তরাংশে হেবেই প্রদেশের বাও লিং নগর এলাকার একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। ২০০৪-এর ১১ই জুন দিনের অসো ফেটির মুখে ওতাসের বেহুড়ক গ্রামের খুন হলেন ৬ জন কৃষক আর আহত ২১ জন। ১৬২ জন কারাগারে, তার মধ্যে ৩১জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রোচ্যার করা হয়, ১০১ জন ছিলেন অপরাধী সন্দেহে কারাগারে আটক। এ বধর চিনের সরকারি সংবাদ মাধ্যম নিম্নলিখিত। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় কর্মকর্তারা নগর এলাকার কয়েকজন পদস্থ অফিসারসহ শেত্ৰ গ্রামে আসে, সঙ্গে ছুটি বড় বাসে এল ৩০০ জন ওতা নিয়ে। ওই গ্রামে ২৬ হেক্টর চাষের জমি কৃষকেরা ছাড়তে রাজি হচ্ছিলেন না। রাষ্ট্রীয় সংস্থা হেবেই ওয়েন্ডা পাওয়ার কোং-র বর্ডা ফেলার জন্যে তাঁদের পরিবেশ বিধিয়ে বাবে, এটাই ছিল তাঁদের অভিযোগ। ২০০৩ সাল থেকে চাষিয়া অনন্যায় মনোভাব নিয়ে চলার

যাও নিঃসঙ্গ এলাকার প্রাথমিক কর্মসূচী প্রতিপালনের প্রক-ও ছিলে পালনে নিঃ। প্রাথমিক তৎবে জানানো হয়, ওই সংস্থার জন্যে ১০টি গ্রামের ১১৬ হেক্টর জমি সরকার, এ ধর অংশেই হাউস হয়ে গিয়েছিল। তবু শেখর গ্রামের কৃষকেরা তাদের সিঁড়ারে অটল ছিলেন বলে ওই সরকারি সংস্থার বিলম্বজন্য ওটা নিয়ে অসন্তোষ চালায়। এই ঘটনার প্রথম দেখা গেল সরকারকে একই সমস্যা পড়তে।

এর আগে অনেক ঘটনা ঘটেছে। সরকারি উপাদান থেকেই বলাবলি। ওই নভেম্বর ২০০৪ সিক্তান গ্রামের হানিউয়ান গ্রামে ১৭ জন প্রতিবাদী কৃষক নিহত হন পুলিশের গুলিতে, আহতের সংখ্যা ৪০। প্রায় ৭০০ জন মধ্য পুলিশের দল ওইদিন সন্ধ্যা ৬টাে কিছুকালের কৃষককে ধর পাড়ক করে, তবুও তাক ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখায় রাত্রি ১০ টার সময় জনতার সিকে বন্দুত তাক কঠোর পুলিশ গুলি চালাতে থাকে। এ সিকে লুও পল নামধারী প্রধান বিরোধী অফিসার কয়েক ঘণ্টা আগে গ্রামে হাজির হওয়ায় সেজেকের মনে কিছুটা ধ্বি আসে। অনেকে চেষ্টাছিলেন, সরকার তাদের অত্যা অভিযোগে কান দেবেন। সেবা গেল, বিঃ লুও এদেশেই কৃষকদের উচিত শিক্ষা দেবার কাজটি ভারতকি করতে। এই ঘটনার পরে মন্ত্রীগ্রামে কংগ্রেস (১৪ই মার্চ, ২০০৭) কিছুটা সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

কৃষকদের জমি জোর করে খসলে নেওড়া, তার ভাগে জনা ধার্য প্রতিপালনের অসুবিধে কমিয়ে সেখানেওর জনা অনেক সময় আকলপক্ষে জমির ওপর ভাড়া কাঁচ, প্রানিহিত বা ভাড়া টাইলস্-এর টুকরো ছড়িয়ে নেওড়া হয় হাতের মধ্যে। সরকার কৃষকদের জমি অবধা দেখে বুক চাপড়তে থাকে। তারা তখন ঘরবাড়ি ছেড়ে লোণায় মাথায় ওঁড়লে তার সুসুন্দরভাব ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই সুযোগে সরকারের তরফে জমির ভিত্তিও ছবি নেওড়া হয়, যাতে সেখানে যায় উর্বার জমি নয়, এতলি নেহাও কৃষিকারে অনুপযুক্ত জমি। এত কিছু করার পরও যদি কেউ ঘরবাড়ি ছাড়তে না চায়, তাদের শাকড়ও করে পুলিশ বা নিরাপত্তাকর্মীরা। এই জাতীয় অত্যাচার কথা করিয়ে হাজার হাজার লাখ লাখ ঐকবদ্ধ প্রতিবাদী গড়ে তুলতে।

সম্রাজ্যে ঘরবাড়ি থেকে বিভাডনের মোটলি বেক সিচয়ান গ্রামের অপরূপ হানিউয়ান কাউন্টির দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারেরা। তারা হিসাবে বলা হয়, একটি জনবিস্তার কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। ২০০৪ সালে ২৮-২৯শে জুলাইর প্রায় লাখখানেক কৃষক ও ছাত্র কাউন্টি প্রাথমিকভাবে অফিসে চুকে ভাঙুর হামলা, হুকি বধ হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ সাত ডাড়াডাড়ি করে প্রায় দশ হাজার মধ্য পুলিশ পাঠায় কৃষকদের হুমকি দমন করতে। তার ঠিক দুইদিন পর আবার ৫০ থেকে ৬০ হাজার গ্রামবাসী নিকটবর্তী শহরগুলিতে জমজমে হয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান পরিচালনা করেন। ওইদিন রাতে একজন সত্তর বছর বয়স্ক বুড়াকে বেড়ে গেলো এক বাড়ি পুলিশের সামনে কয়েক ঘণ্টা। এই ব্যক্তিকে মাথা ইট দিয়ে বেঁচেয়ে হত্যা করে বীরপুত্র পুলিশের দল তাদের শৌর্য প্রদর্শন করে।

বি বি সি-র সংবাদে জানা যায় বেজিংয়ে প্রদেশের হুজি-তে একদফার দামদ্রোদা ধামানোর ব্যাপারে ছিলেন অধিকাংশ পুলিশ

বাদিনীক পঠানো হয়; আনুমানিক প্রায় ২০ হাজার কৃষক সেখানে দুইময় সবজি বিক্রি আর পাঠি নেতাদের গারিবাজী গাজের বিক্রিও বিক্রিও দেখছিলেন। কৃষকদের হাড়া বেহে পুলিশ ব্যাং ডাশ দেখে (১০ই এপ্রিল, ২০০২) ওয়াশিংটন প্রতাপে ছোট-বড় বিভিন্ন ধর্মিক কৃষক বিদ্রোহের লক্ষ্যভুক্তি ঘটনা ঘটে ওয়াশিং ২০০৪ সালে। ২০০৭ জুলাই ওই প্রদেশেই তাইহি-তে মেহনতে তাড়ানোর চেষ্টা করে গ্রামবাসীরা। ওই ডিসেম্বর, ২০০৫-এ ওই এলই হুসেলের লোক-তে বিশ হাজার প্রতিবাদীকে হুতম করলে গুলি চালিয়ে ৫০ জনকে মারে মধ্য পুলিশ আর সেলায়া। ওয়াশিংটন শোটে-এর ১৪ই জুন ২০০৭-এর হিসাবটি দেখা যাচ্ছে, গ্রামবাসীরা নন্দীগ্রামের ধার্য শেখর গ্রামে রাজ্য কেটে একটানা পাহারা চালিয়ে গেছেন যাতে বিদ্রোহ প্রবল থাকে তাদের গ্রামের জমিতে কোনো কাজ করা সম্ভব না হয়। কৃষকদের অবনতির মনোভাবের দৃষ্টি হয়ে 'উইলসনকারী'-রা কৃষক-আন্দোলনের দুইময় নেতা ৬২ বছরের নিউ টাইমস-কে খুলি খেরে বুন করে। পাঠি সবসাধারণের কাজের ঘরটিতে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্টালিন-মাও-এর ছবির তলার ওই নেতার দেহকে পাঠিও রাখা হয়। এই টুকরো খবর থেকে বোকা যায় চিনে প্রকৃত কমিউনিস্টদের সঙ্গে বাস্তবিকভাবে আদীন কমিউনিস্ট নামধারী পুলিশবাসী নেতৃবৃন্দের প্রেসী সংগ্রাম বর্তকালের লগ নিয়েছে।

ইউরানটের উক্ত তথ্যে (Update series 14-6) দেখা যাচ্ছে, বছর বছর ৭৭ অসন্তোষের ঘটনা বেড়েই চলেছে চিনে। ১৯৯০, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০২-এ ৭৭ অসন্তোষের ছোট পড়ার ঘটনার সংখ্যা যথাক্রমে ৭,৭০০, ২৪,৪০০, ৪০০০০ আর ৪৮০০০। ২০০৫-এ ওই সংখ্যা কতটা বেড়ে গিয়ে হয় ৮৭,০০০। অনেক ঘটনার সত্যতা হাজার করে পুলিশ, প্রাথমিকের অস্ত্রি কমাতে। ওয়াশিং প্রদেশের পানলাতে জমি কাড়তে গেল পুলিশদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাহে গ্রামবাসীদের, হাটজন গ্রামবাসী আহত হন। একটি ১৩ বছরের মেয়ে মারা গেলে, পুলিশ সেটাকে হুতম আরেকো হবার ভয়ন ভুড়া বলে চালাবার চেষ্টা চালায়।

মেসেল ভেতরকার সংবাদ বিবিসি সংবাদমাধ্যমের শব্দ সব সময় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যে কারণে বহু ঘটনায় কথা যেমলুম নজর এড়িয়ে যায়; বৈজি থেকে অনেক সত্তর ঘটনা হাঁপে তো কোন্‌কো বলাই নেই। তবুও হাজার প্রতিবুদ্ধতা সত্ত্বেও খবর আসছে সুদূর চিনের ভেতরকার মসেলিয়ায় কৃষক অত্যাচারের। সেখানে কৃষকদের গণবে লখি-চ-কি-খুঁহি মেহে পুলিশ আর পাঠি নি। হাটাদের এক প্রতিনিরিক ওখানকার গ্রামবাসীরা বলেম, হঠাৎ করে অতঃময় মেয়ে আসার তাঁবা টিকভাবে ভবাক সিতে পাবেন নি। তবে এবার কিছু তাদের ওপর অত্যাচার করে কেউ বেহেই পারে না।

এক একটি অপরকার কৃষকদের এই কান্ডাপার লেশবাসী এক মহাবিরোধের সূচনামাত্র। সেই মহাবিরোধ শিখের প্রতিক্রমের একটা নেতৃবহুলী দুইকা থাকে। বিশ্বের কতখানার পুলিশ প্রত্যেক তত্ত্বাবধান নিয়ন্ত্রণের যে পতিসকার হয়েছ, যে শিখানন লেশজোড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জোয়ার সৃষ্টি করেছে, তার ধাবা প্রতিব্রজী বিভায়ে প্রতাপিত হচ্ছে, সেটাই অমেকজন নির্বাক পতি হয়ে উঠবে আগামী দিনে।

মাও-পর্বতী চিনে সাম্প্রদায়িক অধীনতাকে পুঁজি করে আসার নেমেছিলেন তেঁও। পাটিলটিকে কল্যাণ ক'রে উৎপাদনী শক্তি জড়ানোর পক্ষে তিনি সবদিক কবলেন। একই সঙ্গে জোর দেওয়া হলো মুক্তবাজারের শক্তিকে জোরদার করার ওপর। নতুনভাবে অর্থনীতিকে তেঁও সাম্রাজ্যের এটাই তেঁও-উদ্ভাবিত পথ। কেন্দ্রীয়ভাবে রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে দুর্বল করার কথা তিনি উচ্চারণ করেন না পাছে

বিশেষ পরিণামী সংস্কারগুলির জন্য বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

- গ) কৃষি সমস্যার ব্যবস্থা কৃষির দক্ষতা বাড়িয়ে যার প্রমাণিত হয়েছে, অতএব কৃষকদের চুক্তিভিত্তিক বরাদ্দ ক্ষমিতে চান্দবাস করার কাজে উৎসাহ দিতে হবে। বাজার থেকে উৎপাদনের উপকরণ তারা কিনবে, বাজারে বিক্রি করবে তাদের উৎস উৎপাদন, কেনাকাটা সব কিছুই হবে খোলাজাগারের দ্বারা। প্রতিযোগিতায়

‘লোহার তৈরি ভারতের বাট’

১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯, এই কৃষি বছর ধরে চিনে সামাজিকতন্ত্রিক উন্নয়নের প্রচেষ্টার নক্ষর দেওয়া হয়েছিল গুটি বিদ্রোহ ও গণ-এক, প্রতিক-কৃষক যৌথী সূত্র করা; দুই, কোনো প্রকৃৎকর্তী শ্রেণীর উদ্ভবের সম্ভাবনা থাকে দেওয়া। এর জন্য সর্বজনীন সমন্বিতকার প্রচেষ্টা খুব জরুরী ছিল। আমাদের দেশে যেমন প্রচলিত একটি কথা আছে — ‘সবার জন্য যেটা ভাল-সবচেয়ে ব্যবস্থা’, তেমনি চিনে চালু কথা ছিল — ‘লোহার তৈরি ভারতের বাট’। চিনে কমুনিষ্টরা এই ব্যবস্থার প্রণয়ন করে চিনে নাগরিকদের কাজের নিয়ন্ত্রণে ধরনের জন্য প্রবর্তন করেছিলেন। ১৯৯০-এর দশকের প্রায় শেষ অংশে প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থার ‘সংস্কার’ কর্মসূচির জারজ করা হয়নি। কাজের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে এই নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র বিদ্রোহ — সমতুল্য কর্মসূচ্যের ব্যবস্থা না করে কাউকে তার কাজের জায়গা থেকে হুট করে দেওয়া করেন।

কাজে নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত ছিল আবাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। কাজের জায়গার কাছাকাছি কোনো আবাদন কর্মসূত্রে যুক্ততার বরাদ্দ থাকার ব্যবস্থা করাটা নিয়োগকারীর দায়িত্বের মধ্যে ছিল। এর সঙ্গে ছিল ব্যক্তিগত চিকিৎসা, প্রসূতিকালীন যত্ন, কর্তৃত্ব প্রমিতকরণে কঠিনপূর্ণা, বিদ্যা, পেনসন, সম্মান-সম্মতির কুশলিকা, এবং পরিবহনের সবার জন্য আবেশ-গ্রহণে কোমলতার ব্যবস্থাও প্রমিতকরণে অধিকার, কলমে নিয়োগকারীর দায়িত্ব হিসেবে দেখা হত। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পুরো সুযোগ-সুবিধাসহ কাজের নিয়ন্ত্রণকেই নাম দেওয়া হয়েছিল ‘লোহার তৈরি ভারতের বাট’। সমির অধিন, উন্নয়নের হিট-সহ মর্জিন অনেক বিশেষজ্ঞই, বিশেষ করে জন কেন্দ্রের পল্লভরণ, এই ‘লোহার তৈরি ভারতের বাট’র ব্যবস্থাকে সামাজিকতন্ত্র নির্মাণের একটি বড় ধাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মৃত মাও-এর প্রতি জনমনে যে ভালোবাসা আর ভরসার জারজাটা তখনো অটুত রয়েছে, সেখানে কোনো দা পাড়ে। তিনি যারবার সুকৌশলে সামাজিকতন্ত্রিক ব্যবস্থার আরো বেশি দক্ষতা, আরো সুসংহত পরিচালনার কথাটা আওতে পোছেন।

সুচতুরভাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে দুর্বল করতে তিনি প্রবর্তন করলেন নিম্নোক্ত গ্রহণের প্রদে বিবেচনীয়করণের এক অধিনব ব্যবস্থা। কার্যত তার দ্বারা স্থানীয় সামাজিকতন্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি আরো মজবুত করা হলো, ধমিয়ে দেওয়া হলো তৃণমূল ত্তরে গড়ে ওঠা পল্লভরণের কাঠামোতে। যেমন :

- ক) রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থা ও স্থানীয় শহর বা গ্রামের সরকারি প্রণালনকে বলা হলো মুন্যফা অর্জনের লক্ষ্য সামনে রেখে তাদের উৎপাদন আর কোমোডাসহ সমস্ত রকমের কার্যকর্মকে সুপরিচালিতভাবে নতুন ক’বে তেঁও সাম্রাজ্যে হবে।
- খ) বাজারের শক্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের নিপড় তেঁও বহুদুশে রাষ্ট্রনৈত্যের সবাইকে কাজ করতে দিতে হবে। বাজারের শক্তিকে প্রাধান্য দিতে হলে তৎমুখী বাজারের মুখ ত্তরে উৎপাদন করলে হবে না। আমদানি ইত্যো চাই নিয়ন্ত্রণমুক্ত আর উৎপাদনকে করতে হবে রপ্তানি চালিত। বিশেষি লরি দাপত।

কৃষির উন্নতি সত্তর বেশের আধুনিকীকরণের পক্ষে সহায়ক হবে।

- গ) করিউনের অন্তর্গত শিল্পসংস্থার সম্পত্তি ব্যবহার করে গড়ে তোলা হবে শহর ও গ্রাম-ভিত্তিক শিল্প-উদ্যোগ। তার পরিচালনার দিকটি দেখাবে শহর ও গ্রামের স্থানীয় সরকারি প্রণালন।
- গ) রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে চালু হবে চুক্তিপ্রদ প্রথা। যেসব সংস্থা মুন্যফা অর্জনে ব্যছরের পর বছর অপারগ প্রমাণিত হবে, সেগুলিকে বন্ধ করা দরকার। ‘লোহার তৈরি ভারতের বাট’ তুলিতে তেঁও কেলেতে হবে। অর্থাৎ কর্মসংস্থান, আবাসন, খাদ্য কলম, চিকিৎসার সুপন সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা পাবার শ্রমিকদের অধিকারের অবদান খঁটা দরকার। তবেই স্ব-উদ্যোগী হয়ে শ্রমিকেরা উন্নততর জীবনের জন্য রাষ্ট্রনির্ভর না হয়ে নিজেদের পাড়ে ঈর্জিতে শিখবে।
- চ) শ্রমিকদের ধর্মঘট করা নিষিদ্ধ (ডিসেম্বর ১৯৮২-র নতুন সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ী)।
- ছ) শহরগুলো গঠন করা হবে শিল্পের বৌধ সংস্থা। লম্বু শিল্প, ক্ষুর শিল্প, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনসহ খুরো বিপণন ও অন্যান্য পরিষেবা সরবরাহ করার দায়িত্ব কর্তাবে ওই সমস্ত বৌধ সংস্থার ওপর। এই সংস্থাগুলিও পরিচালিত হবে মুন্যফা অর্জনের লক্ষ্যে। এখনকার

কর্মরত প্রমিষ্টেরা দুনাফের ভাগ পাবেন না, তারা শুণু শ্রম থেকে মুক্তি পাবে।

পরিশেষে ১৯৮০-তে কমিউন বাতুল বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৭৯ থেকে 'সেক্স' গঠনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হলো। তারা হয়েছিল 'সেক্স'ওগিসে শিল্প গড়ে তুলে, ম্যাফাও আর ওইওয়ান ও মার্কিন দূতরাষ্ট্রের বসবাসকারী বেশোবাগি ডাইয়াহা। বিশেষি বক্তৃতিতে সোশালিওগিসে দুনাফার আকর্ষণে ভিত্তি জমায়। ১৯৭৯-তে ট্রেবি হয় চারটি 'সেক্স' — হুকেও এর কাছে 'সেনসেন', ম্যাফাও-এর কাছে কুহাই, ওইওয়ানের অপরগারে শিয়াচেন প্রদেশের দিয়াবেন আর অনাবাসী ডিনাসের পল্লবের জায়গা শানটোয়ে। হাইনান দীপটি 'সেক্স' হয়ে গড়ে ওঠে ১৯৮৩-তে। এছাড়া ১৯৮৪-তে প্রসার মহাসাগরের উপকূল ১৪টি বড় বড় শহরকে মুক্ত এলাকা করা হলো। ওগিসি সেক্স-এর মতো। রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিয়োগ কর্মিয়ে আনা হয় ক্রতভার সঙ্গে। দুনাফা বাড়ানোর তাগিদে রাষ্ট্রীয়ত সংস্থা ও শহর-গ্রাম ভিত্তিক শিল্পসংস্থা সবাই পথের দান বাড়তে থাকে। দুনাফাটিকে সেবা দেয়। রাষ্ট্রীয়ত সংস্থার অনেকের কাজ খোয়া গেলে। কল্যাণমূলক কাজে ক্রমশ অর্থ কাটছাট করা হতে থাকে। সবচেয়ে নিম্নাঙ্গ আঘাত আসে প্রমিকসের 'লোহার তৈরি ভতরে রাষ্ট্র'—ওগিসি ভেঙে দেওয়ায়। একে সেয়ে দুনাফাটিকে, তার উপর কর্মসংকোচ, কল্যাণমূলক কাজে ক্রমশ সংকোচ, আবাসের সমস্যা — সব মিলিয়ে সবাই আরও প্রমিকসেরা বলে 'সেক্স' কর্মসূচির প্রকৃত আধার। দক্ষতা বৃদ্ধির অল্পম্যেতে প্রমিকসের 'সেক্স' শুক হলো সব কটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা।

রাষ্ট্রীয়ত শিল্প সংস্থার কিছু শেয়ার বিক্রির ধুম পড়ে গেল। তার জন্যে সংশ্লিষ্ট শিল্পসংস্থার লরি যে বীতিমত লাভজনক, সেখান বোঝানোর প্রয়োজন সেবা দেয়। প্রমিকসের সংস্থা কর্মিয়ে সংস্থাটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে এমনটি দেখতে গেলে বেসরকারি মালিকানার হাতে শেয়ার হস্তান্তর সহজতর হয়। 'জয়েন্ট ভেঞ্চার' বা মুক্ত উদ্যোগ তৈরির শেয়ার মেতে প্রম সংস্থান যোগকভাবে করার কাজে রাষ্ট্র নিজে উদ্যোগী হল। এই প্রক্রিয়ার শুরু ১৯৯৫ সালে। ২০০১ সালে সেবা গেল, ম্যানুফ্যাকচারিং-এ মোট নিয়োগের মাত্র ১৫ শতাংশ ছাড়াই রাষ্ট্রীয় সংস্থা।

কম্প্রাইট মুখী 'সেক্স'—এর পরিণামে চিনে যে অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটে চলেছে, সেটি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় সেকলানার মালিকৃত মুদ্রন সেয়েসে এসেছে বা এক্সো আসিয়ে কোন্ পথে, সেটিতে চিকিত্ত করে।

পার্টী সদস্যের কার্ড নাচিয়ে চিনা কমিউনিস্ট স্কাডবরা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের দানন জেটোতে পারে অক্লেশে। তাদের কলের ওঠোরে প্রমিকসের টাটা কোঁ করার সুযোগ কম। কৃষকদের যদি তারা হাতিয়ে নেয় স্থানীয় সরকার আর ডাডাটো মারিফাবাহিনীর সহায়ত। ওদের অন্ত্য্যচারে যদি প্রমিকসের জীবন ভরে গেছে অর্ধদশসহের পুষ্টিহীন যন্ত্রণার। ১৭ই জুলাই, ১৯৯৫ তারিখে নিউ ইয়র্ক টাইমস লেখে :

সম্পদের হস্তান্তরী লক্ষ লক্ষ কৃষকের আরে সোনার দিনের দিকে ছড়নুড় করে সোজানোর ব্যাপারে একটাই অর্থ হলো অনেকখানি উজ্জ্বল উঠে তীত নীচে দুর্ভোগপূর্ণ অবস্থার দিনে সওয়া ১ ডলারের বিলিময়ে একটা কল্লের সুযোগ জোড়ানো। পরিস্থিতি একটাই হুসহীন যে অনেকের কাজ সেয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করে, লাভ হয় না, তারা ধরা পড়ে যায়, তখন তাদের কাজে বিচিয়ে আনা হয় পল্লের ডাডাভেড়ি পরিষে, তিক ওই অবস্থায় তাদের কটিতে হয় চুক্তির মেয়াদ না ঘুরানো পর্যন্ত।

অন্যদের উত্তর সজাই চালাতে হয় হনিগেরেও এলাকার বনল কল্লের মাপতে। তারা নিরুণায়, কেননা সমগ্র গ্রামাঞ্চলটাই আধুনিক বস্তুদের কল্লায়। শুণু মোকালি ফোন আর ল্যান্ড ফোনের (পণ্ডি) হাত দিয়ে এদের সঙ্গে চিনের ইতিহাসের বস্তুদের দিল অনেকখানি। ইতিহাসে পুরোনো দিনের বস্তুবা কল্লত পর্বতের ওহাম, সেবান থেকে নেমে এসে ঝর্ণপথে পড়ত তাদের শিকারের ওপর [তথ্যসূত্র : Robert Weil Red Cat, White Cat, Cornerstone Publication 2004]

পার্টী কার্ড নাচিয়ে এখনকার স্কাডবরা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কত বাবা করছে তাদের ভগ্নমল্লুর করতে। তারপর হয়ে ওঠে ওকা নর দলি। কেউ কেউ আবার সেখানে খেয়ে থাকে না। হুশ ধন সমগ্র কল্ল তরে ভবির ম্যাফা কারবারে নেমে পড়ে। ওদের কল্লের ওঠোরে প্রমিকসের অবিকার সব ওড়িয়ে বাব। জাণবন সম্পূর্ণ প্রভাবনার অস্থায় নিয়: ওরা কল্লের লামে কিনে দেয় রাষ্ট্রীয় সংস্থা। সনাক্ততাইত ব্যাংক অর্থনীতির নামে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি আয়সাং করাব, পুষ্টিভূত ঐশ্বর্য়ে অবিকারী হবার এই প্রক্রিয়াটিকে মার্কসের পরিভাষায় বলা যায় অদিম ধনসমগ্র (primitive accumulation)। কৃষিকারীকদের ভবি থেকে উচ্ছেদ করে কৃষকদের মালিকানামূলক মজদুরে পরিণত করতে পারলে পুষ্টিবানের মাত্রাগত ধুগম হয়। এভাবে চিনের ম্যাটিতে সনাক্ততাইত কাজে লগিয়ে পুষ্টিবানের স্কাডো নির্মাণ হচ্ছে।

প্রমিকসের অবিকারহরণ ও প্রমিক বিশ্রোহ

একটা প্রমিকসেরদীর পার্টী ছিল চিনের কমিউনিস্ট পার্টী। সে ব্যাক প্রমকীর্ণি জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রাতি বহুলোক হবার মানসিকভাবে প্রভাব দিয়ে পার্টী নিজের সর্বদান ভেঙে এনেছে। 'সেক্স' কর্মসূচির রূপাণ থেকে কল্ল নিরিয়ে নতুন নতুন কল্ল। একটা কল্লের সমাধান করতে যেই 'সেক্স' কর্মকে গভীরতর করা হবে, অর্থনি আরেকটা কল্ল মাফাডা দিয়ে ওঠে। এভাবে জনতার সঙ্গে নিজস্বের প্রস্তাবে পার্টীর নেতারা গড়ে তোলে এক বৈরিদুলক সম্পর্ক। শুক করা যাক, অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকতা ধুর করতে গিয়ে যে সেক্সেরমূলক পরকল্প নেওয়া হলো, তাই নিয়ে। সেবা ব্যক বি-মার্কিনিকতার পল্লিমে তিক শী দলোলা। কল্যাণবরা, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি প্রকৃত পূর্ণা হয়ে পড়ায়, রাষ্ট্রের রেভিনিউ আর কমল। বহুজট ব্যাটিত টেকানোর কোন উপায় রইল না। তার ফল লুপতে হয় প্রমিকসের। ব্যাঙ্কটো টান পড়ায় সরকারের কল্যাণমূলক কাজে ব্যক কাটছাট করতে হল। অর্থনি কমিউন

ব্যাখ্য থেকে শুধু নিজে ভেদারকমে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাতে রক্তীয়র সহায়তা। তাতে দেখা গেল ব্যাখ্যে ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা। প্রমিকসের আবার নাকাল হতে হল বিমার টাকা পেতে, পেনসনভোগীসেরও কটীকো করতে হল।

একদিকে চিকিৎসার খরচ বাড়ল, আবার সমস্যা জটিল হল, সেখানেও এল অনিশ্চয়তা। স্বাস্থ্যসম্পত্তির শিক্ষালাভের খরচও বেড়ে গেল, হেডহেড ব্যাখ্যে সাথে এল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খরচ যোগানোর দায়িত্ব থেকে। এভাবে "সোচ্চার তৈরি ভাতের ব্যাখ্যে" ভেঙে ফেলার রাষ্ট্রীয় সংস্থা প্রমিকেকা পড়লো মহাঘণ্টায়। অনেক জায়গায় রাষ্ট্রীয় সংস্থা থেকে মেনা যেতেও কর্মরতদের একাংশকে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো, কাজ হারানো ওই সমস্ত প্রমিকসের ভজন স-সে-নি-রা অবস্থা। এই সময়ের মোকবিদ্যায় রাষ্ট্র দিখায় নিল রাষ্ট্রায়তনস্বায়ের শেয়ার বেড়ে ব্যাখ্যের ভাতার ওপর নির্ভরতা কটীতে হবে।

রাষ্ট্রের সংস্থায় বেসরকারি মালিকদের প্রবেশের কলে একটি নতুন ধর্ম দেখা গেল। প্রমিকসের সঙ্গে মুনাকাসাটীসের বন্ধ। বেসরকারি মালিক চিনের ব্যক্তিগত হলো শেয়ার কেনার জন্যে তাদের পুথ বেশি বেশি পেতে হতো না। রাষ্ট্রায়তন ব্যাখ্যের কপ শাবার জন্যে পাটির কার্ড নাগালে কাজ হয়ে তেত। অন্য কোন সুপারিশের সরকার পড়ত না। তবে একেবারেও একটা আশঙ্কার বিষয় থেকেই গেল। কোন ফেরকরি মালিক যদি বর্তমান অনুযায়ী দ্রিক সমরমততা অপর বিস্তি না হোঁয়, তাহলে ব্যাখ্য ব্যবস্থার সর্বট ঘনিজে আসতে বাধ্য।

এই সমস্যার সমাধানের জন্যে বিদেশি বরজাতিক কারবারিসের হাতে রাষ্ট্রীয় সংস্থার শেয়ার তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। মুক্ত উদ্যোগ (বা জয়েন্ট ভেঞ্চার) পড়তে থিয়েলি কোম্পানিগুলি হাতে এগিয়ে আসে সেখানে, সেই কারণে তাদের সামনে নাচানো হলো মুনাকার টোপ। এমনভাবে চিনে আগে থেকেই ছিল পরিশ্রমী, দক্ষ আর সৃজনীকমতাসম্পন্ন প্রমিক কাহিনী, পড়ে উঠেছিল নিম্ন-গুণবীতির বসিয়ার। এবার যদি করা হয়, প্রমিকসের ধর্মঘটের অধিকার হাল করা হতোয় নতুন সত্যিখানে (ডিসেম্বর ১৯৮২-তে), যদিও আইনও জো বটাই এমন কি, সরকার বা প্রমিকসের কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ কোনভাবে মালিকসিদের উৎপাদন বাড়ানোর কোন পরিকল্পনায় বাধ্য দেখে না, তাহলে উচ্চল মুনাকার সজ্ঞানায় আর টেকার কে? এইভাবে বেসরকারিসমূহের সরকারি "কট" বেঁধে দেওয়া হল। প্রমিকসের দায়িত্ব আর কাজ হারানোর ঝিনিয়ারে সংস্থার কর্মসূচিতে স্থান গেল ফেরকরি মালিকদের প্রচারের পথ, বুলে গেল বিদেশি কোম্পানিদের সামনে চিনের গুণবীতিতে সম্পদ লুণ্ঠনের নয়া সড়ক।

দেখা গেল আর একটি সমস্যা। প্রমিকসের একটার পর একটা ধাক্কা আর কমতে থাকে, কাজ হারানোর সম্ভাবনা বাড়ল। কিন্তু তার পরিসরে প্রমিকসের পণ্য কেনার ক্ষমতাও টান পড়ে। সৌভাগ্যবশত সর্গীয় হয়ে গেল। তাহলে নবকর জুড়ি হয়েগ ক'রে থিয়েলি লরি এনে উৎপাদন যে বাড়বে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যারটা কোথায়? এই প্রশ্নের সমাধান খোঁজা হলো কাজের চিনের মেনে রপ্তানি নির্ভর উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে। একই সঙ্গে দ্রিক হলো, আমদানিও হতে পারে হবে

প্রবাহে। পণ্যের নাম কমে গেল, কাজ হারানো প্রমিক বা গ্রামের পরিকল্পনও দুর্ভাগ্য হতে। বাণিজ্য ব্যাখ্যে-ও খেপেই অনুকুলে থাকবে রপ্তানির ওপর ভোঁর দিলে। এভাবে সমস্যার মোকবিদ্যা করতে চেয়ে প্রমিকসের ওপর নামানো হল আরো মস্ত আঘাত। রপ্তানি উৎপাদক শিল্পে প্রমিকের সংখ্যা ত্রাস, দ্রিক প্রদানের ব্যবহার, কাজের ঘটনা বাড়ানো এবং মজুরি সন্তোষের পথ অবলম্বন করা হয়। এইভাবে বহুগুণকৃত পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানো হল যাতে বিদেশের পণ্য প্রতিযোগিতায় এটো উঠতে না পারে। উৎপাদনের খরচ কমাতে গেল প্রমিকসের ধকল সইতে হয় ডিমটি দিকে : এক, মজুরি আর কাজের সময়ের পরিকল্পনা ঘটানো হয় প্রমিকের প্রতিদুলে, দুই, হুটাই বা লে-অফ প্রমিকসের মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। তৃতীয় আর একটী দিকও রয়েছে, যদিও বিকাশশীল দেশের উদ্যোগপতিরা মনে করেন ওই দিকটি সম্পর্কে বিশেষ স্পর্শকাতর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তা হচ্ছে প্রতিদুল কাজের পথিকেল। স্বাধীনতার তেতখ আসো-হাওয়া, দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচতে দেখুটি বা নিরাপত্তা, জাতিমে ভালো খাবার মাঝার বা অবসর ব্যাপনের সময় বিনোদনের ব্যবস্থা, প্রমিকসের প্রতি পরিচালকদের আতরণ — সবটা থিয়েলি কাজের মুঠু পরিবেশ। এর জন্যে যে খরচ করা দরকার, মুনাকাসাটী ব্যবস্থায় সে-খরচ বাঁচিয়ে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে রাখাটা আত্মকালকার বেদোজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অতঃ উৎপাদকের চোখে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কাজের জায়গায় নিরাপত্তার অভাব ঘটলে কি হয় সেটা বোকা যায় চিনের কাজের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক রাষ্ট্রীয় প্রশাসকের রিপোর্ট দেখে। ২০০০ সালে কাজের জায়গায় দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল এক লাখ, ২০০২ সালে সেটাই বেড়ে দিয়ে দাঁড়ায় এক লাখ চল্লিশ হাজার। ওই একই প্রশাসনের রিপোর্টে করা হয়েছে পণ্য প্রস্তুতকৃত চিনের মধ্যে ১৫,০০০ প্রমিকের মৃত্যু হয় কারখানায় দুর্ঘটনার জন্যে। (সূত্র : www.chinalaborwatch.org ডাঃ 26 September 2005)

নিউ ইয়র্ক টাইমস (ছন ১৮, ২০০৩)-এর এক প্রতিবেদকের হাতে চিন যদিও মার্কিন দেশে মাদকাসকতারি সংঘের রপ্তানিতে এশিয়ার সেন্তলির মধ্যে অগ্রণী স্থানে রয়েছে, এমনকালর প্রমিকেকা কিছু খাদ্যশস্য, শালুপক, রক্তসম্পন্ন সন্তোজ অসুখ বিষুখ, হকসের রোসের মত দাবণ বোণের কবলে পড়তে, দ্রিক যেননাটি ঘটেছিল শিল্পমুগের উদ্যোগে মার্কিন ও ইউরোপীয় প্রমিকসের বোলায়। আর একজন প্রতিবেদকের হাতে (এপ্রিল ৭, ২০০৩), সরকারি পরিসংখ্যানে বিশাল সংখ্যক ঘটনা ধরাই পড়ে না, হেডহেড মনিবরা প্রমিকসের বিমার জগতায় থিয়েলি আসে না অনেক সময়, অথবা প্রমিকসের বে-আইনিভাবে ঘটানোর জন্যে, অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এই হর্মে রিপোর্ট দেবার জন্যে সরকারি অফিসারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়।

অনেকের ধারণা, হেডহেড "সেজ" ওলিতে থিয়েলি লরি ডিড জায়গায়ে বিস্তার, উৎপাদন বাড়ছে স্রুতগতিতে, কম-খরচে উৎপাদন হচ্ছে, সুতরাং একদিকি এমনকালর চিনের স্রুত বেড়ে ওঠা বর্ণ। আবার ওটা যদি হয় "সেবকেন", তাহলে তো আর কথা নেই। ভারতে এক

মন্ত্রিসভা শেরশেখ মেমরি থেবে জো আরম্ভে আখ্যায়। ভারতের সব কটি সংসদীয় দলের নেতারাও মন্ত্রিসভার কথার বেতে উঠলেন। তাইই আসলে 'সেজ' গড়লে কমুনি অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মস্তি সমাধান সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু ওই সেজ-এর ভেতর কাজের পরিবেশ সম্পর্কে সামান্য কিছু শুভা হাতে এলেই যে কেউ কলোনে, বর্ণ আর নরক কি একই সঙ্গে সহ্যস্থান করতে পারে?

আজকাল যখন-তখন ভারতের মত চিনেও বনি দুইটার প্রতিকের মুখা খঁচছে, যে-আইনি খাননে কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোন ব্যাটাই সেই। পর্যাপ্ত মুদ্রাস্ফাবনী শিল্পেও বেই নিরাপত্তার পর্যাপ্ত আরোপন। যেমন পুতুল শিল্প। তার ফলস্বরূপ কোটি ডলারের ব্যবসা হয় চিনের পুতুল তৈরির শিল্প। তবু সেখানে প্রমিকদের কাজের জায়গার তে: বড়ই এমনকি উন্মিত নিরাপত্তার ব্যাপারেও মন্ত গাফিলতি। ১৯৯০ সালের ১১শে নভেম্বর রাতে ত্রিপি হ্যাডিক্সাক্টনে হ্যাটবিল্ডে বিদ্যুতের পিসিফিক্টির ফলে আতন ধর যায়, বৃদ্ধ। হয় ৮৪ জন প্রমিকের। কহিসে যাবার গোট চারটি, তার মধ্যে একটিই মাত্র খোলা ছিল। সেখান দিয়ে বেরিয়ে পালারবার টেক্সি করতেই পরাপষ্ট হয়ে মারা যায় অনেক। তার পরও যে ক'ব একটা শিল্পা হয়েছে বলে মনে হয় না। নিরাপত্তার স্রোত নিগিষ্টির ভাবটা বজায় রয়েছে যিক আগের মতই। কহিসেরও মানুষ, তাদের জীবনের দান অনেক বেশি, মুদ্রাশা নিকহিরা সে কথায় কর্পাভাই করে না।

পমিকারীদের কাছে মুদ্রাফাই একময় বিচার বিবর। মুদ্রাফা অর্জনের পথে যে কোন বাধা অগ্রাহ্য করাটাই পুষ্টির ধর্ম। প্রমিকের মানবাধিকার কিংবা নিরাপত্তা কোন কিছুই পুষ্টিপতির বিচারে আমল পায় না। এমন কি এই দিকে পুষ্টি ফেরালে মুদ্রাফা যদি কমে যায়, তাহলে সেগুলি গায়ে দলে এগিয়ে বেড়ে ধরে পুষ্টিতে। পুষ্টিবায়ের ইতিহাস অস্ত্রত তাই বলে। আজ কেন প্রশা মহাসাগরের উপকূলবর্তী শহর এলাকার প্রমিক গিগ্রহের খনি আকৃষ্ণর খঁচছে, তার মহাশ পুষ্টিয়ে আছে পুষ্টির হাডাবিক ধর্মের মতো।

মন্তা স্রম : ম্যাকিন্সে কোয়ার্টার্স (সংখ্যা ১, ২০০৫)-২৩ পরিবেশিত একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, প্রতি ফটার মজুরির তার মর্কিন বৃত্তরাষ্ট্র, কনফ্রা কিংবা মেক্সিকোতে যথাক্রমে ২১-৩, ১৮, ২.১ ডলার। তুলনায় ওই মজুরির ছার কিগিনপাইন্স-এ ৭০ সেন্ট (৭ ডলার) আর চিনে মাত্র ৪০ সেন্ট (৪ ডলার)। ১৯৯০-এর দশকের মাক্সাক্সি নাগায় চিনে যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণকারী হংকং-এর লম্বিকারীরা চিনে ৩০ লাখ প্রমিক পাঠালে শুধু এই কালে একবছরে মুদ্রাফা শেত ১২০ কোটি ডলার। (তথ্যসূত্র: Robert Weil, Red Cur, White Call)। আজ বিশ্বের মোট শেলনা রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ আসে চিন থেকে। সমগ্র শীর্ষা চিনা পুতুল শেলনে বাজারের মুখ হাসি কেঁচোতে, তারা কি জানেন, প্রতিটি পুতুলের ভেতর রয়েছে চিনা প্রমিক মহিলাদের জমট কাঁধা অস্ত্র আর ঘাম, ঢাকা দীর্ঘশ্বাস? শেলনার কারখানাগুলিতে কোন ইউনিয়ন নেই, মজুরি সেখানে ফটার ১২ সেন্ট মাত্র। পরবের মরতমে সেখানে খটতে হয় শপ্তাহে সাতদিন, প্রতিদিন ১২ থেকে ১৬

ঘণ্টা; প্রতিবছর শীতে প্রমিক সংখ্যা আরেক কহিসে বেওয়া হয়। কৈয়ুতিনে কারখানাগুলি বেশির ভাগই পার্শ্ব নদীর মোহনায় কাছে, বেশির ভাগের মালিক তাইওয়ানের কোম্পানি। এখানে প্রমিকদের এক-এক সময় মিলে ১৮ ঘণ্টা কাজ করানো হয়। মজুরি ফটার ৩০ সেন্ট। ওভারটাইমের জন্য সেওয়া হয় ফটার ৫০ সেন্ট-এর মতো। মাসে ১০০ ফটা ওভারটাইম খটতেই হবে, এটাই কৈয়ুতিনে শিল্প বেওয়াতে হয়ে পড়িয়েছে।

চিনে এখন ২০ কোটির মত শ্রতনকারী প্রমিক। কল্লের সম্মানে তারা যুগে বেওয়াছেন এক দশক ছেড়ে আর এক অশক। সিন্থলে কৃষকদের ভবি কেরে নেওয়ায় সেবাই গ্রামের কেতনজুরারের রিত এই অবস্থা হতে চলাছে। পরিসেই প্রমিকের বিশপ বাড়িীর সুবিধা কুড়োছে ছোট-মাকবি শিল্প ইউনিটগুলি। তারা মর্কিন কোম্পানিদের অর্ডার মত কাজ করে নিচ্ছে জালের দানে, আর সেই ক'ব তাদের মুদ্রাফাও হচ্ছে বিস্তর।

ইউনাইটেড Update Series 14 (April 24, 2007) কুললে প্রমিকদের প্রতি অধিকারের একময় বেশ কিছু শুভা পাওয়া যাচ্ছে।

'সেজ'-গুলিতে হীতি হলো মাসে একবার মজুরি বেবাব; তবে একদাসের মজুরি পেতে হলে সাধারণত দ্বিগুন দিনের মজুরি তাক কহাতে হবে। কোন কোন কোম্পানি কাহা করে আরো বেশিদিনের মজুরি তাক রাখতে। কেউ যদি কাজের চাপ সইতে না পেলে কাজ ছেড়ে চলে যাবার মনস্থ করে, তাক টাকা অরে ফেরত সেওয়া হয় না।

কাজের সময়

দিনে ১২ ফটার শিফট হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। শপ্তাহে ৬ দিন কাজ না ক'রে উপায় নেই। কোন কোন জায়গার খটানো হয় আরো বেশি সময়। বিশেষ ক'রে যে কারখানাগুলিতে মাক্সডোলাস, ডিসনি, মেসুরো, ওয়ারনার, প্যারামাউটের মত বড় বড় কোম্পানি তিফায় কাজ করিয়ে নেয়। এসব জায়গায় চিনের জাতিয় বিবস (পয়ল্য অস্ট্রোবর) কিংবা মে বিবস-ও কাজ করতে বাধ্য করা হয় — দিনে ১৪ থেকে ১৬ ফটা কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। প্রমিকদের গভার জাণায় কারখানা থেকে মিলিট দু-এর দূরত্বে, এতই টৌছবিব ভেতর। একময় একটি কোম্পানির নাম হার্টন। সেখানে খাটানা হয় সকাল ৭টা থেকে ১১টা, দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা, আরার সাক্ষা ৬-৩০ থেকে রাত ১১-২০ (ওভারটাইম)। একময় রবিবার কালে সবদিনই ওভারটাইম খাটতে হয়। প্রমিকেরা কাজে যোগ সেওয়ায় আগে প্রথমেই তাদের নিজে একটি চুক্তি সই করানো হয়, তার কপি প্রতিবেশ কাছে থাকে না। সরকারি অধিদপ্তরের কোনোবর খানো ওই চুক্তি সই করানো হয়। তাতে এত দীর্ঘসময় ধরে কাজ করার কোন কথা থাকে না। ১৫ থেকে ১৭ ঘন প্রমিককে একটি ২০ বর্গফিটার ঘাবর মধ্যে পুরে সেওয়া হয় — ইল্পাদের বানানো ছোট ছোট খুপিতে এক-এক জনের শোকার জায়গা।

আগেই এ বিষয়ে দু-চার কথা বলা হয়েছে। এখন শুধু উল্লেখ করা দরকার, অধিকাংশ কারখানায় প্রমিক্সের কোন সন্ধান নেওয়া হয় না। তাদের বেশিরভাগের হাতের চামড়ায় পোড়া পোড়া দাগ। দুপোশ পরতেও কেওয়া হয় না। কিন্তু সবক'রী অফিসারেরা কারখানা পরিদর্শনে এসে সন্ধান, ঘুরেছেন। সবই পরতে হয়। নইলে প্রমিক্সের জরিমানা করা হয়। নির্দেশিতদাঁড়ের অবস্থা ভাল, এসের বেশির ভাগ সময় অসুস্থ পিনে বসে বসে চুপাটা করে। (পোশাক-অপাশ বুলি বুঝিবি।) সাত-সুতরাে করার পদ্মা বা তুরসত কোনটাই তারা পায়না। এরা বেশিরভাগই পরিবারী প্রমিক্স। এসের ১৭ শতাংশের কপালে চিকিৎসা পরেব কোন সুযোগ সুবিধা ছোটো না।

মহিলা প্রমিক্সের ওপর জুলুম

চিনের বার্ষিক সংগ্রহে নিবৃত্ত নারী প্রমিক্সের ৬০ শতাংশ কাজ হারিয়েছেন। তবু এখনো সেদেশের মোট প্রমিক্সের ৪০ শতাংশ নারী। একদমের কাজ করার পর কাজ পান নি এখন বহু নারীই আত্ম কর্মপ্রার্থী। দেশের ৭৫ শতাংশ নারী এখন কাজের সন্ধান খুঁজছেন।

'সেক'-এর মতো কোন কারখানার কাজ দেবার সম্ভব হলে দেওয়া হয় সন্ধান পেতে এলে কাজ করে। গ্রাষী নির্মাচনের আগে খুঁটিয়ে ঘনসটা দেবা হয়, আর অধিকহিতা কিনা সে বিষয়ে তলন্ত চাপানো হয়। ছুতো তৈরির রীতব কারখানায় নারী প্রমিক্সের দিতে তারি কাজ করানো হয়, কেননা ইউনিয়ন পড়বে এই অশক্ষয় ওখানে পুরুষ প্রমিক্স দেওয়া হয় না। এই কারখানায় মহিলাদের যৌন হেন্সহর অভিযোগ করেছেন প্রমিক্সেরা। সে কবর বেরিয়েছে ইন্টারনেটে (www.chinalaborwatch.org/ January 2, 2002)। তবে এখনকার মতো অন্য জায়গাতেও নারীপ্রমিক্সের খুব খুঁজ সন্তোষজনে। যৌন হেন্সহা হকার অভিযোগ আনলে পাছে কাজ হারাতে হয় এই ভয়ে।

সরকার যে নারীপ্রমিক্সের দুরবস্থার বিদ্যলিত নয় তার দুটি প্রমাণ:

১. দক্ষতাবৃদ্ধির অজুহাতে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় সে-অফের শিকার হন সর্বপ্রথম ৩৫ বছরের বেশি বয়সের নারীরা; ২. জিয়াঙ্গু হুয়েন ১৪৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বস্ত্র কারখানায় বর্ধন ৯৫,০০০ প্রমিক্সকে সে-অফ করা হয়, তাঁদের মধ্যে ৮০ শতাংশ ছিলেন নারী।

কর্মহীনতা

বিদায়নের ফলে আরম্ভের লাভ হবে, একথা নব্য উদারমৈত্রিক প্রতিটি সরকারই আশ্বাস দিয়ে থাকেন। চিনের সরকারও বলেছেন, লব্ধি বাড়বে খত স্বল্প পড়িতে, ভতই কোরন্ত দুব হবে চিরন্তরে। তবে সরকার একথাও আশ্বাস বলে রেখেছেন, সব কর্মপ্রার্থী আর সে-অফ হওয়ার প্রমিক্সের জন্যে কাজের ব্যবস্থা করা যাবে না। ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোক কর্মহীন অবস্থায় থাকবে ২০০৬-এ। [এ শুধু : China Economic Net 2006]

চিনের জন আবে সামাজিক নিরাপত্তা বিবন্ধক মন্ত্রী আগেব বাক্তব হুবি তুলে ধরেনে। তাঁর মতে ২ কোটি ৪০ লাখ শহরসী এইন কর্মপ্রার্থী হন প্রতিবছর। আর গ্রামে ১৫ কোটি কৃষকের কোন কাজ নেই। তাঁদের ভেতর ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ এদেশেই হওয়ালায়। সুতরাং সব মিলিয়ে হুবিটা ডরাবই (www.laborwatch.org/ 10 March 2004)।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের Key Indicators 2002 আর Key Indicators 2003 আর Key Indicators 2003 এ চোখ মেলালে দেখা যায়, ১৯৮৫-১৯৯৭ এই ১২টি বছরে মানুষাক্যাকারিং- শিল্পে কর্মনিযুক্তির সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে চলোচি টিকই, তবে তারপন থেকে ওই শিল্পে নিযুক্তি হ্রাস পাচ্ছে। ২০০২ সালে ওই শিল্পে নিযুক্তির হারিকের সংখ্যা ১৯৮৫ সালের ত্বরে নেমে গেছে (১৯৮৫-তে নিযুক্ত ছিলেন ৮ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯০ হাজার, ২০০২-এ নিযুক্ত প্রমিক্সের সংখ্যা ৮ কোটি ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার, আর মোট কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির শতাংশ আকারে মানুষাক্যাকারিং-এ নিয়োগ কমে গেছে [১৯৮৫-তে ১৭.৭ শতাংশের জায়গায় ২০০২-এ ১১.৩ শতাংশ]। অপরদিকে কৃষিতে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা মোট কর্মসংস্থানের ৬২.৪ শতাংশ ছিল ১৯৮৫-তে, সেটা নেমে এসেছে ৪৪.১ শতাংশে ২০০২-এ। মোট কর্মসংস্থান কিন্তু বেড়েছে আশোচর্যে ৪৯ কোটি ৮৭ লক্ষ ৩০ হাজার থেকে ১৭.৭ কোটি ৭৪ লক্ষ। কৃষিতে সন্নীন অবস্থা, মানুষাক্যাকারিং-এ কিছুটা হতাশাজনক অবস্থা সত্ত্বেও প্রধানত ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহন ও নির্মাণ শিল্পের কাজের কোয়ার বইয়ে বলে অবস্থান। এতখানি কমপ হয়ে ওঠে নি। এই ক্ষেত্রটিতে "অন্যান্য" হিসাবে দেখানো হয়েছে এ ভি-বির সারগিতে) কর্মসংস্থান ১৯৮৫র তুলনায় ২০০২-এ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে — ২০.৮ শতাংশের জায়গায় ৪৪.৭ শতাংশ।

সরকারি জোয়ার ভিত্তিতে তৈরি এ হুবিতে ব্যক্তব অবস্থার প্রতিফলন কোথায়? স্রেফ কারখানা বন্ধ হবার কারণে যীরা কাজ হারিয়ে আলে িত্বছেন, তাঁদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৯০-এর দশকে অবস্থান ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। মোট কর্মরত জন-বর্ধিত শতাংশ হিসাবে ওই বর্গির-মাথা প্রমিক্সের সংখ্যা বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে — ১৯৮৮-তে ০.৭, ১৯৯৪-এ ১.০, ১৯৯৫-এ ২.৩.৮ আর ১৯৯৬-এ ৩.৫.৮। এই প্রমিক্সদের কর্মহীন ব'লে সরকারিভাবে ধরা হয় না, কেননা ওঁরা মাসিক ভাতা পান ১০ ডলার, যাতে কায়দােসে জীবনধারণ করা করিন হয়ে িড়িয়েছে। এ নিকে গ্রাম ছেড়ে যীরা কাজের সন্ধান খুঁজে ফেড়ছেন আত্ম এখানে, ভাল ওখানে — ওঁদের কৃষিতে বৃত্ত ব'লে ধরা হয়ে এখানে। যাটিন হুটি ল্যান্ডস্কার্গ এবং শল ব্যক্তি তাঁদের গবেষণায় দেখেছেন, চিনের গ্রামাঞ্চলে অধিনিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি। এসের-ও কর্মহীন হিসাবে দেখা হয় না ["Contradictions of China's Construction : Domestic", Analytical Monthly Review, July-August 2004]।

ঊর্ধ্ব ইউনিয়ন আফগান চূড়ান্তভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ও পার্টি আমলাতরা আত্ম বখন শিল্পসংস্থার ম্যানেজার আর বেসরকারি

মালিকদের সঙ্গে জোট বেঁধে চিনের মাটিতে নতুন পুঁজিগতি শ্রেণী হিসাবে গিয়ে উঠেছে, যখন তারা তাদের বিরুদ্ধদের দেশের উন্নত হয়ে নিজানত্বন আক্রমণ নারীরাচ্ছে প্রমিক কৃষকের উপর, তখন সোভিয়তরা একতারা সরকারিভাবে স্বীকৃত ইউনিয়ন অল চারনা ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস (এ সি এফ টি ইউ) সরকারের দাবীতে নিউনমূলক কাজকর্মকে সমর্থন জানিয়েছে।

এ অবস্থার চিনের প্রমিক শ্রেণী নিষ্কৃতি হয়ে বসে নেই। তারা কারবার বস্ত্র স্বাধীন ইউনিয়ন গড়েছেন, সংগ্রামের ময়দানে গড়ে-ওঠা সেই ইউনিয়নগুলিকে সরকার বে-আইনি ঘোষণা করেছে। সেই কারণে, প্রমিকরা জোট বীধনে গোপনে, সংগঠিত হয়েছে তাঁদের উদ্যোগে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় কল শ্রমজাগরণ। সেকাও কোথাও হাত দিলেইয়েন তারা বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গেও। চিনের আন যেন ফোয়ারা পনতাত্ত্বিক আন্দোলন (১৯৭৮-৮১) সেওচান লিখনের মাধ্যমে পনতাত্ত্বের প্রতি মানুষের তীব্র আকর্ষণ গড়ে তুলেছিল যখন, তখনি তারক মনন করা হয়, আন্দোলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই আন্দোলনের নগ্ন পুঁজি পালন করা হয় ১৯৮২-এ। তার প্রতি সংগঠিত জানাতে এলে দলে প্রমিকেরা আসেন। তখনি তৈরি হয় বৈজিৎ অটোনমাস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (ডব্লিউ এ এফ)। তার সদস্য সংখ্যা ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার পর্যন্ত বেড়েছিল। তারপন অন্যান্য শহরেও অটোনমাস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন তৈরি হয়। ওই বছর ২২৯ জন চিনের অল-চারনা ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস (এ সি এফ টি ইউ) — কেউ কেউ টাট্টা করে বলেন, সিন্ধুর চৈনিক সংকল্প — এর দাবি মেনে নিয়ে সরকার ডব্লিউ এ এফ-গুলিকে বে-আইনি ঘোষণা করে। ১৯৯১-এ ট্রী ট্রেড ইউনিয়নস অফ চারনা তৈরি হয়, ১৯৯৪-এ বৈজিৎ-এ গড়ে ওঠে সিং ফর দি প্রোটেকশন অফ দ্য রাইটস অফ ওয়ার্কিং পিপল। ওই একই বছরে শেনজেন-এ তৈরি হয় হাজার আন্ত ওয়ার্কার্স ফেডারেশন। রাষ্ট্রের মননপীড়নের মুখে এই ইউনিয়নগুলির অস্তিত্ব লোপ পায়। চিনের প্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে চিনের শ্রমিকদের অগ্রিমণ্ড পরিবর্তিত আর পাওয়া যায়। ওয়ার্কার্স প্রপাল — যেখানে রয়েছে শেনজেন সহ যেট ডিনটি ‘শেন’, — প্রিন্সিপালের ফেডারেশন ফর ওয়ার্কার্স রাইট্‌স এ্যান্ড গ্যারান্টিস নামের সংগঠনটি বেশ করেকার প্রমিকদের বর্ষকি ডাকে বিনা নোটিশে। ১৯৯০-এর দশকে মালদ্বীপ সময় অবধি শুধু ওয়াংসে প্রদেশেই ৮০০টি বে-আইনি ট্রেড ইউনিয়ন বিভিন্ন সময় গড়ে উঠেছে। কেন কোনটি শব্দবাধা অতিক্রম করে এখনো প্রমিকদের সংগঠিত করে চলেছে। ওই ওয়াংসে লামো লামোবার প্রমিকদের ঘটনা ঘটেছে। [তথ্যসূত্র : Marvin J. Levine, *Worker Rights and Labour Standards in Asia's Four New Tigers : A Common Perspective* (Springer, 1997) p.7]

অল চারনা ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস প্রমিকদের লে-অক; কারবারা ফোয়ার — এ সব কোনো কিছুই বিরুদ্ধে কোনেদিনিই দৃষ্ট শোলে নি। বরং নারী প্রমিকদের ওপর বেশি আঘাত নায়েছে বলে

অভিযোগ ওঠায় ওই ইউনিয়ন ফেডারেশন বিরুদ্ধ করে বাল কিছু মহিলা কারবার চমক হওয়া থেকে কবায় যোগ্য শর্তে লস্ট তলসে কাজ যোগাবে; তাঁদের মনোভাব বনগারে হাবে (২৫শে মে, ১৯৯৫ থেকে বর্ষাও ওয়েইল-এর উক্তি)।

প্রমিকদের প্রতিরোধ

২০০১ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, চিনে আনক বস্তুযত সংহার কাজ বহু হয়ে যাওয়ায়, বিংশ বেসরকারি মালিকানাধীন রাতে শোয়ার হস্তাত্তর হবার দলন ৪ কোটি ৫০ লক থেকে ৭ কোটি প্রতিক লে-অফ হয়েছেন। বিশ্ববণিজ্য সংস্থা সদস্য হবার ২ বছরেই মনো ৪ কোটি প্রতিক লে অফ হয়েছেন (Solinger এর সেওয়া এই তথ্য উকৃত হয়েছে Beverley J Silver, *Forces of Labour Workers' Movement and Globalization since 1870* Cambridge University Press, 2003 বইটিতে)। প্রথম দিকে লে-অফ হওয়া প্রমিকত মাসে ১০ থেকে ৫০ ডলার কেওয়া হত তারা হিসাব। একুল শতকে আর তা হচ্ছে না। লে অফ হওয়া প্রমিককে কোক কিছু টাকা ধরিয়ে তার সঙ্গে সংহার সম্পর্ক চিরতরে চুকিয়ে দেওয়া হয়। কেননা, ওই সংস্থাটি আর রাষ্ট্রতত নব, এটি পণিশত হয়েছে দূত উপলগে।

এখন প্রমিকদের জীবনে প্রমিকততা অপর বেড়েছে। অগণ প্রমিকদের আন্দোলনের প্রধান দলি ছিল নব্বুবি আর শেনসন আনবাবের। অথবা রাষ্ট্রাত্তর কোন শিল্পসংস্থার বেসরকারি হাতে (আনিক হলেও) হস্তাত্তর হবার সম্ভাবনা থাকলে বাড়তি দলি উঠে, কাজ বেড়ে নেবার চক্রান্তর থেকে দূর হতে। এখন দাবি উঠছে, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আমলা আর পারি নেতাদের বৃত্তাভুলক শাসিত।

চিনের উত্তরাংশের দুটি প্রদেশে ২০০২ সালের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত প্রায় আশি হাজার প্রমিকদের যে বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে, সেখানেই প্রতিক লোক বৃদ্ধত পায়ে চিনে রাজনৈতিক অশান্তি লনা বীধয়ে। দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে প্রকল টানাশোড়ন চলেছে, তার প্রকল দেখা গেল এই আন্দোলনে। কয়েক মাস ধরে তাড়ি-তৈল খনি ও শোধনাগারের প্রায় ৫০ হাজার প্রমিক সম্মিল হন এই আন্দোলনে। কয়েক মাস ধরে বিক্ষোভ শোভন মিলাওইংহা শহরে ২০টি রাষ্ট্রতত সংস্থা ৩০ হাজারেরও বেশি প্রমিক।

তা ছাে আর লিয়াওইংহা-এর আন্দোলন প্রথম থেকেই রাজনৈতিক কিছু প্রোগান সামনে নিয়ে আসে। সমাজতন্ত্রের বোরবার ভেতর পুঁজিবাদকে চিনে নিয়ে চিনের মাটিতে সমাজতাবাদীদের বদলদারি চালানোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভিযান চালানোর ডাক দেওয়া হয় এ বিরুদ্ধত থেকে। উল্লেখ করা যেতে পারে ‘তাংহিং’ কথাটার অর্থ মহান উদযাপন। নামকরণ করা হয়েছিল ১৯৯১-এ, যথেষ্ট প্রতিকূল অবস্থার উত্তরণের হাড় কিনা শীতকে উপেক্ষা করে এযানকার প্রমিকরা একটি বিশাল তৈলখনি থেকে তেল উত্তোলনে সাফল্য অর্জন করেন, তাঁদের তৈরি শোধনাগারটি চিনকে তদসা জুগিয়েছিল তৈলদাম্পত্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার। এযানকার তেল উৎপাদনের ফলে উত্তরাংশে চিনের অধিবাসীরা শীতের মোকামিলা

করতে সক্ষম হ'ল। সেই কারণে মাও-এর আদান ছিল "শিঙে তুটিতে খেতে দেখে"।

ওই সময় থেকে তুটিং-এর প্রতিক্রমের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহ, রাজনৈতিক ভাবের অনুশীলন — সমস্ত কিছুই দেখা যায়। মাও-এর আমলে প্রতিক্রিয়া দেখা উঠেছিল একটি বিশেষ শিক্ষা নিয়ে — প্রতিক্রমের সত্যজন নেতৃত্বের উপর নির্ভর করছে যোগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। এখন ওই তুটিং-এর প্রতিক্রিয়া দেখানো, বর্তমান সরকার প্রতিক্রমের ওপর বিশ্বাসের ভাবনা রাখতে পারছে না। তারা প্রতিক্রমের মহাকাঙ্ক্ষিক কোং আর খেতিয়া শব্দ প্রকাশনের অনুগ্রহভাজন ক'রে রাখতে চায়।

প্রতিক্রিয়া শিক্রমের মধ্যে আলাপ আলোচনা ক'রে বুঝতে পারলে, এখন সে-অনু হওয়া প্রতিক্রমের সরকার আর বসিয়ে বসিয়ে তারা দেখে না প্রতিমা। সে থেকে টাকা বহির্ভে বেওয়া হবে তা নিয়ে ক'দিন বা চলবে তাইসে ক'টা আলোচনা করলে, জানাবেন "সোহার তৈরি ভাতের ব্যক্তি" মেয়ে যাবার কথা, সে ব্যক্তি তে-এইয়ে করা এসব নানা প্রশ্ন। — সরকার ও পার্টির পক্ষে রীতিমত অস্বস্তিকর সব প্রশ্ন তুলতে থাকেন তারা একের পর এক।

প্রতিক্রমের সংগঠিত করার অসুবিধে লিয়াওইয়াং-এ চারজন বসিয়ে চেওয়া প্রতিক্রিয়া (Xiangbiao)-কে পুলিশ প্রেস্টার করে। তাইসে অসুবিধে, তাইসে উপস্থানিতে প্রতিক্রিয়া একটি বন্ধ ফেরে এলাস প্রেস্টার প্রতিক্রমের তিরিহি-তে ২০০০ সালের মার্চ মাসে আলাপ আর কমপ্যুটারের সফেরে শেখেন চারটি পোস্টার সেটছিল। একটিতে হেসিডেও জিয়াং জেইনিয়ে তুটিং: অসুবিধেতে লিয়াওইয়াং-এর প্রবেশিক সরকারকে দেখা চিহ্নি; তুটিংটি লিয়াওইয়াং-এর জনগণের উদ্দেশ্য দেখা, কিছুটা প্রেক্ষাপট: জনগণ আপনারা কি ওজনবর্ষ উদযাপন করছেন? চতুর্থটিতে একটি ব্যাখ্যামূলক দেখা — ওই প্রেস্টার নেতারা প্রতিক্রমের প্রতি তাইসে দায়িত্ব লঙ্ঘন করছে, কিভাবে জালের হয়ে তারা কেউ দিয়েছে কারগণতা? — তার তিরিহি। ওই কারগণনা বিশ বছর চাকরি করার পর কারগণনা বন্ধ হওয়ায় তাইসে প্রেস্টার ২০০০ ডলার। নেতাদের ওই পোস্টারে ক'না করা হয়েছে দুইটিগত স্বীকৃতি হিসাবে।

চাঙ্চিহ্নি গেট জেডো হবার আদান জানানো চারটি পোস্টার অসুবিধে হতেছে: দু'বছর কামেও দেখা গেছে, পুলিশ সেগুলি সরায় নি। প্রতিবাদ করলে কি ফল হয় সম্ভবত সেই বিষয়ে শিক্ষা নেবার মতলবে।

লিয়াওইয়াং-এ প্রতিক্রমের প্রতিবাদ জোড়ালো হয়ে উঠেছিল একটি কারণে। বেইজিং-এ নবমত্বীয় শিপুলুং কংগ্রেসে (কোম্পানির প্রতিনিধিরা জড় হন এই কংগ্রেসে) লিয়াওইয়াং শহরের প্রাক্তন নগরপাল তাঁর বক্তৃতায় হস্তাক্ষর করেন (পরে সরকার-নিরস্ত্রিত টেলিভিশন দ্বারাও সম্প্রচারিত হয়) যে, লিয়াওইয়াং-এ কোনো একজনও সেকার হানুং নেই। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে (চীনের) তখন হুজুংহিম করা নীত। ঘর গরম রাখার জন্যে শক্তি ব্যয়ের বিল নেটোতে দিয়ে বসিয়ে-বেওয়া প্রতিক্রমের তখন কালমা ছুটি বাবার যোগাড়।

লিয়াওইয়াং আর তুটিং-এর মত উত্তর চীনের যু সান-এর রাজ্য নেমেছিলো জাপি হাজার কাং-হারানো প্রমিথ (Xiangang) তাইসের মধ্যে প্রায় হাজার বছরক মানুস গিয়ে বাক্য অটিক দিলেন পুরায়। ২০০২ সালের মার্চের মাসমাঝি নাগাল এটা ঘটে। পুলিশের অসুবিধার পরেও না ক'রে আশোনে জাপি নেন যু সান-এর কল্যা, সিমেন্ট, ইম্পাত আর পেট্রোজার্মানিক শিল্পের কাজ হারানো প্রতিক্রিয়া। তারা দাবি করেছিলেন, বেইজিং থেকে মত তাতা। তখনকার মত যুসানের প্রশাসনিক ক'টার প্রত্যেক প্রতিবাদকারী হাতে ৯ ডলার টাক দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

এই প্রতিবাদ আপশ্রুত সামলে নিলেও চীনের তেজীয়া সরকার বুঝতে পারে, গণ-আন্দোলনের সম্ভাবনার স্বীকৃতি দিয়ে আছে এবই মধ্যে। মাও-এর আমলে হানুংয়ের তীরনে নিরাপত্তা ছিল, এখন আর সে রামও নেই, সে-অভ্যর্থনাও নেই। পার্টি এবং সরকারের নেতারা পুলিশের স্বীকৃতি এনে বুঝেছে। এখন সেটি হুইকহ, তাকে কেউ ফেলার সাধা নেই ওদের — হানুংয়ের কথাই বার্তার প্রায় প্রকাশ পাচ্ছে এ কথাগুলি। সেইভাবে পার্টির নেতারা দ্বিগুণ ক'রে ফেলছে, তুগ্মমূল্যের কেউ যদি স্বাধীনভাবে চলতে চায় তাহলে তার সম্ভাবনাকে উৎসাহিত করতে হবে। সেই কারণে নামানো হচ্ছে রাষ্ট্রের হিসে অসুবিধা।

যে ক্ষাপারটা অসুবিধা, তা এই যে প্রতিক্রমের সেই সম্ভাব্য এবং রক্তচক্ষুকে কখনো কখনো পরোয়া করলে না। ২০০০ সালে যু সান চাইগার প্রাক্তরম কল্যাখনিতে প্রায় তিরিশ হাজার বসি প্রতিক্রমের বিদায় জানানোর পর জনমানসে বিরূপ প্রতিপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রতিক্রমের তার বিরুদ্ধে উঠে গাঁড়ানোর জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হুইকহেন তখন থেকে। তারা দেখলেন, যু সান-এর কল্যাখনিতে ২০ বছর কাজ করার পর তাঁদের সে-অনু করার সময় থেকে ৪৪০০ ডলার হাতে ব্যয়কে চেওয়া ছিল। এমনটিতে মনে হবে হয়তো এ তো বিশাল পরিমাণ টাকা। করবত তারা এ যে অসুবিধে বুঝি সামান্য কটা টাকা, সেটা বুঝতে পারলেন, রাষ্ট্র তার দায়িত্ব চুকিয়ে দেওয়ার পর যখন তারা ব্যয় হচ্ছে সমস্ত খরচের দায় বহন করতে। ঘর গরম রাখার জন্যে, চিকিৎসা, পেনসন বা বিহার জাদো (রাষ্ট্র যে খরচগুলো দেয় তাই) তাইসে লাগছে বছরে ১৪০০ ডলার। অর্থিক অনটন প্রকাশভাবে এই প্রথম তাঁদের স্বীকৃতি প্রায় কল।

অন্য তারা চেপের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, পার্টি আর সরকারের নতুন প্রকল্পের নেতারা থেকে আরম্ভ করে পুরোটা মনিরয়া পর্যন্ত তি আদামসে বিন কাটাচ্ছে। তাদের পরিবারের লোকজনকে ক'মকে গাড়ি, সেলফোন বা বাসপার্শ্ব জুড়োর জন্যে বা খরচ করে প্রতিবাদ, তা দিয়ে একটি চিনা পরিবারের ক'ত বছর চলবে তার ঠিক নেই [তথ্যসূত্র: Robert Marquand, "China faces growing labour unrest; Christian Science Monitor, March 25, 2002]।

চীনের উত্তরাংশে প্রতিক্রমের বিরোধ যেমন জাপি আকার ধারণ করেছে, তার ঠিক একই অবস্থা দক্ষিণের অনেক শহরেও। এখানে আদমা সাংহাই থেকে ১৫০ মাইল দূরের একটি শহুরে শহর দাংফং-এর

উপকণ্ঠে এতটী পশু কারখানার প্রতিক্রমের আন্দোলনের বিষয়ে কিছু কথা বলা এই বিষয়ে স্বেচ্ছা চানতে চাই।

এই কারখানার দু'হাজার প্রমিত (বেলিয়ানগেই নাকী প্রমিত) ওয়াফেও বহু আকর্ষণীয় স্থান তখন মাটি কামড়ে পড়ে থেকে বেশোকাচারে ধর্মঘট পবিত্রাঙ্গনা করেন। ধর্মঘট শুরু হয় ২০০১-এর ১৬ই ডিসেম্বর, তাঁরা সাতটি নীচম গলি দিয়ে ১১ দিনের মাঝার প্রতিক্রমের ধর্মঘট ভেঙে দেয় সরকার।

এই কারখানার প্রতিক্রমার ফোফোনে, হাজার হাজার সাতটি সিল্প প্রতিটি হয় বহু হয়ে গেছে নতুবা বহু হওয়ার মুখ, না হয় স্ত্রি হয়ে গেছে। সার্বভৌমত্বের কাজের নিরাপত্তা আর মানব সুরক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিনিময়ে এখন স্ত্রী হয়ে গেছে-অন্য। অনেক সময় তাঁদের সারা জীবনের সঞ্চয় হারিয়ে নিয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত ম্যানেজার-রা। তাঁরা দেখেছেন, যে পাটি একমুদ্রার সবার জন্য উন্নততর জীবনের স্বপ্ন দেখাত, আজ তাদের কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।

১৯৯০ সালে পুরোনোয় বেরকারিকরণ ডাঙরা শুরু হয়নি। বেঞ্জি-এর সরকারি আদালত। হানিও অফিসারদের কল, পূর্বল সংস্থার শেয়ার প্রতিক্রমের বেড়ে মাও। প্রতিক্রম প্রত্যক্ষত তাদের কারখানার কিছু শেয়ার কেনে, তবে বেলিয়ানগ শেয়ার বইল রাষ্ট্রের হাতে। পরে কারখানা চলাব কিছু দিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তবে পরে আবার শেয়ার বেতার বেতার প্রতিক্রমার বেঁচে বলে, পেনাও তারা কারখানার কোন শেয়ার আর তারা কিনতে ব্যক্তি নয়। প্রতিক্রমের সন্ততিও বুঝতে পেরে অফিসারেরা ইনিয়ে বিনিয়ে মুনাবার উচ্চল সম্ভাবনাও তথা তুলে ধরে। প্রত্যক্ষ ধর্মকর মুরে বলে, শেয়ার না কিনলে ফল পেতে হবে হারেনাভেতে।

১৯৯৬-এ 'সংস্কার'-এর চেউ এসে লাগে দাফেও-এ। চার হাজার প্রতিক্রমের বাধ্য করা হয় শেয়ার কিনতে। প্রত্যক্ষ প্রতিক্রম পাঁচশ-ছাশে ডলার পরক করে কারখানার শেয়ার কিনল। বছর-বছর ডিভিডেন্ডে পাথর কথা কলপেও পাঁচ বছর তাদের ডিভিডেন্ডে ফেওয়া হেরেছে মাত্র একবার। অবশেষে নভেম্বর ২০০১-এ সংস্কারে দুর্ভিক্ষে বেউলিয়া ফোফা করার পরো প্রস্তাব পাঠালে কারখানার নবনিযুক্ত ম্যানেজার। কারখানার সম্পত্তির তথ্য আড়াল করে অফিসারেরা খুব কম মানে হার্টের শেয়ারগুলি কিনে নিয়ে কারখানার কর্তৃত্ব নষ্ট করতে চায়। এমন কি, প্রতিক্রমার জানতে পারে ম্যানেজার প্রতিক্রমের মাইনে গটার তাল করেছেন। ম্যানেজার এমনভাবে কাপড় তৈরি করল যাতে দেখানো হয় কারখানা প্রতিক্রমের কাছে পার দিয়েছে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার। তার মধ্যে ২০ লাখ ডলার প্রতিক্রমের শেয়ার, আর ৩০ লাখ ডলার পেনসন ব্যবস্থা প্রতিক্রমের ফেওয়া। আরো দেখান হয়েছে সরকার মিলকে দিয়েছে ৮০ লাখ ডলার প্রতিক্রমের সেনা বেটোনের জবো, আর ফাফেও কল খোঁজা গেছে তাদের জন্যে কলপাফুলক করতে।

প্রতিক্রমার প্রায় করে সে টাকা গেল কোথায়? তার উত্তর ফেওয়া দুইয়ের কথা, প্রতিক্রমের মাইনে কেউ ফেওয়া হলো। মাইনে হয়ে গেল আফেকার হস্তুরির অর্ধেক। প্রতিক্রমের কথা হলো, নতুন একটি চুক্তি সেই করতে, ওই চুক্তিতে সেই অর্ধেক হস্তুরি দেবার ব্যাপারে প্রতিক্রমের সম্মতি রয়েছে।

তখনি ভাঙ্গল বিদ্রোহ। প্রতিক্রমের কোন নেতা নেই, সংগঠন নেই। তারা কারখানা ছাড়ল না। ম্যানেজমেন্ট বলল, তোমাদের প্রতিনিধিত্বের নাম বল। প্রতিক্রম (সে-প্রস্তাব-ও ব্যক্তি করে)। কোন ব্যানার নেই, ফেস্টুন নেই, প্রোগ্রাম নেই, তবু প্রতিক্রমার আন্দোলনে অন্যতম।

পুলিশের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে প্রতিক্রমের বহুদুখ ঘটিছে মিসের ভেতর — দু-একবার নয়, বারবার। পুলিশের দলবল ছেঁটা, বলপ্রয়োগ তার কারখানার ভেতর থেকে প্রতিক্রমের বের করে ছেঁড়া। কখনো পুলিশ তাঁদের চোখে মুঠি ধরে দিত দিত করে ট্রেন ট্রেন নিয়ে গেছে। কখনো কেন্দ্রস্থিত সন্ত্রাস লিগে তাঁদের গরবে আঘাত করেছে। প্রতিক্রমার ত্রাতও ভুল হয় নি। প্রতিদিন প্রতিক্রমের ওপর আক্রমণ নামত রাতে, দিনের আসল দুটালে পুলিশ পরিচয় নেওকা হেঁটে।

ধর্মঘটের চতুর্থ দিনের রাত ম্যানেজমেন্ট মিসের ভেতরটা গরম রাখার বহু কল করে নিল। প্রতিক্রমার একে অসহ্যত চড়িয়ে ওয়ে গিয়েছেন, কেউবা খোঁটা কেউ বা কথক এমন দিন-চাবকন চড়িয়ে বলে থাকছেন। কিন্তুতাই কারখানা ঘেঁড়ে বোলায় না।

রাষ্ট্র নির্যাতন প্রচার মাধ্যম কোন ব্যবস্থা নেই নি তাদের বলাকেই বিবাহ। তবে পুলিশের প্রতিবিধি বা সরকারি অফিসারদের কথবাহী পাচার করছেন কিছু সংখ্যক মিল অফিসার।

রাষ্ট্রের পর রাত চলে এই বেলা। পুলিশের সংখ্যা বাড়তে থাকে পরপর। শেষে ডিভিও কার্যের পিছনে আন্দোলনের নেতাদের চিহ্নিত করার বাধা আসতে হলো। প্রেষ্টার করা হয় ৩৮ বছর বয়স্ক মিসের ২০ বছরের অভিজ্ঞ একজন প্রতিক্রমের। কিছু প্রতিক্রমের মিসের অর্ধেক তথ্য পাচারের অভিযোগে প্রেষ্টার করা হলো। প্রতিক্রম নয়, এলাকার এমন কিছু ব্যক্তি যাঁরা প্রতিক্রমের আন্দোলনের সংরক্ষণ চাননিহেঁচিয়েন, তাঁদেরও প্রেষ্টার করা হয়।

নির্ভরশীল শহর ইয়েনভেও-এ এতটী রাষ্ট্রায়ত্তর কাপড়ের কল প্রতিক্রমার ধর্মঘট করেন। আরেকটী নির্ভরশীল শহরে প্রতিক্রমের দ্বারা অসহ্যত হয় এক মার্কিন ব্যবসায়ী। আর একজন প্রতিক্রম দুর্ভিক্ষ নিয়ে বিবাহ চলার সময় স্ত্রি হয়ে একটি মুনাবারকেই তখনই করে যেন। এইভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আন্দোলন ছড়িয়ে মাছিল। পাশ্চাত্য-এর কারখানার প্রতিক্রমের শত্রুতা করতে পুলিশের সঙ্গে নামল সামরিক বাহিনীর ইউনিট। প্রায় দশাশু ওক হয়ে যার কারখানার ভেতর। তবুও প্রতিক্রমার দলনেতা না। এমিকে বেজিং-এ কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে কথা করার জন্যে ঘাঁড়ের পাঠানো হতেছিল, তাঁদেরও প্রেষ্টার করা হলো। অবশেষে ২২শে ডিসেম্বর কারখানার গেট ডালা কোলাসে হলো। প্রতিক্রমার শীতে কাবু হয়ে, ত্রিকমত খাবার না পেয়ে অনুষ্ট হতে ওক করলেন। তাঁর মননবীড়নের ভেতর দিয়ে মাইনে-কাটার প্রস্তাব মেনে নিতে প্রতিক্রমের বাধ্য করা হয়। ২৭শে ডিসেম্বর প্রতিক্রমার ব্যক্তি যোগ দিলেন। এই হচ্ছে ডিনের কমিউনিস্ট পৃথিবীয়া ফাসিবার। পাটি ও সরকারের স্বৈরাচারিক শক্তির সঙ্গে নতুন শৃঙ্খলিত জেবীর আক্রমণ।

টিক এইভাবে নামের প্রমিতীকী জনতার ওপর। বোকা কণে প্রমিকসা এখনো নিচুই ইংলেন্ডে [তথ্যসূত্র : Philip P Pan, "High Tide of Labour Unrest in China" *Washington Post Foreign Service*, January 21, 2002]।

চিনের ইতিহাসে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ আর ক্রোধের পাহাশে টেকেনি অনেক সরকার। সেই কৃষক জনতা আবার অশান্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সাথে যুক্ত হচ্ছে লে-অুক হওয়া প্রমিক, সংগ্রামী পেনসনকারী, আর লক্ষ লক্ষ মানুষ খাঁস গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে ভিড় জমাচ্ছেন শহরে, বীরা হলো হয়ে বৃজয়েন বেঁচে থাকার সুপুতসঙ্কল। গনতন্ত্রের সপক্ষে বাণক মানুষের অনুভূতি আর সাড়া জাগছে বেশমত। বামপন্থীরা এখনো সংখ্যায় সামান্য। পুন্ডিবাবী উন্নয়নের বিপ্লোভিতা করার তাঁদের প্রতি মানুষের সমর্থন কাজছে। আর তখনই নামানো হচ্ছে তাঁর দমননীড়ন।

ওয়াশে শহরের কাছে দুটাই টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে প্রমিকসের একটি ধর্মঘট প্রতিবাসের চোখা নেয়। মাইনে বাড়ানোর দাবিতে সমবেত ধর্মঘটী প্রমিকেরা কোণ্ডে গাড়ি ভাঙচুর করেন। তাঁদের ছড়তছড়ত করতে পুলিশ টিয়ারগ্যাসের শেল ফাটার আর তিন হাজার প্রমিকের জমায়েতের ওপর বেশজোয়াভাবে ডাড়া চালায়। সাংস্কৃতিক বহরগলিতে কারখানার কু-পরিসালনা, আর গরিবদের জীবন কল্লার মনোভ্রমেন সরকারি কার্যতা এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। প্রমিকদের অভিযোগ, বালপূর্বক বাড়তি সময় কাজ করানো, মাথা লাগানো থেকে প্রমিকদের বঞ্চিত করা, মাইনে কেটে নেওয়া আর প্রমিকদের অধিকার হরণ করা চলছে সরকার ও পার্টি বেতনের মদতে। চিনা প্রমিকদের শ্রৌলিক অধিকারগুলি হরণ করা হয়েছে — তাঁর মধ্যে মত প্রকাশের এবং সংগঠিত হবার অধিকার অন্যতম। এরন কি, তাঁদের অত্যাধ-অভিযোগের প্রতিকারের কোন পথও খোলা রাখা হচ্ছে না। হাটীন, বৃত্ত গনতান্ত্রিক প্রমিক সংগঠন থাকলে তার মাধ্যমে প্রমিকদের কোত প্রকাশের ব্যবস্থা থাকত। সরকার বাম সাধছে, অনুমতি দেবে না।

২০০৪-এর মার্চ-এপ্রিল হাজার হাজার প্রমিক বিক্ষোভ কোণ্ডে ওয়াশেতে। সেন্টা ইন্টারন্যাশনাল সু ক্যাটরিতে প্রতিবাস চলে দীর্ঘ কালের সহ্য, সামান্য মজুতি, আর খাশেব নিয়মানের বিলম্ব। প্রতিবাসকারীরা ফ্যাক্টরির বহুগতি ভাঙচুর করে, ক্যাটরিনেও ভাঙচুর চালায় আর গাড়িগুলিকে উটে দেয় রাশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেস্টে ডিপার্টমেন্টের খবর, এই ঘটনার ৭৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়, তাদের মধ্যে তিনজনের বয়স ১৮-র নিচে। ওয়াশিংটনে পোস্ট-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এরকম ঘটনা ঘটছে বিক্ষোভের মত — যেসব চাষি জমি হারিয়েছেন, বেসমন্ত প্রমিককে লে অফ করা হয়েছে আর যেসমন্ত গ্রামবাসী মনে করেন সরকারের দুর্নীতিগ্রস্ত অতিসারসের দ্বারা প্রতারণিত হচ্ছেন, তাঁরাই কোণ্ডে চেটে পড়ছেন। পানসি প্রদেশে গ্যাসে নীড়িত ১০৬ জন খনি প্রমিকের দুর্ভাগ্যে (নভেম্বর ২০০৪-এ) শোকাহত জাতীয় পরিজন করলা খনির অতিস আর হানীত সরকারি প্রশাসন তখন চুকে পড়েন। দেশের পূর্বাংশে দুখণ ছড়াচ্ছে একটি ওষুধ কারখানা, রেগে হুঁসে সেখানকার কৃষকেরা কারখানার হামলা চালায়।

কেন এই অসন্তোষ, কেন এই অশান্তি? তার উত্তর খুঁজোছে ডয়েস অব অমেবিকা (ডোয়া)। মজার কথা, সেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মতের প্রতিফলন। "সেবর আনরেটে ইন চায়না" শীর্ষক সম্পাদকীরতে (২২শে জুলাই, ২০০৪) তোলা লিখেছে :

চিনে আইনের শাসনের অভাব রয়েছে, সেই স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাও। প্রমিকদের সংগঠিত হবার অধিকার, ভাল কাজের পরিবেশ আর মজুরির দাবিতে আন্দোলন করার অধিকার নেই, আর সেই ধর্মঘটের অধিকার, যদিও গত বিশ বছরে কলকরখানা অনেক হয়েছে [http://www.voanews.com/uspolicy/archive/2005-07/2005-07-22-voa2.cfm, accessed on 19/8/2007]।

পুন্ডিবাবী দুনিয়ার বিশ্বাসের এ কি হাল! চিনে প্রমিকদের সংগঠিত হবার অধিকার প্রমিকদের নেই। তাঁরাই জানে আজ কিনা খোশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ও উদ্বিগ্ন!

ডাক্তার বিনায়ক সেনের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তুলে নিন, অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিন

১৬ জুন, সোমবার

[মূল ইংরেজি অবিলম্বে বাংলা তর্জমা]

১৪ মে [২০০৭] থেকে ডাক্তার বিনায়ক সেনকে একটানা আটক রাখায় আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীরা মর্মাহত। ডাক্তার বিনায়ক সেন হলেন ছত্তিসগড় শিল্পমূল্য ইউনিয়ন অব সিভিল সিবার্টিজ (পি ইউ সি এস)-এর সাধারণ সম্পাদক। এছাড়াও তিনি হলেন ভারতের প্রাচীনতম একটি নাগরিক অধিকার সংস্থা পি ইউ সি এস-এর জাষ্টিস ইণ্ড সচিবর্ত।

একদা ভারতে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বৃহত্তম কর্মসূচী বোমের সবচেয়ে অনুষ্ঠিত অঞ্চলগুলিতে, সবচেয়ে গরিব মানুষগুলির কাছে স্বাস্থ্য-পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার এক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন। ডাক্তার সেন সেই মৃতপ্রায় ঐতিহ্যেরই ধারক ও বাহক। গত তিরিশ বছর ধরে তিনি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে স্বাস্থ্য-পরিষেবার কাজে মন দিয়ে আসছেন। তিনি ছিলেন রাজ্য উপসভা কমিটির সভ্য, যে-কমিটি ছত্তিসগড়ে লোকসমাজ-ভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মী কর্মসূচির সূত্রপাত করে। প্রমিথব্রহ্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত যে-সমিতি হাসপাতাল পরি-রক্ষাহারাতে গত পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছে, তিনি তার স্থপতিত্বের মধ্যে একজন। ডাক্তার সেনকে প্রেষ্টার করার ঘটনাটিকে আমরা ভারতের গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের প্রতি এক গুরুতর আঘাত বলে মনে করি। ছত্তিসগড় সরকার তার 'সলুওয়া জুডুম' অভিযান মারফত যে-প্রবল অত্যাচার চালাচ্ছে, যে সমস্ত নিরপেক্ষ সংগঠন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ছত্তিসগড়ের পি ইউ সি এস তার অন্যতম। নিম্নোক্ত সংঘর্ষ, ধর্ষণ, গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, অত্যাচার আদিমণীয়ে ভিটেছাড়া করা এবং তার পরিণতিতে তারের জীবিকা উপার্জনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাকসী বেশ কয়েকটি নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়েছে। স্পষ্টতই, ছত্তিসগড় রাজ্যে মানবিক অধিকার এইভাবে দলিত হওয়ার বিরুদ্ধে পি ইউ সি এস এবং আরো অনেকের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদী কঠক ভয় দেখিয়ে স্বত্ব করার উদ্দেশ্যেই ডাক্তার সেনকে প্রেষ্টার করা হয়েছে। সম্ভ্রতিকালে রাষ্ট্রীয় হয়রানির পান্না আরো প্রসারিত হয়েছে। হয়রানির শিকার হয়েছেন : ডাক্তার ইলিনা সেন, যিনি বহু বছর ধরে নারী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন; নন্দীঘাটা ঘোঁরাই পৌরস্বয়ংসংস্থাপ্রাণ্য, পি ইউ সি এস-এর রক্ষা বিবেধী এবং পি ইউ সি এস-এর আরো অনেক সক্রিয় কর্মী।

ডাক্তার সেন প্রেষ্টার হয়েছেন 'ছত্তিসগড় স্পেশাল পারলিক সিভিটরিটি অ্যাক্ট, ২০০৬' এবং 'আনুলমূল অ্যাক্টিভিটিজ (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট, ২০০৪' মোতাবেক। ফের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তা একেবারেই ডিগ্ৰিহীন। বেসাইনি (আনুলমূল)

কলতে কী বোঝানো হচ্ছে তা এখানে ঘাবলানই অস্পষ্ট এবং মনগড়া : এছাড়া যাবতীয় অসন্তোষকে স্বত্ব করে নেওয়ার জন্য এতে রাষ্ট্রকে ব্যবসায় ক্ষমতা প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই কারণে ক নাগরিক অধিকার রক্ষা গোষ্ঠী এই দৃষ্টি অব্যাহতবিক অইনে বিকল্পে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই ঘটেছে। এই দৃষ্টি অপ্রত্যক্ষ অইনের শিকার হয়েছেন ডাক্তার সেন এবং ছত্তিসগড়ের পি ইউ সি এস।

আমাদের দাবি :

- ১। ডাক্তার সেনের ওপর থেকে যাবতীয় অভিযোগ তুলে নিয়ে অধিকারে উত্তরে মুক্তি দিতে হবে।
- ২। অন্যান্য সক্রিয় কর্মীদের হয়রানি করা ও হুমকি দেওয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
- ৩। 'সলুওয়া জুডুম' অবিলম্বে ডেও দিতে হবে।
- ৪। 'ছত্তিসগড় স্পেশাল পারলিক সিভিটরিটি অ্যাক্ট, ২০০৬' এবং 'আনুলমূল অ্যাক্টিভিটিজ (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট, ২০০৪' অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

স্বাক্ষরকারী :

- প্রোফেসর মোহন চন্দ্র
- প্রোফেসর বোমিলা পাণ্ডা
- প্রোফেসর ইব্রাহিম হাবিব
- ডক্টর অশোক মিত্র
- হাবিব তনভির
- অরুণভী রায়
- প্রোফেসর অমিত্র বাগাটী
- প্রোফেসর প্রভাত পট্টাচার্য

এক আরো ২৭ জন বিশিষ্ট ভারতীয় নাগরিক।

উৎস মানুষ প্রকাশিত বই

- | | |
|---|------------------------------|
| • বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান ১ | □ বিজ্ঞানকে মুখোশ ক'রে |
| □ ঐ ২ | □ বিবেকানন্দ অনা চোখে |
| • অপ্রিয় অনৌকির অস্তরালে | □ ঐ : আরো কিছু বিতর্ক |
| □ গ্রন্থিউসের পথে | • তিন অবহেলিত জ্যোতিষ |
| □ স্বাস্থ্যের বৃদ্ধ | □ সাপ নিয়ে কিংবদন্তী |
| • ইতিহাসের দিকে ফিরে: ছেচমিশের দাসা | □ চেনা বিষয় অচেনা জগৎ |
| • বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ | □ খাবার নিয়ে ভাবার আছে |
| □ জ্যোতিষ কি আসে বিজ্ঞান | □ লুপ্ত হয়ে যায় বদশতুমি |
| □ এটা কী ওটা কেন | • হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান |
| □ কী আর কেন | □ প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় |
| □ চলতে ফিরতে | • প্রেসিডেন্ট বুশের এই যুদ্ধ |
| • যে গল্পের শেষ নেই | • বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু |
| • শেকল ভাঙা সংস্কৃতি | • নিজের মুখোমুখি |
| • প্রতিবেশ : অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে | • আরজ আলী মাতুব্বর |
| • আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান | • বর্তমানে পাথর যাচ্ছে |



উৎস মানুষ-প্রকাশিত বই সংগ্রহের কেন্দ্র

বই - চিত্র

১৫, বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

কফি হাউসের তিনতলা

দূরভাষ : ২২৪১-৬৮৪৫, ৩২৯০-৭৮৩৭